পত্রস্মৃতি

পরিমল গোস্বামী

কলকাতা : এলাহাবাদ : বোম্বাই : দিল্লী

প্রথম প্রকাশ :
অগস্ট, ১৯১১

মুদ্রাকর ও প্রকাশক :
শতদল গোস্বামী
নব গ্রন্থনা
৮ কৈলাস বোস স্ট্রীট
কলকাতা ৬

পরিবেশক :
রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা ১২
৯৪ সাউথ মালাকা, এলাহাবাদ ১
১১ ওক্ লেন, ফোর্ট, বোম্বাই ১
৩৮৩১ পাতৌদি হাউস রোড, দরিয়াগঞ্জ, দিল্লী ৬

ব্লক ও মুদ্রণ :
স্ট্যাণ্ডার্ড ফোটো এনগ্রেভিং কোং
১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা ৯

কভার ব্লক :
সরকার'স ক্রোমোটাইপ স্টুডিও
৪২ রামধন মিত্র লেন, কলকাতা ৪

বাইণ্ডার :
শোভনা বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
৫১/১এ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা ৯

দাম : বাইশ টাকা

ভূমিকা

পত্রস্মৃতি আমার স্মৃতি পর্যায়ের চতুর্থ পুস্তক। পূর্বের তিনখানা— ১। স্মৃতিচিত্রণ ১৯৫৮, ২। দ্বিতীয় স্মৃতি ১৯৬২, ৩। আমি যাঁদের দেখেছি ১৯৬৯।

বর্তমান পত্রস্মৃতি অন্যগুলির থেকে কিছু স্বতন্ত্র। আমি যে ভাবে এ পুস্তকের পরিকল্পনা করেছি, সে রকম পুস্তক বাংলা ভাষায় সম্ভবত আর নেই।

এ পুস্তকে দুরকম পত্র ও দুরকম স্মৃতি আছে। অনেকগুলি পত্র নিজস্ব মূল্যেই অনেক বেশি স্থান জুড়েছে, আবার অনেকগুলি পত্রের সঙ্গে স্মৃতি বেশি স্থান জুড়েছে। পত্রগুলির পৃথক পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন, শ্রেণী-বিভাগের প্রশ্নও ওঠে না। তবু মোটামুটি ভাবে শুধু বলা যায়, অনেকগুলির চিত্র-ধর্মিতা আমার বিশেষ ভাল লেগেছে, অনেকগুলির সঙ্গে চিত্তগ্রাহী নানা তথ্য বা সংবাদ জড়িয়ে আছে, এবং অধিকাংশ লেখকেরই স্বভাব বা রচনা বৈশিষ্ট্যও উদঘাটন করেছি। আবার এমন অনেক চিঠি আছে যা বিশুদ্ধ কৌতুক রূপে উপভোগ্য মনে হয়েছে। মোটকথা পত্র-পরিচয়ের সঙ্গে লেখক-পরিচয়ও যথেষ্ট দেওয়া হয়েছে।

মোটের উপর হাল্কা সুরে লিখতে গিয়েও সব জায়গায় পারিনি, অনেক পত্রের বিষয়বস্তু বা পত্র-লেখকের মেজাজ আমাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। এ পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত অল্প কয়েকখানা পত্র অন্যত্র অন্য উপলক্ষে প্রকাশিত হলেও তা এতে স্থান পেয়েছে অন্য পটভূমি ও ব্যাখ্যায়।

এ পুস্তকে শুধু আমারই তোলা ফোটোগ্রাফ থাকবে এই পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় ফোটোগ্রাফ কিছু বাদ পড়েছে। জীবিত পত্র লেখকদের, যাঁদের ফোটো নেই, তাঁদের দুএকজনকে ডেকেছিলাম তুলব বলে, তাঁরা বলেছিলেন ১০ই মার্চের ইলেকশনের পরে আসবেন। ইলেকশন পার হওয়ার পরে তাঁরা পথে বেরুতে আরো শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন বলে আর আসেননি।

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর একখানা চিঠিতে দেখা যাবে, তাঁর যে ফোটো তুলেছিলাম তার এচিং কৌশল তাঁর ভাল লেগেছিল (৬৬-৬৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। সেই খানাই এ পুস্তকে ছাপা হয়েছে, কিন্তু এচিং স্ক্রীন নষ্ট হয়ে

যাওয়াতে এচিং-এর সৌন্দর্য আর দেখানো গেল না। সুধাকান্ত রায়চৌধুরী রবীন্দ্রনাথকে পরিচালনা করছেন, এই ফোটোগ্রাফখানা কিছু অস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ছাপা হল কারণ রবীন্দ্রনাথের পৃথক ছবি আমার কয়েকখানা তোলা থাকলেও সুধাকান্তের ছবি আর নেই। ছবি অস্পষ্ট হলেও তাঁর সম্পর্কে, যাঁরা তাঁকে চিনতেন, তাঁদের স্মৃতি আজও অস্পষ্ট হয়নি আশা করি।

সাধুভাষায় যাকে মুদ্রণ প্রমাদ বলে, এবং সাধারণত যাকে ছাপার ভুল বলা হয়, তা এতে কিছু কিছু রক্ষা করা হয়েছে বাংলা বইয়ের ঐতিহ্য রক্ষার জন্য। যেমন 'উষ্মা' কথাটি 'উষ্ণা' হয়ে আছে (পৃঃ ৮) অথবা 'প্রতীক' 'প্রতীপ' হয়েছে (পৃঃ ২৬৭) এবং এই রকম কয়েকটি, এবং সেগুলি এত জঘন্য না হলেও আছে। এই জাতীয় ভুল বুদ্ধিমান পাঠক ভুল বলে বুঝতে পারবেন বলে সংশোধন তালিকা ছাপা অপ্রয়োজনীয় মনে হল।

আমি ব্যক্তিগত সম্বোধনে কাউকে তুমি বলি, কাউকে আপনি। সে সব ব্যক্তির সর্বনামেও সে ও তিনি রেখেছি। অধ্যায়ের সংখ্যা অনবধান বশত সহজতর অধ্যায়-১, অধ্যায়-২, প্রভৃতি না লিখে প্রথম পরিচ্ছেদ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ এইভাবে লিখেছি। প্রথমে ভাবতে পারিনি পুস্তক এত বড় হয়ে যাবে। তাই পরিচ্ছেদ সংখ্যা কিছুদূর এগিয়ে যাবার পরে ক্রমে সংখ্যার বিশেষণ লিখতে অসুবিধা বোধ হতে লাগল, এবং ৩০এর ঘর ছাড়ার পরে ভার দিলাম পুত্র শ্রীমান শতদলের উপর। সে অভিধান খুলতে খুলতে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তবু শেষ পর্যন্ত ঠিক হলে বাঁচি।

আয়তন বৃদ্ধির ভয়ে আরো অনেকের অনেক পত্রের সঙ্গে অনেক স্মৃতি চাপা পড়ে রইল। সুযোগ হলে আরো একখণ্ড পত্রস্মৃতি উপস্থিত করা যাবে।

পুস্তকের পাণ্ডুলিপি তৈরিতে শ্রীমতী রুমা দাশগুপ্ত ও শ্রীমতী রত্না সরকার অনেকখানি সাহায্য করেছে।

১-সি, গোপালচন্দ্র বসু লেন,
কলিকাতা-৫০

পরিমল গোস্বামী
১লা অগস্ট ১৯৭১

শ্রী প্র ম থ না থ বি শী

সুহৃদ্‌বরেষু—

প্রথম পরিচ্ছেদ

পত্রস্মৃতি লেখার কথাটা মনে এসেছে এত দিন পরে পুরানো চিঠি দেখতে গিয়ে। বাছাই করা সহজ ছিল না। পুরানো প্রিয় গান অনেকদিন পরে শুনলে মনে অনেক সময় বিচিত্র আলোড়ন জাগায়। পুরানো চিঠিও তাই। পড়তে গিয়ে তাই অনেক দেরি হয়ে গেল। কত স্মৃতি জেগে উঠল এক-একখানা চিঠি ঘিরে। অনেক সময় ভুলে যাওয়া অনেক সংবাদও, যা যথাসময়ে বিশেষ মূল্যবান বোধ হয়নি।

এইসব অতীত দিনের চিঠি ওলটাতে থাকলে তার ধারাবাহিকতার মধ্যে প্রাপকের জীবনেরও একটা পথের চিহ্ন বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। তখন বোঝা যায় সে পথের চিহ্ন আজও ঘোচেনি, বনের তৃণ সে পথ সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলেনি।

আমি যে সব চিঠি নিয়ে স্মৃতি রচনা করতে বসেছি, তার অনেকই হয়তো 'খ্যাত' ব্যক্তির লেখা নয়, কিন্তু স্মৃতির ক্ষেত্রে খ্যাত অখ্যাত কথাটা সম্পূর্ণ অবান্তর। সামগ্রিক ভাবে সবাই মিলে আমার স্মৃতির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে। আমার মনের খ্যাতি-বিচারে সবাই সমান।

অনেক চিঠি আমার সম্পাদনা-বৃত্তির সঙ্গেও জড়িত। অনেকের লেখা ছাপতে না পেরে লেখকদের দুঃখের কারণ ঘটিয়েছি, আবার অনেক লেখা ছাপতে হয়েছে বলে দুঃখ পেয়েছি। কথাটা অদ্ভুত মনে হলেও সত্য। বিবেককে যান্ত্রিক উপায়ে নিয়ন্ত্রিত রাখা যায় না, গেলে সব সম্পাদকই বিবেকানন্দ হতেন। ছাপার জন্য পাঠানো চিঠি যা ছাপা চলেনি, তাও দুএকখানা এপর্যায়ে থাকা সম্ভব, এবং আমি আমারও দুএকখানা চিঠির নকল রেখেছি, তারও কিছু এতে স্থান পাবে। লিখতে গিয়ে প্রসঙ্গত কোন্‌টা কিভাবে আসবে তা আগেই বলা সম্ভব হচ্ছে না। যাঁদের চিঠিআমি বাছাই করেছি তাঁদের সবার চিঠি ওজন করে প্রমাণ করিয়ে দিতে পারি সবচেয়ে ভারী ওজন হবে জ্যোতির্ময়ী দেবী, নলিনীকান্ত সরকার, কিরণ রায়, মণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দার, বনফুল, এবং পুলিনবিহারী সেনের চিঠি। তারপরেই নলিনীরঞ্জন রায় ও ফণীন্দ্রনাথ রায়ের। প্রত্যেকটি বাণ্ডিলই হয়তো এক কিলোগ্রাম ওজন হবে। কিন্তু আমার স্মৃতি জাগানোর কাজে সব চিঠির দরকার হবে না।

আমার চিঠির নানা জাতি, এর পিছনে কৌতুককর স্মৃতিও আছে। জীবনের সোজা দিক উলটো দিক দুইই আমার জীবনে সত্য, জীবনকে আমি পোলারাইজ করে দেখি না। কিন্তু তবু সবার সামনে যে টুকু ধরা যায় তার একটা সীমা আছে। সেই সীমা আমি অবশ্যই রাখতে চেষ্টা করব। কিন্তু চিঠিগুলির তারিখের পারম্পর্য ঠিক রাখা অসম্ভব। স্মৃতি কখনো তারিখ মিলিয়ে চলতে জানে না।

এখনই যে চিঠিখানা নিয়ে আরম্ভ করছি, সেখানা কবিশেখর কালিদাস রায়ের লেখা। তিনি একদিন বড়ই বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন হঠাৎ তাঁর মৃত্যুসংবাদ প্রচার হওয়াতে। তিনি ২৩শে নবেম্বর ১৯৬০ তারিখে আমাকে লিখছেন—

ভাই পরিমল, I am dying many times before my death! সেইরূপ একবার মরে গিয়েছিলাম। দক্ষিণ কলিকাতার বহু স্কুলে আমার মৃত্যু পালনে ছুটি হয়েছিল। বহুলোক শ্মশান যাত্রায় মরযাত্রী হতে এসেছিল।……ইতি তোমার দাদা

শ্রীকালিদাস রায়, ১৩, চারু অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-৩৩।

এ চিঠি পেয়ে এবিষয়ে কিছু লিখতে প্রেরণা পাওয়া গেল। দারুণ সংবাদ, অথচ কৌতুককর। আমি আমার 'ইতস্ততঃ' কলমে যা লিখলাম, তা ছাপা হয়েছিল ৪ঠা ডিসেম্বর (১৯৬০) তারিখে। আমি লিখেছিলাম, গুজব না হয়ে যদি এ সংবাদ কাগজে ছাপা হত, তাহলে যারা শ্মশানে যাবে বলে এসেছিল, তারা কবিশেখরকে জীবিত দেখেও বিশ্বাস করত না, কারণ ছাপা লেখায় অধিকাংশ লোক বেশি বিশ্বাস করে। এ বিষয়ে একটা কাল্পনিক ছবি এঁকেছিলাম। তার শেষে এই কথাগুলি লিখি—

"আসল কথা হচ্ছে আমরা যে অবস্থায় দিন কাটাচ্ছি তাতে আমরা জীবিত কি মৃত, তা আমরা কেউ জোর করে বলতে পারি না। কবিশেখর পেরেছেন দেখে তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমার নিজের এ রকম হলে যদি বন্ধুরা খবর শুনে চলে আসতেন, এবং খাটিয়া জোগাড় হত, তাহলে খুব সম্ভব আমি নিজেই গিয়ে তাতে শুয়ে পড়তাম। অমি জীবিত কি মৃত সে বিষয়ে আমার নিজেরই যখন সন্দেহ আছে, তখন আর উপস্থিত শবযাত্রীদের সঙ্গে তর্ক করে কি লাভ? (৪-১২-৬০),,

এটি পড়ে ৬ই ডিসেম্বর তারিখে কবিশেখর লিখলেন "ভাই পরিমল, লেখা

পড়লাম। চমৎকার রসিকতা হয়েছে, বাড়ির সবাই এন্‌জয় করেছে।"......

কবিশেখর প্রসঙ্গের স্মৃতি পিছিয়ে চলল ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে। তখনকার ছবিটি এখনো মনের মধ্যে জীবন্ত হয়ে আছে।

আমহার্স্ট স্ট্রীট থেকে বেরিয়েছে ফকিরচাঁদ মিত্র স্ট্রীট। সেখানকার একটি মেস, মেস স্বত্বাধিকারী কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। সেইখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশন আরম্ভে পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্ররূপে এসে উঠেছি। সন্ধান দিয়েছিল সম্ভবত আমার সহপাঠী বিমলকৃষ্ণ ঘোষ। বিশ্ববিদ্যালয় স্মরণ করতেই ক্লাসের কথা মনে এলো: সেই ঋষিতুল্য অধ্যাপক কবি মনোমোহন ঘোষ, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, ষ্টিফেন, স্ক্রিমজ্যর, রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুহাস রায় প্রভৃতির কথা। কিন্তু এ প্রসঙ্গ এই পর্যন্তই থাক।

ফকিরচাঁদ মিত্র স্ট্রীটের অনেক ঘটনা স্পষ্ট মনে আছে, অনেক ঘটনা কিছুতে মনে পড়ে না। সেইখানেই প্রথম পরিচয় কিরণকুমার রায়ের সঙ্গে। কিরণকুমার কুষ্টিয়ার লোক. (সরোজ আচার্যও ছিল কুষ্টিয়ার লোক—পরে জেনেছি ওরা পরস্পর বিশেষ পরিচিত ছিল।) প্রসঙ্গত বলি, কুষ্টিয়াকে অনেকে ভুল করে 'কুষ্ঠিয়া' লেখেন, কিন্তু কুষ্ঠিয়া কদাপি নয়। এ বিষয়ে সঠিক জানতে হলে 'ছিন্নপত্র' দ্রষ্টব্য। আমার নিজের বাড়িও কুষ্টিয়ার কাছে ছিল, তাই হয়তো কিরণের প্রতি তখন বেশি আকৃষ্ট হয়ে থাকব। কিরণ তখন উনিশ কুড়ি বছর বয়সের যুবক, তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। সাবিত্রীপ্রসন্ন কিরণের সঙ্গে একটি ঘরে বাস করতেন। পত্রস্মৃতি লিখতে বসে কিরণকে কয়েকটি আমার ভুলে যাওয়া কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য কিছু দিন আগে চিঠি লিখি। তার উত্তরে সে যা জানিয়াছে (২-২-৭০) তার সংক্ষিপ্ত সার এই যে, ১৯১৮ সনে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে সে সেণ্ট পলস কলেজে ভরতি হয়। সাবিত্রীপ্রসন্ন তখন ঐ কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। একদিন সে হসটেলের রীডিং রুমে বসে উপাসনা মাসিক (সম্পাদক, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়) পড়ছিল, পাশের এক সীটের ছাত্র জিজ্ঞাসা করলেন, যে লেখাটা পড়ছেন, কেমন লাগছে? সেটি একটি কথিকা, নাম খেয়াঘাট। তার পরেই তিনি বললেন লেখাটি তাঁর। লেখকের নাম দেখা গেল সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। বন্ধুত্ব গড়ে উঠল ঐ খেয়াঘাট উপলক্ষেই। তারপর কিরণের নিজের চিঠির ভাষাতেই বলি—

"এরই কিছুদিন পরে সেন্ট পলসের প্রিন্সিপ্যালের সরস্বতী ভঙ্গের পর্ব এবং আমাদের অর্থাৎ শতকরা ৯০ টি ছাত্রের ভাঙা সরস্বতী নিয়ে কলকাতার পথে পথে মিছিল। ছাত্রদের মিছিলের ইতিহাসে এটাই বোধ হয় প্রথম। আমরা কলেজ ছাড়লাম। আমাদের কয়েকজনকে নিয়ে গড়ে উঠল ৩৩ নং কলেজ স্ট্রীটের মেস। তারপর আমাদের তৃতীয় আশ্রয় ফকিরচাঁদ মিত্র স্ট্রীটের আস্তানা, এর জন্ম ১৯২০। তৃতীয় এ জন্য যে, দ্বিতীয় আস্তানা হয়েছিল ৬১ মেছুয়াবাজার স্ট্রীট। এই খানেই নজরুল ছোড়দার [শম্ভু রায়] সঙ্গে "দে গরুর গা ধুইয়ে" ধ্বনি দিয়ে আবির্ভূত হল।"...

এই প্রসঙ্গে মনে এলো, সেন্ট পল্‌স ও পরে সিটি কলেজে সরস্বতী পূজা নিয়ে যে গণ্ডগোল হয়েছিল, তা এতদিনে সবার ভুল হয়ে গেছে। যাঁরা তখন সরস্বতী বাঁচাতে এত উৎসাহ দেখিয়েছিলেন, তাঁদের পরবর্তীরা নিজ হাতে বিদ্যাকে চূর্ণ করে আজ তার বিসর্জনের জন্য পরম উৎসাহী হয়ে উঠেছে, এবং আমার বিশ্বাস সেন্ট পলসের প্রিন্সিপ্যাল এবং সিটি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল আজ বেঁচে থাকলে তাঁরাই আজ এই 'ভাঙা সরস্বতী' নিয়ে প্রতিবাদ মিছিল বার করতেন।

উপাসনা মাসিক সম্পর্কে কিরণ রায় আরো লিখছে—"মহারাজা কাশিমবাজারের খরচেই উপাসনা চলত। পরে ব্যয় সংক্ষেপের জন্য তিনি একটি প্রেস দান করেন। এইটিই উপাসনা প্রেস। প্রেসের জন্ম ১৯২০-২১। কালিদা [কালিদাস রায়] উপাসনায় মাসিক সাহিত্য সমালোচনা লিখতে সাবিত্রীপ্রসন্নের আস্তানায় আসতেন। তিনি বোধ করি তখন ভবানীপুরের একটি মেসে থাকতেন। উপাসনা সম্পাদক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটে থাকতেন। রামমোহন লাইব্রেরির পাশ দিয়ে যে পথ দীনেন্দ্র স্ট্রীটে গিয়ে পড়েছে, সেখানে, লাল রঙের তেতলা একটি বাড়িতে।"

কালিদাস রায়ের প্রসঙ্গে এসব কথা উঠল তার কারণ আছে। সে আর কিছুই নয়, এই ১৯২০তেই তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়, সাবিত্রী-প্রসন্ন ও কিরণকে উপলক্ষ করে। উপাসনা মাসিক আসলে সাবিত্রীপ্রসন্নই চালাতেন—কিরণ ছিল তাঁর সহকারী। কিরণের কথাও এই প্রসঙ্গে সংক্ষেপে বলে নিই। এর পরে সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় উপাসনা সম্পাদক

হলে কিরণ হয় সহকারী সম্পাদক। তারও পরে উপাসনা হস্তান্তরিত হয়ে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস ও মেট্রোপলিটান ইনশিওরেনসের প্রতিষ্ঠাতা সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্যের হাতে যায়, এবং নাম বদল হয়ে হয় বঙ্গশ্রী, সম্পাদক হন সজনীকান্ত দাস। কিরণ তখনও সহকারী সম্পাদক। প্রমথনাথ বিশী বঙ্গশ্রী দলের সবার বিষয়ে ছন্দে চরিত্রচিত্র রচনা করেছিল, তার মধ্যে কিরণের পরিচয় ছিল এই রকম—

কে ঐ চেয়ারে মগ্ন নাহি ধারে ধার ?
চৌদ্দ বর্ষ পুরাতন সাব-এডিটার।
নেহাৎ মানুষ, তাই নাহি হ'ল নাম,
ঘৃত হলে এতদিন বেড়ে যেত দাম,
ষোল টাকা সের আহা !...

'পুরাতন পঞ্জিকা' নামে এই সব চরিত্রচিত্র আমার সম্পাদনাকালে শনিবারের চিঠিতে (মাঘ ১৩৪১) ছাপা হয়েছিল। তবে কিরণ পরে বঙ্গশ্রী মাসিকের ও বঙ্গশ্রী ইংরেজী সাপ্তাহিকের সম্পাদক হয়েছিল। এবং দুইয়েরই সহকারী হয়েছিল সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী ও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্পাদনায় এমন নিপুণ হাত কম দেখা যায়, চিন্তার দিক থেকেও কিরণ ছিল স্বতন্ত্র, কিন্তু চাকরির ব্যাপারে স্বকীয়তা চেপে রাখা ছিল তার স্বভাব।

উপাসনা প্রেস ছিল ওয়েলিংটন স্কয়ার, লী মেমোরিয়ালের কাছে। উপাসনায় তখন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত নিয়মিত লিখতেন। আমিও লিখতাম। কিন্তু ১৯২০ সনের উপাসনা উপলক্ষে কবিশেখরের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় এবং সমান্য পরিচয়। তিনি প্রায়ই আসতেন আমাদের ঐ মেসে। নজরুল-কেও প্রথম দেখি ঐ মেসে, নলিনীকান্ত সরকারের সঙ্গে। কিন্তু কবিশেখরের সঙ্গে আমার এই মেসে প্রধানতম স্মৃতি এই যে, আমি একটি কবিতা লিখে তাঁকে দিয়েছিলাম, এবং আরো আশ্চর্য কাণ্ড, তিনি তা উপাসনায় ছেপে-ছিলেন। সে কবিতায় কোনো 'রীজন' ছিল না, শুধু 'রাইম' ছিল এইটুকু মনে আছে। কবে তা ফেলে দিয়েছি ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে। আর এক সংবাদ : রবীন্দ্রনাথের একখানা ছবি এঁকেছিলাম, কিরণ সেখানা উপাসনাতে ছেপে দিয়েছিল।

এর পঁচিশ বছর পরে আবার কালিদাস রায়ের মুখোমুখি হবার সুযোগ এলো। ইতিমধ্যে চারখানা সাময়িক পত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম সম্পাদক রূপে।

এই সম্পাদন কাজের আয়ু ১৯৩২ থেকে ১৯৪৩ পর্যন্ত। তারপর ১৯৪৫ সনে এলাম যুগান্তর রবিবারের সাময়িকী বিভাগের সম্পাদক রূপে। আমার অবসর গ্রহণের পরেও (১৯৬৪) কবিশেখরের সঙ্গে নানাসূত্রে যোগাযোগ। এই অর্ধ শতাব্দি কালের মধ্যে তাঁর চরিত্রে একটি জিনিস আবিষ্কার করেছি এই যে, তা ক্রোধ শূন্য। তিনিও বৈষ্ণব, আমিও তাই, কিন্তু ক্রোধ আমার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ তিনি স্বভাব বৈষ্ণব, আমি নামে। কবিশেখর বর্তমানে (১৯৭০) দেশিকোত্তম হয়েছেন। সম্ভবত বৈষ্ণব মনোভাব থাকলেই দেশিকোত্তম হওয়ার অধিকার জন্মে। প্রমাণ, শান্তিনিকেতনবাসী নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী।

কবিশেখর দেশিকোত্তম সম্মান লাভের পর আমাকে ১৯৭০, ১০ই ফেবরুয়ারি তারিখে যে চিঠিখানি লিখেছিলেন তার অংশবিশেষ এই—

"সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক যখন শেষ হয়ে এল, তখন একটা স্বীকৃতি পাওয়া গেল, এ যেন মহাপথের পাথেয়রূপে আমার কাছে এসে পৌঁছল।

"পরিমল-লোভী আমি অলি-কবি
তোমারে শুনাই গান।
আমার পাখায় পরাগ মাখায়
তোমার সুরভি দান।"

এখানে 'সুরভি দান' কথাটার একটু ব্যাখ্যা দরকার। আমার সম্প্রতি (১৯৬৯) প্রকাশিত 'আধুনিক ব্যঙ্গ পরিচয়' নামক পুস্তকে কবিশেখর সম্পর্কে একটি অধ্যায় আছে, তাঁর ব্যঙ্গ রচনার গুণগ্রাহীরূপে তিনি আমাকে এই স্নেহসম্মান দিলেন।

ঐ চিঠিরই গোড়ার দিকে তিনি লিখেছেন, "যে বইখানি পাঠিয়ে দিয়েছ তা পেয়েছি এবং পড়েছি। আলোচনা গুলি বেশ উপাদেয় হয়েছে। দন্ত্য বিষয়গুলি যথাযথ চর্বণের ফলে বেশ তালব্য হয়ে উঠেছে।" আমি উত্তরে লিখেছিলাম, "তালু থেকে মূর্ধা পর্যন্ত পৌঁছেছে কি ?"

কবিশেখর বিশ্বভারতীর শ্রেষ্ঠ অ্যাকাডেমিক সম্মান পেয়েছেন, দেরিতে হলেও পেয়েছেন, এবং মনে হয় দেরির জন্যই পেয়েছেন। আমার বিশ্বাস, এ-জাতীয় সম্মান ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে দেওয়া হয়। ডাক্তার যখন রিপোর্ট পাঠান, "প্রায় হয়ে এসেছে," তখন শ্রেষ্ঠ সম্মান বিতরণের পালা আসে। নিত্যানন্দবিনোদের ক্ষেত্রেও তার দৃষ্টান্ত মিলবে।

কয়েক বছর আগে তিনি তাঁর কোনো কোনো লেখার মধ্যে কিছু হতাশা প্রকাশ করেছিলেন। তার কারণ ছিল। কবিতা বিষয়ে বাংলাদেশে হঠাৎ একটা বিপ্লবের যুগ এসে গেছে। অবশ্যই তা ইউরোপীয় প্রভাবে, এবং অনেক ক্ষেত্রে অনুকরণে। এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা আগের যুগের কবিদের পক্ষে সম্ভব নয়। পাঠকদের পক্ষেও সম্ভব ছিল না। তাই আমি কবিশেখরকে তাঁর সম্পর্কে আমার মনের কথা প্রকাশ করে ১৯৬২তে তাঁকে একখানা চিঠি দিয়েছিলাম। কারণ এই সময়ে আমি লক্ষ্য করছিলাম তিনি দুএকস্থানে এমন কথা প্রকাশ করেছেন যে, এ যুগের মতে তিনি সেকেলে হয়ে পড়েছেন।

এ বিষয়ে তিনি নিজেও যে কতখানি সচেতন ছিলেন তা তাঁর নিজেরই একটি রচনায় প্রকাশিত হয়েছে (১৯৬৫, শারদীয় যুগান্তরে)। তিনি এক যুবকের সঙ্গে একবার বি-এন রেলপথে কোথাও রবীন্দ্রজন্মতিথি উৎসবে সভাপতি রূপে আহূত হয়ে চলছিলেন। তাঁর কামরায় অপরিচিত কয়েকজন যুবক সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করছিল। প্রসঙ্গত কবিশেখরের কথা উঠল। দেখা গেল তাঁর বিষয়ে ওদের মধ্যে দুটি দল হয়েছে—একদল পক্ষে আর একদল বিপক্ষে। কবিশেখর সঙ্গীকে নীরব থাকতে ইঙ্গিত করে ওদের বিরোধী দলের পক্ষ হয়ে নিজেই নিজের বিরুদ্ধে যতরকম সম্ভব বলতে লাগলেন। বললেন, "কালিদাসবাবুর লেখায় কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, স্বাতন্ত্র্য নেই······পুরানো কথা নতুন ছাঁদে লিখেছেন মাত্র, সে ছাঁদ এ যুগে অচল" ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর যে স্টেশনে তিনি নামলেন, সেখানে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে অনেকে এসেছিলেন, তখন তাঁর পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ল, দূরগামী তর্করত যুবকেরা তখন হতবাক্।

কিন্তু সে যাই হোক কবিশেখর মজা সৃষ্টির জন্যই হোক বা অভিমানবশতই হোক, কাব্য বিষয়ে একটি সত্য কথা বলেছিলেন, ঐ যে পুরানো কথা নতুন ছাঁদে লেখা, এবং সে ছাঁদ এখন অচল ইত্যাদি। এবং এ বিষয়ে তিনি যে সচেতন ছিলেন, ঐসব কথাতেই তা প্রমাণ হয়। কিন্তু তবু কবিশেখর অত্যন্ত ভাল মানুষ এবং শিশুর মতো সরল বলে ও কথার মধ্যে কিছু অভিমান ছিল বলেই আমার বিশ্বাস।

কাব্যের বিষয় যে খুব বদল হয় তা নয়, কিন্তু প্রকাশের ভঙ্গি অবশ্যই বদল হয় যুগবদলের সঙ্গে, এবং এই কারণেই অনেকের কাছে তা সেকেলে মনে

হয়। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে এলো, এক পরিদর্শক কোনো এক কলেজ পরিদর্শনে এসেছেন কয়েকবছর পরে। তিনি অর্থনীতির ক্লাসে গিয়ে দেখেন আগের বারে যে সব প্রশ্ন নিয়ে ক্লাসে আলোচনা করা হয়েছে, এখনো তাই চলছে। পরিদর্শক একটুখানি উষ্মার সঙ্গে অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কি? অধ্যাপক গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন, অর্থনীতিতে প্রশ্নের বদল হয় না, কিন্তু উত্তর প্রতিবছর বদল হয়ে যায়।

কাব্যের ভঙ্গিও তাই, উপায় নেই। এ পরিবর্তন অনিবার্য। রবীন্দ্রনাথও এ কথা একাধিকবার স্বীকার করেছেন। একই ভাব ভিন্নযুগে কি রকম বদলাতে থাকে, তা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন সজনীকান্ত দাস তাঁর মাইকেল বধ নামক যৌথভাবে রচিত কাব্যে। এ অতি কৌতুকর দৃষ্টান্ত হলেও এটা সত্য। আমি কিছু নমুনা দিই। মূল ছত্রগুলি এই—

সম্মুখ সমরে পড়ি বীর চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ হে দেবি অমৃতভাষিণি!
কোন বীরবরে বরি সেনাপতি পদে
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি?

এ কবিতা (মেঘনাদবধকাব্য) ১৮৬১তে রচিত। ১৯১৪ সনে এই ভাব নিয়ে স্বয়ং কালিদাস রায় (তাঁর পর্ণপুটে) লিখলে কি রকম দাঁড়াত তার আভাস মাইকেল বধ কাব্যের একটিতে দিয়েছেন নলিনীকান্ত সরকার। সেটি এই—

স্পন্দ বিনা বন্ধ নাড়ী
সন্ধ্যাঘন অন্ধকার,
বনে আহুত বীরবাহুতো
রাহু যে রামচন্দ্র তার।
বেচারা আজি বেঘোরে মরে
চলিয়া গেল যমের ঘরে,
ক্রন্দনেতে অন্ধ আঁখি
শোকে নিকষা-নন্দনার।
হে বীণাপাণি বলতো আসি
কীচকবনে বাজাব বাঁশি,
বল মা সুধাকণ্ঠে বাণী
নাচায়ে কটিচন্দ্রহার।
ভাসিছে পিতা নয়নজলে
শ্বসিছে বসি নমেরু তলে
শ্রাবণ-সম প্লাবন
নাহি রাবণ চিতে রন্ধ্র আর।
আবার বলে যাইতে রণে,
সেনানায়ক সে কোনজনে,
নীবার শিরে দিবার আগে
দিল বিজয়ানন্দ হার।
স্পন্দবিনা বন্ধ নাড়ী
সন্ধ্যাঘন অন্ধকার।

কালিদাস রায়ের বিখ্যাত 'নন্দকুলচন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার' কবিতার অনুকৃতি। কবিশেখর মাইকেলের ভঙ্গি সেকেলে মনে করলে নিজেই এই রকম লিখিতেন, অনুমান করা হয়েছে। একই বিষয়ে কত রকমে প্রকাশ হয় নানাযুগে, এ বিষয়ে কারোই সন্দেহ থাকবার কারণ নেই। কৌতুক-কর দৃষ্টান্ত হলেও এ সব সত্য কথা।

এবারে আগের কথায় ফিরে যাই। কবিশেখরের নিজের বিষয়ে সেজন্য কোনো অভিমানই থাকা উচিত নয়। এবং একথা তাঁকে জানানো কর্তব্য মনে হল একবার। উপলক্ষটাও স্মরণীয়। তিনি ২২-১-৬২ তারিখে লিখলেন—

"দন্তরুচি কৌমুদী নামে হাসির কবিতা সংকলন ৯ ফর্মার বই এক বছর আগে প্রেসে দেওয়া হয়েছিল, আজো তো বেরুল না। এই বইখানা তোমাকে উৎসর্গ করেছি। আশা করি জীবাদ্দশাতেই বেরুবে। কলম আর চলতে চায় না, অক্ষরগুলো ক্রমে ক্ষীণাঙ্গ হয়ে আসছে। ইতি—দাদা"

এর পরের চিঠি পেলাম ৭-৪-৬২ তারিখে। তার অংশ বিশেষ এই—

"বহুকাল গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করে বইখানা শেষ পর্যন্ত প্রসূত হলো। আমার তো প্রকাশক নেই দয়া করে কেউ এক আধখানা বার করে।... আশা করি ভাল আছ। আমি সুস্থ থাকি না আর। জরাই তো ব্যাধি।"

আমার নামে উৎসর্গ করা বই পাবার পর নানাকারণে তাঁকে চিঠি দিতে দেরি হয়েছিল। এই সময়ে আমি নিজে কয়েকটি কারণে বিব্রত ছিলাম। কবিশেখর আমার এই নীরবতায় সঙ্গত কারণেই ক্ষুব্ধ। তাঁর পরবর্তী চিঠি পেলাম ৫-৬-৬২ তারিখে। তখন তাঁর বাড়ির ঠিকানা ছিল ১০।১৩ দেশপ্রাণ শাসমল রোড, (পুরাতন ৪১।৪৩ রসা রোড, কলিকাতা-৩৩), আরো পরে ঐ বাড়ির ঠিকানা হল ১৩ চারু অ্যাভিনিউ! এই লেখা ছাপা হতে হতে এ ঠিকানাও বদল হওয়া বিচিত্র নয়।)

কবিশেখর লিখলেন—

"ভাই পরিমল, তুমি আমার উপর কেন সহসা বিরূপ হলে, তা বুঝতে পারছি না। তোমার নামে বই উৎসর্গ করাতে কি তুমি রাগ করেছ?"...

কবিশেখর অত্যন্ত সরলপ্রাণ এবং স্নেহপ্রবণ। তাঁর সাম্প্রতিক সমাজ বিষয়ক গল্প-আকারে লেখা রচনাগুলি পড়লেই তা বোঝা যায়। আমি এই উপলক্ষে, তাঁকে যে কথাগুলি বলব ভাবছিলাম তাই লিখলাম চিঠিতে।

তাঁরই জানা কথা, এবং নিজেকে নিয়ে তিনি যে সব অভিমানের কথা বলে আসছেন, সে বিষয়ে তাকে বুঝিয়ে বলা কর্তব্য মনে হল। তাঁকে সেকেলে মনে করে, তাতে যে তাঁর কিছুই মনে করা উচিত নয়, সেই কথাটাই বিশ্লেষণ করা আবশ্যক মনে করলাম। লিখলাম—

"আপনি আমার নামে বই উৎসর্গ করে আমাকে ধন্য করেছেন, আমি গৌরব বোধ করছি, এ বিষয়ে আপনার কোনো সন্দেহ পোষণ করা উচিত নয়। আপনি আমার শ্রদ্ধাভাজন এবং সাহিত্যক্ষেত্রে আমার বহুপূর্বে এসেছেন, অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, অনেক বেশি দেখেছেন।...

"সম্প্রতিকালে আমি লক্ষ্য করছি, আপনি অবহেলিত বলে একটি ক্ষোভ পোষণ করে আসছেন, এটি আমার পছন্দ নয়। একথা সত্য যে, সাহিত্যিকেরা সমসাময়িক কালকে উদ্দেশ করেই যা কিছু রচনা করেন। বিশুদ্ধ সৃষ্টির আনন্দে, কালকে তুচ্ছ করে কোনো লেখক কিছু লেখেন কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। কিন্তু আপনার দিক থেকে এ কথা তো বলা যায়, আপনার যেটি সমকাল, সে কালের হাতে আপনি যথার্থ মূল্য এবং সম্মান পেয়েছেন। আপনি সে কালকে অতিক্রম করে বেঁচে আছেন, অতএব বৃথা দুঃখ বেদনা পাওয়া" ইত্যাদি।

এরপর বৈষ্ণব মতে আমাদের মান অভিমানের পালা সাঙ্গ হয়েছিল, এবং সম্পর্কের ভিতরে আর কোনো ভুল বোঝার অবকাশ ছিল না।

আর একখানা তুচ্ছ চিঠি—এক লাইনের, কিন্তু এই উপলক্ষে স্মৃতিপথে কিছুদূর যাওয়া যাবে—

ARTHIK UNNATI OFFICE
107, Mechua Bazar St
Calcutta 29-7-1926.

সবিনয় নিবেদন,

আগামী রবিবার সকালবেলা আসিতে পারিবেন কি?

বাড়ির ঠিকানা—৪৫ পুলিস হসপিটাল রোড, এনটালি

ইতি—ভবদীয়
শ্রীবিনয়কুমার সরকার

১৯২৬ সনে লেখা এই চিঠির পথ ধরে প্রথমেই চলে যাচ্ছি ১৯১২-১৩ সনে। এই সময় আমি স্কুলের ছাত্র। কয়েকখানা রঙীন ছবির ব্লকের

তদ্‌বির করতে আমি মফঃসল থেকে কলকাতা এসেছিলাম ব্লকপ্রস্তুতকারক, সে যুগের বিখ্যাত কে. ভি. সেনের প্রতিষ্ঠানে। এটি ছিল পুরাতন রিপন কলেজের বাড়িতে। ৬০-বি, মিরজাপুর স্ট্রীট, বাড়িটি হ্যারিসন রোড ও মিরজাপুর স্ট্রীটের সঙ্গমে। (এইখানে পরে সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির কাজ চলতে থাকে।) কে. ভি. সেনের প্রতিষ্ঠানে যেতে হলে বাড়িতে প্রবেশ করেই ডানদিকে একটি প্রেস ছিল তার নাম বণিক প্রেস। এই প্রেসে আমার পিতার অনূদিত গীতাবিন্দুর প্রথম মুদ্রণ (১৯১৩) আরম্ভ হয়, অবশ্য মাত্র পাঁচ ফর্মা, তারপর অন্য দুটি প্রেসে বাকিটা। অতএব আমার নিচে উপর দুদিকেই সম্পর্ক ছিল। আরো উল্লেখযোগ্য যে সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতি যখন হ্যারিসন রোড ও বেনেটোলা লেনের মোড় ৪৫, বেনেটোলা লেন থেকে এখানে উঠে আসে, তখন আমার সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানেরও একটা সম্পর্ক স্থাপিত হয় 'বঙ্গলক্ষ্মী' মাসিকপত্র উপলক্ষে। হেমলতা ঠাকুরের সঙ্গে আগেই পরিচয় ছিল, তাঁর ঐ পত্রিকা স্থায়ী সম্পাদন ভার ছিল কবি রাধাচরণ চক্রবর্তীর উপর, তিনি ছিলেন আমার পিতার লেখার ভক্ত। নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে যখন পিতার কুমারসম্ভবের ছন্দানুবাদ প্রকাশিত হতে থাকে, তখন থেকেই তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। আমিও এই সময় বঙ্গলক্ষ্মীর লেখক হয়ে গেলাম।

কে. ভি. সেনের কাছে (১৯১২) ব্লক তৈরির জন্য কয়েকবার যাই। একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করে জানতে চাইলাম ব্লক কি করে তৈরি হয়। তিনি বিলেত থেকে শিখে এসেছিলেন, তিনি বোধ হয় আমার মতো বালকের প্রশ্নে কৌতূহলী হয়ে সরলভাবে আমাকে মোট কৌশলটার কথা বুঝিয়ে বললেন। তৈরি কেমন করে হয় তাও দেখাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা আর দেখা হয় নি। এ সময়ে আমি অল্প দিনের ব্যবধানে কলকাতা এসে কখনো দু-তিন দিনের বেশি থাকিনি।

রঙিন ছবির উপর এমন এক আকর্ষণ অনুভব করতাম শৈশব থেকেই যে, রঙীন ব্লক তৈরির দিকেও সেজন্য আকর্ষণ বেড়ে গিয়েছিল। আমারই আঁকা রঙীন ছবি রঙীন ব্লকে ছাপা দেখে রীতিমতো মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু পরে মনের ঐ ইচ্ছাটা চাপা পড়ে গিয়েছিল। বহুদিন পরে ১৯২১ সনে শান্তিনিকেতনে একদিন হঠাৎ এই ইচ্ছাটা মনের মধ্যে জ্বলে উঠেছিল একটি কারণে।

শান্তিনিকেতনে কোন্ বাড়িটা এখন মনে নেই, দোতলায় একটি ছোট আর্ট গ্যালারির মতো ছিল। বাইরের খোলা বারান্দায় অবনীন্দ্রনাথের রঙীন ছবি টাঙানো ছিল কয়েকখানা, ভিতরে বিলেতে ছাপা ইংরেজী ওমর খৈয়ামের বইতে অবনীন্দ্রনাথের রঙীন ছবি সমেত বই দেখেছি এমনি একটা ক্ষীণ স্মৃতি আছে। এবং এই হলেরই বারান্দায় শারদোৎসবের (ঋণশোধ নাটক উপলক্ষে) নন্দলাল বসুর পেন্ট করা শরৎকালের একটি লম্বা প্যানেল খাড়া করা ছিল। এ বিষয়ে আমি স্মৃতিচিত্রণে বলেছি।

নন্দলাল বসুর মতো এমন ভদ্র এবং নিরহঙ্কার সহানুভূতিশীল শিক্ষক আমি কমই দেখেছি। তিনি আমার অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন বন্ধুর মতো। আমি যখন জিজ্ঞাসা করলাম অবনীন্দ্রনাথের মূল রঙীন ছবি এভাবে খোলা অবস্থায় টাঙিয়ে রাখলে নষ্ট হয়ে যাবে না? তিনি বললেন, ওসব ছবির একটিও মূল ছবি নয়, সমস্তই ছাপা। আমি তো শুনে অবাক। লিথো ছাপা আমি ছেলেবেলা থেকে দেখেছি, বোধ হয় সে সব ছবি তিনচার ফুট লম্বা হবে, বড় মানচিত্রের মতো, রবি বর্মার আঁকা, দোলনায় দোল খাচ্ছে এক যুবতী, চুল পিছন দিকে উড়ছে, নিচে লেখা আছে মোহিনী। এই ছবিখানা জ্ঞান হবার পর থেকেই দেখেছি, তাই স্পষ্ট মনে আছে। কিন্তু সে লিথোর সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের ছবির লিথো পদ্ধতিতে কোনো মিল নেই। এর ধোঁয়াটে রঙ কতরঙের মিশ্রণে যে তৈরি তা দেখে বোঝবার উপায় ছিল না।

নন্দলাল যখন বুঝিয়ে বললেন, প্রত্যেকখানা ছবিতে ১০০ থেকে ১৫০ কিম্বা ২০০ খানা ব্লক পরপর ছাপা, এবং এ ছাপা জাপান ছাড়া হয় না, তখন সে কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। মনে একটা শিহরণ জেগে-ছিল। তিনরঙা ছাপা দেখেছি—এবং একমাত্র সেই ধারণাই ছিল তখন. কি ভাবে ছাপতে হয়, তা কে. ভি. সেন আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তার পরেই শান্তিনিকেতনের এই অভিজ্ঞতা, নয় বছর পরে।

কথাটা ভুলতে পারিনি। যা কিছু করেছি তার পরে, ঐ কথাটা মাঝে মাঝে মনের মধ্যে ঠেলে উঠত, শেষ পর্যন্ত ১৯২৬ সনে যখন ব্লক তৈরির ইচ্ছাটা অতি প্রবল হয়ে উঠল মনের মধ্যে, তখন মনের আর একটা দিকে কিছু বিষয়বুদ্ধি জাগল। মনে হল টাকা খরচ করে বিদেশে যাওয়া সহজ (তখন খুবই সহজ ছিল, ভাড়াও বেজায় কম ছিল) কিন্তু যাবার আগে কোনো বিজ্ঞ লোকের পরামর্শ নেওয়া দরকার। অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করা গেল

টাকা খরচের ব্যাপার যখন, তখন আর্থিক উন্নতিতে সমর্পিতপ্রাণ অধ্যাপক বিনয় সরকারের সঙ্গে দেখা করলে সবচেয়ে ভাল হয়।

যে চিঠিখানা প্রথমেই উদ্ধৃত করেছি, তার নিজস্ব মূল্য কিছুই নেই, কিন্তু বিনয় সরকারের সঙ্গে দেখা করার পর তিনি নিজে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তার হয় তো কিছু মূল্য আছে। প্রথমেই বলি, তিনি আমাকে সম্পূর্ণ দমিয়ে দিয়েছিলেন। দমিয়ে দেওয়ার মতো যে কথাগুলি তিনি বলেছিলেন তার মর্ম এই: কোনো শিল্প বা অন্য কিছু শিখতে হলে বিদেশে যাবার আগে দেখতে হবে এদেশে তা শেখা যায় কিনা, বিদেশে যাওয়া মানে দেশের টাকা ওখানে গিয়ে খরচ করা, কিন্তু সে খরচের সার্থকতা কতখানি তার হিসেব করা দরকার। তুমি কি চেষ্টা করে দেখেছ এখানে শেখা যায় কি না? যদি শেখা যায় তাহলে এখানে যতদূর সম্ভব শিখে তারপর উন্নত শিক্ষার জন্য বিদেশে গেলে ভাল হয়। কিন্তু গোড়া থেকে শেখার জন্য অকারণ পয়সা নষ্ট করা ঠিক নয়।

বিনয়কুমারের অর্থনৈতিক এবং শিক্ষানৈতিক উপদেশের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্ব আমাকে দুর্বল করেছিল, এবং যদিও তখন (এবং সম্ভবত এখনো) এ দেশে এই জাতীয় শিক্ষার কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল না বা নেই, তবু আমার সদিচ্ছা সেই মুহূর্তেই ৪৫ পুলিস হসপিটাল রোডে বিসর্জন দিয়ে ঘরে ফিরে এলাম। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার তখন 'আর্থিক উন্নতি'র সম্পাদক, অফিস ১০৭ মেছুয়াবাজার স্ট্রীট। তাঁর উপদেশের ফলে বিদেশে অর্থব্যয় থেকে দেশ কিছু বেঁচে গেল অবশ্যই, কিন্তু তাতে দেশের আর্থিক উন্নতি কি পরিমাণ হল, তা তখন বুঝতে পারিনি। কিন্তু তখন তিনি আমাকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, সে উপদেশ অনেক পরে এতকাল ধরে আমিও অনেককে দিয়েছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে নিয়ে, আমি শনিবারের চিঠিতে যোগ দেবার (১৯৩২) আগে, অনেক রসিকতা করা হয়েছিল, মনে পড়ে। বোমারু বারীন্দ্র, পরে বীমারু বারীন্দ্র, পরে বামারু বারীন্দ্র ইত্যাদি।

বোমার যুগ উদ্‌বোধন করার অনেক কাল পরে বারীন্দ্রকুমার অন্ন সংস্থানের আশায় নানা বৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, পরে স্টেটস্‌ম্যান কাগজের লেখক হয়েছিলেন, দৈনিক বসুমতীতেও সম্পাদনার কাজ করেছেন। তারপর সংসার করবেন মানসে বিবাহ করেছিলেন।

এসব নিয়ে যাঁরা রসিকতা করেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে আমার কিছু মতভেদ ছিল। বারীন্দ্রকুমারের জীবনের এই পর্যায় বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত হারুর জীবনের সঙ্গে অনেকটা মেলে। হারু গরিব, কিছু উপার্জনের আশায় ফেরিওয়ালা হয়েছিল, কিন্তু লোকে টিটকারী দিতে লাগল। সে কাজ ছেড়ে সে চাষের কাজে লাগল। লোকে তবু টিটকারী দিতে লাগল। হারু এসব সহ্য করতে না পেরে সন্ন্যাসী হল। তখন যারা ওকে টিটকারী দিয়েছিল তারাই এসে ওর পায়ে ভক্তিভরে লুটিয়ে পড়ল। বারীন্দ্রকুমারও তেমনি যখন তাঁর জীবনের বিপ্লবী যুগ শেষ করেছেন, তখন অন্য কাজ করা তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক ছিল না কিছুই। তিনি আমরণ বোমা তৈরি করে সাহেব মারবেন, এমন আশা করা অবশ্যই অন্যায়। তবে বোমার যুগের কার্যকলাপ জনসাধারণের মনে একটা পবিত্র যুগের ধারণা জন্মিয়ে দিয়েছিল। এঁদের সবার কাজ একটি সৎকাজরূপে স্থায়ী ছাপ এঁকে দিয়েছিল তাঁদের মনে। তাই বোমার যুগের মানুষ সাধারণ চাকরি করছে বা টী স্টল খুলেছে, এতে মনে আঘাত লাগা স্বাভাবিক, এবং এই আঘাত থেকেই পরে বিদ্রূপের উদ্ভব। কিন্তু পরে আত্মিক সাধনায় রত হলে সমালোচনা বন্ধ হল।

তাই যখন ১৯৩৩ সনে বারীন্দ্রকুমার বিবাহ করলেন, তখন তা নিয়ে কোনো কোনো কাগজ খুব রঙ্গরহস্যে মেতে ওঠে, কিন্তু এ ঘটনা স্বাভাবিক ভাবেই নিয়েছিলাম, তার প্রমাণ আছে তখনকার লেখায়।

বারীন্দ্রকুমারের কিছু কিছু লেখা আমি যখন যুগান্তর 'সাময়িকী' বিভাগে

পত্রস্থ করি, তখন একটি লেখা উপলক্ষে তাঁর জন্মস্থান জন্মতারিখ ইত্যাদি চেয়ে পাঠাই। তিনি মূল 'বার্থ সার্টিফিকেট' ও তৎসহ জীবনের উল্লেখযোগ্য কিছু কিছু ঘটনার একটা তালিকা পাঠান। সে বোধহয় ১৯৫৬ হবে। বছর দশেক ধরে তাঁর কিছু কিছু লেখা আমি ছেপেছি, খুব অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন, আমাকে লেখা তাঁর অনেক চিঠিতে তার প্রমাণ। বয়োজ্যেষ্ঠ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় যেমন আমাকে 'পরিমলদা' সম্বোধন করতেন চিঠিতে (ও মুখে) বারীন্দ্রকুমারও মাঝে মাঝে তাই করতেন। তিনি আমার অনুরোধে যে সব জন্মকথা লিখেছিলেন তার ভিতর থেকে মূল বার্থ সার্টিফিকেটখানা আমি ফেরৎ দিয়েছিলাম। এখন মনে হচ্ছে, না দিলেই ভাল হত, তা এখন কোথায় কি ভাবে আছে জানি না। হাতের লেখায় যে পরিচয়খানা আছে তা এই—

আমার সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

১। জন্ম—লণ্ডনের উপকণ্ঠে ক্রয়ডনে ১৮৮০, ৫ই জানুয়ারি।

২। এক বৎসরের শিশু ভারতে আগমন—রোহিণীতে রেললাইনের ধারে গ্র্যাণ্ট সাহেবের বাড়াতে খানসামা আয়া বাবুর্চি সহ পাগলমায়ের সহিত বাস। [বারীন্দ্রকুমারের মাতার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেছিল।]

৩। আমার ৬ হইতে ৯ বৎসর অবধি লালা তারিণীচরণের বাড়ীতে বাস। দিদি ও আমার প্রহার নির্যাতন ও অর্ধাহারে ক্ষীণদেহ।

৪। ৯ বৎসর বয়সে রাঙা-মায়ের ইচ্ছায় ডাঃ কে. ডি. ঘোষ [পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ] তাঁহার বন্ধু ভঞ্জচৌধুরীর সাহায্যে গুণ্ডার দ্বারা আমাকে হরণ করিয়া লইয়া যান।

৫। সেই প্রথম গোমেস্ লেনের বাটীতে রাঙা-মায়ের কাছে আদরের জীবন ও হাতে খড়ি।

৬। ১৮৯২ সনে পিতৃবিয়োগ, ভোর রাত্রে স্বপ্নে রাঙা-মাকে পিতার দর্শন দান।

৭। পরবর্তী বৎসরে ধর্মান্ধ গোঁড়া ব্রাহ্মদের দ্বারা আবার মাতৃকোল হইতে ছিন্ন। [প্রসঙ্গতঃ রাজনারায়ণ বসু এঁর মাতামহ ছিলেন।]

৮। দেওঘরে ঋষি রাজনারায়ণের সহিত বাস—১৯০১ এনট্রান্স পরীক্ষা অবধি আট নয় বৎসর দেওঘর বাস।

৯। মেজদা প্রফেসর মনোমোহন ঘোষের বিবাহ, ঢাকায়। কিছুদিন পাটনা কলেজে পাঠের পর মেজবৌদির সহিত ঢাকায় বাস। ঢাকায় কবি জীবন।

১০। আবার পাটনা, রাঙা-মায়ের টাকায় B. Ghose's Tea Stall, প্লেগের মহামারী, বরোদায় কবি, কৃষি ও মৃগয়ার জীবন।

১১। বিপ্লবের পথে—১৯০৩ হইতে ১৯০৮, দুইবার বাংলায় গুপ্তচক্র স্থাপন।

১২। সুরাট কংগ্রেস ভাঙা—লেলের কাছে আমার দীক্ষা, বরোদায় অরবিন্দের দীক্ষা।

১৩। ১৯০৮, ২রা জুন গ্রেপ্তার, বিচার, দ্বীপান্তর দণ্ড, ১৯০৯ হইতে ১৯২০ ডিসেম্বর অবধি।

১৪। কালাপানি হইতে প্রত্যাবর্তন ও কারামুক্তি, বিজলী, চেরী প্রেস।

১৫। পণ্ডিচেরীতে সাত দিন, তিন মাস, দশ মাস। সাড়ে ছয় বছর।

১৬। পণ্ডিচেরী ত্যাগ, দ্বিতীয় পর্যায় বিজলী।

১৭। বসুমতীতে ৭ বৎসর।···

এর পরেও আছে, কিন্তু তা তাঁর সাধনা জীবনের ভবিষ্যতের ইচ্ছা ও ইঙ্গিত, এখানে তার উদ্ধৃতি নিষ্প্রয়োজন।

এই পর্যন্ত লিখে থেমে ১০ই মার্চ (১৯৭০) পণ্ডিচেরীতে নলিনীকান্ত সরকারকে কয়েকটি প্রশ্ন করে একখানা চিঠি লিখি। নলিনীকান্ত ১২ই মার্চ তার উত্তরে যা জানিয়েছেন তার অংশবিশেষ এই—

"লেলের পুরো নাম বিষ্ণু ভাস্কর লেলে। ইনি গৃহযোগী ছিলেন। বারীনদা লেলের কাছে যোগসাধনায় দীক্ষিত হয়েছিলেন, কিন্তু মন্ত্রদীক্ষা নয়, যোগসাধনার নির্দেশ। শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নেন শাখারিয়া স্বামীর কাছ থেকে। এই শাখারিয়া স্বামীর আশ্রম ছিল নর্মদা অঞ্চলে। বারীনদার পর শ্রীঅরবিন্দ যোগসাধনার নির্দেশ নেন লেলের কাছ থেকে।

"রাঙা-মা সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন। 'বিজলী'র গোড়ার দিকে এই 'রাঙা-মা'র সঙ্গে এক পরিবার ভুক্ত হয়ে আমি দীর্ঘদিন কাটিয়েছি, তখন তিনি বৃদ্ধা।

"স্ত্রী স্বর্ণলতা পাগল হয়ে যাওয়ায় স্বামী কৃষ্ণধন ঘোষ (ডাঃ কে· ডি· ঘোষ নামেই সমধিক পরিচিত) বহুবিধ চিকিৎসায় বিফল হয়ে দেওঘরের কাছে



নলিনীকান্ত সরকার

ফোটো : পরিমল গোস্বামী, ১৯৫৯

রোহিণীগ্রামে একটি বাড়ি ভাড়া করে বালকপুত্র বারীন্দ্রকুমার ও নিতান্ত বালিকাকন্যা সরোজিনী সহ স্ত্রীকে সেখানে রাখার ব্যবস্থা করেন, অদূরেই দেওঘরে থাকতেন রাজনারায়ণ বসু, পাগলকন্যার তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা তিনিই করেছিলেন।

"ডাঃ কে. ডি. ঘোষ তখন খুলনার সিভিল সার্জন। রাঙা-মাও (আসল নাম আমি জানিনা, বারীনদা তাঁকে রাঙা-মা বলেই ডাকতেন) খুলনার মেয়ে, তাঁর যৌবন কালেই ডাঃ কে ডি ঘোষ তাঁকে গ্রহণ করেন এবং কলকাতার দপ্তরিপাড়ায় একটি বাড়ি তাঁর নামে কিনে সেখানে তাঁকে রাখেন। পাগলামায়ের কাছ থেকে বারীনদাকে একরকম চুরি করেই আনা হয় কলকাতার এই বাড়িতে, বারীনদার বয়স তখন মাত্র দশ বছর, অপূর্ব সুন্দরী দেখে তাঁকে বারীনদা রাঙা-মা বলতেন।

"এই রাঙা-মার কাছ থেকে টাকা নিয়ে বারীনদা পাটনায় চায়ের দোকান খোলেন। দোকানের সাইনবোর্ডে থাকত B. Ghose's Tea stall.—Half anna cup, rich in cream.

"রাঙা-মা দপ্তরিপাড়ার বাড়ি বিক্রি করে বর্ধমানে বাড়িভাড়া করে ছিলেন কিছুদিন। পাটনার ব্যবসায় বিফল হয়ে রাঙা-মার কাছ থেকে টাকা নিয়ে বারীনদা বরোদায় যান শ্রীঅরবিন্দের কাছে।"

এ চিঠিতে বিস্তারিত খবর জানা গেল। আমার বাল্যকালে বারীন্দ্রকুমার ও অন্যান্য বিপ্লবীদের কথা স্মরণ মাত্র মনে অভূতপূর্ব রোমাঞ্চ জাগত। সেই বোমার যুগ স্বদেশী যুগের আসল অর্থ কি তা বুঝি না বুঝি, দূর পল্লীতে যে একটা নব যুগের হাওয়া এসে লেগেছিল তাকে খুব পবিত্র মনে হত, বোমার যুগস্রষ্টা বারীন্দ্রকুমারের প্রতি যে একটা রোমাঞ্চকর শ্রদ্ধা বালক বয়সে আমার মনে জেগেছিল, তা শেষ পর্যন্ত আমার মন থেকে দূর হয়নি। তাঁর পরবর্তী জীবনে তিনি যে দুঃখ পেয়েছেন, তার জন্য আমি বেদনা বোধ করেছি, এবং আমার যেটুকু সাধ্য ততটুকু সাহায্য তাঁকে করেছি. অবশ্য তাঁর লেখা চেয়ে নিয়ে ছাপিয়ে। তাঁর যে কখানা চিঠি আমার কাছে আছে, তাতে তাঁর অভাবের ইঙ্গিত আছে, কিন্তু হীনতার ভাব নেই।

বাঁচতে হলে কিছু অর্থ চাই, মানুষের জীবনে বিধাতা-ব্যবস্থিত এই ট্র্যাজিডিকে মেনে চলতেই হয়, যিনি আত্মিক সাধনায় রত থাকবেন, তাঁরও এ থেকে নিস্তার নেই, একই সঙ্গে সাধনার পথে চলা এবং ব্যবসা দ্বারা

কিছু উপার্জন, এই দুয়ের শিক্ষা এদেশে কেউ পায়নি। "Moral businessman" সম্ভবত পরস্পরবিরোধী কথা, তাই অ্যামেরিকানদের শিক্ষাকে বিদ্রূপ করে এক রসিক লেখক বলেছেন, তিনি একটি ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তুমি কি কি বিষয় নিয়েছ ?' সে উত্তর দিয়েছিল 'Salesmanship and Religion'। লেখক মন্তব্য করেছেন—Here was a young man whose training was destined to turn him into a moral businessman. তিনি একথা অক্সফোর্ডের ছাত্রদের কাছে বলেছিলেন। আমাদের ছাত্রদের কাছেও বলতে পারতেন, কিন্তু এসব প্রসঙ্গত।

বারীন্দ্রকুমার বোমার যুগ শেষ করে প্রবীণ বয়সে ঘরের শান্তি কামনা করেছিলেন, কিন্তু তা নিয়ে কোনো কোনো কাগজে খুব বিদ্রূপ করা হয়েছিল। যেন কতবড় অধঃপতন ! আমরা শান্তিতে ঘরে শুয়ে বারীন্দ্রকুমারের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে রঙ্গরহস্যে মেতেছি। এ জিনিস আমার পছন্দ ছিল না। আমি ১৯৩৩ সনে—তখন তাঁর সম্পূর্ণ অপরিচিত আমি, শনিবারের চিঠিতে (তখন আমি সম্পাদক)এই প্যারাগ্রাফগুলি লিখেছিলাম—

"বারীনদার বিবাহ হইয়াছে। মানুষই বিবাহ করিয়া থাকে—ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কাহারো দৃষ্টির প্রসার হয়, কাহারো সঙ্কোচন ঘটে, মোটকথা কেহ একই মত অথবা দৃষ্টি লইয়া বাল্য কাল হইতে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত কাটাইয়া দেয় না। শেষ সত্য পাইয়াছি ইহা এক হোমিওপ্যাথ ছাড়া আর কাহাকেও বিশেষ বলিতে শুনি নাই, সুতরাং বারীনদা যদি এতদিন পরে বিবাহের প্রয়োজন বোধ করিয়া থাকেন, তাহাতে বাঙালী জাতির সর্বনাশ হইল বলিয়া মনে হয় না।

"বাঙালী হইয়া বিবাহ করিল না—এটা অসাধারণত্ব। এইজন্য কেবলমাত্র বিবাহ না করিলেই অনেকে অবিবাহিত লোকটিকে অসাধারণ লোক বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকে। অনেক সময় পাঁচজনের মুখে এইরূপ অতিমানবতার স্তুতি শুনিয়া শ্রবণকারীর ইহকাল পরকাল নষ্ট হইয়া যায়। বোমার বারীনদা বীমায় ঢুকিবার পরেও কোনো কোনো কৌতূহলী লোকের মনে এরূপ ধারণা থাকা অসম্ভব ছিল না যে, তিনি হয়তো একদা কোনো বীমা কম্পানির ডিরেকটরকে হত্যা করিয়া আবার আন্দামান যাইবেন। কিন্তু এই বিবাহ হইবার পর তাঁহাদের সে আশা চূর্ণ হইল।

"লোককে যখন নির্দিষ্ট কোনো একটি আশাদ্বারা উস্কাইয়া তোলা হয়—তখন কেউ ভাবে না যে, যিনি আশা দিলেন তিনি মানুষ, অদ্যকার যে লোকটি আশা দিলেন আগামীকল্য তিনি আর সে লোকটি থাকিবেন না। এই-টুকু ভুলিয়া যাওয়াতেই যত অনর্থ। বারীন্দ্রকুমার সম্বন্ধে দেশ আর কি আশা করিতেছিল? ভদ্রলোক জীবনে একবার দেশের জন্য জীবন পণ করিয়া-ছিলেন—তাহার পর বুঝিয়াছেন তাঁহাদের সেই পথ ভারত উদ্ধারের পথ নহে। পথ হউক অপথ হউক, যৌবনের প্রথম আগুন এই পথেই তিনি জ্বালাইয়া নিজেকে ভস্মে পরিণত করিয়াছেন। এখন যদি তিনি সাধারণ লোকের মতো বিবাহ ইত্যাদি করিয়া সংসার পাতিতে চাহেন তাহাতে নিন্দার কিছু নাই।" (অগ্রহায়ণ ১৩৪০)

বারীন্দ্রকুমার এ সময়ে আমার অপরিচিত, আগেই বলেছি। তাই তাঁর বিষয় তখন যা বলেছি তা হয়তো সম্পূর্ণ সত্য না হতেও পারে। কিন্তু তাঁর বিবাহ করা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ঘটনা, এ বিশ্বাস আমার তখনো ছিল—এখনো আছে, এবং তিনি যে "লোকে কি বলবে" সে কথা না ভেবে নিজের বুদ্ধিতে চলেছিলেন এ জন্য তিনি আমার শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন। উপরে যে টুকু উদ্ধৃত করেছি তা আংশিক, দুটি প্যারাগ্রাফ বাদ দিয়েছি। মনে রাখতে হবে ঐ লিখনটি আজ (১৯৭০) থেকে ৩৭ বছর আগে লেখা। বারীন্দ্রকুমারের শেষ জীবনের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য লড়াই আমার মনে একটা বেদনার ছবি এঁকে দিয়েছে, আত্মিক সাধনার দিকে ঝুঁকে পড়েও শেষ পর্যন্ত অভাবই তাঁকে দীর্ঘজীবী হতে দেয়নি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হেমলতা ঠাকুরের দুখানা চিঠি রয়েছে আমার সংগ্রহে। (ইনি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রবধূ এবং দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিমাতা।) ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে লেখা দুখানাই, কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় এর সাত-আট বছর আগে থেকে। সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির মুখপত্র 'বঙ্গলক্ষ্মী' মাসিক পত্রে আমি কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম সেই সময়। পরিচয় শুধু সেই সূত্রে নয়, আমার ভগ্নী সরলা পুরীতে বসন্তকুমারী বিধবাশ্রমের ছাত্রী ছিল এই সময়ে, এই সূত্রে পরিচয় আরো একটু অন্তরঙ্গ হয়েছিল। হেমলতা দেবী ১৯৩৯ সনে আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী মঞ্জুর বিবাহ (সরোজ আচার্যের সঙ্গে) উপলক্ষে আমাদের কৈলাস বসু স্ট্রীটের বাড়ীতেও এসেছিলেন। খুব কথা বলতে ভাল বাসতেন। উজ্জ্বল গৌরবর্ণা, সর্বদা হাসিমুখ, তাঁর আলাপ ছিল খুব হৃদয়-গ্রাহী, শুনতে বেশ ভাল লাগত।

১৯৩৮ সনে কৃষ্ণনগর সাহিত্য সম্মিলন উপলক্ষে কথাসাহিত্য বিভাগের সভানেত্রীরূপে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন, সেটি প্রস্তুতের ব্যাপারে তিনি আমার শরণাপন্ন হয়েছিলেন। এই সম্পর্কে তিনি আমাকে যে দুখানা চিঠি লেখেন তার কথা বলার আগে ১৯৩৩ সনের একটি ঘটনা বলি। এই সময়ে তিনি একদিন আমাকে ডেকে পাঠালেন একটি পরামর্শের জন্য, তাঁর ইচ্ছা হয়েছিল প্রতি বৎসর তিনি বাছাইকরা একজন কথাশিল্পীকে একটি নগদ টাকার পুরস্কার দেবেন। কি ভাবে একটা বিচারক মণ্ডলী গঠন করা যায় সেই বিষয়ে তিনি আমার সঙ্গে আলোচনা করতে চান। আমি যে দিন তাঁর কাছে যাব, সেদিন সজনীকান্ত দাসকেও আমার সঙ্গে যেতে বললাম, সজনীকান্ত খুব উৎসাহী হয়ে উঠলেন।

১৯৩৩ সনের এক শীতের সকাল, তারিখটি মনে নেই, ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলির বিখ্যাত বাড়ি। এই বাড়ির সঙ্গে আমার সামান্য কিছু স্মৃতি জড়িয়ে আছে। ১৯২৩ সনে একদিন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একখানি ফোটোগ্রাফ তুলতে গিয়েছিলাম ঐ বাড়ির দোতলায় পশ্চিমের বারান্দায়। ঐ সময় কিছুকাল ৬নং বাড়ির নিচের একটি ঘরে বাসও করেছি। ১৯২৭ (?) সনে ঐ বাড়িতে নটীর পূজা অভিনয় দেখেছি। ১৯২৩ থেকে ১৯৩৭ সনের মধ্যে চারবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্যক্তিগত কারণে দেখা

করেছি, এবং ১৯৩৬ সনে তাঁর গদ্যকাব্যের আবৃত্তি শুনেছি ৬/৩ নম্বর বাড়িতে। এবং এই সময় বাসব ঠাকুরের আহ্বানে তার ঘরে বসে তার কয়েকটি নতুন লেখা সুন্দর কবিতা শুনেছি। রবীন্দ্রনাথের গদ্যকাব্য পাঠের দিনের একটি অতি কৌতুককর ঘটনার কথা বলি। ৬/৩ নম্বর বাড়ি—যেখানে পরে বিশ্বভারতী পত্রিকা অফিস হয়েছে, সে বাড়ির সিঁড়িটি খুব প্রশস্ত নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর তৎকালীন গদ্যকাব্য পাঠ করে শোনাবেন নিমন্ত্রিতদের কাছে। সজনীকান্ত দাস, প্রমথনাথ বিশী ও আমি যথাসময়ে গিয়েছি সেখানে। সিঁড়িটি জুতোয় ভরতি, পাঠশেষে যখন নিচে নামছি তখন সজনীকান্তের নজরে পড়ল প্রকাণ্ড একজোড়া বিদ্যাসাগরী চটির উপর, তৎক্ষণাৎ বোঝা গেল এ জুতো রবীন্দ্রনাথের না হয়ে যায় না। সজনীকান্ত বললেন এ জুতো সরাতে হবে। তাঁর নিজমুখে আগে শুনেছিলাম রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত অন্যান্য জিনিসও তিনি কিছু কিছু হস্তগত করেছেন, তার মধ্যে কবির নিজহাতে মার্জিনে মন্তব্য লেখা বইও আছে। বইখানা কার লেখা এখন আর আমার মনে পড়ে না। রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত যে-কোনো জিনিস ভবিষ্যতে বিশেষ মূল্যবান হয়ে উঠবে এ বোধ সজনীকান্তের একটু তীব্র রকমেরই ছিল। শ্রীযুক্তা হেমন্তবালা দেবীকে দেওয়া কয়েকটি জিনিস সজনীকান্ত তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন, এবং পরে রবীন্দ্রনাথ তা জানতে পেরে হেমন্তবালা দেবীর উপরে কিছু অসন্তুষ্টও হয়েছিলেন। (সে সব কথা রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র (৯) তে ছাপা আছে। যে সব চিঠিতে এর উল্লেখ আছে ছাপার সময় তা থেকে নাম অবশ্য বাদ দেওয়া হয়েছে।)

অতএব রবীন্দ্রনাথের চটি সজনীকান্তের সংগ্রহকে আরো মূল্যবান করবে এই আশায় তাড়াতাড়ি জুতোজোড়া সরাবার উপক্রম করতেই শিল্পী (শান্তিনিকেতনের) দীর্ঘকায় দীর্ঘপদী হরিপদ রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, আমার চটি কোথায়? সজনীকান্ত তাড়াতাড়ি কাগজের ভিতর থেকে চটি জোড়া যথাস্থানে রেখে দিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, এ চটি কার, হরিপদ দার নাকি? পরে এ নিয়ে খুব হাসাহাসি হয়েছিল। যাই হোক, সজনীকান্ত ও আমি যথাসময়ে গিয়ে পৌঁছলাম ৬ নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলিতে। কে যে আমাদের পথ দেখিয়ে অন্দরের গোলকধাঁধার পারে হেমলতা দেবীর ঘরে পৌঁছে দিয়েছিল যে কথা আজ আর মনে পড়ে না। তবে সাহিত্য বিষয়ে অনেক

আলাপ হয়েছিল এবং কথাশিল্পীরা যে আমাদের দেশে অধিকাংশই গরিব, সে সব কথা আলোচনার পরে পুরস্কারের কথা পাড়লেন। তিনি বললেন তিনি বছরের শ্রেষ্ঠ বাংলা গল্প বা উপন্যাস লেখককে বছরে ১০০ টাকা পুরস্কার দিতে চান।

অঙ্কের পরিমাণ শুনে দমে গেলাম। অথচ সে যুগে একশত টাকা খুব কম ছিল না। টাকার দাম তখন কেমন ছিল অন্যভাবে তার আভাস দেওয়া যেতে পারে। ঐ টাকায় তখন চাল পাওয়া যেত ৬০০ থেকে ১০০০ সের। অথবা মিলের ধুতি কেনা যেত মাঝারি ধরনের ৫০ জোড়া, রুইমাছ পাওয়া যেত ২০০ সের, এবং এই সময় সজনীকান্ত দাস মাসে ২০০ টাকা বেতনে বঙ্গশ্রী সম্পাদক নিযুক্ত হওয়াতে বন্ধু মহলে উৎসব আরম্ভ হয়েছিল। এত বড় চাকরি সহজে কারো ভাগ্যে মেলে না। সেই বাজারে একশত টাকা পুরস্কারের কথা শুনে যে দমে গিয়েছিলাম (যাঁদের জন্য এই পুরস্কার-প্রস্তাব তাঁদের মনোভাব যাচাই না করেই) সে অন্য কারণে। আমরা জানতাম হেমলতা দেবীর অনেক টাকা আছে। এবং পথে আমরা অনুমান করেছিলাম অন্তত পাঁচশত টাকা অবশ্যই তিনি দিতে চাইবেন। কিন্তু আমরা যেমন দমে গেলাম, তিনিও তেমনি। বাংলাসাহিত্যের জন্য এই প্রথম পুরস্কার ঘোষণার ঐতিহ্য গড়ে ওঠায় (নিজেদের অবিমৃষ্যকারিতার জন্যই) বাধা দিলাম। পুরস্কার প্রথা সর্বপ্রথম প্রচলিত করেন হেমেন্দ্র বসু, কুন্তলীন পুরস্কার ঘোষণা দ্বারা। কিন্তু তা ছিল ভিন্ন জাতের। গল্পের জন্য ছোট পুরস্কার, এবং সে গল্পে কৌশলে কুন্তলীন তেলের নাম ব্যবহার করতে হবে। জগদীশচন্দ্র বসুও ২০ টাকার কুন্তলীন পুরস্কার পেয়েছিলেন, একটি গল্প লিখে। পুরস্কার-প্রাপ্ত গল্পগুলির সেই লম্বা আকারের বই, যতদূর মনে পড়ে ঘোর গোলাপী কালীতে কুন্তলীন প্রেসে ভারী সুন্দর ছাপা, ছেলেবেলায় পড়েছি। অতএব হেমলতা দেবীর পুরস্কারই হত আসল সাহিত্যের পুরস্কার।

কৃষ্ণনগর সাহিত্য সম্মিলনী (১৯৩৮) ভাষণ প্রস্তুতে সাহায্য করার জন্য দুখানা চিঠির উল্লেখ করেছি, তার প্রথম খানি এই—

সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি
৬০-বি মির্জাপুর স্ট্রীট,
কলিকাতা—৪-১-৩৮

কল্যাণীয় পরিমল,

তারাদাসের মুখে তুমি আমাকে কথাসাহিত্যের অভিভাষণ সম্বন্ধে

সাহায্য করবে জেনে আমি যার পর নাই সুখী হয়েছি। আমি জানি তুমি এ সম্বন্ধে যে তথ্য দেবে তা কত মূল্যবান ও সুচিন্তিত হবে। একেই তো এ রকম একটি অভিভাষণ লিখতে গেলে অনেক জানা থাকা দরকার, তা ছাড়া ভাবতেও হবে অনেকখানি। এসব করতে আমার একেবারেই সময় অভাব। আপাতত তুমি বই ঘেঁটে কথাসাহিত্যের ঐতিহাসিক ধারাটি আমাকে ধরিয়ে দেবে, শেষে নিজের ভাষায় সেটি গেঁথে নেব। নানা কাজে আমি এত ব্যস্ত যে বেশী সময় এর জন্য দিতে পারছি না, অতএব তুমি অভিভাষণটি একরকম তৈরি করেই দেবে, আমি নিজের ভাষায় গুছিয়ে নেব মাত্র। এ কাজে তোমাকে খানিকটা সময় দিতে হবে, তোমার সময়ের ও পরিশ্রমের মূল্য আমি জানি। সামান্য কিছু সাহায্য সেজন্য আমি তোমাকে তারাদাস মারফৎ পাঠালাম। ৮।১০ দিনের মধ্যে লেখাটুকু পেতে পারব তো? আমাকে আবার গুছিয়ে ভাষায় বসিয়ে নিতে সময় দিতে হবে।

ইতি—বড়মা

পুঃ পাঁচটি টাকা পাঠালুম—

—বড়মা

এবারে আট-দশদিনের পরিশ্রম সার্থক মনে হল। টাকা একেবারেই আশা করিনি। ঐ টাকায় একমাসের বালাম চাল (চল্লিশ সের—চার টাকা) ও দুদিনের বাজার হল (আট আনা + আট আনা)। সাহিত্য কর্মের জন্য বার্ষিক একশ টাকা দিতে চেয়েছিলেন তিনি, তখন তা মনঃপূত না হওয়াতে যে ভুল করেছিলাম, এবারে আর সে ভুল করিনি।

পত্র ও টাকাবাহক তারাদাস—তারাদাস মুখোপাধ্যায়, বীরভূমের মানুষ। তখন বয়স সম্ভবত ২৫ বছর, লেখকরূপে ছদ্মনাম ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়।

হেমলতা ঠাকুরের দ্বিতীয় চিঠি—

ওঁ

৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন,
জোড়াসাঁকো, ৩।২।১৯৩৮

কল্যাণীয় পরিমল,

কাল তোমার চিঠিখানি পেয়ে বিশেষ উপকৃত হয়েছি এবং তোমার নির্দেশমত স্থানে স্থানে পরিবর্তন করে দিলুম। কাকামহাশয় (রবীন্দ্রনাথ) পুনঃ পুনঃ নিষেধ করেছেন এই সব প্রবন্ধে ব্যক্তিগত নাম উল্লেখ করতে।

তাই উল্লেখ করতে সাহস পাই নাই। প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বর্তমান সম্মিলনীর জন্য যে অভিভাষণ লিখেছেন, তাতে একজনেরও নাম উল্লেখ করেন নাই, যা বলবার সব সাধারণভাবে বলেছেন, আমার প্রবন্ধটা একবার কাকামহাশয়কে দেখিয়ে আনার জন্যে শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তিনি যা বলেন তাই করি।

আমি যে এসব বিষয়ে অনেকটা আনাড়ি সবাই তা জানে, তবে তাই বলে যা তা লিখতে হবে তা হতে পারে না, কেউ কানে না নিলেও, মনে গ্রহণ না করলেও, আমাকে অবশ্য সাবধান হতে হবে।

তোমার suggestion পেয়ে কাল খানিক খানিক বদলেছি এবং তাতে ভাল হয়েছে। কাকামহাশয় পছন্দ করেন না অনেক নাম উল্লেখ করা, তাই করতে সাহস করলুম না। তবে তাঁরা যে প্রতিভাশালী সে কথা বিশেষ করে উল্লেখ করেছি।

তুমি যে আমার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করেছ এজন্য আমি কৃতজ্ঞ।

—বড়মা

এ চিঠি পাবার কিছু দিনের মধ্যে হেমলতা ঠাকুর আমাকে ঐ তারাদাস মুখোপাধ্যায়ের হাতে একটি ব্লাকবার্ড ফাউনটেন পেন কিনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। নীলরঙের কলমটার কথা আজও ভুলিনি। কাজ করিয়ে নিয়ে তার পরিবর্তে কিছু দেওয়া কর্তব্য এ বোধ যাঁরই আছে, তাঁর প্রতিই আমি শ্রদ্ধা পোষণ করি। হেমলতা ঠাকুরের জন্য সামান্য কাজ করার বিনিময়ে আমি কিছু যে আশা করিনি, এ কথা আগে বলেছি। আমি খুব খুশি হয়েই এই অসহায় ব্যক্তিটিকে যথাসম্ভব সাহায্য করেছিলাম।

এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রায় অনুরূপ ঘটনার কথা মনে এলো। এক্ষেত্রেও এক মহিলা এবং তিনিও ধনী। উপরন্তু তিনি ধনী পিতার সন্তান। পিতা, সার তারকনাথ পালিত, স্বামী ভাগলপুরের বিখ্যাত জমিদার দীপনারায়ণ সিং। এঁর সঙ্গে আমাকে পরিচিত করিয়ে দিয়েছিলেন লেখক এনজিনিয়ার কপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য। দীপনারায়ণ সিং তখন সদ্য মারা গিয়েছেন, লীলা সিং তখন শোকসন্তপ্ত বিধবা।

আলাপের পরে লীলা সিংএর ইচ্ছা হল আমি তাঁর স্বামীর বিষয়ে বাংলায় একটা প্রবন্ধ লিখি। লেখার জন্য প্রয়োজন খবরের কাগজের কিছু কিছু ক্লিপিং পেলাম, এবং আমার অনুরোধে তিনি দীপনারায়ণের পড়বার

ঘর, বিশ্রাম ঘর এবং তাঁদের প্রাসাদের পরিবেশটি ঘুরে ঘুরে দেখবার ব্যবস্থা করে দিলেন। এইভাবে প্রায়-সর্বদা-বিশ্বভ্রমণরত দীপনারায়ণের মনের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করলাম।

প্রবন্ধটি বেরিয়েছিল যতদূর মনে পড়ে জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত ভগ্নদূত নামক সাপ্তাহিকে। তার কোনো কপি আমার নেই। আমার সেই লেখা পাঠের পর লীলা সিং আমাকে এই চিঠিখানি লেখেন—

Mansurganj
Bhagalpur EIR
The 3rd July 1936

My dear Parimal Babu

Please do not think I am trying to flatter you when I say that I was greatly touched and moved by what you have written. It shows not only the command of language but the insight of a true artist for you to have writien as you have done about whom you did not personally know but only knew through his intimate friends and those who loved him. You have caught such salient points of his character that it seems amazing to me how any one who did not know my husband persanally could have done so, Much has been written about him since his death but nothing I have read has really moved me as greatly as your article.

With deepest thanks
and kind regards
Believe me, yours very
sincerely
Lila Sing.

এরকম একখানা চিঠি পেয়ে মনটা স্বভাবতই স্ফীত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু সেই স্ফীতির কেন্দ্রে কি পাঁচ টাকার একখানা চেক পাব এমন দুরাশা লুকিয়ে ছিল? এখন আর তা স্পষ্ট মনে পড়ে না, তবে সত্যই যদি পেতাম, তাহলে অবশ্যই আশা করতে থাকতাম যে এবারে হায়দারাবাদের নিজামের বিষয়ে কিছু লেখার আদেশ পাব।

হেমলতা প্রসঙ্গ শেষে এবারে শান্তিনিকেতনের কথায় ফিরে যাচ্ছি। ১৯২১ সনে সেখানে নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামীর সঙ্গে পরিচয় হয়। অল্প দিনের পরিচয়। অথচ কি এক মধুর স্মৃতি অর্ধশতকাল পার হয়ে আমার মনের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে। কোনো উপকার পাওয়ার স্মৃতি নয়, স্বার্থের স্মৃতি নয়। সে যে কি তা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে না, শুধু একটা চরিত্রমাধুর্য স্মৃতি মনের মধ্যে বয়ে বেড়াচ্ছি। তাই দীর্ঘ ৩৫-৩৬ বছর পরে যখন আমি মাসিক বসুমতীতে 'স্মৃতিচিত্রণ' নামক স্মৃতির ছবি আঁকতে শুরু করি, তখন নিত্যানন্দবিনোদের কথা মনের মধ্যে একটা আনন্দের আলো জ্বালিয়ে তুলেছিল। একটি কথা লিখেছিলাম এই যে তাঁর শ্মশ্রুশীর্ষ আমার স্মরণ রেকর্ডখানার উপর নীডলের কাজ করছে। যখন তাঁকে দেখি, তখন তাঁর ছাঁটা দাড়ি ঠিক একটা পিনের আগার মতো নিচের দিকে ঝুলে ছিল। এই স্মৃতিকথা নিত্যানন্দবিনোদের মনোযোগ আকৃষ্ট করে, এবং সেটি পড়ার পর তিনি ২১-৪-৫৮ তারিখে শান্তিনিকেতন থেকে যে চিঠিখানি লেখেন তা এই—

সশ্রদ্ধ নমস্কার জানবেন, এই চিঠি পেয়ে নিশ্চয়ই একটু চমকাবেন। মাসিক বসুমতী যখন মাঝে মাঝে হাতে এসে পড়তো তখন আপনার স্মৃতি-চিত্রণ পড়ার সুযোগ হতো, সম্প্রতি আমাদের শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছ থেকে অখণ্ড 'স্মৃতিচিত্রণ' [গ্রন্থ] খানি নিয়ে অখণ্ড আনন্দলাভ করলাম। শান্তিনিকেতন প্রসঙ্গে অনেক পুরোনো কথা মনে পড়ে গেল। বই খানির ঝরঝরে ভাষাতে সমস্তটা সৌন্দর্য্য-পরিমলেই মনোরম হয়েছে। ঘটনার বৈশিষ্ট্য নানা মানুষের আনাগোনা প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি সত্যই চিত্রের মতোই চোখে ভেসে ওঠে। অথচ যাঁর স্মৃতি চিত্র তিনি কিন্তু 'প্রমিনেণ্ট' হবার চেষ্টা করেননি, এইটেই খুব ভাল লাগল। আমি এখনো ধরাধামে বিরাজমান আছি। শরীর খুবই ভেঙে পড়েছে। আমার যে 'শ্মশ্রুশীর্ষে' আপনার স্মরণ রেকর্ডখানার উপর (স্টীলের) নীডলের কাজ করেছে, আজ তা এলুমিনিয়মের (শুভ্র) নীডলত্ব প্রাপ্ত। আপনার চিত্রণের এক পাশে চিত্রিত হয়ে গেছি, এ জন্য আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। নিশ্চয়ই চেহারাতে বদল হয়েছে, পথে ঘাটে ট্রামবাসে পরস্পরকে আর চিনে উঠতে পারব না।···

ইতি—শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী

যে স্নিগ্ধ সহৃদয়তা নিত্যানন্দবিনোদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য, তার প্রমাণ এই চিঠিখানাও বহন করছে।

বিশ্বভারতীর শ্রেষ্ঠ সম্মান তিনি পেয়েছেন—'দেশিকোত্তম'। এই সংবাদ পাবার পর আমি নিত্যানন্দবিনোদকে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলাম, তার উত্তরে তিনি লিখলেন— (ঠিকানা হাসপাতালের।)

P. M. Hospital
Santiniketan
30. 12. 65

…মৃতদেহের মাথায় তাজ, সাজের বিষয় না লাজের বিষয়। …আজ ৪ বছরের অধিককাল স্ট্রোক হয়ে হাসপাতালে অচল অবস্থায় শেষ শয্যায় বিষ্ণুর মতো শায়িত আছি, হাত পা সব কাজে জবাব দিয়েছে। সুতরাং আমার অবস্থা অনুমানযোগ্য। কর্তৃপক্ষের ইচ্ছায় হুইল-চেয়ার বাহনে মঞ্চের কাছে যেতে হয়েছিল। ……এইবার বাহাত্তুরে ধরল। সুতরাং বয়সের রস নেই যশও নেই, এখন এক পা ওপারের জমিতে এক পা এপারের ভূমিতে আটকে দাঁড়িয়ে আছি, সত্বর একটা পা তুলতেই হবে।…

শুয়ে শুয়ে লিখলাম পড়তে কষ্ট হলে ক্ষমা করবেন।

নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী

আজ তাঁর সম্পর্কে লিখছি, মে, ১৯৭০ সনে। আজ আমিও শুয়ে শুয়ে লিখছি। পায়ের কথা বলব না, হাত আমার অনেক, সেই সব হাত দিয়ে অনেক জিনিস আঁকড়ে ধরে আছি, কেউ যদি ছাড়িয়ে নেয়, নেবে, তা নিয়ে ভাবি না।

বাসব ঠাকুরের কথা বলেছি আগে। উল্লেখ করেছি তার ঘরে বসে কবিতা শুনেছিলাম, খুব ভাল লেগেছিল। তারপর মে ১৯৩৬ সনে সে বিলেত যায়। ছিল কবি, হয়ে এলো রয়্যাল অ্যাকাডেমিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পী। মাঝখানে যুদ্ধের কাজে সে লণ্ডনে এ-আর-পি'তে যোগ দিয়ে ভ্যান-ড্রাইভার হয়েছিল। তার বিষয়ে একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা আমার আজও মনে পড়ে, এবং কৌতুক অনুভব করি ভাবতে গেলেই। ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় তৃতীয় দুটিপুত্রই শিল্পীরূপে খ্যাতিলাভ করেছে সুভো ও বাসব। বাসব চমৎকার আলাপী, ইংরেজী বা বাংলায় মনোগ্রাহী কথা বলে যেতে পারে, কিন্তু কিছু লিখতে হলে বানান বিষয়ে ভয়ানক দুঃসাহসী হয়ে ওঠে। তবু

তাকে দিয়ে নানা বিষয়ে লিখিয়েছি এবং অত্যন্ত সুপাঠ্য হয়েছে। তার বিবাহ হয় ১৯৫৮তে। স্ত্রী শ্রীমতী স্মৃতিও খুব সুন্দর ঘরোয়া আলোচনা মেয়েদের বিভাগে অনেকগুলি লিখেছে, কিন্তু বাসব যে দিন স্মৃতির লেখা প্রথম এনে আমাকে দেয়, সে লেখায় লেখিকার নাম ছিল না। আমি বললাম, নাম লিখে দাও তুমিই। কিন্তু এ অনুরোধ তার কাছে বিভীষিকাবৎ বোধ হতে লাগল, স্ত্রীর নাম স্মৃতি না সৃতি কিছুতে মনে পড়ে না। আমি বললাম দুইয়েরই মানে হয় অতএব তার কাছ থেকে শুনে আমাকে পরদিন জানাবে। বিবাহের দু এক বছরের মধ্যেই স্ত্রীর নাম বিস্মৃত হওয়ার দৃষ্টান্ত সহজে চোখে পড়ে না। আসলে বানানটাই ছিল তার কাছে সমস্যা।

শিশিরকুমার ভাদুড়ির সম্বন্ধে এই জাতীয় একটি গল্প প্রচলিত আছে বটে। কাশীতে সীতা অভিনয়কালে হঠাৎ স্টেজে তাঁর ভুল হয়ে গেল তিনি রাম না আলমগীর, কৌশলে প্রম্পটারের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রম্পটার ধাঁধায় পড়ে গেল। বলল, ভিতরে মেয়েদের কাছে জিজ্ঞাসা করে আসি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল ১৯৩৯ সনে। সে সময় 'অলকা' নামক একখানা স্বল্পায়ু মাসিকপত্রে সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীর সহযোগী সম্পাদকরূপে আমিও যুক্ত ছিলাম, এই উপলক্ষে ১নং পাম প্লেসের বাড়িতে আমি সপ্তাহে অন্তত একবার গিয়েছি।

তারপর ১৯৪৫এ আমি যখন যুগান্তর দৈনিকের সাময়িকী বিভাগের সম্পাদক নিযুক্ত হই, সেই সময় প্রমথ চৌধুরীর কয়েকটি অপ্রকাশিত রচনা প্রকাশ করি। তখন একবার ইন্দিরা দেবীর কাছে আমি প্রস্তাব করি রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষা বিষয়ে তাঁর মত যেন তিনি আমাকে জানান। রবীন্দ্রনাথ এই সময়ের প্রায় চার বছর আগে পরলোক গমন করেছেন।

আমি প্রমথ চৌধুরীর কিছু অপ্রকাশিত লেখা এই সময় ইন্দিরা দেবীর কাছ থেকে সংগ্রহ করে যুগান্তরে ছাপতে থাকি। তার একটির উল্লেখ আছে এখন যে চিঠিখানা এখানে উদ্ধৃত করছি এই চিঠিতেই এবং রবীন্দ্রস্মৃতি প্রকাশ্যে রাখবার জন্য কোন্ ভঙ্গিতে কোন্ বস্তুর সাহায্যে প্রস্তুত করা যায় সে বিষয়েও এতে ইন্দিরা দেবীর নিজস্ব মন্তব্য পাওয়া যাবে।

ওঁ

লাল বাঙ্গলা
৫-৬-৪৫

কল্যাণবরেষু, "টোক" সংখ্যাটিও দেখেছিলুম, চিত্রিতা যা ফেরৎ দিয়েছেন এবং অপ্রকাশিত বা খণ্ড প্রবন্ধ ইচ্ছেমত একদিন এসে দেখে যেও. প্রকাশ হলেই ত ভাল। মূল পত্রাদিও পরে ফেরৎ দিয়ে যেও।

রবীন্দ্র স্মৃতিচিহ্ন সম্বন্ধে আমার নিজস্ব পরিকল্পনা বিশেষ কিছু নেই। তিনি নিজে চেয়েছিলেন জনগণের মনে যে শ্রদ্ধা প্রীতিপূর্ণ স্মরণ, তা যদি তাঁর কৃতকর্ম দিয়ে না পান, তবে কি বাইরের চিহ্ন দিয়ে পাবেন? তবে জনগণের পক্ষ থেকে একটা সাকার চিহ্ন রাখতে চাওয়া স্বাভাবিক। সে হিসেবে নব-গঠিত রবীন্দ্র স্মৃতিভাণ্ডার সমিতি যে উদ্দেশ্য-চতুষ্টয় ঘোষণা করেছেন, সেগুলিও আমার বেশ উপযোগী বা সার্থক বলে মনে হয়। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্বের সঙ্গে যোগ ত রাখাই চাই। "Rabindra Way" টা

যে মনোনীত নয়, সে টুকু সহজেই বলা যেতে পারে। কর্পোরেশনের কল্পনার দৌড়ত দেখি ঐ রাস্তার নামকরণ গণ্ডি।

শ্রীইন্দিরা দেবী

রবীন্দ্র স্মৃতিরক্ষা বিষয়ে আমার একটা পরিকল্পনার কথা ইন্দিরা দেবীকে জানিয়েছিলাম, আমার ইচ্ছা ছিল হিমালয়ের (দার্জিলিঙের এলাকায়) কোনো একটি অখণ্ড পাহাড় খুদে রবীন্দ্রনাথের মূর্তি গড়া, যা দূর থেকেও দেখা যাবে। এতে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বিরাটত্ব শুধু নয়, আমরা তাঁকে যে পরিমাণ বিরাট মনে করেছি তার কিছু প্রতিফলন তাতে পাওয়া যেত। আমার প্রস্তাব যে বাংলা দেশের পক্ষে বাড়াবাড়ি হয়েছিল, তা আমি বুঝেও পেশ করেছিলাম। আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধার চিহ্ন দেখানো খুব শস্তায় সারা না গেলে তা আমরা করি না। সে হিসাবে করপোরেশনের পন্থাই শ্রেষ্ঠ, পন্থার নাম বদল। একই পথের নাম কিছুদিন পর বদল করা চলে, তাতে সাইন লেখকের বেশ লাভ হয়।

আমার আরো একটি প্রস্তাব ছিল। সে হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের গল্পের বিখ্যাত চরিত্র কয়েকটির মর্মরমূর্তি নানা জায়গায় স্থাপন করা। কিন্তু এতেও তো খরচ, তাছাড়া এ রকম জিনিসের মূল্য বুঝেও, আমাদের জীবনে রবীন্দ্রনাথের কি মূল্য, সে বোধেরও ইন্দিরা দেবীর এই চিঠিখানায় কিছু আভাস আছে—

লালবাঙ্গলা, ১নং পাম প্লেস
বালিগঞ্জ ২৯।৫।৪৫

কল্যাণবরেষু

কদিন হ'ল যুগান্তরের রবিবারের সংখ্যা পেয়ে খুসি হয়েছি। ওঁর মূল চিঠিখানা ফেরৎ পেলে আরও সুখী হব। আশা করি সুবিধামত দিয়ে পাঠাবে।

রবীন্দ্রস্মৃতিচিহ্ন সম্বন্ধে তোমার পরিকল্পনা খুব উচ্চস্তরের ও দরের কিন্তু একটু নাগালের বাইরে মনে হল।

শ্রীইন্দিরা দেবী

এইসব পত্রস্মৃতির সঙ্গে একটি দার্শনিক তত্ত্ব মনে উদয় হল। ছিন্নপত্রাবলীতে ইন্দিরা দেবীর কৈশোরের একখানি ফোটোগ্রাফ ছাপা হয়েছে। আর আমি ১৯৩৯ সনে তাঁর একখানি ফোটোগ্রাফ তুলেছিলাম। দুখানাই

প্রায় একই দিকে মুখ ফেরানো। কিশোরী ও বৃদ্ধা একই ব্যক্তি, মাঝখানের বছরগুলি উধাও। মানুষের জীবনের ও চেহারার স্থায়িত্বকাল যেন একটি নিশ্বাসের ব্যাপার। দুটি ছবি পাশাপাশি দেখলে আমি যা বললাম সেই চিরপরিচিত কথাটি আরো একবার উপলব্ধি করার সুযোগ পাওয়া যাবে।

ইন্দিরা দেবীর হ্রস্বইকারের একটি মজার বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। একটি বাঁকা লাইন, দুটি লাইন হয়েছে। তারও পরে ঐ দুটি লাইন গাছের পাতাতে পরিণত হয়েছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এই সঙ্গে আর এক অমায়িক ব্যক্তির কথা মনে এলো। সুধাকান্ত রায়-চৌধুরীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় করে তা মনে নেই। তারপর ১৯৪৫ এর পর থেকে মাঝে মাঝে দেখা হয়েছে। কিন্তু প্রথম আলাপেই তাঁর অকপট নিরহঙ্কার চরিত্রটি মনে একটা মধুরতার ছাপ এঁকে দিয়েছিল, তাঁর কিছু কিছু লেখাও আমি চেয়ে নিয়ে ছেপেছি। তিনি একবার একটা মজার কাহিনী বলেছিলেন—শান্তিনিকেতন থেকে তিনি একখানা মাসিক পত্র প্রকাশ করেছিলেন সেই বিষয়ে। কাগজ চালানোর নতুন অভিজ্ঞতা এবং পরীক্ষা এটি। তিনি সেই কাগজে নতুন লেখকদের লেখা ছাপাবেন এই রকম বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। লেখা ছাপার জন্য সম্পাদককে টাকা দিতে হবে, এই ছিল প্রস্তাব। নতুন লেখকদের লেখা ছাপা হওয়ার দুর্বলতার উপর কাগজের মুনাফা। বহু লেখা ও টাকা আসতে লাগল। এবং তাতে ছাপা খরচ ইত্যাদি বাদে সম্পাদকের মাসে পঞ্চাশ টাকা লাভ থাকত। সুধাকান্ত তারপর বললেন, এমন উত্তেজক খবর শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কানেও পৌছাল। তিনি সুধাকান্তকে ডেকে তাঁর এই নতুন অ্যাডভেনচারের জন্য খুবই তারিফ করলেন, বললেন পরিকল্পনাটা ভাল, কিন্তু একাজ শান্তিনিকেতনে বসে আর ক'রোনা, বাইরে গিয়ে করলেই ভালো।

বাস্, এমন লাভের ব্যবসাটা এখানেই বন্ধ করে দিতে হল।

এবারে আর একটি স্মৃতিতে ফিরে যাচ্ছি। ৫-২-৫২ তারিখে আমি সুধাকান্তের কাছ থেকে যে চিঠি পাই, তার অংশ এই—

শান্তিনিকেতন, ৪-২-৫২

প্রীতিভাজনেষু,

প্রিয় পরিমলবাবু, গত ২৮-১-৫২ তারিখে বম্বে হতে ফিরেছি স্বরাজ্যে। পথে এলাহাবাদে ঠাণ্ডা লেগেছিল, ফলে ব্রংকাইটিস হয়ে শুয়ে আছি বিছানায়। সময় কাটাবার জন্য যোগাড় করেছি কতগুলি মাসিক আর দৈনিক। কার্তিক ১৩৫৮ সালের প্রবাসীতে দেখলুম "আমার চীন ভ্রমণ"। পরিমল গোস্বামী লিখিত দেখে আগাগোড়া মন দিয়ে ভ্রমণ কাহিনীটি পড়েছি।...প্রবাসীর পরিমল কি আপনি? ইতি—প্রীতিবদ্ধ

সুধাকান্ত রায় চৌধুরী



চন্দননগর বিংশতিতম সাহিত্য সম্মিলনের উদ্বোধন সভায় গমনরত
সুধাকান্ত রায়চৌধুরী পরিচালিত রবীন্দ্রনাথ

ফোটো : পবিমল গোস্বামী, ১৯৩৭

এই ভ্রমণ কাহিনী বিষয়ে কিছু বলা দরকার। প্রবাসীতে, তৎকালীন সম্পাদক কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের স্থায়ী আদেশ ছিল, ভ্রমণ কাহিনী হলেই তা যেন আমি প্রবাসীতে দিই। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের আমল থেকেই প্রবাসীতে ভ্রমণ কাহিনী লিখে আসছিলাম। এই আদেশ মান্য করে কয়েকটি দীর্ঘ ভ্রমণ কাহিনী প্রবাসীতে দিয়েছিলাম—হাজারিবাগ জেলা ভ্রমণ (১৯৪৬) ডুয়ার্স ভ্রমণ, (১৯৪৬) পশ্চিম হিমালয় ভ্রমণ, (১৯৪৯) কিন্তু ১৯৫১তে কোথাও যাবার সম্ভাবনা ছিল না। তাই আমি জানিয়ে দিলাম, এবারে তো বাইরে যাচ্ছি না, যদি কলকাতা ভ্রমণ করে সেই ভ্রমণ কাহিনী লিখি তা হলে চলবে ?

উত্তরে সহকারী সম্পাদক যোগেশচন্দ্র বাগল জানালেন অবশ্যই চলবে।

তখন হঠাৎ মনে হল আমার চীনা বন্ধু ল চংগীর কথা (তখন, যতদূর মনে পড়ে, সে বঙ্গবাসী কলেজের বি-এ ছাত্র, স্পেশাল বেঙ্গলী সহ)—তাকে নিয়ে যদি কলকাতাব চানা পাড়ায় ক্যামেরা নিয়ে ঘুরে 'আমাব চীন ভ্রমণ' লিখি তাহলে একটা নতুন জিনিস হবে। ল চংগী খুব রাজি, সে যেন আমার চেয়েও বেশি উৎসাহী। ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেছে সংস্কৃত নিয়ে। বাংলা দেশে তিন পুরুষ ধরে আছে। তার বাংলা রচনা খুব সুন্দর, আমি ছেপেছিলাম কয়েকটি। (এখন সে পুলিস সারজেন্ট, লালবাজারে।)

আমার কাঁধে লাইকা ক্যামেরা। দুজনে প্রথমে গেলাম ধাপায়। সেখানে চীনাদের চামড়ার যাবতীয় কাজ দেখলাম, বৃত্তান্ত সংগ্রহ করলাম, অনেক ছবি তুললাম। তারপর আর একদিন সে ও তার কাকার সঙ্গে চীনা পল্লীতে প্রাচীন বুদ্ধ মন্দির দুটিতে প্রবেশ করে নানা তথ্য সংগ্রহ করা গেল, এবং চীনা সমাজের নানা তথ্য। ফোটোগ্রাফ প্রচুর তোলা হল। আধুনিক চীনা বাড়িতে কলেজে পড়া মেয়ে ও তাদের নানা শিল্প কাজেরও ছবি তোলা গেল। সে অনেক কথা। প্রবাসীতেও অনেকগুলি ছবির সঙ্গে "আমার চীন ভ্রমণ" ছাপা হল। আমার সব ভ্রমণের সঙ্গে অনেক ফোটোগ্রাফ পাওয়া যাবে এটি প্রবাসীর ছিল একটি আকর্ষণ।

সুধাকান্ত রায়চৌধুরী প্রবাসীতে আমার এই লেখাটি পড়েই চিঠি দিয়েছিলেন। আমি তাঁর ৪ তারিখের চিঠি ৫ তারিখে পেয়ে সেই দিনই তাঁকে জানিয়ে দিলাম প্রবাসীর লেখক আর আমি অভিন্ন। তাঁরও সন্দেহ ছিল না, তবু সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে তবে তাঁর কথা লিখলেন। আমি তাঁর

আগের চিঠির উত্তর ৫ তারিখে দিয়েছিলাম, তিনি তার উত্তর দিলেন ৭ তারিখে।—

শান্তিনিকেতন
৭-২-৫২

প্রীতিভাজনেষু,

প্রিয় পরিমলবাবু, আপনার ৫।২।৫২ তারিখের চিঠি পেয়ে খুশী হয়েছি। প্রবাসীতে প্রকাশিত "আমার চীন ভ্রমণ" পাঠ করে খুব খুশী হয়েছি। খুশী হবার যথেষ্ট কারণ, লেখাটি নিছক সত্য ঘটনায় পূর্ণ অথচ সরল সাহিত্য। কেবল ভ্রমণ বৃত্তান্ত এটা নয়, তার চেয়ে অনেক উঁচুদরের জিনিস, যেহেতু চীন ভ্রমণের ছদ্মবেশ ধরে, এই চীনারা যে বাঙলার অত্যন্ত আত্মীয়ের রূপে দেখা দিয়েছে—অন্তত আমার মনের কাছে চীনা বিদেশীদের সঙ্গে একটা ঘরোয়া ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের নাড়ীর টান রয়েছে—সেই গভীর সম্বন্ধের মাধুর্য অন্তঃসলিলার মত প্রবাহিত হয়ে চলেছে শতবর্ষ ধরে এই বাঙলায়, অথচ আমাদের স্বভাবজাত ইন্‌ডিফারেন্‌সের জন্য আমরা এইসব মানুষকে নিজেদের ঘরের মানুষ বলে অনুভব করতে পারি না—আমরা দেহময় চোখ দিয়ে না দেখি স্বদেশ, না দেখি বিদেশ, এমনি হয়েছি আমরা মমতাহীন, দৃষ্টিহীন—আপনি ঘরের ভিতরের, আশে-পাশের, জিনিস দেখেছেন সত্য দরদীর দৃষ্টিতে, প্রীতিশ্রদ্ধা নিন

শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী

কোনো লেখা ভাল লাগলে নিজে থেকে এভাবে লেখককে জানানো আমাদের দেশের সাধারণ রীতি নয়। কিন্তু সুধাকান্ত ছিলেন মানুষ হিসাবে কিছু স্বতন্ত্র। সরলতা ছিল তাঁর অন্তরের প্রধান সম্পদ। যতবার দেখা হয়েছে অথবা যতবার তিনি আমাকে চিঠি লিখেছেন, প্রত্যেকবারেই তাঁর অকপটতাই আমাকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছে।

একটি কর্মপ্রিয় মানুষ হঠাৎ বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে দেহের দিক থেকে অচল হয়ে পড়লেও মনের সজীবতার জন্য তাঁর পক্ষে জরাকেও অনেকখানি অগ্রাহ্য করা চলে, এসব কথা তিনি আমাকে বলতে ভালবাসতেন, এবং নিজের মনটা যে আগের মতোই তাজা আছে একথা তিনি বার বার আমাকে লিখেছেন। তাছাড়া অনেক ব্যক্তি যে আরো বেশি বয়সেও কর্মক্ষম আছেন সে কথাও স্মরণ করে তিনি আরাম বোধ করতেন। আমি একবার কলকাতায়

নলিনীকান্ত সরকারের একটি সামান্য দুর্ঘটনার কথা সুধাকান্তকে জানিয়ে, সেই সঙ্গে আমি আহত নলিনীকান্তকে পণ্ডিচেরীতে যা লিখেছিলাম, তা সুধাকান্তকে জানাই। আমি নলিনীকান্তকে লিখেছিলাম—হেদোর কাছে রিকশ থেকে পড়ে গিয়ে ৭৮ বছর বয়সেও গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পণ্ডিচেরী যেতে পেরেছেন এটি আশ্চর্য ব্যাপার, আমি হলে দেহটাকে ফুটপাথের ধারে ফেলে রেখে তৎক্ষণাৎ পালিয়ে যেতাম। এ চিঠির উত্তরে সুধাকান্ত আমাকে লিখলেন—

সেবাপল্লী, শান্তিনিকেতন

২৩—১২—৬৮

সুহৃদ্‌বরেষু,

আজ আপনার ২১-১২-৬৮ তারিখের পত্র পেলাম। ...নলিনীকান্ত সরকারের মনের জোর অসাধারণ, তাই বিকশ হতে মাটিতে পড়ে গিয়েও, এবং বেশ চোট পেয়েও বেশ আছেন।......আপনি কি জানেন পণ্ডিচেরী আশ্রমের কবি নিশিকান্ত আমার আপন ছোট ভাই? সেও মনের জোরেই বেঁচে আছে—দেহাগারে বহুবিধ রোগ পুষেও? ইতি

প্রীতবদ্ধ সুধাকান্ত

আর একখানা আগের লেখা চিঠিতে দেহের সঙ্গে মনের লড়াইয়ের কথা—

সেবাপল্লী, শান্তিনিকেতন

১৩—১২—৬৮

সুহৃদ্‌বরেষু, প্রিয় পরিমলবাবু,

...আপনার বইটি [আমি যাঁদের দেখেছি] ছাপা হলে যদি দয়া করে এক কপি আমাকে রেজিস্টার্ড বুকপোস্টে পাঠাতে পারেন, তা হলে বাধিত হব। ......ক্রমাগত গঙ্গাযাত্রার পথেই এগিয়ে চলেছি, অথচ আপনার মতন আমারও মন সজীব আছে। কিন্তু এই সজীব মনের সঙ্গে জরাগ্রস্ত দেহ কিছুতেই কো-অপারেশন করতে চায় না। এই...বিড়ম্বনা সত্যিই দুঃসহ। তবে জীবনদীপ নিবে না যাওয়া পর্যন্ত দুঃসহকেও সহ্য করতেই হয়।

ইতি প্রীতিমুগ্ধ

সুধাকান্ত রায়চৌধুরী

এর কয়েকমাস আগের লেখা একখানা চিঠিতে সুধাকান্তের স্বাস্থ্যকথার বাইরেও নিজের সম্পর্কে কিছু পরিচয় আছে—

সেবাপল্লী, শান্তিনিকেতন

১১-৩-৬৮

প্রীতিভাজনেষু, প্রিয় পরিমলবাবু, আজ আপনার পত্র পেলাম। আপনার এবং আমার অবস্থা প্রায় সমরূপ, অর্থাৎ দেহ জরাগ্রস্ত, দুর্বল, অথচ মন সজীব। সজীব মনের সঙ্গে দেহটা যদি সজীব সক্রিয় সহযোগিতা না করে তা হলে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা হয় বিড়ম্বনাময়। সংসারে (গৃহে) স্বামী স্ত্রীতে পরস্পর মতের অনৈক্য প্রবল হলে যেমন সেই গৃহে অশান্তির সৃষ্টি হয়।

স্বামীস্ত্রী সম্বন্ধ ছাড়াও প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব একটা সত্তা আছে, সেই নিজস্ব সত্তার সুস্থতা নির্ভর করে দেহমনের সজীবতায়। কাজেই মনের সজীবতাকে যখন পদে পদে দৈহিক দুর্বলতা তার (মনের) চিন্তাধারার প্রবাহকে বাধা দিতে থাকে, তখন সেই মনের অবস্থা হয় প্রবহমান নদীতে ধস নামা পাহাড়ের মতন। নদী চলতে চায়, কিন্তু বাধাগ্রস্ত হয়ে ইচ্ছেমতো চলতে পারে না। এই না চলতে পারা শেষটায় নদীতে বিকার ঘটায়, মানুষের সজীব মনও এইরকম দুর্বল না হয়ে বিকারগ্রস্ত হয়ে ওঠে। তাই আমার ভয় হয়—আমার বক্তব্যের বিষয় ক্রমে বিচারহীন ও যুক্তিহীন প্রলাপের মতো না হয়ে পড়ে। এই জন্যই আর কোন বিষয় প্রবন্ধ কবিতা বা সমালোচনা লিখতে সাহস হয় না। এই রকম ভাবে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কি আর ডট পেন দিয়ে প্রবন্ধ লেখা চলে ?

আমি হিন্দুস্থানী (চলতি হিন্দী) ভাষায় লিখতে এবং পড়তে পারি। আজকাল দুএকটি সাপ্তাহিক পত্রের ভাষা, অহিন্দী বহু ভাষার শব্দ-মিশ্রিত এবং সুপাঠ্য, যদিও গোঁড়া হিন্দীপন্থীরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেন হিন্দীভাষাকে সংস্কৃত ভাষার দ্বারা প্রভাবিত করতে। আধুনিক কয়েকজন স্বনামধন্য হিন্দী লেখকদের লেখা পড়ে বুঝতে পারি যে তাঁরা বেশ ভাল করেই ইংরাজী ও উর্দু ভাষার চালচলন জানেন—এই জন্যই এঁদের লেখা হিন্দী জোরালো এবং প্রগতিশীল, যেমন কথ্য বাংলা ভাষা।

আমার বক্তব্য হচ্ছে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমেই আমরা য়ুরোপীয় সাহিত্য-জগতের সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচিত এবং বিজ্ঞান-জগতের বহু তথ্যজ্ঞান লাভ

করেছি, কাজেই নানা বিষয় বাংলা ভাষাতে গ্রন্থ রচনায় ইংরাজী ভাষায় জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। দেশ হতে ইংরাজী শাসন বিদায় নিয়েছে, তাই বলে ইংরাজী ভাষাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা মূঢ়তা।

এই চিঠিখানি সুধাকান্ত নাম সই করতে ভুলে গিয়েছেন। তবে এই ইন্‌ল্যাণ্ড লেটারের বাইরে নাম ঠিকানা লেখা আছে।

ইংরেজী রক্ষা করা বিষয়ে আগেও সুধাকান্ত আমাকে লিখেছিলেন। অবশ্য এ চিঠি লেখেন আমার একটি পাঁচ মিনিটের রেডিও কথিকা শুনে।

সেবাপল্লী, শান্তিনিকেতন

৬-৩-৬৮

পরম প্রীতিভাজনেষু,

…অনেকদিন পরে আপনাকে পত্র দিচ্ছি। কয়েকদিন পূর্বে রাত্রিতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে রেডিওতে শুনতে পেলুম আপনার ছোট্ট ভাষণ। … মনে হল আপনার মতে বঙ্গ সাহিত্যের বহুমুখী প্রগতি বা উন্নতি ঘটেছে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে। যদি ঠিক আপনার ভাষণের মর্ম বুঝে থাকি তা হলে আমি আপনার সঙ্গে একমত। য়ুরোপীয় সাহিত্য-জগতের, বিজ্ঞান-জগতের, সংস্রবে আমরা এসেছি প্রধানত ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে।

জনসাধারণ অবশ্য ইংরাজীতে যেমন আনাড়ী হিন্দীতেও তেমনি আনাড়ী। কিন্তু উচ্চশিক্ষিত বাঙালী যদি ইংরাজী ভাষাকে পূর্বের মতন শ্রদ্ধার সঙ্গে চর্চা না করেন, তা হলে আমার ধারণা বঙ্গসাহিত্যের ভাবীকালের অবস্থা হবে নিম্নস্তরের।

আমার স্বাস্থ্য জরাগ্রস্ত হয়ে ক্রমাগতই গঙ্গা যাত্রার পথে এগিয়ে চলেছে, তবু দুর্ভাগ্য হেতু মনটা সজীব আছে, কিন্তু এই সজীবতা বিড়ম্বনাময়।…

প্রীতিধন্য সুধাকান্ত

আর একখানা চিঠিও আমার একটি রেডিও কথিকা শুনে লেখা—

সেবাপল্লী, ১৯।৩।৬৮

প্রীতিভাজনেষু, পরিমলবাবু, কয়েকদিন ধরে অসুস্থতায় কাবু হয়ে আছি। এই অবস্থাতেও বিছানায় শুয়ে শুয়ে দু এক দিন পূর্বে রেডিওতে, বঙ্গসাহিত্যে হাস্যকৌতুক বা ব্যঙ্গাত্মক রচনার খুব উৎকর্ষ হয়নি, যেমনটি পাশ্চাত্য সাহিত্যে হয়েছে, আপনার এই মন্তব্য যে টুকু শুনেছি তা যদি ঠিক বুঝে থাকি তা হলে

আমি আপনার সঙ্গে একমত। এই প্রসঙ্গে বলি, আমার ধারণা, বাঙলা দেশের সেকেলে মুখে মুখে প্রচলিত অনেক ব্যঙ্গগল্পে, কবির লড়াইতে, বুড়োবুড়িদের অনেক হাস্যপরিহাসময় বাক্যে (যার ভাষা আধুনিক মতে শালীনতা-বর্জিত, অশ্লীল) এমন একটা সরস নির্লজ্জতা আছে, যা যেমন শিক্ষাপ্রদ, তেমনি তার মর্মকথায় আছে বস্তুতান্ত্রিক গভীর অভিজ্ঞতা।...

ভবদীয়—

শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী

পরবর্তী চিঠি এরই জের। এ চিঠি আমার চিঠি পাবার পরে লেখা—

সেবাপল্লী, শান্তিনিকেতন

২৬।৩।৬৮

পরম প্রীতিভাজনেষু,

...(১) আমার দৈহিক দুর্বলতা বেড়েই চলেছে, কমবে না, সুতরাং মন যতদিন সজীব আছে এবং যতদিন সাধ্যে কুলায়, প্রীতিভাজন ও শ্রদ্ধেয় বন্ধুদের সঙ্গে পত্রদ্বারা যোগ রক্ষা করব। (২) আমাদের দেশে মুখে মুখে হিউমার-ভরা এমন অনেক গল্প আছে যা গোপাল ভাঁড়ের হিউমারের মত ছিল না—অথচ উপভোগ্য। এসব হিউমার ছাপার অক্ষরে গাঁথা থাকলে হিউমার-সাহিত্যে স্থান পেত। (৩) কথা প্রসঙ্গে একবার রবীন্দ্রনাথ আমাকে বলেছিলেন, বাহ্যত শব্দে ভাল্‌গার হলেও যে সব বাক্য শুনে লোকে প্রাণখুলে অট্টহাসি হাসে, সে সব বাক্যের মর্মবাণী শ্রোতার মনে নির্মল আনন্দ দেয়। নির্মল আনন্দ না বোধ করলে অট্টহাসি হাসা যায় না। চোখটিপে মুচকি হাসি হাসা যায়। তবু স্বীকার করতেই হবে আজকাল ভদ্রসমাজে ভালগার হিউমার অচল, এবং অচল থাকাই বাঞ্ছনীয়।

রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য খাঁটি।...

ভবদীয়

সুধাকান্ত রায়চৌধুরী

সুধাকান্ত শান্তিনিকেতনের প্রায় গোড়া থেকেই ছিলেন। কালক্রমে তিনি হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের একান্ত সচিব। এমন নির্ভরযোগ্য কর্মতৎপর পরম উৎসাহী মানুষটিকে পেয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্যক্তিগত বহু বিষয়ে তাঁর উপরে ছিলেন নির্ভরশীল! এমনকি ১৯৩৭ সনে চন্দননগরে বঙ্গীয় সাহিত্য

সম্মেলন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথকে ধরে মঞ্চে নিয়ে আসার ভারও ছিল সুধাকান্তের উপর। এর বাইরে অন্য সময়েও তিনি রবীন্দ্রনাথের 'প্রপ' রূপে কাজ করেছেন বলেই অনুমান করি।

আমি মাঝে মাঝে সুধাকান্তের বিচিত্র জীবনের স্মৃতিকথা লিখতে অনুরোধ করতাম। একবার তিনি লেখেন—

সেবাপল্লী, শান্তিনিকেতন

৩।৪।৬৮

প্রীতিভাজনেষু,

…আমার মন সজীব আছে সত্য, কিন্তু এই মনটা প্রত্যহ তিক্ত হয়ে ওঠে এক একবার সাংসারিক বিচিত্র জটিলতার আঘাতে। মন এরই তাল সামলাতে ঘায়েল হয়ে পড়ে। নইলে মনের এই সজীবতা দিয়েই (শ্রুতি লেখকের সহায়তায়) সাহিত্যে আমার যা দেয় ছিল দিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু মনের সে সাধ মনেই জমা হয়ে রইল বাক্সে বন্দী জিনিসপত্রের মতন —যে বাক্সের ঢাকনি কেউই খুলে দেখতে পারবে না বাক্সে কি আছে। এতকাল কত লেখাই তো লিখেছি প্রবাসী, ভারতী, ভারতবর্ষ, সুপ্রভাত, উপাসনা, মালঞ্চ, সওগাত, মোসলেম ভারত, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, দেশ, যুগান্তর, আনন্দবাজার পত্রিকা, ইত্যাদি বহু পত্রপত্রিকায়। কত কবিতা, গল্প প্রবন্ধ ও প্রহসন ইত্যাদি। —যাক এসব কথা। প্রীতিবদ্ধ—

সুধাকান্ত রায়চৌধুরী

আর একখানা চিঠিতে লিখলেন স্মৃতিকথা লেখা প্রসঙ্গে—

সেবাপল্লী

১৬।৪।৬৮

প্রিয় পরিমল বাবু,

শুয়ে শুয়ে এই চিঠি লিখছি, আপনার গুড ফ্রাইডে তারিখের পত্রের উত্তরে জানাই—(১) আজকাল স্মৃতিকথা লেখার জন্য নিরুৎসাহ বোধ করি। কারণ উঠে বসে ফুল্‌সক্যাপ কাগজের একটা তো দূরের কথা আধ পৃষ্ঠাও লিখতে পারি না। শুয়ে শুয়েই কোনো রকমে ছোটখাটো চিঠি লিখতে পারি মাত্র।……(২) স্মৃতিকথা লিখলে কেউ কেউ এমন প্রশ্নও করবেন, আপনার স্মৃতিকথা যে সত্যি তার প্রমাণ কি? বানিয়েও তো সুপাঠ্য স্মৃতিকথা লেখা চলে ইত্যাদি। সত্যিই তো, এ সব কথা যে কাল্পনিক নয়

তা প্রমাণ করব কি করে? সবই নির্ভর করে পাঠকের মনোভাবের উপর। (৩) সার পি. সি. রায়, সার জে. সি. বোস, সার যদুনাথ সরকার, শিশির-কুমার ভাদুড়ি ইত্যাদি বহুজন সম্বন্ধে (এক একটা ঘটনা-কেন্দ্রিক) কিছু স্মৃতি আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে, স্মৃতিদর্পণে তাঁদের সদ্‌গুণের এক একটা দিক বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু এসব তো আমার স্মৃতি।

ইতি—প্রীতিবদ্ধ ভবদীয়—

সুধাকান্ত রায়চৌধুরী

সুধাকান্ত আমাকে খুবই স্নেহ করতেন, তাই তাঁর অবসর প্রাপ্ত শয্যাশায়িত দিনগুলিতে আমার লেখা বা বেতারভাষণ শুনলেই আপনা থেকেই আমাকে চিঠি লিখতেন, এবং সেই উপলক্ষে নিজের কথাও বলতেন, যেমন এই চিঠিখানায় দেখা যাবে—

সেবাপল্লী, শান্তিনিকেতন

২৫ ১১-৬৪

প্রিয় পরিমলবাবু, আজই কিছুক্ষণ আগে সাপ্তাহিক "অমৃত" পত্রিকায় "একটি সাংস্কৃতিক মিলনের গল্প" পড়ে আপনাকে পত্র লিখবার ইচ্ছা হচ্ছিল, এমন সময় শ্রীমতী লীলা বন্দ্যোপাধ্যায় [সাঁতারু লীলা চট্টোপাধ্যায়, তৎকালীন শান্তিনিকেতনে সাঁতার শিক্ষিকা] এসে বললেন, 'পরিমলবাবু জানতে চেয়েছেন, আপনি কেমন আছেন।' আমি সঙ্গে সঙ্গে...এই পত্র লিখছি।... বেশ বুঝতে পারছি যে জরার প্রধান ধর্ম হচ্ছে অতীতের ভুলে যাওয়া বিস্তর স্মৃতিকে মনের দর্পণে খুব নিখুঁতভাবে এবং উজ্জ্বলরকমে ফুটিয়ে তোলা। এই দর্পণে দেখছি আমি আর ডাক্তার রাম অধিকারী আর আপনি এক রজনীতে শিশিরকুমার ভাদুড়ি মহাশয়ের একটা অভিনয় দেখছি, আরও কত কি। যুগান্তর অফিসের আড্ডা দেখছি। ......আপনি আমার খোঁজ নিয়েছেন জেনে খুশী হয়েছি।......

ভবদীয়

সুধাকান্ত রায়চৌধুরী

স্মৃতিকথা বিষয়ে আর একখানা চিঠি—

প্রীতিভাজনেষু, আপনার ২৯।৪।৬৮র পত্র পাইলাম। বৃদ্ধ বয়সের ভাগ্য-

বিড়ম্বনা—না বাদ দেয় পরিমলকে না বাদ দেয় সুধাকান্তকে। আমাদের উভয়ের নাম মধুময় হইলে হইবে কি।

উঠিয়া বসিয়া আর লিখিতে পারি না—প্রাপ্তপত্রের জবাব দেই ঝাপসা দৃষ্টিতে শুইয়া শুইয়াই, কাজেই স্মৃতিকথা কেমন করিয়া লিখিব? শ্রুতি লেখকও সহজে মেলে না।

ভবদীয়
সুধাকান্ত রায়চৌধুরী

আমার একটি ভূতের গল্প শুনে সুধাকান্ত লিখছেন—

সেবাপল্লী, শান্তিনিকেতন
১৯।১২।৬৮

পরম প্রীতিভাজনেষু, প্রিয় পরিমলবাবু,

গতকাল (বুধবার) রাত্রিতে বেতারে আপনার ভৌতিক বা ভূতের গল্প শুনলাম।······

আমি বুড়ো এবং খেয়েদেয়ে কাজ নেই, বিছানাতেই থাকি, কাজেই অলৌকিক গল্পকাহিনী বেশ উপভোগ করি।·····যতক্ষণ উপকথা পড়া যায় ততক্ষণ উপকথার রাজ্য মনের মধ্যে এমনি স্বাভাবিক হয়ে যায় যে, সে রাজ্যের গোরুকে গাছে ওঠা দেখলেও মনে হয় ঐ রাজ্যের সঙ্গে তাঁর সঙ্গতি আছে। জন্মান্তর সম্বন্ধে আমি কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত—

সুধাকান্ত

সুধাকান্তের শেষ চিঠিগুলির কয়েকখানায় কিছু আত্মকথাও পাওয়া যাবে, এগুলি সবই ১৯৬৯সনে লেখা এবং ঐ সনেই ১২ই নবেম্বর তাঁর মৃত্যু ঘটে।

সেবাপল্লী, শান্তিনিকেতন
৩০।৪।৬৯

সুহৃদ্বরেষু, প্রিয় পরিমলবাবু,

আজ সকালে পুলিন সেনের হাত হ'তে আপনার প্রেরিত উপহার গ্রন্থ [আমি যাঁদের দেখেছি] পেলাম। ধন্যবাদ। বইটি আগাগোড় মন দিয়ে পড়ে আপনাকে আমার মন্তব্য জানাব। বইতে যাঁদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন তাঁদের মধ্যে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সজনী দাস, নজরুল, দাদাঠাকুর, শিশিরকুমার ভাদুড়ি, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র

ভট্টাচার্য, প্রমথ চৌধুরী, মোহিতলাল ও নলিনীকান্ত সরকার প্রভৃতি স্বনামধন্য ব্যক্তিদের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। এঁদের মধ্যে যাঁরা বেঁচে আছেন, তাঁদের দুএকজনের সঙ্গে মাঝে মাঝে পত্রালাপ হয়। শিশির ভাদুড়ি মহাশয়ের বেশ কয়েকটি চিঠি আমার কাছে আছে বলে মনে হচ্ছে।

কবিকন্যা মীরা দেবী সম্বন্ধে, আমার স্মৃতি ভাণ্ডারে যা আছে তা দিয়ে একটি প্রবন্ধ লেখার জন্য পুলিনবিহারী সেন বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেছেন। নিজে তো উঠে বসে লিখতে পারি না। যোগ্য কোন শ্রুতিলেখক পেলে পুলিনের অনুরোধ রক্ষা করব (যদি বেঁচে থাকি)। মীরা দেবীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল অসাধারণ—ঠাকুর বাড়ীর পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে।

ইতি প্রীতিবদ্ধ

সুধাকান্ত রায়চৌধুরী

আর একখানা চিঠিতে আমার বই পড়ার পরে তাঁর যা মনে হয়েছে জানালেন। —এবং চিঠির মাথায় একটি ছবি এঁকেছেন "ঘর ছেড়ে নৌকা যাচ্ছে অজানা পথে।" ছোট্ট একটুখানি আঁচড় কাটা, কিন্তু তাঁর আসন্ন মৃত্যুর কথা মনে করেই যেন আঁকা—প্রথম দর্শনে মনে হঠাৎ ধাক্কা লাগে। ছবির নিচের কথাগুলি তাঁর মনে মৃত্যুর পূর্বাভাস রূপে ফুটে উঠেছে।

সেবাপল্লী, শান্তিনিকেতন

৩।৫।৬৯

সুহৃদ্‌বরেষু, পরিমলবাবু, বলাই বৃথা জরাগ্রস্ত রোগগ্রস্ত দেহ নিয়ে সর্বক্ষণ হয়ে আছি স্থাণু। ……দেহের সঙ্গে মনের তীব্র অসহযোগ চলছে। তবু "আমি যাঁদের দেখেছি" বইখানা আগাগোড়া আজ পড়ে শেষ করেছি। আপনার এই গ্রন্থটি পড়ে অনেক কিছু জানতে পেরেছি তাঁদের সম্বন্ধে, যাঁদের দেখেছি, যাঁদের সঙ্গে মিশেছি. (যথা কাজী নজরুল, দাদাঠাকুর, মোহিতলাল, প্রেমাঙ্কুর ইত্যাদি) এবং যাঁদের সঙ্গে এখানো পত্র ব্যবহার হয় (যথা সুনীতিবাবু, নলিনীকান্ত এবং পরিমল গোস্বামী)।

আপনার কি মনে পড়ে এক সন্ধ্যায় শিশিরবাবুর অনুরোধে শ্রীরঙ্গমে আপনি, ডাঃ রাম অধিকারী এবং আমি 'তখৎ-এ-তাউস' দেখেছিলাম? আপনার বইটি পড়ে ভাল লাগল কারণ প্রত্যেকের সাহিত্যিক সত্তা এবং মানুষ সত্তার বিশ্লেষণ করেছেন নাতিদীর্ঘভাবে এবং যৌক্তিকভাবে। ক্লান্তবোধ করছি।···

ভবদীয়

সুধাকান্ত রায়চৌধুরী

এই চিঠির জের হিসাবে পরবর্তী চিঠিতে জাগল নিজের স্মৃতি—

সেবাপল্লী, শান্তিনিকেতন
৮।৫।৬৯

সুহৃদ্‌বরেষু, প্রিয় পরিমলবাবু,

…প্রেমাঙ্কুরবাবু সম্বন্ধে আপনি আপনার গ্রন্থে সংক্ষেপে যা লিখেছেন, আমার সম্বন্ধেও কতকটা সেইরকম কিছু লেখা চলে। আমার জীবনটা হয়তো তত বেশি ভবঘুরে না হলেও মনটা ভবঘুরে প্রকৃতির। মনের তরী এক ঘাট হতে নানা বিচিত্র বিষয় বোঝাই করে অন্য ঘাটে বিনা মোহে উজাড় ক'রে দিয়ে নতুন ঘাট হতে স্বল্প মেয়াদী সর্তে অনেক কিছু সংগ্রহ করে, আবার অন্য কোনো ঘাটে উজাড় করে দেয়। কোনো কিছুকেই ব্রতপালনের মতন আঁকড়ে থাকে না……কোনো বাঁধন আমার ধাতে সয় না, তবু অনেক কিছু সহ্য করছি নিরুপায় হয়ে কৃতকর্মের দায়িত্ব পালনের জন্য। দায়িত্ববোধ আছে বলে বন্ধনহীনতায় সম্যক আনন্দ পাই না।

ভবদীয়—সুধাকান্ত রায়চৌধুরী

এই চিঠি পাঠানোর দুদিন পরে আবার লিখেছেন—

সেবাপল্লী, শান্তিনিকেতন
১০।৫।৬৯

সুহৃদ্‌বরেষু,

যেহেতু আপনি আমার সম্বন্ধে interested, সেইজন্য আপনাকে জানানো সঙ্গত মনে করি যে, (১) বাল্যকাল হতেই আমি বিশেষ কোনো লক্ষ্যপথ ধরে চলিনি, যদিও অনেক বিষয়ে আমার ইন্টারেস্ট ছিল, কিন্তু সে ইন্টারেস্টের আনন্দ মরশুমি লতাপাতা ফুল দেখার মতন। কোনো কিছু জীবনপথের লক্ষ্য বলে আঁকড়ে ধরিনি। সাহিত্য বিষয়ে আমার পড়াশোনা বেশি নয়, তবু দেশী বিদেশী সাহিত্য সম্বন্ধে একেবারেই যে কিছু জানি না তাও সত্য নয়। কিন্তু কোনো সাহিত্যিকই আমার যৎসামান্য সাহিত্য চিন্তাকে প্রভাবিত করেন নি। লক্ষ্যহীন ব্যক্তিকে কেই বা প্রভাবিত করবে। আমি পিউরিটান না হলেও ইতরতা, নোংরামি, উচ্ছৃঙ্খলতা এবং ভালমন্দ কোন বিষয়েরই অতিশয়তাকে মন থেকে সহ্য করতে পারি না, তবে সমাজে বাস করি বলে নিরুপায় হয়ে বাধ্য হয়েই সবকিছু সহ্য করি।…… আমি প্রগতিবাদী কিন্তু প্রগতির অতিশয়তা আমার ভাল মোটেই লাগে না,

পুরাতনের সব কিছুকেই ঝেঁটিয়ে ফেলতে মন চায় না, আবার নতুনের সব কিছুকেই স্বাগত জানাতে ইচ্ছা হয় না। ভবদীয়

সুধাকান্ত রায়চৌধুরী

এবং পরবর্তী চিঠিখানিতে সুধাকান্তের আত্মপরিচয় আরো চিত্তাকর্ষক বোধ হবে।

সেবাপল্লী, শান্তিনিকেতন

২১-৫- ৯

সুহৃদ্বরেষু,

প্রিয় পরিমলবাবু, আপনার ৬ তারিখের চিঠি যথাসময়েই পেয়েছি, উত্তর দিতে দেরী হয়ে গেল, কারণ কয়েকদিন ধরেই বেশ দুর্বল বোধ করছি।··· (১) শান্তিনিকেতনে আমার আসার সম্ভাবনাই ছিল না, কারণ আমার জন্মদেশ উত্তর প্রদেশের উনাও শহরে, সে আজ প্রায় ৭৬ বৎসর পূর্বের ইতিহাস। আমার যে ভাই (বড়) বেঁচে আছেন, লখনৌতে ঘরবাড়ী তৈরী করে সেইখানেই আছেন, তাঁর ছেলেদের সঙ্গে পত্রব্যবহার করি হিন্দীভাষায় আর দাদার সঙ্গে পত্রব্যবহার করি ইংরাজী ভাষায়। (২) শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের আদিপর্বে সতীশ রায় (যাঁর মৃত্যু ঘটেছিল ২১ বৎসর বয়সেই, শান্তিনিকেতনে) ছিলেন আমার মামা। আমার বয়স যখন আট-নয় বৎসর তখন তিনি তিনদিনের জন্য দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আগ্রায় আমাদের বাড়ীতে ছিলেন। তিনি আমার মাকে বলেছিলেন, "ছোড়দি, খোকাকে (অর্থাৎ আমাকে) আর একটু বড় হলে শান্তিনিকেতনে আমার তত্ত্বাবধানে লেখাপড়া শেখবার জন্য পাঠিয়ে দিস, এই আমার অনুরোধ।" —এই অনুরোধের জন্যই বাবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও মা আমাকে এবং আমার ছোটভাই নিশিকান্তকে (যে পণ্ডিচেরীর কবি নিশিকান্ত বলেই সাহিত্য রাজ্যে সুপরিচিত) এখানে পাঠান। বাবা ছিলেন উত্তর প্রদেশে উকিল। তারপর বিচিত্র ইতিহাস। পরে লিখে জানাব। ভবদীয় প্রীতিবদ্ধ—

সুধাকান্ত রায়চৌধুরী

আমার বই "আমি যাঁদের দেখেছি"র জের চিঠিতে এখনও চলছে। তিনি লিখছেন—

সেবাপল্লী, শান্তিনিকেতন
১।৬।৬৯

সুহৃদ্‌বরেষু,

প্রিয় পরিমলবাবু, ...পুনরায় সবটা বই পড়েছি......কাজি নজরুলের সঙ্গে একসময়ে আমি যে খুবই অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা করেছি এবং আমিই সর্বপ্রথম লিখিত পত্রে তাঁকে জানিয়েছিলাম যে তিনি সত্যিকার কবি এবং মানবপ্রেমিক, এইসব কথা মুজফফর সাহেব তাঁর নজরুল সম্বন্ধীয় প্রকাশিত গ্রন্থে লিখেছেন। সে আজ অনেকদিন আগের কথা। আমরা তুজনে মোসলেম ভারতেও কবিতা লিখতাম। সে দিন আর বর্তমান দিনে আকাশ পাতাল তফাৎ। ...আপনার বইখানি অনেককে পড়ে দেখতে দেবার ইচ্ছে থাকলেও দিতে সাহস হয় না, বহু বই পড়তে দিয়ে আর ফেরৎ পাইনি।

সুধাকান্ত এ চিঠিতেও নিজের নাম লিখতে ভুলেছেন। মৃত্যুর আর পাঁচ মাস বাকি, আমার অনুরোধ অনুযায়ী স্মৃতিকথা লিখতে সুধাকান্ত ছট-ফট করছেন। আমার বইখানা পড়ে উৎসাহ আরো বেড়েছে কিন্তু দেহ সেই পরিমাণে অপটু হয়ে পড়েছে।—

সেবাপল্লী, শান্তিনিকেতন
৫।৬।৬৯

সুহৃদ্‌বরেষু,

প্রিয় পরিমলবাবু, উপুড় হয়ে সামনে বিছানায় খাতা রেখে কিছু লেখাও অসম্ভব .....আপনার বইটি পড়ে খুব ভাল লেগেছে, শুধু স্মৃতিচারণ নয়, স্মৃতিসাহিত্য। রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিও সাহিত্য। কিন্তু এই তুই সাহিত্যের আলেখ্য, বিষয়ের বর্ণনা স্বতন্ত্র. আমার জীবনকথা বিচিত্র, যদি লেখা সম্ভব হয় লিখে পাঠাব। এখন সম্ভব নয়। খুবই তুর্বল হয়ে আছি।

ভবদীয় প্রীতিবদ্ধ
সুধাকান্ত রায়চৌধুরী

এরপর শেষ চিঠি, মৃত্যুর প্রায় তিনমাস আগে লেখা। পড়লে মনে হয় তিনি বিদায় নিচ্ছেন, যেন সেই শেষ দিনের পদধ্বনি তাঁর কানে এসে বাজছে। নইলে চিঠি যে সম্বোধনে আরম্ভ করেছেন এবং যে ভাষায় শেষ করেছেন, আগের কোনো চিঠিতে ঠিক তেমন ভাষা লেখেন

নি। তাঁর অনেক চিঠি আমি পেয়েছি এবং অনেক চিঠিতেই কোন্ লোকটি ৮০ বছর বয়সেও কর্মক্ষম, কোন্ লোকটি বয়সে বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ছুটে বেড়াতে পারে তাদের কথায় ভরা। সুধাকান্তের বন্দী মনটা ঐরকম হতে পারলে যেন খুশি হত, ইঙ্গিতটা তাই। শেষ চিঠিতেও তেমনি একজনের কথা আছে—

সেবাপল্লী, শান্তিনিকেতন
২৫-৮-৬৯

সুহৃদ্‌বরেষু, ভাই পরিমলবাবু,

আজ আপনার ২৩।৮।৬৯ তারিখের পত্র...পেলাম,...দেহশক্তি দুর্বল হয়েই চলেছে; তাই সজীব মনের সদ্‌ব্যবহার করতে পারছি না অনেক ভাল ভাল স্মৃতিকথা লিখে।

ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারীর সঙ্গে এই এক বছরে দু-তিনবার দেখা হয়েছে। তিনি এখনো বেশ সুস্থ, আগেকার মতো হাসি খুশী মানুষ।

পত্রশেষ করবার পূর্বে, আমার প্রতি আপনার সহজ সরল প্রীতির জন্য যে আনন্দ পাই সে কথা অবশ্য কর্তব্য বলেই জানাচ্ছি। আমার সাদর প্রীতি ও শ্রদ্ধা জানাই।

ভবদীয়—
সুধাকান্ত রায়চৌধুরী

আমি কিন্তু ভাবিনি যে এটা তাঁর শেষ চিঠি হবে। এ চিঠিতে শেষ বিদায়ের সুর ছিল তা এখন পড়ে বুঝতে পারছি। একখানা চিঠিতে সুধাকান্তের বাল্যকালের গোটাকত কথার মধ্যে তাঁর মামা সতীশচন্দ্র রায়ের উল্লেখ আছে। এই সতীশচন্দ্র আমার কাছে এক পরম বিস্ময়। এতবড় প্রতিভা, শিক্ষায় এমন দীপ্ত উৎসাহ, গুরুভক্তি, এবং আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত—বাঙালী যুবসমাজে বিরল বলা চলে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতি যে স্নেহ প্রীতি এবং শ্রদ্ধা পোষণ করতেন, তা তিনি নানাভাবে প্রকাশ করে গেছেন। সুধাকান্ত এঁর জন্যই শান্তিনিকেতনে আসতে পেরেছিলেন।

আরো দুখানা চিঠি আমার সামনে: একখানা কন্যা শ্রীমতী মঞ্জুর (রবীন্দ্র সঙ্গীতে খ্যাত) বিবাহের নিমন্ত্রণ, (বিবাহের তারিখ ২৮।১।৬৬) প্রেরক সুধাকান্ত। হলুদ চিঠি। অন্যখানা সুধাকান্তর মৃত্যুসংবাদ (মৃত্যু, ১২।১১।৬৯) ও তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়ায় উপস্থিতির নিমন্ত্রণ। স্বাক্ষরকারীদের একজন শ্রীমতী মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ফিরে যাচ্ছি ১৯৩২ সনে। রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীট, শনিবারের চিঠির অফিস। আমি নবনিযুক্ত সম্পাদক। কতক লেখকের সঙ্গে নতুন পরিচয় হচ্ছে। আগের পরিচিতও অনেকে রয়েছেন। ব্লক-মেকার ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিংএর চালক। শ্রীমানী বাজারের দক্ষিণে দোতলায় মস্তবড় সাইনবোর্ড। অমায়িক স্বভাব ফণীবাবুর। আর একজন লেখকের সঙ্গে নতুন পরিচয় ঘটল—নাম গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, বসু বিজ্ঞান মন্দিরের গবেষক। এই দুটি নাম একত্রে বলছি, তার কারণ আছে। ফণীবাবু ছিলেন স্যর জগদীশচন্দ্রের ভাগ্নে। এবং আমি বসু বিজ্ঞান মন্দির সম্পর্কে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি সম্বলিত (সত্যমিথ্যা জানি না) একখানি অপরিচিত ব্যক্তির চিঠি পেয়ে সেখানা ছাপব বলে প্রেসে দিয়েছিলাম, এবং ফণীবাবু প্রুফ দেখার সময় এসে পড়াতে তাঁকে সেই প্রুফ দেখালাম। অভিযোগ গুরুতর কিছুই না, এইটুকু মনে আছে। চিঠিও ছোট, শনিবারের চিঠির এক পৃষ্ঠার বেশি না। ফণীবাবু তৎক্ষনাৎ উঠে চলে গেলেন অবলা বসুর কাছে এবং গিয়ে সবকথা তাঁকে বললেন। অবলা বসু তাঁকে বললেন, এ সময়ে ও-ধরনের কোনো সমালোচনাই ছাপা উচিত হবে না ; হলে বিজ্ঞানমন্দিরের ক্ষতি হতে পারে। অতএব ঐ চিঠি ছাপা বন্ধ হওয়া উচিত। সেই উদ্দেশ্যে তিনি গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যকে পাঠালেন আমার কাছে। সজনীকান্ত দাস শনিবারের চিঠির স্বত্বাধিকারী, তাঁকে সব বললাম। তিনি প্রুফ নিয়ে চললেন অবলা বসুর কাছে, সঙ্গে চললেন গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য।

কয়েকঘণ্টা পরে সজনীকান্ত ফিরে এসে বললেন, রফা হয়ে গেছে, অবলা বসুর কাছ থেকে কমপোজিংএর ক্ষতিপূরণ বাবদ কুড়ি টাকা নিয়ে এসেছি, ঐ চিঠি ছাপা বন্ধ করে দিন।

এতে শনিবারের চিঠির লাভই হল। কারণ তখন ঐ মাসিক খুব কম খরচেই ছাপা হত। শনিবারের চিঠির আকার ছিল তখন ডবল ক্রাউন ১৬ পৃষ্ঠা। শনিবারের চিঠির নিজস্ব কোন মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, শুধু টাইপ কমপোজিংএর ব্যবস্থা ছিল বাড়িতে। দুজন কমপোজিটর নিযুক্ত ছিলেন একাজে। তাঁদের দিতে হত, প্রতি ফর্মা দু তিনবার প্রুফ দেখা সমেত চার

টাকা। অন্যপ্রেস থেকে ছেপে আনা হত, সেখানে ছাপা খরচ প্রতি ফর্মা প্রতি হাজার দেড়টাকা। কাগজ মেকানিকাল আর্ট, প্রতি রীমের দাম দু টাকা চার আনা। তাহলে মোট ১৬ পৃষ্ঠা কমপোজিং ছাপা ও কাগজের দাম সহ এক হাজারের জন্য মোট খরচ পড়ত সাত টাকা বার আনা। এর উপর কভার ও বাঁধাই খরচ। বর্তমানে (১৯৭০) ঐ একই জিনিষ কাগজ সমেত ফর্মা ছাপতে লাগে প্রায় নব্বুই টাকা।

এই হিসাবে এক পৃষ্ঠার ছোট একখানি চিঠি কমপোজ করা ও ভেঙে ফেলার জন্য সজনীকান্তের কুড়ি টাকা প্রাপ্তি লাভজনক বলতে হবে। কিন্তু এই উপলক্ষে গোপালচন্দ্রের সঙ্গে আমার যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল তা অদ্যাবধি (১৯৭০) অটুট আছে, এবং যদিও দুজন কেউ কাউকে অনেকদিন দেখিনি, তবু টেলিফোনে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। গোপালচন্দ্রের সঙ্গে মিলে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের জন্য উৎসাহের সঙ্গে কাজ করেছি প্রথম কিছুদিন। তারপর আমি দুকূল বজায় রাখতে না পেরে পরিষদ ছেড়ে আসি। সে সব ১৯৪৮ সনের কথা।

গোপালচন্দ্রের বিজ্ঞান ক্ষেত্রে প্রবেশের আশ্চর্য কাহিনী আমি 'স্মৃতি-চিত্রণ' গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। ইণ্টারমীডিয়েট আর্টসও উত্তীর্ণ হননি তিনি, কিন্তু বিজ্ঞান গবেষকরূপে এবং বিজ্ঞান বিষয়ের লেখক রূপে আজ তিনি বহুখ্যাত। তিনি কীট পতঙ্গ, যেমন পিঁপড়ে মাকড়সা (তার মধ্যে ব্যাঙ ব্যাঙাচিও আছে) ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা চালিয়ে অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছেন। এ সব কথা সবাই জানেন, কিন্তু তারও আগে তিনি কি ছিলেন, তা হয়তো সবারই অজ্ঞাত। আমি তাঁকে অনুরোধ জানিয়েছিলাম সে সব কথা জানাতে। তিনি গত বৎসর (১৯৬৯) আমার আশা পূরণ করেছেন দীর্ঘ এক চিঠিতে। যে খবর এতে আছে তা অন্যত্র প্রকাশিত হয়নি যদিও গোপালচন্দ্র অনেক স্মৃতিকথা লিখেছেন নানা স্থানে। চিঠি খানা আমি এখানে সবটাই উদ্ধৃত করছি।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের চিঠি

" ছোটবেলা থেকেই একমাত্র সাঁতার কাটা ছাড়া কোন রকম খেলাধূলায় আকর্ষণ অনুভব করিনি। অবসর সময়টা প্রায়ই বনজঙ্গলে, খাল-বিল এঁদো পুকুরের ধারে কীটপতঙ্গ পাখী এবং ছোট ছোট মাছ ও জল পোকার গতিবিধি লক্ষ করে কাটিয়ে দিতাম। গাছপালারও অনেক কিছুই নজরে



বসুবিজ্ঞান মন্দিরে গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

ফোটো : পরিমল গোস্বামী, ১৯৪১

পড়তো। কিন্তু অনেক কিছুর তাৎপর্য বোঝবার ক্ষমতা ছিল না। এইসব সাধারণ দেখাই পরবর্তীকালে আমার কাজে অনেকটা সহায়ক হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের কথা আজ পর্যন্তও অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও তখনকার দেখা কিছুই পুনরায় দেখতে পাইনি।

"অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি—আনাড়ি হাতেই একটা টাইমপীস খুলে ব্যালান্স হুইলটার অদ্ভুত দ্রুতগতি এবং অন্যান্য (আপাত) নিষ্ক্রিয়তা দেখে অবাক হয়ে ভাবতাম কেমন করে এটা সম্ভব হচ্ছে। একদিন খোলবার সময় অসতর্কতার ফলে প্রচণ্ড বেগে মেন স্প্রিংটা খুলে গিয়ে ব্যারেলটা-সমেত উপরে টাঙানো সরু একটা তারের উপর ছিটকে পড়ে 'ব্যালানসড্' হয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে দোল খেতে লাগল। অন্যান্য জিনিষ দিয়ে অনুরূপভাবে ব্যালান্স করবার চেষ্টায় লেগে গেলাম। ইতিমধ্যে স্কুলের হেডমাষ্টার আমাদের কাছে কতকগুলি সায়েনস ম্যাজিক দেখিয়ে তার কারণ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন। তারমধ্যে গোটাদুই ব্যালান্সের খেলাও ছিল। এইসব ব্যাপার থেকেই ম্যাজিক শিখতে আগ্রহান্বিত হয়ে উঠি। বেশ কয়েক বছর ম্যাজিকের চর্চা করেছিলাম। ইতিমধ্যে ঘড়ি, গ্রামোফোনের যন্ত্রাদি সম্পর্কেও কিছু-পরিমাণ দক্ষতা অর্জন করেছিলাম।

"এর আগেই রামায়ণ ও মহাভারত অনেকটা পড়েছিলাম। মায়ের ছিল ভয়ানক বই পড়ার ঝোঁক। অনেক রাত জেগে উপন্যাস গল্পের বই পড়তেন। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে মায়ের বই পড়তাম। ক্রমশঃ উপন্যাস পড়বার ঝোঁক বাড়তে লাগলো, অক্ষয়কুমার দত্তের চারুপাঠ এবং দুএকখানা বই ছাড়া বিজ্ঞানের বই পড়ার সুযোগ পাইনি। এইসব আজেবাজে জিনিস পড়ার ফলে বেশ ক্ষতি হয়েছিল বটে, কিন্তু লাভও যে কিছু হয়নি, এমন কথা বলতে পারি না। এই সময় থেকেই ছড়া কবিতা লেখবার চেষ্টা করি, পুরনো ঘড়ি, গ্রামোফোন, খুলে খুলে যান্ত্রিক কৌশল দেখবার চেষ্টা করি।

"কলেজে কেমিস্ট্রি ছিল একটি পাঠ্য বিষয়। প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের জন্য প্রত্যেকবারেই একসেট যন্ত্রপাতি এবং রাসায়নিক পদার্থ নিজের হেফাজতে রাখবার জন্য দেওয়া হতো। নিজের ইচ্ছামত পরীক্ষা করতাম, ফসফোরেটেড হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন প্রভৃতি গ্যাস তৈরি করা রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে আগুন জ্বালানো এবং অন্যান্য অনেকগুলি পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করে উৎসাহিত হয়ে উঠলাম।

"কেমিস্ট্রির প্রফেসর ক্লাসে অ্যামোনিয়া গ্যাসের পরীক্ষা দেখিয়েছিলেন। সেটা দেখে উপরে জল তোলবার সহজ পদ্ধতির একটা যান্ত্রিক ব্যবস্থার নক্সা করে রসায়নের অধ্যাপক তারাপদ চট্টোপাধ্যায়কে দেখিয়েছিলাম, তিনি সেটাতে একটা ভুল দেখিয়ে দিয়ে বললেন তুমি কি এটা নিজে করেছ? আমি তাঁর ক্লাসের এক্‌সপেরিমেণ্ট-এর কথা থেকে কি করে এটা মাথায় এসেছিল—সব বললাম। তিনি আমাকে সায়েনস নিয়ে পড়বার জন্য বিশেষ করে বললেন। রোজই তাঁর বাড়ীতে যেতাম, তিনি বিজ্ঞানের কোন কোন বিষয় সহজ করে বুঝিয়ে দিতেন। তিনি ঢাকা কলেজে পুনরায় সায়েনস নিয়ে ভরতি হবার ব্যবস্থাদি করে আমার অভিভাবককে জানালেন। তিনি কিছুতেই রাজি হলেন না। এর ফলে শেষ পর্যন্ত পড়া আর হলো না। দেশে এসে হাইস্কুলে মাস্‌টারিতে ঢুকলাম। স্কুল থেকেই আমার জিম্মায় একটি বাগান ও মালী আমাকে দেওয়া হয়েছিল। ছেলেদের নিয়ে সেখানে গাছপালা সম্বন্ধে সাধ্যমত পরীক্ষাদি করতাম। কৃত্রিম উপায়ে ফুলের পরাগ সঙ্গম ঘটিয়ে সঙ্কর উদ্‌ভিদ তৈরির চেষ্টা, কলমের সাহায্যে একই গাছে দু তিন রকমের ফুল উৎপাদন করা ইত্যাদি ছিল পরীক্ষার বিষয়।

"এর মধ্যেই শতদল নামে একটি হস্তলিখিত মাসিকপত্র প্রকাশ সুরু করেছিলাম। কয়েকটি ছেলেকে নিয়ে একটা দুঃস্থ সংস্থাও গঠন করি।

"রিলিফের কাজে ব্যাপৃত থাকবার সময় সমাজের অবস্থা এবং বিভিন্ন লোকের মতিগতি সম্বন্ধে, নিজের দেখা কয়েকটি ঘটনা নিয়ে কাব্যবিশারদ ধরনে হস্তলিখিত পত্রিকায় কিছু ব্যঙ্গ কবিতা প্রকাশ করি। কিন্তু সেজন্য নানাভাবে নাজেহাল হতে হয়। পত্রিকাও কিছুকাল বন্ধ রাখতে হয়। তার পরেই স্থানীয় সমাজ ও বিভিন্ন লোক সম্বন্ধে ছড়া, কবিতা বা গান লিখে নতুন ধরনের একটা জারিগানের দল গড়ে তুলি। এর মধ্যে মাঝে মাঝে মাথায় খেয়াল চাপতো, কিছু ম্যাজিক ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা আয়ত্ত করেছিলাম, যেগুলি কাজে লাগিয়ে মানুষকে ভয় দেখানোর এবং কৌতুকসৃষ্টির জন্য অনেক কিছু করেছিলাম।

"পূজার্চনা সামাজিক রীতিনীতি নিয়ে মায়ের সঙ্গে প্রায়ই বাদানুবাদ হতো। একবার ভাইয়ের ভয়ানক অসুখ হয়। ডাক্তার ও কবরেজ যখন আশা ছাড়লেন তখন একদিন স্বপ্ন দেখার ভান করে একটা ওষুধ নিয়ে মাকে দিলাম, ওষুধ ধারণ করবার পর রোগী ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করে।

এই ব্যাপারটাকে উপলক্ষ্য করে পদ্যছন্দে একখানি ব্রতকথা লিখে ছাপিয়ে দিলাম। নাম 'আপদনাশিনীর ব্রতকথা'। বইটি ঘরে ঘরে প্রচারিত হলো, এমন কি আজও বোধ হয় এই ব্রতকথা কোন কোন স্থানে প্রচলিত আছে। প্রচারের পর মাকে সমস্ত বিষয়টা যে মিথ্যা তা খুলে বলে এগুলির অসারতার কথা বুঝিয়ে দিলাম, অন্য লোকদেরও বললাম, কিন্তু কেউ আমার এই কথা সত্য বলে মানতে রাজি হয়নি।

"তার পর কলকাতা এসে একটি ছেলেকে পাই, বয়স ২৫-এর মত, ভাল গান গাইতে পারে। পল্লীগীতিতে 'নিমাই সন্ন্যাস' ও 'লালাবাবুর দীক্ষা' নামে দুটি পালাগান লিখে তাদের দিয়ে গাইবার ব্যবস্থা করেছিলাম। বেশ বড দল হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে বর্ষীয়সী ও বৃদ্ধাদের নিয়ে পদ্মপুরাণ ধর্মঙ্গল, চণ্ডীর গানের একটা আসরও গড়ে তুলেছিলাম। ...১৯২০তেই সম্ভবত 'কাজের লোক' (Businessman) ও পরে 'সনাতন' পত্রিকার ভার নিয়েছিলাম।"

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের সব বিষয়ে কৌতূহল এবং কোনো কোনো প্রাকৃতিক ঘটনা নিজের গরজে আগাগোড়া ধৈর্য ধরে পর্যবেক্ষণ করার একটা প্রেরণা ছেলেবেলা থেকেই ছিল, এ প্রেরণা তাঁর স্বভাবজাত। ইউরোপে অনেক বিখ্যাত বিজ্ঞানী এইভাবেই গড়ে উঠেছেন। মেনডেল, ফ্যারাডে, এঁদের বিজ্ঞানীরূপে খ্যাত হওয়ার কোনো বিদ্যাই ছিল না প্রথম জীবনে। এঁরা বিজ্ঞানের ছাত্রও ছিলেন না কোনোদিন। নিজের গরজে, পর্যবেক্ষণে, বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী হয়েছেন। ম্যাটারলিংক ছিলেন নাট্যকার ও সাহিত্য-বিষয়ক নানা রচনায় খ্যাত। তিনি লিখলেন উইপোকার জীবনী, মৌমাছির জীবনী প্রভৃতি। নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ বিদ্যা থেকে, আমাদের দেশে এদিক থেকে সম্ভবত একমাত্র গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের নামই করা যেতে পারে। যাদুকর, পালাগান রচয়িতা, গোপালচন্দ্র হলেন কীটপতঙ্গ বিশারদ এনটমোলজিস্ট। তাঁর প্রাঞ্জল ভাষা বাংলা দেশে বিজ্ঞান প্রচারে অনেকখানি সাহায্য করেছে সন্দেহ নেই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

এবারে বিজ্ঞানীর কথা বন্ধ রেখে কয়েকজন শিল্পীর কথা বলা যাক। প্রথমেই দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর কথা মনে আসছে। তাঁর চিঠি খোলা রয়েছে কয়েকখানা সামনেই। আর তাঁর প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয় ছাত্র কালীকিঙ্কর ঘোষদস্তিদারের কথা, দুজনের কথাই পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। দেবীপ্রসাদের সমস্তই বলিষ্ঠ ও সরল। তবু কি করে তিনি যে রঙের সূক্ষ্ম মায়াজাল সৃষ্টি করেছেন অজস্র, তা ভাবলে অবাক লাগে। তাঁকে দেখলে মনে হবে একমাত্র ভাস্কর্যই তাঁর হাতে মানায়। নিজের পেশীবহুল দীর্ঘদেহটি ব্যায়ামবীরের. চোখদুটিতে শুধু কোমলতা, স্নেহ ও প্রীতির আবেশ মাখা। মুখে বাঁশি উঠলে সুরের খেলায় বাতাস মুখরিত হত এককালে। শিল্পীমনের সঙ্গে দার্শনিকের উদারতা। দেহের মতো মনটাও বিশাল। অজস্র গোপন দানে দক্ষিণ হস্ত গৌরবান্বিত। তাঁর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য প্রথম জানতে পারি তাঁর প্রিয় শিষ্য কালীকিঙ্কর ঘোষদস্তিদারের কাছ থেকে। আর সেই সঙ্গে আমি নিজে দেখেছি এক দুঃস্থ বন্ধুর কাছ থেকে S. O. S. পাওয়া মাত্র টেলিগ্রাফ মনিঅর্ডার যোগে টাকা পাঠাতে।

আমার সঙ্গে দেবীপ্রসাদের পরিচয় হয় যতদূর মনে পড়ে ১৯৩২ সনে, এবং শনিবারের চিঠির মোড়লদের তিনি একজন বন্ধুলোক, সেই সূত্রে। দ্বিতীয় সূত্র কালীকিঙ্কর ঘোষদস্তিদার। দেবীপ্রসাদ সম্পর্কে বলতে কালী-কিঙ্করকে মনে পড়ার কারণ আছে। কালীকিঙ্কর নির্ভীক চরিত্র, ন্যায়ের পক্ষে লড়াই করতে সদাপ্রস্তুত, তাতে জীবনপণ করতে কিছুমাত্র বাধা অনুভব করে না। অন্যের অনুগ্রহ, কোনো আকারে নিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। কিন্তু নিজের সম্বল অন্যকে বিলিয়ে দিতে তার কোথাও কোনো মানসিক বাধা নেই, কাতরতা নেই। ছবি এঁকে দিয়ে বিল করতে জানে না, টাকার দাবি করে না কখনো, যে যা দেবে তাই তার প্রাপ্য, না দিলেও ভুলে যায়, অনেকেই অনেক টাকার কাজ করিয়েছে, কিন্তু টাকা দেয়নি। কালীকিঙ্কর বলে, দিতে পারেনি, তাই দেয়নি। কাজ করিয়ে নেওয়া সহজ ছিল, কিন্তু তার জন্য ধরে বেঁধে এনে টাকা দিতে হত, পাওনার সময় তার ঠিকানা পাওয়া যেত না, কোথাও ছবি এঁকে কারো উপকার করা হবে জানলে সেখানে আগে ছুটবে, কিছু নিতে হবে না, এ তার পক্ষে বড়ই আরামের।



দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

ফোটো : পরিমল গোস্বামী, ১৯৫০

১৯৩০ সম্ভবত, কলকাতা আর্ট স্কুলের কয়েকজন ছাত্র প্রিনসিপ্যাল মুকুল দের সঙ্গে পরস্পর ভুল বোঝাবুঝির ফলে স্ট্রাইক করল, এবং তার ফলে 'একস্‌পেলড' হল। অবনী সেন, গোবর্ধন আশ ও কালীকিঙ্কর ছিল এই বহিষ্কৃতের দলে। কালীকিঙ্করের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে উঠল। আশা ছিল শিল্পী হবার, বাধা পড়ল মাঝ পথে। তারপর কিছুদিন অস্বস্তিতে কাটাবার পর ভারতের নানা আর্টস্কুলে কালীকিঙ্কর ভরতি হবার আবেদন পাঠাতে লাগল, এবং সে আবেদনে উল্লেখ করতে ভুলল না যে, সে কলকাতা আর্ট স্কুলের থেকে 'বহিষ্কৃত ছাত্র'। গভর্মেণ্ট আর্ট স্কুলের 'একস্‌পেলড' ছাত্র শুনে অনেকেই ভয় পেয়ে গেলেন, পেলেন না একমাত্র দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। কালীকিঙ্কর খুব উল্লাসের সঙ্গে মাদ্রাজে চলে গেল। দেবীপ্রসাদ তার কাজ দেখে খুশি। বললেন, আমার ভাল লেগেছে কিন্তু তুমি আমার কাজ দেখ, যদি তা পছন্দ কর এবং মনে কর আমার কাছে শিক্ষা পেলে তুমি খুশি হবে, তা হলে ভরতি হয়ে যাও।

কালীকিঙ্করের মুখে সে সময় এই কথাটা শুনে চমক লেগেছিল। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে যথার্থ বোঝাপড়া থাকলে উভয়ের পক্ষেই মঙ্গল, এ বোধটা শিক্ষক দেবীপ্রসাদের ছিল, এতে তাঁকে অনন্যসাধারণ মনে হয়েছিল তখন। ছাত্রটিও শিক্ষকের এমনই ভক্ত হয়েছিল যে তাঁর দেবার মতো যা কিছু বিদ্যা ছিল সবটা অধিকার না করা পর্যন্ত সে তাঁর কাছ থেকে চলে আসতে চায়নি। পরীক্ষা দিলে পাসকরা শুধু নয়, প্রথম স্থান অধিকার করত জেনেও এক বছর সে পরীক্ষাতেই বসেনি। কারণ তা হলেই তো গুরুশিষ্য সম্পর্ক আইনত ছেদ হয়ে যাবে! দেবীপ্রসাদ আমাকে লিখেছেন—

Madras School of Arts and Crafts

Madras 12. 7. 50

প্রিয়বরেষু,·········সারাটা জীবন নানা প্রথায় প্রশংসা ভিক্ষা করে বাঁচার ব্যবসা চালিয়ে আসছি। ভিক্ষাকে প্রায় দাবীর স্তরে তুলে নামের সংস্থান কতকটা করেছি, তবু ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবার উপায় নেই, মরার পরেও ভিক্ষার পুঁজি টিকে যাবে কিনা তারই চিন্তায় অস্থির হয়ে থাকি। যে দেশে শিল্পীকে দিয়ে না খেতে জীবন্ত কবর দেওয়ার নিয়ম, সেই দেশেই রসের খোরাক কিছু রেখে যাবার জন্য অস্থির হয়েছি। এটি একটি বিশিষ্ট মনোব্যাধি, মায়ার জবরদস্ত দৃষ্টান্ত।

জীবন্ত কবরের কথায় কালীকিঙ্কর আমার চোখের সামনে উপস্থিত হল। স্বচক্ষে দেখে এসেছি মাটির তলায় মানুষের বসবাস। ছেলেটার আত্মসম্মান বোধই সুস্থ জীবনযাত্রার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওকে ছবি আঁকা এবং মূর্তিগড়া শিখিয়েছিলাম—আসল দীক্ষায় ভুল হয়ে গিয়েছিল। ভিক্ষার আর্টের বিভিন্ন প্যাঁচগুলি শেখাতে পারিনি। শেখাবার চেষ্টা করলেও বিশেষ ফল পেতাম বলে মনে হয় না, কারণ এদিকটায় ওর receptive quality বেজায় ভোঁতা। ......

আপনার দেবীপ্রসাদ

এই চিঠিখানাও আমাকে বিস্মিত করেছিল। দেবীপ্রসাদের আত্মবিশ্লেষণ, সাহিত্যের বিচারও পাকাশিল্পীর হাতের। পিছনে আছে সেই সরল বলিষ্ঠ অকপট মনটি। কালীকিঙ্করের চরিত্র বিশ্লেষণও অদ্ভুত। ভিক্ষার আর্টে তাকে কেউ দীক্ষা দিতে পারত না, পারেনি। সমস্ত দুঃখকে পদদলিত করে প্রশস্ত হৃদয়ের উদার হাসিতে জীবনটা কাটিয়ে দেওয়ার এমন দৃষ্টান্ত আমার আর দ্বিতীয় জানা নেই।

ইতিমধ্যে আমি ১৯৫০-এর জুলাই মাসে দেবীপ্রসাদ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করি। এটি আমার শিল্পীদের সম্পর্কে পৃথক কোনো রচনা নয়। ১৯৪৫ থেকে সুভো ঠাকুর, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ রায়-চৌধুরী, অতুলচন্দ্র বসু, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কয়েক-জন শিল্পীর মূল রচনাভঙ্গি বিশ্লেষণ করেছিলাম। দেবীপ্রসাদ সম্পর্কে যে রচনাটি লিখেছিলাম, তার প্রুফ এককপি তাঁকে মাদ্রাজে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। তিনি লিখলেন—

Debi Prasad Roychowdhury M.B.E. — Madras
Principal — 29. 7. 50
Govt, School of Arts & Crafts

প্রিয়বরেষু,.........প্রুফ পড়লাম। আপনার খোঁজা ও পাওয়ার সফলতায় মুগ্ধ হয়েছি। স্বরচিত আলেখ্য দর্শনেও হয়ত আপনার পাওয়ার উপর বেশী কিছু দিতে পারতাম না। ভেবেছিলাম কালীর [কালীকিঙ্কর ঘোষদস্তিদার] সম্বন্ধেও আপনি কিছু লিখবেন, কিন্তু কোথাও বেচারার নামগন্ধ পাওয়া

গেল না। ......শিল্পী ও মানুষ হিসাবে ওর চরিত্র আদর্শ করার মত জিনিস। আপনার মত দরদী যদি শিল্পীদের জনসাধারণের নির্লিপ্ততা থেকে না বাঁচায় তাহলে তারা দাঁড়াবে কোথায়?

আমি বিশ্বাস করি মানুষ মাত্রেরই প্রকার ও স্তরভেদে রসগ্রহণের স্পৃহা আছে। কোন ক্ষেত্রে গ্রহণ শক্তি প্রযোজনার অভাবে নিস্তেজ হয়ে আসে, মারা পড়ে, কোন ক্ষেত্রে কুচক্রীর প্রভাবে রসগ্রাহীর মন কলুষিত হয়ে যায়। রূপের সৌন্দর্য ভোগ সম্বন্ধে জনসাধারণের নির্লিপ্ততা ঘটনাচক্রের ফল। রূপসংশ্লিষ্ট সৌন্দর্যের সহিত ঘনিষ্ঠতা না থাকায় তার ব্যবহার বন্ধ হয়েছে। সুতরাং সুপ্ত মনকে জাগিয়ে তোলার জন্যই আপনাকে কলম চালাতে হবে, অন্যথা আত্মজাহিরের স্বার্থে ফ্যাশনবাদীরা মেতে উঠবে। ওদের ষড়যন্ত্রে শৃঙ্খলা আছে। মণ্ডায় মণ্ডায় ঘাঁটি আগলে থাকে, পাছে কোন সত্যকথা সাধারণের কাছে গিয়ে পৌঁছায়। আপনার সাহসের সহিত জোরদার কলম যোগ দিলে বহু শিল্পী বাঁচার পথ খুঁজে নিতে পারবে।

আত্মজাহিরের জন্য আমি নিজেই সব সময় অতিষ্ঠ হয়ে থাকি, কিন্তু ঐ স্বার্থটিকে পরের ঘাড় ভেঙে তেজীয়ান করার চেষ্টা এখনও করিনি। তবে দিনকাল যা আসছে তাতে self defence এর জন্যই offensive হতে হবে।

আপনাকে লিখতে বসলে অনেক দুঃখের কথা আত্মপ্রকাশের জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে। শিল্পী হয়ে জন্মেছি, বলার কি শেষ আছে?...

ইতি আপনার—

দেবীপ্রসাদ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

দেবীপ্রসাদের কথা মান্য করে শিল্প বিষয়ে যা লিখেছিলাম তা পরে বলছি। কিন্তু কালীকিঙ্কর সম্পর্কে আমি তখন যে বিস্তারিত লিখিনি তার কারণ ছিল। কালীকিঙ্কর তখন আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল, এবং তার বিষয়ে লিখতে গেলে সে নিজেই তা পছন্দ করত না। নিজের বিষয়ে কালীকিঙ্কর অতিমাত্রার উদাসীন ছিল, কিন্তু তার উপস্থিতিতে যদি অন্য কোনো শিল্পীর কেউ নিন্দা করত, তখন সে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠত। অন্য শিল্পীবিষয়ে সে সবসময় শ্রদ্ধা ও সহানুভূতিশীল ছিল। অন্যের প্রশংসা তার সব সময় ভাল লাগত, নিজের প্রশংসা নয়।

আমি দেখেছি সে পশুপাখী বিষয়ে এমন নিপুণভাবে অনুশীলন করেছিল যে, এদের সম্বন্ধে কিছু আঁকতে বলামাত্র তার চোখের সম্মুখে পশু বা পাখীর সমস্ত চরিত্র বৈশিষ্ট্য যেন স্পষ্ট ভেসে উঠত, এবং এদের চরিত্র অঙ্কন বিষয়ে সে এমন আঙ্গিক আয়ত্ত করেছিল যাতে সে অল্প সময়ের মধ্যে পরিপূর্ণ ছবি গড়ে তুলতে পারত, ছবির আকার যত বড়ই হোক। ঝড়ের বেগে চলত আঁকা এমন পূর্ণ ডীটেল সমেত এমন জীবন্ত ছবি এবং এত তড়িৎগতিতে যে, না দেখলে বিশ্বাস কার শক্ত, এবং দেখলে বিস্ময়ের অন্ত থাকত না।

কালীকিঙ্কর চোখের অসুখে এখন (১৯৭০) ছবি আঁকা ছেড়েই দিয়েছে এবং আমি জানি, যে-কোনো প্রকৃত শিল্পী আপন সৃষ্টির মধ্যে যে মুক্তি পেয়ে থাকে তা থেকে বঞ্চিত হলে ভিতরে ভিতরে তার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠতে বাধ্য। কিন্তু কালীকিঙ্কর এর এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম।

শিল্পীর নির্লিপ্ততা আমি তার মধ্যে যতটা দেখেছি, এমন আর কোথাও দেখিনি। ক্রমাগত ছবি আঁকছে, আর যেখানে বসে আঁকছে সেখানেই তা ফেলে চলে যাচ্ছে, তার প্রতি আর তার কোনো মোহ বা টান নেই, এমন আর কোথাও দেখিনি। সবই প্রদর্শনীতে দেখানোর মতো ছবি অথচ দ্বিতীয় বার তার দিকে ফিরেও চায়নি বলে, আঁকার আনন্দ আঁকার সঙ্গেই শেষ হয়ে গেছে। আর ও ছবি দিয়ে কি হবে? নির্লিপ্ততা এবং শিল্পীর সম্মান বিষয়ে উগ্র চেতনা সম্পন্ন আর এক উদাসীন শিল্পীকে মাত্র জানি—তাঁর নাম ভোলা চাটুজ্জে, ভি-সি নামে পরিচিত। একবার তাঁর ছবির প্রদর্শনী হয়েছিল। এক অবাঙালী তাঁর একখানা ছবির জন্য দুহাজার টাকা দিতে



কালীকিঙ্কর ঘোষদস্তিদার

ফোটো : পরিমল গোস্বামী, ১৯৫০

চেয়েছিলেন। ভি-সি একথা শুনে ভীষণ উত্তেজিত : "কি! যে মানুষ ছবির সম্মান জানে না, ছবি বোঝে না, সে শুধু টাকা আছে বলে ছবি কিনবে? অসহ্য!" ভি-সি তৎক্ষণাৎ সেই বিশেষ ছবিখানা সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে এক বন্ধুকে দান করে এলেন। এবারে শিল্পী মহা তৃপ্ত।

কালীকিঙ্কর আমার কাছে বসে গল্প করতে করতে ছবির পর ছবি এঁকে যেত, আমি সে সব যত্ন করে রেখে দিতাম। প্রদর্শনী করবে তার ছাত্ররা, ছবি দেবে না সে। ছাত্ররা—অর্থাৎ ধর্মতলা স্ট্রীটের ইণ্ডিয়ান আর্টস্কুলে সে কিছুদিন শিক্ষকতা করেছিল। ছাত্রদের সে ছবি আঁকার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিল। কখনো সে কোনো ছাত্রকে সমালোচনা করেনি। প্রত্যেককে নিজ নিজ পথে চলবার আনন্দ দিয়েছিল। তারপর বৃষ্টির দিন এলো। সে দেখলো টীচাররা একটি পথে বৃষ্টি এড়িয়ে স্কুলে প্রবেশ করতে পারেন. কিন্তু ছাত্রদের জন্য পৃথক পথ, সে পথে স্কুলে প্রবেশ করতে বৃষ্টিতে ভেজা অনিবার্য। কালীকিঙ্কর বলল, তা হবে না, সবাইকে একপথে আসতে দিতে হবে। কর্তৃপক্ষকে অপমান করা হয়েছিল এতে, কালীকিঙ্কর আর সেখানে যায়নি। শিল্পী সুধীর মৈত্র সেখানে কালীকিঙ্করের ছাত্র ছিল।

ছাত্ররা ছিল তার পরম ভক্ত. তারা এলো আমার কাছে ছবির জন্য, আমি কালীকিঙ্করের ফেলে দেওয়া ছবি থেকে কয়েকখানা বেছে দিলাম। বলে দিলাম মাউন্ট করে নিতে। ছবি সবই চিঠিলেখা বা সম্পাদকীয় রচনা লেখার কাগজে, আকারে ছোট। প্রদর্শনীতে চারশ টাকার ছোট ছোট ছবি বিক্রি হয়েছিল যত দূর মনে পড়ে। সে টাকা কালীকিঙ্কর কিছুতে নেবে না, ছাত্ররা জোর করে কিছু রেখে এসেছিল।

আর একবার ইউথ ফেসটিভ্যালের এক উদ্যোক্তা এসে আমার কাছ থেকে ঐজাতীয় ছবি ৯০ খান নিয়ে গিয়েছিল। শুনেছিলাম ছবি বিক্রি করে প্রায় হাজার টাকা পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু টাকার কোনো অংশই শিল্পীর কাছে পৌঁছয়নি। শুধু ছবি নেওয়ার রসিদখানা (১৩।৫।৫৫) আজও আমার কাছে পড়ে আছে। কালীকিঙ্কর এর কোনো খবরই রাখে না।

শিল্পী ভোলা চাটুজ্জের নামের সঙ্গে আর একটি প্রতিষ্ঠানের নাম আমার স্মৃতিতে রয়ে গেছে, ১৯৪২এর ঘটনা। ১২ নম্বর ওয়াটারলু স্ট্রীটে বন্ধুদের সমাবেশ ঘটল এক প্রকাশনীর উদ্‌বোধনে, পৌরোহিত্য করলেন ভোলা চাটুজ্জে। বিনয়কৃষ্ণ দত্ত, সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী ও ব্রতীশঙ্কর রায় সাধারণ সম্পাদক

রূপে দেখা দিলেন—'শতাব্দী গ্রন্থমালা' পর্যায়ে পরপর ছোট ছোট বই প্রকাশ করবেন এই উদ্দেশ্যে।

উদ্‌বোধনের দিন কালিদাস নাগ উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথিরূপে, এই প্রকাশনী সম্পর্কে 'স্মৃতিচিত্রণ' বইতে আমি অনেকটা লিখেছি।

এবারে কালিদাস নাগের স্মৃতিটি মনে বড় হয়ে উঠছে। সেদিন যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কালিদাসবাবু ও বিভাস রায়চৌধুরী এখন আর জীবিত নেই। ব্রতীশঙ্কর অধ্যাপকরূপে অস্ট্রেলিয়া নিবাসী হয়েছেন।

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মাঝখানের এই প্রসঙ্গ, স্মৃতির দাবিতে এসে গেল। দেবীপ্রসাদ সম্পর্কে এর পরে আবার আরম্ভ করা যাবে, এবং সেই সঙ্গে আরো কয়েকজন শিল্পীর কথা।

নবম পরিচ্ছেদ

কালিদাস নাগের সঙ্গে আমার পরিচয় প্রথম কোথায় মনে পড়ে না, হয় তো ১৯৩২-৩৩ সন থেকে। তাঁর ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য সহজেই আমাকে আকর্ষণ করেছিল। সৌজন্যে তাঁর তুলনা হয় না, রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অনুগত ছিলেন, তাঁর পোশাকে সব সময়ে ছিল একটা সযত্ন পারিপাট্য, একখানা দামী চাদর পাঞ্জাবীর উপর সবসময় পরতেন, ডান হাতের নিচে দিয়ে বাঁ কাঁধের উপর গিয়ে পড়ত। সব সময় সদালাপী, কণ্ঠস্বর ছিল চিত্তাকর্ষক, বাগ্‌ভঙ্গি সুমার্জিত এবং বাক্য পরিমিত, আর তা প্রায় সব সময় কোনো না কোনো বিষয়ে তথ্যসমৃদ্ধ। কথা বলতেন অনেক কিন্তু আড্ডাবাজ হতে দেখিনি।

১৯৪৩ সনে ফোটোগ্রাফি বিষয়ে আমার প্রথম বই ছাপা হয়। সে সময়ে যাঁদের ঐ বই ভাল লেগেছিল এবং আমাকে লিখে জানিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অমল হোম, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস নাগ ইত্যাদি। এই উপলক্ষে আমার প্রতি কালিদাস-বাবুর প্রীতির পরিচয় পেয়েছিলাম। আমি ১৯৪৫ সনে প্রথমে যুগান্তরে প্রবেশ করি, এই সময় আমি যাঁদের কাছ থেকে রচনা প্রার্থনা করি তাঁদের মধ্যে কালিদাসনাগও ছিলেন। তিনি নিজেই আমার সম্পাদক হওয়ার খবরের চিঠি পেয়ে লেখা দেবেন বলেছিলেন। আমার যুগান্তরে যোগ দেওয়ার সংবাদ সম্বলিত একখানা চিঠি পাবার পর তিনি লিখছেন—

President
Dr. S. P. Mookherjee
D. Litt, Bar-at-Law
Hony. Secretary
Dr. Kalidas Nag (Cal)
D. Litt (Paris)

Greater India Society
P-26, Lansdowne Rd Extension
(Raja Basanta Roy Rd)
Calcutta-29, 14-10-47

বন্ধুবরেষু, প্রিয় পরিমলবাবু……আপনি এখন যুগান্তরের ম্যাগাজিন সেকশনের সম্পাদক যখন হয়েছেন, তখন মাঝে মাঝে প্রবন্ধাদি আমরা পাঠাব। বাংলার বাইরে বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ বিস্তার নিয়ে লেখবার অনেক কিছু আছে। ১৯১৯ সালে যখন প্রথম সিংহল কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে যাই তারপর থেকে অনেক প্রদেশের সাহিত্যিকদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা

হয়েছে। এ বিষয়ে প্রবন্ধগুলি আপনি মাপসই করে তিনচার ভাগে (যেমন দাঁড়ায়) ছাপবেন।······আপনার নিমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ। আমি একমাস মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসা (দাঁত ইত্যাদি) করিয়ে সবে বাড়ী ফিরেছি, ······অমৃতবাজার পত্রিকা (১৯শে)-তে Indian Literary Conference (Delhi) দরুন প্রথম প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। পড়ে বলবেন, কেমন লাগল।

ভবদীয়

শ্রীকালিদাস নাগ

পরবর্তী এ চিঠিখানা তাঁর প্রবন্ধগুলির শেষ কিস্তি ছাপার পরে লেখা—

P 26 Raja Basanta Roy Rd.

Calcutta-29

12. 1. 48

বন্ধুবরেষু,

প্রিয় পরিমল বাবু, অনেক ধন্যবাদ······শেষ কিস্তি যুগান্তরে পডলাম, ভুল খুবই কম, প্রথম কিস্তিতে উড়িয়াভাষী ১০ মিলিয়ন না ছেপে ১ ছেপেছে, অর্থাৎ শূন্যটা নেহাৎ শূন্যার্থ-বাচক না ধরলেই ভাল ছিল, যা হোক আপনার চেষ্টায় ও তাগিদে বাংলা ভাষা নিয়ে একটা নাড়া দেবার সুযোগ হল। এ ধরনের লেখা যখন দরকার জানাবেন, আপনার প্রবন্ধ চিত্রপ্রদর্শনী পডে সুখী হলাম।

ভবদীয়

শ্রীকালিদাস নাগ

৮ই ফেবরুয়ারি ১৯৬২ তারিখে শ্রীযুক্তা শান্তা দেবী আমাকে একটি প্রবন্ধ বিষয়ে একখানি কার্ড লেখেন তার অপর পৃষ্ঠায় কালিদাস নাগ আমাকে লেখেন—

বন্ধুবরেষু, আপনি আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বিষয়ে দুটি প্রবন্ধ ছাপেন। তাঁর সহপাঠী নরেন দত্ত নিয়ে কত অজানা অধ্যায় যে আছে তার আভাস দিয়েছি (মাঘ) উদ্‌বোধন পত্রিকায়। সেটি পড়ে আপনি সাজেস্ট করলে কিছু আপনাকে দিতে পারি। নিবেদিতা ও বিবেকানন্দ অমৃতবাজার পত্রিকা খুঁজে দেখবেন (১৮৯৭-১৯০২)।

স্বামীজি নিবেদিতার মৃত্যু [বিষয়ে] অমৃতবাজার পত্রিকায় হয়ত অনেক

Notes and Comments আছে। ৪ঠা জুলাই [১৯০২] স্বামীজির মৃত্যুর পর নিবেদিতা বেলুড়ের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করলেন কেন? খুঁজে দেখা দরকার।

ইতি প্রীতিমুগ্ধ

শ্রীকালিদাস নাগ

এই সময়ে কালিদাস নাগ নিবেদিতা বিবেকানন্দের সময় ও সম্পর্কে কিছু বলবেন বলে প্রস্তুত হচ্ছিলেন, অন্তত তাঁদের বিষয়ে তিনি যে খোঁজ খবর করছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে আর একখানা চিঠিতে।—তারিখহীন চিঠি অস্পষ্ট পোষ্টমার্ক-১৭ এপ্রিল ১৯৬১ অনুমিত হয়।

১০৮ রাজা বসন্ত রায় রোড

কলিকাতা-২৯

বন্ধুবরেষু, আমায় চারটি প্রবন্ধ দিতে বলেছেন—

১। বীরেশ্বর ও কিশোর পর্ব (১৮৬৩-৮১)

২। নরেন দত্ত (১৮৮১-১৮৯২)

৩। বিবেকানন্দ (১৮৯২-১৯০২)

৪। স্বামীজির প্রভাব (১৯০২-১৯৬২।

এমনি কাঠামো খাড়া করেছি, এখন আপনার মতামত শীঘ্র চাই, কারণ আমার পূর্বজন্মের লালাভূমি ও মালবিকারা ডাক দিয়েছেন রবীন্দ্র শতাব্দী ভাষণ দিতে, হয়তো ৫ই মে ভূপাল যাত্রা করব। তাই চিঠি পেয়ে কার্ড লিখলে উপকৃত হব। ছবি প্রত্যেক প্রবন্ধে দিতে চেষ্টা করব। আপনি পুরান অমৃতবাজার ব্লকবিভাগ থেকে কিছু হয়তো আবিষ্কার করবেন। আমি প্রবুদ্ধ ভারত অফিসে দেখছি। উদ্বোধন দলও দেবেন, তাঁদের মাঘ সংখ্যায় খোঁচা দিয়ে বহু অপ্রকাশিত বিবেকানন্দ-চিঠি ছাপিয়ে নেবার ব্যবস্থা করেছি। মহাত্মা শিশিরকুমার, নরেন দত্তকে (১৮৮২-৯২) উপদেশ দেন, দয়া করে খুঁজে দেখুন।

স্টার থিয়েটারে ভগ্নী নিবেদিতার প্রথম বক্তৃতায় তর্ক উঠেছিল (১৮৯৮) অমৃতবাজার পত্রিকা ও নরেন সেনের ইনডিয়ান মিরার দ্রষ্টব্য। এই বয়সে ন্যাশন্যাল লাইব্রেরি যাবার সাধ্য নেই যদিও সেকালে (১৯০৮-১৮) আলিপুর পশুশালা (মামার বাড়ী)-তেই আমি ও ভাই গোকুল, সাহিত্যিকদের স্নেহ-স্পর্শ পাই। মামা (বিজয়কৃষ্ণ বসু, ইলা পালচৌধুরীর পিতা) ও মামীমা

ইন্দুমতী আমাদের মানুষ করেন। সেখানে শিবনাথ শাস্ত্রী আসতেন, তাঁর কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কাহিনী শুনেছি—পরে রবীন্দ্রনাথের কাছেও। আমি চলে গেলে সেসব গল্প চাপা পড়বে। আচার্য শীলের Quest Eternal কাব্য কিভাবে যোগাড় হয় ?—

প্রীতিমুগ্ধ শ্রীকালিদাস নাগ

জাতীয় পাঠাগার ও পশুশালা কাছাকাছি বলেই একটা বলতে আর একটা মনে পড়েছে। কালিদাস নাগের জন্ম তারিখ ৬ই নবেম্বর ১৮৯১ (২৩ শে মাঘ ১২৯৭), মৃত্যু হয়েছে ৮ই নবেম্বর ১৯৬৬ (২২শে কার্তিক, ১৩৭৩)। প্রায় ৭৫ বছর বয়সে মৃত্যু, এযুগে একে অকাল মৃত্যু বলা চলে, বাইরের স্বাস্থ্য দেখে এমন কথা মনে করা কঠিন ছিল। অসুখটা ছিল ভিতরে অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের, এর সঙ্গে হাইপারটেনশন। এ জাতীয় অসুখে দেহের প্রতি যে পরিমাণ যত্ন নেওয়া দরকার তা নেওয়া এমন একজন অক্লান্তকর্মী সদাশয় ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব ছিল না। যেসব কথা তিনি না বলে গেলে অন্য কেউ আর বলবার থাকবে না লিখেছেন, তা আর বলা হল না।

দশম পরিচ্ছেদ

আবার শিল্পীদের প্রসঙ্গে ফিরে আসছি। দেবীপ্রসাদ যে কালীকিঙ্কর সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহী ও স্নেহশীল তা তাঁর অনেক চিঠিতে দেখা যায়। আর একখানা চিঠির নমুনা এই প্রসঙ্গে দিচ্ছি। এতে দুটি জিনিস উল্লেখযোগ্য—কালীকিঙ্করের ঠিকানা লেখায় উদাসীনতা ও সেবিষয়ে দেবীপ্রসাদের রসিকতা।

Govt. School of Arts & Crafts
Madras, 22-6-50

প্রীতিভাজনেষু,········কালী, ওঁ-মার্কা ঠিকানা দিয়ে পত্র দিয়েছিল। স্থানটি কোথায় যথেষ্ট খোঁজার পরেও পাত্তা পাওয়া গেল না, ওর সহজ ঠিকানা পত্রোত্তরে জানালে খুসী হব।

এখানে আসার পরেই কাজে লেগে গিয়েছি। ব্যাগারের কাজে কেউ পয়সা দেয় না, তবু থেমে যাবার উপায় নেই। শিল্পীর কল্পনা চাক্ষুষ হতে চাইলে তাকে বাধা দেওয়া দায়। জটিল গ্রুপ-কমপোজিশনের (স্কাল্‌পচার) মধ্যে দারুণ সংগ্রাম চলছে, কোনপ্রকার মাটির চাঁইকে মাংসল করে ফেলতে পারলেই আপনার কাছে ফোটো পাঠাব।

···ইতি আপনার দেবীপ্রসাদ

মাদ্রাজ থেকে লেখা এই চিঠিখানার খামে কিছু কৌতুক জড়ানো আছে। চিঠির পিছনে লেখকের মাদ্রাজী কেরানিকে আমার ঠিকানা যা বলেছিলেন, এবং সে যা শুনেছিল তার মধ্যে গরমিল আছে। চিঠির পশ্চাতে হাতে লেখা আছে C/o Jogandar Calcutta—এবং খামে টাইপ করা আছে—

Perumal Goswami Esq.
Care, Editor,
"JOGENDRA"
Calcutta.

আমার নাম হয়েছে পেরুমল। এবং ঠিকানা হয়েছে "যোগেন্দ্র" সম্পাদকের কেয়ার এবং শুধু ক্যালকাটা, অথচ আশ্চর্য ব্যাপার, এ চিঠি যথাস্থানে যথাসময়ে পৌঁছেছিল! ডাকবিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মীকে নিশ্চয় "যোগেন্দ্র" নাম

জপতে জপতে এর ধ্বনি থেকে "যুগান্তর" আবিষ্কার করতে হয়েছিল চোখ বুজে। নইলে C/o Editor "Jogendra" এবং পরে শুধু Calcutta লেখা চিঠি কখনো আমার কাছে পৌঁছাত না। আমাকে পেরুমল বানানোর দুঃখ এতে ভুলেছিলাম। এর বছরখানেক আগের একখানা চিঠিতেও কালীকিঙ্কর প্রসঙ্গ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মাদ্রাজ

১৯-৭-৪৯

প্রীতিভাজনেষু, পরিমলবাবু·········কালীর সঙ্গে আমার যা সম্বন্ধ তা প্রায় নাড়ীর টানের। আমার ভাই বোন নেই, উভয়ের অভাব ওকে দিয়ে অনেকটা পূর্ণ হয়, সুতরাং বাড়িয়ে বলা গুণকীর্তনকে প্রশ্রয় দেবেন না।

ঠিক আপনি যে ভাবে কালী সম্বন্ধে চিন্তা করেছেন, আমিও সেই উদ্দেশ্যে কাজে নেমেছিলাম। বিবেকানন্দবাবুর [বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় তৎকালীন যুগান্তর সম্পাদক] কাজটা প্রায় গুছিয়ে এনেছিলাম। ব্যবস্থা হচ্ছিল আমার কাজের সঙ্গে আমার ছেলেদের কাজ বার করা। পাকা কথায় দিন স্থির হয়ে গেল—কিন্তু কলকাতায় থাকতে পারলাম না।...চিঠি লিখে সম্পাদককে বশ মানানো সহজসাধ্য বস্তু নয়। অগস্ট মাসে কলকাতায় যাবার সম্ভাবনা আছে। সময়মত জানাব।

এবার দুটো ফুল এবং দুটি লেপার্ড শিকার করেছি। ফুলকে তৃতীয় লেপার্ডের চোখ মনে করে গুলি চালিয়েছিলাম, প্রায় ৭০।৮০ ফুট দূর থেকে। রাত তখন বারোটা হবে। পাগলা হাতী মারার জন্য সরকার সালেম জেলায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন। হাতী পাওয়া গেল না, ছোট বাঘ মেরেই ফিরতে হল।......

সেনটিমেণ্ট প্রকাশ করে প্রায় কাবু হয়ে পড়েছেন বলে মনে হল। বাঁচার অবলম্বনে বৃহৎ সহায় হৃদয়। ঐ বস্তুটির সহিত মানুষের যদি কোন যোগ না থাকে, তাহলে তাকে চালাক বলা চলে, কিন্তু মানুষ বলে স্বীকার করা যায় কিনা সন্দেহজনক। যাকে ভাল লাগে তাকে নিঃসঙ্কোচে ভাল বলার বাধা যেখানে উপস্থিত হয় সেখানে বুঝতে হবে ভালকে প্রাণ দিয়ে স্বীকার করা হয়নি।

আপনার মত রূপরসিক ফোটো তুললে লাভ তো আমারই বেশী। চেহারাটা দিনের পর দিন গলদে ভরে উঠছে। নানা পত্রিকায় মুসোলিনি

সাহেবের ছবি বার করে তলায় আমার নাম বসিয়ে দিচ্ছে। কয়েকদিন আগেই Orient কাগজে এইরূপ একটি যাচ্ছেতাই কাণ্ড দেখলাম। আপনাকে সিটিং দেবার জন্য একটা দিন ছুটিও নিতে পারি।

হরদম ছবি আঁকছি। মূর্তির নতুন কমপোজিশন ধরেছি। কাজটা যদি মনের মত হয় তা হলে দেশকে কিছু দিয়ে যেতে পারব। বড় কাজ আরম্ভ করলেই কালীর কথা মনে পড়ে। ছেলেটা এমন প্রাণ দিয়ে শিখত যে আমারই ওর ছাত্র হয়ে যাবার ইচ্ছা আসত, আমার যতদূর মনে পড়ে ফাইনাল ইয়ার পরীক্ষায় ও প্রথম স্থান অধিকার করে ডিপ্লোমা আজও নেয়নি, অধিকন্তু আগের বার পরীক্ষাতেই বসল না পাস করার ভয়ে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যে ছেলে, তাকে বিদায় হতে হয়। এক বৎসর বেশী শেখবার জন্য ইচ্ছে করে ফেল মেরে গেল। কালীর আঁকা ছবি বার হোক তার সঙ্গে মানুষটিকেও সাধারণের কাছে চিনিয়ে দেওয়া দরকার, ওর জীবন ধারণ একটি আদর্শের বস্তু। ···আমরা যা চেষ্টা করছি তা গুণের প্রচার, আধুনিক বীভৎসতার বিরুদ্ধে অভিযান, আমার কাছে যারা শিখেছে তার মধ্যে কালী, পানিকর, সুশীল, আসল শিল্পী মনের অধিকারী। কালীকে আমার চিত্রবিদ্যার পুঁজিপাতি সব দিয়ে যাবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কাছে পেলাম কৈ? টেকনিক্যাল বহু জিনিস বহু ছবি কষ্ট করে সংগ্রহ করেছিলাম, সেগুলো আমার মৃত্যুর পর কারও কাজে আসবে না, এটি আমার কাছে খুব আনন্দের বিষয় নয়।—

গুণমুগ্ধ দেবীপ্রসাদ

দেবীপ্রসাদ সবসময়ে দেশের পটভূমিকেই মনের চোখে রেখে শিল্পচিন্তা করেছেন সন্দেহ নেই। এবং সবাইকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়াই ছিল তাঁর লক্ষ্য কিন্তু যাকে সবচেয়ে কাছে পেতে চেয়েছিলেন, সেই কালীকিঙ্কর ঘোষদস্তিদার তার প্রকৃত শিল্পী-জনোচিত গুণাবলী নিয়ে এবং দেবীপ্রসাদের নান বিভাগীয় শিল্প নৈপুণ্যের অনেকখানি আয়ত্ত করেও সম্মুখে এগিয়ে এলে না। পশ্চাৎপটে পড়ে থাকার ইচ্ছাই তার বাধারূপে দেখা দিল। সে আমার নির্দেশে কিছু কিছু কাজ করেছে, হয়তো সে কাজে তার মনটা যোগ দেয়নি, তবু আমাকে সে ভালবাসে বলে এড়াতে পারেনি। পয়সা পাওয়া যায় যে কাজে, তা করা তার মানসিক গঠনের বিরোধী, বিনাপয়সার কাজে তাকে সবরকম দায়িত্ব নিতে দেখেছি। কি উৎসাহ তাতে! নিজের

মনের আনন্দে স্বাধীনভাবে কাজ করা এবং একমাত্র তারই মধ্যে সমস্ত আনন্দ খুঁজে পাওয়াই তার চরিত্র বৈশিষ্ট্য।

এই প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে এলো। মাদ্রাজ থেকে বেরিয়ে আসার পর দেবীপ্রসাদের নির্দেশে সে এক জারমান প্রতিষ্ঠানে চাকরি নিয়েছিল। চাকরি করা তার ঠিক মনের মতো কাজ নয়। কিন্তু এখানের চাকরিটি ঠিক সে যা চায় তাই, নিজের স্বাধীন ইচ্ছামতো ভারতীয় জীবনের নানা ছবি এঁকে যাবে, কোনো আদেশ পালন নেই, কারো তদারকি নেই। কিন্তু বেশ কিছু দিন পরে ঐ প্রতিষ্ঠানের তার এক সহকর্মী গোপনে তাকে একখানি জারমানিতে ছাপা বই এনে দেখাল। কালীকিঙ্কর দেখতে পেল, সবই তারই আঁকা ছবি, কিন্তু ছবির কোণে এক জারমানের স্বাক্ষর। এবং বইখানিও সেই জারমানের রচিত বলে ছাপা হয়েছে জারমানিতে। এটি দেখার পর কালীকিঙ্করের মনে কি হয়েছিল জানি না, কিন্তু সে ঐ প্রতিষ্ঠান থেকে নীরবে বিদায় নিয়েছিল, আর সেখানে যায়নি।

কথাটা সে হঠাৎ ১৯৪৯সনে সিমলায় আমার কাছে প্রকাশ করেছিল, ৮০০০ ফুটের উচ্চতায় বসে। কালীকিঙ্কর ও আমি এই সময় এক ল্যান্সডাউন-বাসিনীর নিমন্ত্রণ পেয়ে কুমায়ুন পর্বতের সেই দুর্গম মিলিটারি শহরে বেড়াতে গিয়েছিলাম। তারপর সেইখানে থাকতেই তৎকালীন সরকারী চাকুরে (ভূতপূর্ব বঙ্গশ্রী সম্পাদক) কিরণকুমার রায়ের ডাকে এক পাহাড় থেকে নেমে আর এক পাহাড়ে গিয়ে উঠলাম। সিমলার আবহাওয়ায় (সেখানে বায়ুর চাপ অবশ্যই কিছু কম!) কালীকিঙ্করের মনটা কিছু শিথিল হয়ে থাকবে, তাই একদিন আমাকে সে মাদ্রাজের চাকরিটির ঘটনা কথাপ্রসঙ্গে বলেছিল। তার আগে, কখনো এমন একটি ঘটনা যে তার জীবনে ঘটেছিল তা প্রকাশ করেনি।

দেবীপ্রসাদের চিঠিতে ফোটোগ্রাফ তোলার কথা আছে, তাঁর যে ফোটো আমি তুলেছিলাম, পোরট্রেট হিসাবে আমার নিজেরই তাতে তৃপ্তি হয়েছিল। পরবর্তী চিঠিতে তাঁরও ভাল লাগার কথা জানা যাবে।

মাদ্রাজ

৪-৭-১৯৫০

প্রিয়বরেষু,...নিজের ছবি পেলাম, আয়নায় মুখ দেখার চেয়েও ভাল, অর্থাৎ বিবাহের বিজ্ঞাপনে কাজে লাগান যায়, ছবিটির জন্য অফিশিয়ালি ধন্যবাদ

দিলেও গোপনে কিছু অভিযোগ জানাবার আছে। পুরো ২১ বৎসর বাদে আমার স্ত্রী আমাকে বাদ দিয়ে ছবির প্রেমে পড়ে গিয়েছেন।...এচিং-এর জালে যে জাল করেছেন তাতে অনেক তাম্রপত্র (etching plate) ঘায়েল হবে।

ইতি গুণমুগ্ধ
আপনার দেবীপ্রসাদ

নিজের হাতের কাজ ভাল হলে নিজেই অনেকটা বোঝা যায়। এই নকল এচিং-এর ফোটোগ্রাফ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না যে দেবীবাবুরও ভাল লাগবে। তারপর তাঁর এই চিঠি আমাকে অনেক আনন্দ দিয়েছিল বলা বাহুল্য।

আমার ফোটোগ্রফি সম্পর্কে আর এক অপ্রত্যাশিত প্রশংসাও আমার কাছে খুব তৃপ্তিজনক বোধ হয়েছিল, এবং এ চিঠিখানাও শিল্পীর।

'জয়ন্তী' ৭৭ রসা রোড সাউথ
টালিগঞ্জ
১১-১১ [১৯৫১]

ভাই পরিমল, তোমার সঙ্গে কতদিন যে দেখা নাই তার ঠিক নাই। তাছাড়া আমরা এখন ব্যাকডেটের আসামী, কেবল নন্দলাল বসু এখনও আনন্দবাজার দেশ প্রভৃতির মধ্যে সবার সামনেই আছে, এইটুকুও ভাল, এবং আমাদের আশা।

যাইহোক তোমার চিত্রে নৈসর্গিক ফোটোগুলি বরাবর তোমায় সজীব রেখেছে, এসব আমাদের কম সুখের কথা নয়। এখন আমাদের সৃষ্টি যেন স্তব্ধ হয়েছে, তোমাদের প্রয়াসের মধ্যে দেশের শিল্পবোধ যেন বেঁচে আছে। আমার তো মনে হয়, ফোটোর মধ্যে তুমি দেশের বৈচিত্র্যকে বাঁচিয়ে রেখেছ।...

ইতি
তোমাদের প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

এ প্রশংসা তৃপ্তিজনক হলেও আমি মনে মনে জানতাম পিকটোরিয়াল ফোটোগ্রাফির ক্ষেত্রে আমি যা করব ভেবেছিলাম, তা করতে পারিনি। নিজের মনের আনন্দে কাজ করার সুবিধা আমার ছিল না, তাই ১৯৩৬-এর আরম্ভে প্রথমে নীরদচন্দ্র চৌধুরী ও পরে অমল হোমের কাছ থেকে আধুনিক

ক্যামেরার ছবিতে যে উৎসাহ পেয়েছিলাম তা বেশিদিন রাখা সম্ভব হয়নি। নীরদবাবু 'নূতন পত্রিকা'র সম্পাদক ও ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের অস্থায়ী সম্পাদকরূপে প্রথমে এবং অমল হোম স্থায়ী সম্পাদকরূপে পরে আমার চিত্রধর্মী দৃশ্য ও মহাজনদের পোরট্রেট যেভাবে যত্ন করে ছেপেছিলেন, তাতে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। এরপর থেকে নানা পত্রিকায় অনেক ছবিই প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু পঞ্চাশ টাকা খরচ করে মাঝে মাঝে তার এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ মূল্য পাওয়ার আনন্দ বেশি দিন থাকে না, তবে তৃপ্তির তো কোনো শেষ দাম নেই, যে দাম আমি প্রচুর পেয়েছি বহুকাল ধরে বন্ধুদের নিয়মিত পোরট্রেট তুলে। দেখেছি মেয়েরা বেশি খুশি হয় ছবি পেলে, তাদের পোশাকও ছবির উপযুক্ত। ছোটদের ছবি আরো বেশি ভাল লাগে তুলতে। শেষপর্যন্ত পোরট্রেটের দিকেই ঝুঁকতে হয়েছে প্রকৃতির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে।



অতুলচন্দ্র বসু

ফোটো : পরিমল গোস্বামী ১৯৫১

একাদশ পরিচ্ছেদ

শিল্পী অতুল বসুর একখানা চিঠি দিয়ে এই বহুখ্যাত পোর্ট্রেট পেন্টার প্রসঙ্গ আরম্ভ করি। অতুল বসু লিখছেন—

Burdwan Compound Extension
Ranchi, BNR
Sept 6, 1950

প্রিয়বরেষু, আমি······২রা এখানে এসে পৌঁছেছি। যে জায়গায় দুখানা ঘর পেয়েছি তা খুবই মনোরম, একেবারে ধানক্ষেতের মাঝেও বলা যায়। পাশে দুচারিটি সাঁওতালের ঘরও আছে। এত জুটবে ধারণাই করতে পারিনি, তবে শহর থেকে দূরে। তা আমাদের ভালই লাগছে, বাজার হাটের যা একটু অসুবিধে, তাতেও আশাবাদী বলতে পারেন কারণ দূর হওয়াতে আর দুপয়সার সওদা করতে দুচার মাইল চক্কর দেওয়াতে স্বাস্থ্য ফিরে যাবেই, চাই কি যৌবনও ফিরে পাওয়া যেতে পারে।···

যে রাজত্বে আছি সেখানে কানে শোনার বন্দোবস্ত কম, শুধু চোখে দেখার বিরাট আয়োজনই সারাদিন সারারাত চলছে। চারদিকে সবুজ মোড়া হয়ে আছে মাটি, মাঝে মাঝে আধ-পাকা পুরো-পাকা নানা রকম রঙের ফসল, আবার উঁচু নিচুর টক্করও আছে, ক্ষেতগুলিও স্বাধিকার-প্রমত্ত হয়ে রঙিন পাড় প'রে গায়ে গায়ে জড়িয়ে আছেন, দূরে বনের আবেষ্টন, মাঝে মাঝে লোকালয়ের চিহ্ন, সবার উপর বর্ষাশেষের মেঘের বাহার। দিন-রাত যে কতবার মেঘবরণ সাড়ী বদল হচ্ছে তার কোন হদিসই পাই না। পাহাড়গুলিও পাহারা দেবার জন্য ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেন যে বর্ণচোরা হয়ে আছেন তাও বোঝবার বাইরে। যাক কবিত্ব। ভালই আছি। ······

ইতি আপনাদের অতুলবাবু

সতেরো বছরের পরিচয়ের পরে এই প্রথম চিঠি। কথায় ছবি আঁকতেও অতুলবাবু পটু। শিল্পী মানুষ, রাঁচিতে তো উন্মাদদের আশ্রম আছেই, তদুপরি শিল্পীরা তো স্বভাব উন্মাদ। তার উপরে আবার ইটপাথরের জেল-খানা থেকে হঠাৎ খোলা সবুজের ভিতর গিয়ে ওঠাতে ভাষাতেও কিছু উন্মাদনা আসা স্বাভাবিক।

১৯৩২ সনের শেষের দিকে আমি শনিবারের চিঠির সম্পাদক। তারপর থেকে যেসব (প্রায় সব) শিল্পী ও সাহিত্যিক ঐ মাসিককে কেন্দ্র করে এসে জুটেছিলেন, তাঁদের অনেকের সঙ্গেই সম্পর্ক অদ্যাবধি অটুট আছে। আমাদের তখনকার বন্ধুদের একজন যক্ষ্মায় অকালে মারা গেলেন, দুজন আত্মহত্যা করলেন, তাঁদের একজন ইটালিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ডকটরেট উপাধিধারী, অন্যজন জ্যোতিষী। একজন উন্মাদ হয়ে গেলেন। আর একজন নিজের উপর বেপরোয়া অত্যাচার করে নিজেকে যৌবনবয়সে মারলেন। অকালমৃত্যু অনেকেরই ঘটল। যাঁদের কথা বললাম, তাঁরা যথাক্রমে রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়, প্রমথনাথ রায়, সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস, সুবল মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বাগচি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের পরবর্তী যে সব গুণী অকালে মারা গেলেন, তাঁদের সংখ্যাও কম নয়। ডঃ বটকৃষ্ণ ঘোষ, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিল্পী অরবিন্দ দত্ত, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস এবং ডঃ সুশীলকুমার দের মৃত্যুও অকালে বলা চলে বৈকি। মোহিতলাল মজুমদারও তাই।

আমরা যে কজন অমর হয়ে থাকব ঠিক করেছি, অতুল বসু তাঁদের মধ্যে একজন। আমি ১৯৩৩ সনে শনিবারের চিঠিতে এক ধারাবাহিক রচনা আরম্ভ করি, অতুলবাবু হলেন তার প্রধান ভক্ত। ১৩৪০-এর জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত 'বনবাসের ডায়ারি'টি বাল্মীকি রামায়ণ অনুসরণ করে একটু আধুনিক করা হয়েছিল। তার আরম্ভটা ছিল এই রকম—

"পিতৃআদেশ পালনের মুখে রাম কহিলেন, সীতা, আমি তো চলিলাম, তোমার দশা কি হইবে?

"সীতার চোখ দিয়া জল গডাইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিবার পর তিনি বলিলেন, আমাকে সঙ্গে লইয়া যাও।—"

এইভাবে আরম্ভ করেছিলাম ভূমিকা। ভূমিকার শেষে ছিল এই রকম—

"তাহার পর রামচন্দ্রকে [লক্ষ্মণ] বলিয়াছিলেন,—বড়দা, আমি বাবাকে এবং আপনার শত্রুপক্ষীয় যাহারা আছে তাহাদের সবাইকে হত্যা করিয়া আপনার সিংহাসন নিষ্কণ্টক করিয়া দিতেছি—আপনি সিংহাসনে চাপিয়া বসুন—দেখি কোন্ শালা কি করে।

"কিন্তু রাম কোন কথাই মানিলেন না।"

এরপর থেকে আসল ডায়ারি আরম্ভ। দুটি বড় বড় কিস্তি দুমাস ধরে

বেরিয়েছিল, কিন্তু বন্ধ করতে হল দুটি কারণে। প্রথম কারণ বাংলার জনসাধারণ বাল্মীকির রামায়ণ একেবারে মানে না, কৃত্তিবাসী রামায়ণ মানে। দ্বিতীয় কারণ, বর্ণনা আধুনিক ভাষা ও ভঙ্গিতে করা হয়েছিল, ধর্মে সমর্পিতপ্রাণ দেশের পক্ষে তা অগ্রাহ্য হতে বাধ্য। এদেশে অধার্মিক লোকও যে দুএকজন আছেন, তার প্রমাণ পাওয়া গেল অতুল বসুর কথায়। তিনি বার বার আমাকে দুঃখ করে বলেছিলেন, 'ওটা বন্ধ করলেন কেন, আমার খুব ভাল লাগছিল।

এক সময়ে শিল্পীদের সম্পর্কে পরপর কয়েকটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম আগে বলেছি। দেবীপ্রসাদ আমাকে লিখেছিলেন শিল্প বিষয়ে আরো লিখতে। অতুল বসু বিষয়ে লেখার একটা উপলক্ষ এলো। অনেকের মতে তিনি ইউরোপীয় ভঙ্গিতে ছবি আঁকেন। অর্থাৎ পোরট্রেটও "ভারতীয়" শিল্প-রীতির হওয়া চাইই এই তাঁদের মত। আমি নিজে এ বিষয়ে সংস্কারমুক্ত। অতুল বসু সম্পর্কে লেখার প্রেরণা পাওয়া গেল প্রবাসীতে (বৈশাখ ১৩৫৮) প্রকাশিত একটি রচনা থেকে। তৎক্ষণাৎ কলম নিয়ে বসা গেল। এই প্রবন্ধের একস্থানে ছিল "ভারতীয় নিজস্ব চিত্রের ভাষাকে বর্জন করা দেশপ্রীতির বিরুদ্ধে মহাপাপ।" এই 'মহাপাপ' কথাটা যেমন আমাকে বিচলিত করল, তেমনি 'ভারতীয় নিজস্ব চিত্রের ভাষা' আমার কাছে যুক্তিহীন বোধ হল।

আমি অতুল বসু সম্পর্কে লিখতে গিয়ে প্রথমে এই 'ভারতীয় নিজস্ব চিত্রের ভাষা' বলতে যে অস্পষ্ট এক ধারণার সৃষ্টি হয় তা ভেঙে দিতে চেষ্টা করলাম। ভাবলাম যুক্তির পথে চললে এই কথার বিরুদ্ধে কতদূর যাওয়া যায় তা দেখব। এবং এভাষা বর্জন করে আমাদের শিল্পীরা কে কে মহাপাপী হয়েছেন, এই প্রসঙ্গে তাও দেখা যাবে। আমার রচনাটির অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি।

"শিল্পী অতুল বসু সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে প্রথমেই হয়তো প্রথা মতো বলা উচিত তিনি ইউরোপীয় ভঙ্গিতে ছবি আঁকায় দক্ষ। অর্থাৎ তাঁর ভাষা ইউরোপীয়, মাতৃভাষা নয়।

"কিন্তু একথা বললে একটি অতি জটিল প্রশ্নকে এড়াবার একটি অতি সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। কারণ ভাষার সঙ্গে ছবির রচনা রীতির তুলনা বা উপমা অতি সামান্য দূর পর্যন্ত হয়তো টানা যায়, তারপর তুলনা

অচল হয়। কারণ ভাষা বলতে আমরা মুখের ভাষা বুঝি, যা ধ্বনি মাত্র, কতকগুলি চিহ্নদ্বারা তা লেখাও যায়। চিত্রশিল্পের কোনো ধ্বনি নেই, সবটাই লিখতে হয়, এবং লেখার সময় যে চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তা উপযুক্ত নামের অভাবে ভাষা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু তা মৌখিক ভাষার সমধর্মীরূপে ব্যবহার করতে গেলে ভুল হবেই। অথচ আমাদের দেশে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় গুণী ব্যক্তিরাও 'ভাষা' কথাটি পুরোপুরি মৌখিক ভাষার সমার্থকরূপে ব্যবহার করে চলেছেন চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে।......

"বাংলা দেশের ছবির ভাষা যদি বাংলা অক্ষরে লেখা মুখের ভাষার সঙ্গে তুলনা করা যায় তাহলে নাগরী বা রোমান অক্ষরে বাংলা লিখলে তা আর বাংলা ভাষা থাকবে না। তেমনি বাঙালীর ছবি যদি রেখাপ্রধান না করে শুধু আলোছায়ার মাধ্যমে আঁকা যায় তাহলে সে ছবি বিদেশী ভাষায় আঁকা হবে।

"এ হল অক্ষরে লেখা ভাষার কথা। কিন্তু ভাষা মানে যদি ভঙ্গি হয় তাহলে দেশী ভাষা মানে দেশী ভঙ্গি। অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল এবং গগনেন্দ্রনাথ বিদেশী ভাষার শিল্পী, কারণ তাঁরা তাঁদের অধিকাংশ ছবিতে পার্সপেকটিভ ধর্ম বজায় রেখেছেন। শুধু তাই নয়, গগনেন্দ্রনাথ তো অনেক ছবি শুধু আলোছায়া দিয়েই এঁকেছেন, অতএব তিনি বিদেশী।

ভাষা মানে যদি রং ব্যবহারের রীতি হয়, তাহলে অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ শিল্পীরা চীনা বা জাপানী রীতিতে রং ব্যবহার করায় তাঁদের ছবি মাতৃভাষায় আঁকা ছবি হয়নি। শিল্পের প্রবীণ শিল্প সমালোচক মুখের ভাষার সঙ্গে ছবির ভাষা সম্পূর্ণ সমার্থক করতে চান। তিনি বলেছেন, "ভারতীয় নিজস্ব চিত্রের ভাষাকে বর্জন করা দেশপ্রীতির বিরুদ্ধে মহাপাপ।" কথাটায় কিছুমাত্র গুরুত্ব আরোপ করলেও অবনীন্দ্রনাথ চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে মহাপাপী।

"সাহিত্যের ক্ষেত্রেও বাংলা ভাষা মানে যদি শুধুই বাংলা শব্দের বিন্যাস হয়, তাহলে বাংলা 'মথি লিখিত সুসমাচার' অবশ্যই বাংলা সাহিত্য। যদি ভঙ্গি, রীতি ফর্ম বা স্টাইল হয় তাহলে বঙ্কিমচন্দ্রের নভেল নিঃসন্দেহে বিদেশী, কারণ বাংলা দেশে কখনো নভেল ছিল না। ......বাংলা যাবতীয় নভেল ও ছোটগল্প বাংলাদেশের মহাপাপ।

"ভাষা বলতে যদি আত্মিক দৃষ্টি বা ধ্যান দৃষ্টিজাত দেখার ভাষা হয়, এবং সকল রকম sensuousness শিল্প থেকে বর্জনীয় হয়, তাহলে এদেশের অধিকাংশ চিত্র ও ভাস্কর্য বিদেশী হয়ে পড়ে, সাহিত্য থেকে কালিদাস রবীন্দ্রনাথরূপ মহারথীগণ বাতিল হয়ে যান আধাআধি। মাইকেল মধুসূদনই বা কতখানি থাকেন?

"ভাষা মানে যদি content বা ভাষাধারস্থ বস্তু হয় তাহলে ইংরেজ জীবন নিয়ে বাংলাভাষায় গল্প লিখলেও তা বাংলা সাহিত্য হবে না, এবং ইংরেজী ভাষায় লেখা 'গোবিন্দ সামন্ত' বা 'বেঙ্গল পেজাণ্ট লাইফ'কে বাংলা সাহিত্য বলা চলবে।

"উপমা আরো বিস্তার করলে শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় এই যে, যে চাঁদ ইংরেজকে আনন্দ দেয় তা আমাদের আনন্দ দিতে পারে না, যে মেঘ ইংরেজের ক্ষেত বৃষ্টিতে সরস করে, সে মেঘ আমাদের আকাশে অচল।

"কিন্তু এর শেষ কোথায়? তাছাড়া বিশুদ্ধ দেশী বলে কি কোথাও কিছু আছে?

"······ক্রাফ্‌ট দলগত হতে পারে, আর্ট নয়। আসলে যে শিল্পী নিজের ভাব প্রকাশের বাহন হিসাবে যে রীতিই অবলম্বন করুন, তাই তাঁর রীতি। তার মধ্যে দেশপ্রীতির কথা তোলা শুধু অবান্তর নয়, হাস্যকর।

"······অতএব চিত্রশিল্প বিচারে বিশেষ শিল্পী কোন্ বিশেষ 'ভাষা' তাঁর ভাবরূপের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী মনে করেছেন তা না ভেবে, তা কতখানি সাফল্য লাভ করেছে সেটাই বিচার্য। আর একথা যদি স্বীকার করা যায়, তাহলে অতুল বসুর শিল্পের ভাষা বা জাতিবিচারের প্রশ্ন ওঠে না।······

"অতুল বসু বড় শিল্পী। বড় শিল্পী তাঁর মডেল বা সিটারের স্বভাব বৈশিষ্ট্যটি ধরবার চেষ্টা করেন।

"মানুষের চরিত্র বা স্বভাববৈশিষ্ট্য এমন একটা জিনিস, যা কোনো রেখা বা বর্ণের বন্ধনে বাঁধা থাকে না। তা প্রত্যেক মানুষের আছে তার সমস্ত সত্তায় মিলিয়ে। যার প্রকাশ অনেক সময় গোপন থাকে। ······শিল্পী সেই স্বভাব বৈশিষ্ট্যকে একটি স্থিরচিত্রের মধ্যে ধরতে চেষ্টা করেন। একটি জীবন্ত রূপহীন জিনিসকে রূপায়িত করতে হয় একটি মাত্র ভঙ্গির মধ্যে। যা স্পর্শের অতীত তাকে স্পর্শের অতীত করেই স্পর্শযোগ্য ছবির মধ্যে

ফোটাতে হয়। —প্রতিকৃতির রেখা বা রং ছাপিয়ে তা স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে।……"

এই নৈপুণ্য অতুল বসুর প্রতিকৃতিতে কি সুন্দর ভাবে প্রকাশ পেয়েছিল, এ রচনার অবশিষ্টাংশে তারই বর্ণনা। যুক্তি যথাসম্ভব ঠিক রাখতে চেষ্টা করেছি। এবং বিশেষ একটি পদ্ধতিতে না আঁকলে মহাপাপ হয়, এ কথা আমি মানতে পারিনি।

বিশেষ পদ্ধতিতে সাহিত্য রচনা করতে হবে এমন চাপও এসেছে আমাদের দেশে। এবং সে চাপ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপরে সম্ভবত সবচেয়ে বেশি দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে আমি আমার 'আধুনিক বাঙ্গ পরিচয়' নামক পুস্তকে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

আমার প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পর অতুল বসু লিখেছেন—

৭৪ বনডেল রোড
বালীগঞ্জ, কলিকাতা-১৯
১০।৬।৫১

প্রিয়বরেষু,

এইমাত্র যুগান্তর হাতে পেয়ে আপনার লেখা আমরা উভয়ে পড়ে ফেললাম। এরকম বিচার প্রধান লেখা এদেশে কখনও ছবির সম্পর্কে পড়েছি বলে মনে হয় না। সাহিত্য দর্শন নিয়ে বিচার হয়, এমন কি এ সম্বন্ধে popular articleও একটা স্টাণ্ডার্ড বজায় রেখে চলে, কিন্তু কেন যে ছবি ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে আমাদের কালচার-কদলীবৃক্ষের এমন খানায় প'ড়ে প'চে যাওয়ার অবস্থা ঘটে তা ভেবে দেখবার নিতান্ত দরকার হয়েছে।

আপনি যে লিখেছেন, "যা স্পর্শের অতীত তাকে স্পর্শের অতীত করেই স্পর্শযোগ্য ছবির মধ্যে ফোটাতে হয়"—এত অল্প কথায় এত বিস্তারিত import প্রকাশ করা বাংলায় কেন, ইংরেজীতেও পড়িনি।

আপনার রচনা সার্থক, আমি তার উপযুক্ত বাহন কিনা তা পরে বিবেচ্য। তবে যে দৃষ্টি ভঙ্গির আপনি advocacy করেন, তা এ জীবনে তো ছেড়েই দিন, পর জীবনেও দেখবেন কিনা সন্দেহ।

গৃহিণী আপনার তোলা আমার ফোটোর এক কপির জন্য দাবী জানাচ্ছেন।……

আপনাদেরই শ্রীঅতুলচন্দ্র বসু

আগে উল্লেখ করেছি শিল্পীদের সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। এই পর্যায়ে অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লেখাটি পড়ে অতুলচন্দ্রের খুব ভাল লেগেছিল। তারপর রবীন্দ্রশিল্প প্রসঙ্গে আমাদের শিল্পচিন্তাকে যুক্তির পথে চালনা করতে চেয়েছিলাম। চিন্তার গোঁড়ামি ভেঙে দিয়ে সর্বজাতীয় শিল্পের মধ্যে যে টুকু উপভোগ্য, তা চিনিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলাম। এবং তাতে যে অনেকখানি সফল হয়েছিলাম তার প্রমাণ পেয়েছিলাম শিল্পীদের অভিনন্দন পেয়ে। ভোলা চাটুজ্জে, কালীকিঙ্কর, গোপাল ঘোষ, সূর্য রায়, আমার কাছে এসে তাঁদের খুশি হওয়ার কথা জানিয়ে গিয়েছিলেন। অতুল বসু লিখলেন—

৭৪ বনডেল রোড,
কলিকাতা-১৯
৩।৬।৫২

প্রিয় পরিমলবাবু,...

...রবীন্দ্রশিল্প লিখতে গিয়ে আপনি তো শিল্পসাগর মন্থন করে তুলেছেন দেখছি, কী অসাধারণ খাটুনি খাটতে হয়েছে বেশ বুঝতে পারছি।

'আলোর বাণী' [তৎকালীন প্রদর্শিত সোভিয়েট শিল্প প্রদর্শনী] উপলক্ষে আপনার তো আমার কথা মনে পড়ল, আমার মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথের একটি লাইন "তোমার নাম জানিনে সুর জানি/তুমি শারদ প্রাতে আলোর বাণী।" এত ভালো কি করে লিখলেন বলুন তো? বাস্তবিক আপনার মত যুক্তিবাদী লেখা আমাদের দেশে কমই লেখা হয়েছে। এক সময় ছিল এইরকম একটি প্রবন্ধ নিয়ে সাড়া পড়ে যেত, এখন তো চিত্রজগতে সাড়া পাই শুধু ফি সপ্তাহে এগজিবিশনের নিমন্ত্রণ লিপি পেয়ে। ...সোভিয়েট আর্ট এগজিবিশন উপলক্ষ্যে আমাকেও কিছু না কিছু করতে হয়েছে 'স্বাধীনতায় তিনকলম, তাছাড়া বৈশাখের 'পরিচয়' ও 'চতুষ্কোণ'এ কিছু মতামত প্রকাশ করেছি।...

আপনাদের শ্রীঅতুলচন্দ্র বসু

১৯৪৭-৪৮ যতদূর মনে হয়, একদিন অতুল বসুর সঙ্গে পথে দেখা। তৎক্ষণাৎ আর্ট স্কুলের এগজিবিশনে নিমন্ত্রণ পাওয়া গেল। আমি সবসময়েই পত্রের নিমন্ত্রণ ও পথের নিমন্ত্রণ বেশি পছন্দ করি, অতএব কথা দিলাম, যাব। কিছুক্ষণের জন্য রঙের রাজত্বে বসে থাকার মধ্যে একটা আনন্দ আছে। বসে থাকা অবশ্য হয় না, প্রদর্শনীতে ঘুরে বেড়ানোই দরকার।

প্রদর্শনীতে পদচারণায় রত ছিলাম, সঙ্গে অতুল বসু ছিলেন। একখানা বেশ বড় ছবিই বলা যায়, একটু উপরের দিকে টাঙানো ছিল, একটু স্বতন্ত্র মনে হল। অতুল বাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, এটি কার আঁকা? বেশ ভাল লাগছে।

অতুলবাবু তৎক্ষণাৎ শিল্পীকে ডেকে বললেন, শানু, তোমার ছবি পরিমল-বাবু প্রশংসা করছেন। পরিচয় হল, নাম শান্তা মজুমদার, শানু নামে বেশি পরিচিত, পরে শুনলাম শিল্পী নীরদ মজুমদারের বোন। শানুর সম্পর্কেও যুগান্তরে লিখেছিলাম, কারণ তার ঐ একখানা ছবি আমার পক্ষে তার অন্যান্য ছবির সঙ্গে পরিচয়ের পাসপোর্ট রূপে কাজ করেছিল। তার অনেক স্কেচ আমি দেখে তার শিল্পী হবার উৎসাহ এবং ক্ষমতা বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছিলাম। শানু শক্তি ও গতির ছন্দের সঙ্গে পরিচিত হতে রেসকোর্সে গিয়ে ছুটন্ত ঘোড়ার যে সব স্কেচ করেছিল তাতে প্রকৃত শিল্পীর উদ্দীপনা ছিল।

শানু মজুমদার শানু লাহিড়ী হল. তারপর মাতৃত্বে উন্নীত হল, এবং ১৯৫৫ পর্যন্ত তার উৎসাহ ছিল, আমাকে লেখা তার অনেক চিঠিতে তার প্রমাণ পেলাম। কিন্তু এদেশে শিল্পীদের তখনো পর্যন্ত আত্ম প্রকাশের সুযোগ ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। এখনো হয়তো তাই। তবে শানুর তৃপ্তি সম্ভবত দু একটি এগজিবিশনেই শেষ হয়েছিল মনে হয়। তারপর তার সার্থকতা ও তৃপ্তি সম্ভবত অন্যপথে। নারীত্বের মহিমাতেই পূর্ণ হয়েছে তার জীবনের উদ্দেশ্য অনুমান করি।

গোপাল ঘোষের কয়েকখানি চিঠি খোলা আছে সামনে। স্পষ্ট বোঝা যায় কথার চেয়ে রেখা তার সহজে আসে। শানু মজুমদারও আমাকে সচিত্র চিঠি লিখেছে কয়েকখানি। গোপাল ঘোষও তাই। কথা অল্প ছবি বেশী। অক্লান্ত হাত। এ বিষয়ে কালীকিঙ্করের সঙ্গে তার অনেকখানি মিল আছে, যদিও দুয়ের প্রকৃতি বিভিন্ন। ইতিহাসের দিক থেকে অসুবিধা সৃষ্টি হয় কারণ কালীকিঙ্কর নামহীন তারিখহীন ছবি এঁকে যায়। ভবিষ্যতের গবেষক-গণ মুশকিলে পড়বেন, যদি শিল্পের ক্ষেত্রে কালীকিঙ্করকে কোনো স্থান দিতে চান তার ছবি সমেত। কিন্তু গোপাল ঘোষ প্রতি ছবিতে নাম ও তারিখ লেখা



গোপাল ঘোষ

ফোটো : পরিমল গোস্বামী, ১৯৫০

এমন অভ্যাস করে ফেলেছে যে তা ঐ ছবির রেখার সঙ্গে তুলির টানের সঙ্গে রঙের সঙ্গে কমপোজিশনের সঙ্গে একসুরে বাঁধা। মিলিয়ে থাকে ছবির অঙ্গরূপে ছন্দরূপে।

গোপালের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় কিছু কৌতুককর। ১৯৪৬ কিম্বা ৪৭ হবে। একখানা মাসিক পত্রে তার আঁকা ছবি দেখে তার ছবি ছাপব অভিপ্রায়ে মাসিক অফিসে জানিয়ে রাখি, গোপাল ঘোষের ছবি ছাপতে চাই, ওখানে এলে যেন তাকে একথা জানানো হয়। গোপাল ঘোষকে কখনো আগে দেখিনি, তার ছবির সঙ্গেও পরিচয় ছিল না, সেও তখন খুব খ্যাতি লাভ করেনি। আমার ভাল লেগেছিল বলেই এই আহ্বান।

একদিন যখন পূজার ছবি সব ঠিক হয়ে গেছে, এমন অবস্থায় হাতে একটি প্যাকেট নিয়ে গোপাল এলো। আমি এই অপরিচিত লোকটিকে বললাম দেরি হয়ে গেছে। তখনো তাকে চিনি না। আগন্তুক প্যাকেট হাতে রওনা হবার মুখে বলল, আমার নাম গোপাল ঘোষ, আপনি আমাকে আসতে বলে-ছিলেন। শুনে স্তম্ভিত। বড্ড দেরিতে এভাবে আসায় আমি বিশেষ লজ্জিত ও দুঃখিত হয়েছিলাম।

পরে তার ছবি অনেক ছেপেছি এবং প্রথম দিনের অদ্ভুত পরিচয়ের দরুন যে দুঃখ পেয়েছিলাম, অথবা সে পেয়েছিল, পরবর্তী বন্ধুত্বে তার ক্ষতিপূরণ হয়ে গিয়েছিল। আমি তার ৯৮ নম্বর বালিগঞ্জ গার্ডেনস-এর বাড়িতে একাধিক বার গিয়ে তার ছবির পরিবেশে স্বাস্থ্য ভাল করে এসেছি। সে এখন আর্ট কলেজের শিক্ষক, বহুকাল পরে আমার অনুরোধে সে ১৯৬৮তে আমার কাছে এসেছিল। আমার পৌত্রী শ্রীমতী হৈমন্তীর বয়স তখন পাঁচ বছর। তার পেনটিং ও ড্রয়িং তাকে দেখানোই ছিল আমার উদ্দেশ্য। সে দেখে শুনে হৈমন্তীর রঙের বাক্‌স নিয়ে তারই একনম্বর তুলিতে একখানা রঙীন দৃশ্য এঁকে তাকে উপহার দিয়ে গেল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

শশিশেখর বসু বাংলা ভাষায় লিখতে আরম্ভ করেন ১৯৫২ সনে, প্রায় আশি বছর বয়সে। আমিই তাঁকে একাজে প্রবৃত্ত করাই। আগে ইংরেজীতে লিখতেন। আমার সঙ্গে পরিচয়ের অব্যবহিত আগে মণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দার সম্পাদিত বিহার হেরালডে লিখতেন, ESOBSS এই ছদ্ম নামে।

বাংলাভাষায় তাঁর একখানি মাত্র বই প্রকাশিত হয়েছে, শেষ বয়সের কয়েকটি লেখার সংকলনরূপে। এই বইয়ের ভূমিকা আমি লিখে দিয়েছিলাম, রাজশেখর বসুর অনুরোধে। বইয়ের নাম 'যা দেখেছি যা শুনেছি'—প্রকাশক মিত্র অ্যাণ্ড ঘোষ।

কিন্তু বইয়ের বিষয় সাধারণ হলেও যে সরল সরস এবং সকৌতুক ভঙ্গিতে তা লেখা, তেমন লেখা আমার তো মনে হয় সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষভাবে অভিনন্দনযোগ্য ছিল, কিন্তু একখানি মাত্র বই লিখে বর্তমানকালে খ্যাতিলাভ করা দুঃসাধ্য। শশিশেখরের রচনা কেমন ছিল তা বুঝতে হলে আগে তাঁর সংস্কারহীন শিশুসুলভ মনটির সঙ্গে পরিচয় থাকলে ভাল হয়। আমাকে লেখা তাঁর কয়েকখানি চিঠি ও তাঁর রচনার কিছু উদ্ধৃতি দিলেই তাঁকে ভাল করে চেনা যাবে।

মণি সমাদ্দার পাটনা থেকে আমাকে বিহার হেরালড প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত পাঠাত, তাতে ছদ্মনামধারী শশিশেখরের লেখা পেলেই আগে পড়তাম। খুব দুঃসাহসিক কৌতুক রস—মনের কোথাও কোনো বাধা নেই, 'ইনহিবিশন' নেই। অবশ্য ইংরেজীতে লেখা বলেই ততটা বেমানান হত না। কিন্তু সেই জাতীয় লেখা তিনি বাংলাতেও লিখতে চাইলে আমি বাধা দিলাম। বাংলায় সেরকম চলে না। তাঁকে ভাল করে বোঝাবার পর, এবং মাঝে মাঝে তাঁর লেখা থেকে অংশবিশেষ বাদ দিয়ে ছাপার পর তিনি নিজেই আর সেরকম লিখতেন না। অন্তত আমার কাছে তেমন লেখা পাঠাতেন না।

তাঁর অনেকগুলি চিঠিতেই আমাকে লিখতেন—

"ভাই, এবারের লেখা একদম নিরামিষ।" একখানা চিঠিতে লিখছেন,

"ভাই পরিমল, এলাহাবাদের একটা প্রবন্ধ পাঠালাম। সাদাসিদা, একদম নিরামিষ, আঁশগন্ধ নাহি তায়। কেবল শহরটার কথা......"

আশীর্বাদক দাদা শশী

এই চিটি বড়ই করুণ—(তারিখ ১৯।১২।৫৪) ভাই পরিমল, আশাকরি সকলে ভাল আছ। আমি প্রায় ভাল।

"ভূমিকম্প" পাঠালাম। একদম নিরামিষ। ..... ভাই একটু লাইসেন্স না দিলে আমার নাম ডুববে। এ প্রবন্ধে এসব কিছু নেই। ....

তোমাদের শশিশেখর বসু

'ভাই, একটু লাইসেন্স না দিলে আমার নাম ডুববে' এমন আকৃতিতে বেশ একটুখানি কৌতুকের আভাসও আছে। ইংরেজীতে লাইসেন্স দিয়েছিল মণি সমাদ্দার! সে লাইসেন্স বাংলা বচনায় সম্ভব হল না। এজন্য অবশ্য তাঁর দুঃখ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। একবার মাত্র লাইসেন্স দিয়েছিলাম। শারদীয় সংখ্যা যুগান্তরে, যদিও সেই লেখা থেকেও অনেক বাদ দিতে হয়েছিল। প্রবন্ধটির নাম 'উপন্যাস প্রসঙ্গে'। আংশিক নমুনা দিচ্ছি।

"মিথিলা ও উত্তর প্রদেশের জেলা বিশেষে সাহিত্যে বা (স্কচ, স্প্যানিশ গানের মতন) সঙ্গীতে চুম্বনের স্থান নেই। থিয়েটারে ৫০ বছর পূর্বে যখন গোবিন্দলাল জলে ডোবা রোহিণীর মুখে ফুঁ দিতেন, তৌরহুতিয়া দর্শকরা বাঙ্গালী দর্শককে ঘৃণায় বলতো—"কেহন গন্ধানালাকি পোঁথি লিখল তোহর বঙ্কিম ? ছোঁড়ায়াকে মুহাসে ওঠ লাগাকর বাঙ্গালীবাবু হাওয়া ফুকত্, রাম !

"অথচ এত ঘৃণা করেও সেই একই দল প্রতি পারফরম্যানসে যেত, আমরাও প্রতি পারফরম্যানসে রোহিণী দেখতাম রাগ না করে। বাড়িতে দর্শকরা রোজই ফুঁ দিচ্ছেন, কিন্তু পরের ফুঁ দেখা চাই। একেই ফ্রয়েডিয়ান পণ্ডিতগণ 'পীপিং মেনিয়া' বলেন। আড়িপাতার সঙ্গে প্রায় এক, এই মহাপাপ।

"শেলী এরকম লোককে 'মেল প্রুড' নাম দিয়েছেন তাঁর 'দি চেনচি' নাটক পড়ে জনকয়েক বালিকার পিতা রুদ্র মূর্তি ধারণ করেছিলেন এই বলে যে, এ রকম অস্বাভাবিক পিতা জন্মায় নাই। অথচ দেখা যায়, এ কল্পনা নয়।

"বঙ্কিমের মনে রিপ্রেশন বা অবদমন দ্বিধা লক্ষ্য হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট ব'লে লজ্জা আছে। ভয়ে ভয়ে ভূমিকা ক'রে প্রেমের রহস্য বৃত্তান্ত লেখেন 'গ্রন্থকার

প্রাচীন, লিখিতে লজ্জা নাই' [অর্থাৎ হচ্ছে।] মার্জিত-রুচি পাঠক পড়া বন্ধ করবেন, আ ছিছি, "ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে চুম্বন করিলেন।"......

"নিজের পত্নীকে ব্রজেশ্বর কিস্ করছে, তাতে বঙ্কিমের এত লজ্জা!

"...এসব ধোঁয়া ধোঁয়া কথা পাঠকের প্রত্যাশা সফলীকৃত করে না, যেমন সাদা কথা—"দৃঢ় বলে দুই হাতে বিনোদিনীকে বক্ষে টানিয়া লইলেন" ক'রে থাকে। ঔপন্যাসিক মনে রাখবেন স্যাকরার ঠুকঠাক, কামারের এক ঘায়ের কাছে কিছুই না। দুটোতে দুরকম আর্ট অবশ্য আছে।

"উচ্চশিক্ষিত পাঠকের কাছে নায়ক নায়িকার ঘুজুঘুজু বাঞ্ছনীয় কিন্তু ঘটনা কম, বাজে কথাবার্তা অতিরিক্ত, পাঠকের ধৈর্য নষ্ট করে।......

"খাপছাড়া কথা অনেক পাঠক চাননা। কিছুদূর গিয়ে গ্রন্থাকার থেমে গেলেন, ভাবেন পাঠক অনুমান করে নেবে, আর্ট হবে। এ আর্টে অনেক কুঁড়ে পাঠকের মেহনত হয়, ভাবেন ঔপন্যাসিক যখন গাজিয়াবাদ অবধি নিয়ে গেলেন, তখন দিল্লী দেখালেন না কেন?..."

বড় প্রবন্ধের অংশ উপহার দিলাম। চিন্তায় কোথাও বাধা নেই। শশিশেখর প্রকৃতই ছিলেন সরল ও কিছু শিশু প্রকৃতির, ছলনাতেও পটু ছিলেন। রাজশেখরের ছেলেবেলা বিষয়ে রচনা চাওয়ার পর সে কথাটা বোঝা গেল। কি ভীষণ ভয় ভাইয়ের যদি পছন্দ না হয়? পছন্দ না হওয়ার কারণ বড়দাদা তাঁর সহোদর বিষয়ে প্রবন্ধ লিখছেন, রাজশেখরের এজন্য যদি আপত্তি হয়! বালকের মতো ভয়ে কাতর। এবং বালকের মতোই ছলনা। এ ঘটনা আমার কাছে ভীষণ ভাল লেগেছিল। কি করে ছাপার আগে সবটা গোপন রাখা যায়, সে বুদ্ধিও আমিই জুগিয়ে দিয়েছিলাম। সফল পরিকল্পনা, বৃদ্ধ ভীষণ খুশি! এজন্য আমাদের পরামর্শ সভা বসেছিল। রাজশেখর ঘুণাক্ষরে টের পেলে সব উল্‌টে যেতে পারে। বলেছিলাম রাজশেখরকে জানতে দেব না। কিন্তু দুএকদিনের মধ্যেই শশিশেখরের মন ব্যাকুল হয়ে উঠল! সব ইতিহাসটা বলি। তিনি লিখলেন—

বিবেকানন্দ রোড,

২১-৮-৫৩

গোস্বামী মহাশয়, যদি কোন রকম টের পায়, তাহলে আমাকে বলবে "ছি ছি ক্যানসেল কর।"

তার অনুরোধ শুনতে আমি বাধ্য, সে আমার অনুরোধ রেখেছে অতএব দয়া করে দেখবেন leak না করে। ......প্রণাম

শশী



শশিশেখর বসু

ফোটো : পরিমল গোস্বামী, ১৯৩১

শশিশেখরের হাত-কত পাকা তা তাঁর রচনাগুলি পড়লেই বোঝা যায়। বাংলা লেখা ধরামাত্র সফল হয়েছিলেন তিনি। কৌতুকরসে উচ্ছল ছিলেন সব সময়। আমি যখন অনুরোধ জানালাম, আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ 'বড়দা'—আমাকে 'আপনি' সম্বোধন করবেন না, তখন আমাকে লিখলেন-(৯-৯-৫৩) "আপনি ব্রাহ্মণ, আমাদের প্রণম্য। আরো কিছুদিন ইয়ারকি দিয়ে তবে তুমি বলবো।"

শেষের এই একটি কথাতেই সবখানি চরিত্র প্রকাশিত। আমার একখানি বইয়ে 'অভিনন্দন' নামক একটি গল্প ছিল। তা পড়ে তিনি খুব পছন্দ করে তা ইংরেজীতে অনুবাদ করার অনুমতি চেয়েছিলেন। শেষে অনুবাদ করে আমাকে দেখিয়ে বেহার হেরাল্ডে ছাপিয়েছিলেন। ঐ গল্পে তাঁর মনের মতো কৌতুক ছিল। এক কবিকে সভায় বিরাট অভিনন্দন জানিয়েই কবিকে শোভাযাত্রায় বার করে দিয়ে সভার উদ্যোক্তাগণ আড়ালে বসে কবির বিরুদ্ধে যাচ্ছেতাই বলতে আরম্ভ করলেন। একজন বললেন "ও শালা আবার কবিতা লিখতে জানে নাকি?" অথচ সভায় এঁরাই বাংলাভাষায় যত প্রশংসাবাক্য আছে সব উচ্চারণ করেছেন কিছুক্ষণ আগে।

শশিশেখর 'অভিনন্দন' অনুবাদ করে বেহার হেরাল্ডে দিলে, কত লোক পড়বে, কোন্ কোন্ প্রখ্যাত লোক ঐ কাগজের পৃষ্ঠপোষক, কে স্বত্বাধিকারী সমস্ত জানিয়ে আমাকে চিঠি দিয়েছিলেন। আমার কাছে তাঁর প্রায় এক শ খানা চিঠি আছে, কবিতায় লেখা চিঠিও আছে।

রাজশেখর বসু শশিশেখরকে খুব ভালবাসতেন। প্রতি সপ্তাহে একবার করে তিনি বিবেকানন্দ রোডে আসতেন বকুলবাগান রোড থেকে, শুধু দাদাকে দেখতে। শশিশেখর 'আম' বিষয়ে একটি প্রবন্ধ দিয়েছিলেন আমাকে, তা শুনে রাজশেখর ছোট্ট একটি কাহিনী দাদাকে পাঠিয়েছিলেন, শশিশেখরের প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করতে। লিখছেন—

My dear Parimal, ৩।৫।১৯৫৩ (?)

……Hearing this morning that you are going to print my mango article, Rajshekhar has sent me a little mango story which I herewith send If time and space permit kindly insert it anywhere in the middle

Yours affectionately

শশিশেখর বসু

টাইপরাইটার নিয়েই প্রায় বসে থাকতেন। আমার কাছে যত চিঠি লিখেছেন, তার অনেকগুলি পুরো ইংরেজী, কতক আধা ইংরেজী আধা বাংলা।

মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ি থেকে (তখন দূরত্ব ছিল পাঁচ মিনিটের) রান্না করে পাঠানো হত। একদিন পিঠে খেয়ে কবিতায় চিঠি দিয়েছিলেন। আর একদিন পোলাও খেয়ে লিখছেন—

183B Vivekananda Road
Cal-6. 23-12-53

My dear Parimal,

কষ্ঠা দেওয়া পোলাও খুব গরম গরম খেলাম। অতি উত্তম খেতে। চিরকাল বাঙাল রান্না ও ভাষাকে ঠাট্টাই করেছি, যদিও আমরা উলোর বাঙাল, ও আমাদের ভাষা "গোট্‌টো কমনে গেল, মুড়ি প্যালাম না" এই রকম দেশের। বদলে গেল মতটা ছেড়ে দিলাম পথটা।

Yours affectionately
Dada শশী

শশিশেখরের চরিত্র তাঁর এইসব লেখার ভিতরেই প্রায় সবখানি প্রকাশিত তবু আরো কিছু বাকি আছে।—

একটা চিঠিতে লিখেছেন—যেন নিজে নিজের লেখা নিয়ে ফেরি করছেন এইভাবে—

183-B, V. Road
28|2

ভাই পরিমল, 'চাই প্রবন্ধ? গল্প লিবে গো?' 'এই গল্পওয়ালা, এই সিধে সিঁড়ি। নামা তোর ঝুড়ি। দেখি এ গল্পটা কেমন, পাঠকেরা পছন্দ করবে কিনা। জাঁকড়ে রেখে যা এই "ষোল আনা" গল্পটা। সাতদিন পরে ফেরৎ নিয়ে যাস পছন্দ না হলে।' 'যে আজ্ঞে মশায়।'.........বড়দা

আরও একখানা চিঠি—

20-7-54

ভাই পরিমল,......আশাকরি ভাল আছ। আমার পূজার প্রবন্ধ 'মুচিপড়া' মুচিপাড়া পাঠালাম।......নরেন মুখার্জি (সচিত্র ভারত) রাজশেখরের ক্লাসমেট। রাজশেখরের অনুরোধে তাঁকে দিয়েছি।

তোমার হাতে 'বেল পাকলে' পুঁজি ছিল। তাই 'কলা' 'আনারস' স্থানাভাব ভেবে পাঠিয়ে বিরক্ত করিনি। আমিতো সপ্তাহে তিনটে লিখতে পারি। স্থান কৈ? কাজেই খদ্দের এলে বেচে দিই। 'নগদা মজুর'।

তোমার অমনোনীত 'নেতাজির বার্তাবহ', 'ষোলআনা ডুবল' ওরা সেনসর করে ছেপেছে। ওদিগে তো আগে দিইনি। 'পত্নীপ্রেম' নিরামিষ নয় বলে তোমাকে দিইনি। যখন পড়বে তোমার নিজের ভাল লাগবে, বলবে "বা রে বুড়ো!"

—তোমার শশী

এই চিঠিখানার "বা রে বুড়ো!" দেখতে ছোট, কিন্তু একটি মানুষের (যাঁর জন্ম ১ভাদ্র ১২৮১, মৃত্যু ১৪ ফাল্গুন ১৩৬১, অর্থাৎ যখন প্রায় আশি বৎসর বয়স) মস্ত বড় পরিচয় বহন করছে নাকি? লেখা অন্যকে দেওয়াতে পাছে আমি কিছু মনে করি, সেই জন্য কত কৈফিয়ৎ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

রাজশেখর বসু তাঁর দাদার চেয়ে কিছু ভিন্ন প্রকৃতির। তাঁর কৌতুক কলমে বেশি, ব্যবহারে নয়। ব্যবহারে কিছু গম্ভীর। তবে স্নেহের দিকটা খোলা, দাদার মতোই। মনে রাখতে হবে তিনি বারো-তেরোটি বিড়াল পুষতেন।

রাজশেখরের হাস্যরস সংযত ভাষায়। তাঁর অধিকাংশ রচনাই ব্যঙ্গের ভিত্তিতে হাস্যরস, তবু মাঝে মাঝে তিনি তাঁর স্বভাবের বাইরে গিয়ে তীব্র ব্যঙ্গ লিখেছেন। কিন্তু চিঠিতে তিনি সব সময়েই সংযত।

শশিশেখর কেন 'রাজশেখরের বাল্যকাল' লিখতে এত সঙ্কোচ বোধ করেছিলেন, তা বোঝা গেল শশিশেখরের বইয়ের (যা দেখেছি যা শুনেছি) ভূমিকা লিখতে গিয়ে। এই ভূমিকা রাজশেখর আমার কাছ থেকে চেয়েছিলেন। আমি এইভাবে আরম্ভ করেছিলাম—

ভূমিকা

"গত ৯ই অগস্ট তারিখে লেখা শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসুর একখানি চিঠি পেলাম। তিনি লিখেছেন, 'যা দেখেছি যা শুনেছি' এই নাম দিয়ে দাদার একটি রচনা-সংগ্রহ ছাপা হচ্ছে। প্রকাশক মিত্র আশু ঘোষ। আপনার উৎসাহেই দাদা বাংলা লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, সেজন্য আমার ইচ্ছা তাঁর বইয়ের একটি ভূমিকা আপনি লিখে দেন।

"শশিশেখরের কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে আমি যে স্নেহ লাভ করেছি তারই ঋণ এতে সামান্য শোধ করতে পারব এই আশায় এই আদেশ শিরোধার্য করলাম।" ইত্যাদি

কিন্তু আমার ভূমিকা পেয়ে রাজশেখর আমাকে জানালেন, দাদার বইয়ের ভূমিকায় তাঁর নাম না থাকাই বাঞ্ছনীয়। অতএব তিনি আমার লেখা ভূমিকা থেকে ঐ অংশ বাদ দিয়ে এবং প্রয়োজনীয় অন্য কিছু যোগ করে আমার কাছে তা অনুমোদনের জন্য পাঠালেন। আমার বলবার কিছুই ছিল না। শুধু বোঝা গেল শশিশেখর সম্পর্কে তাঁর ভাই আমাকে ভূমিকা লিখতে বলেছেন, একথা বাইরের কাউকে জানাতে চান না। এবং শশিশেখর তাঁর ভাই সম্পর্কে কিছু লিখবেন এতেও তাঁর আপত্তি হবে অনুমান করে শশিশেখর ভয় পেয়েছিলেন। রাজশেখর যদি বলেন 'দাদা, ক্যানসেল কর,' তাহলে ঐ মূল্যবান রচনাটি আর ছাপাই হত না।

তাঁর চিঠিতে প্রয়োজনীয় কথার বেশি একটি কথাও থাকে না, অবশ্য ব্যতিক্রম আছে। আমার কাছে তাঁর অনেক চিঠি আছে, প্রায় কুড়ি খানা। তা থেকে তিনচার খানা মাত্র এখানে উল্লেখ করব। শশিশেখরের বইয়ের ভূমিকা লেখা প্রসঙ্গে একখানির পরিচয় দিয়েছি।

রাজশেখরকে খেজুর গাছের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। ভিতরে কোষে কোষে রস, কিন্তু বাইরে থেকে বোঝবার উপায় নেই। কেটে, চেঁচে, বুকে হাঁড়ি বেঁধে, তবে তা থেকে রস সংগ্রহ করতে হয়। অবশ্য চিঠিতে অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে কৌতুক-রসের অবতারণা করেছেন কিনা আমার জানা নেই। কোনো কোনো চিঠিতে আমার প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন। সেখানে হৃদয়ের স্পর্শ। একখানি চিঠি এই—

৭২ বকুলবাগান রোড,
কলিকাতা-২৫
৪।৭।৫৭

প্রীতিভাজনেষু, আপনার ২৯।৬এর চিঠি পেয়েছি। আপনার স্ত্রীর অসুখের খবর অনেকদিন থেকে পাচ্ছি, কিন্তু উনি কতটা পীড়িত তা জানতাম না। চুপ করে থাকা ছাড়া আর উপায় নেই। মহাভারতের সেই শ্লোক সুখংবা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদিবাপ্রিয়ম্‌ প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত হৃদয়েনাপরাজিতঃ (সুখ বা দুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয়, যা পাবে অপরাজিত হৃদয়ে মেনে নাও) এর চাইতে ভাল উপদেশ নেই। আপনারা উভয়ে শান্তিলাভ করুন এই কামনা করি।…

আপনার রাজশেখর বসু

পরিভাষা কিংবা ভাষার ব্যবহার নিয়ে রাজশেখরের সঙ্গে দু-একবার আলোচনা হয়েছে। বাংলাভাষায় অ্যাটম ও মোলিকিউলের জন্য দুটি পৃথক বাংলা শব্দ না হলে বাংলায় বিজ্ঞান পড়ানোই সম্ভব হতে পারে না, এই বিষয়ে রাজশেখরের সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছিল। অ্যাটম ও মোলিকিউলের পৃথক ধারণা যে যুগে ছিল না, সে যুগে অণু দুই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে দুই অর্থে এক শব্দ অচল। কিন্তু তবু অনেকেই অ্যাটমিকের বাংলা আণবিক লিখতে থাকায় বাংলাভাষায় বিজ্ঞান প্রচার অসম্ভব হয়ে উঠেছে। পরমাণু ও অণু যথাক্রমে অ্যাটম ও মোলিকিউল, এই দুটি ইংরেজী শব্দের প্রতিশব্দ রূপে স্বীকার করতেই হবে এই ছিল আমার প্রধান বক্তব্য। রাজশেখরও সে কথা মানলেন এবং আমাকে ৪।৯।৫৫ তারিখে লিখলেন—

"আধুনিক পরিভাষায় atomic পারমাণবিক বা পারমাণব। আমিও তাই লিখি। কিন্তু সমস্ত সংস্কৃত অভিধানে অণু আর পরমাণু সমার্থক। বৈশেষিক দর্শনের 'অণুবাদ' একরকম atomic theory। আধুনিক বিজ্ঞানে পরমাণুরও পরমত্ব লোপ পেয়েছে।"

এই প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয়ের আলোচনা আছে ঐ একই চিঠিতে। আমি রাজশেখরকে লিখেছিলাম—চলন্তিকায় পরিভাষা বিভাগে উদ্ভিদবিদ্যা শিরোনামে Bacillus ও Bacteria এই দুটি শব্দ আছে। এর একটি একবচন অন্যটি বহুবচন। এটি আমাকে আমার বিজ্ঞানী বন্ধু সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী প্রথমে দেখিয়ে দেয়। আগে দেখা ছিল না। সেই অনুযায়ী তাঁকে লিখেছিলাম, ব্যাসিলাস-এর সঙ্গে ব্যাকটিরিয়াম লিখলে সমতা রক্ষা হত মনে হয়। তার উত্তরে রাজশেখর লিখেছিলেন—

"একটিমাত্র বোঝাতে bacterium, কিন্তু সাধারণ প্রয়োগে সর্বত্র জীবাণুর সংঘ (colony) অর্থে bacteriaই চলে। ইংরেজী technical dictionaryতে bacteriaই আছে। বাংলাতেও ব্যাকটিরিয়া চলে।"

কিন্তু তবু এই ব্যাখ্যা আমার মনঃপূত হয়নি। চেমবার্স এবং অন্য একখানি তিন খণ্ডের অভিধানে 'ব্যাসিলাস' (একবচন) দিয়েই শব্দের আরম্ভ। কিন্তু অন্যটির বেলায় প্রথমেই ব্যাকটিরিয়া দিয়ে আরম্ভ পরে অবশ্য একবচন ব্যাকটিরিয়াম উল্লেখ করা হয়েছে। এবং এতে মনে হয় ব্যাকটিরিয়া কথাটাই সাধারণতঃ প্রচলিত, কিন্তু College Standard Dictionaryতে প্রথমেই যেমন ব্যাসিলাস আছে তেমনি প্রথমেই বাকটিরিয়াম আছে। (বহুবচন দিয়ে আরম্ভ নেই), অতএব সমতার খাতিরে পরিভাষা বিভাগে দুটো শব্দই একবচনে লেখা হলে ভাল হত। কারণ কলোনি অর্থেই ব্যবহৃত হলেও যেখানে ব্যাসিলাস লেখা হচ্ছে, সেখানে ব্যাকটিরিয়াম লেখা অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত। ঐ চিঠি পাবার পর আমি এ বিষয়ে আর আলোচনা চালাইনি।

তবে অ্যাটম পরমাণু অথবা অ্যাটমিক পারমাণবিক এই নির্দিষ্ট প্রতিশব্দ যে বাঙালী সমাজে প্রচার হওয়া দরকার একথা রাজশেখর বসু বুঝেছিলেন। তিনি 'গ্রহণীয় শব্দ' নামক একটি রচনায় (চলচ্চিন্তা, ১৯৫৯) অন্য শব্দ প্রসঙ্গে লিখলেন—

"Atom bomb অর্থে অনেকে আণবিক বোমা লেখেন। এই অনুবাদ ভুল। Atomicএর বাংলা পারমাণবিক। পরমাণু বোমা লিখলে ঠিক হয়। এসম্বন্ধে পরিমল গোস্বামী মহাশয় অনেকবার আলোচনা করেছেন।

আলোচনা যুগান্তরেই বেশি করেছিলাম 'ইতশ্চেতঃ' কলমে, একটি বড় প্রবন্ধ লিখেছিলাম আনন্দবাজার পত্রিকায় (১৬।৫।৬৫), তার আরম্ভটি ছিল এইরকম—

"গত ২১ শে এপ্রিল সকাল আটটায় কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচাবিত পাঁচমিনিট স্থায়ী ঘটনাপ্রবাহ নামক কথিকাটি শুনছিলাম। কথক এই পাঁচমিনিটে প্রায় বিশবার অ্যাটম বম্-এর বাংলা শোনালেন, পালাক্রমে একবার 'পারমাণবিক বোমা' ও একবার 'আণবিক বোমা'।

"ঐ একই তারিখে ওয়াশিংটন থেকে প্রচারিত বাংলা সংবাদ পর্যালোচনা (সন্ধ্যা সাতটায়) উপলক্ষে একটি মেয়ের ও একটি পুরুষের কণ্ঠে কথোপকথন শুনছিলাম। মেয়ে বললেন 'আণবিক' ছেলে বললেন, 'পারমাণবিক'—দুজনেই নিউক্লিযাসের বাংলা শোনালেন দুভাবে।

"দেখলাম বাংলায় অ্যাটম চিন্তার মূঢ়তা সুদূর ওয়াশিংটন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে।......"

দাবদাহ একটি শব্দ যাব অর্থ forest fire, দাব মানে অরণ্য। যেমন মৃগদাব মানে হরিণেব বন। দাবদাহ, দাবানল,—বনে যে আগুন জ্বলে। সে কথা থেকে ক্রমে প্রখর জ্বালা, দাবানলের মতো তাপ, অর্থ এসেছে মনে হয়। তার মানে আসল অর্থ লোকে ভুলেই গেছে। গ্রীষ্মের দাহ না বলে গ্রীষ্মের দাবদাহ, খবরের কাগজে সর্বদা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। রাজশেখর বসু লিখছেন—

৭২ বকুল বাগান রোড, কলিকাতা-২৫

২৩-৯-৫৫

প্রীতিভাজনেষু, আপনার ২১ তারিখের চিঠি গতকাল পেয়েছি। খবরের কাগজে (এবং অনেক নামজাদা লেখকের বইএ) নিরঙ্কুশ বাংলা ভাষাব সৃষ্টি হচ্ছে, তাতে বাধা দেওয়ার শক্তি কারও আছে মনে হয় না। 'কার্যকরী উপায়' 'কলিকাতায় গ্রীষ্মেব দাবাদাহ' (forest fire) ইত্যাদি নিত্য নূতন idiom দেখা যাচ্ছে। দাদার বই [যা দেখেছি যা শুনেছি] পূজোর আগে বার হবে, গজেনবাবু [গজেন্দ্রকুমার মিত্র] এই আশা দিয়েছেন। আপনার কাছে চারখানা বই পাঠাতে বলব।

আপনার রাজশেখর বসু

"কার্যকরী" দিল্লীর রেডিওতে আমি কয়েকবার চিঠি লিখে বন্ধ করিয়েছিলাম। আকাশবাণী থেকে এখন "কার্যকর" বলা হয়, 'আণবিক'ও বন্ধ করিয়েছিলাম চিঠি লিখে। কিন্তু সম্পূর্ণ বন্ধ হয় নি। কার্যকারী (যা থেকে কার্যকারিতা) কারো লেখায় দেখেছি বলে মনে পড়ে না। আর একটি অন্যায় শব্দ খুব দেখা যাচ্ছে যুদ্ধ "বাঁধা", দাঙ্গা "বাঁধা"। এই প্রসঙ্গে আরো বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ একটি উচ্চারণ পৃথক করার জন্য what অর্থে 'কি' না লিখে 'কী' লিখতে আরম্ভ করেন। (সংস্কৃতে কিন্তু what অর্থে 'কি' ব্যবহৃত হয়।) পাছে পাঠক "কি পাইনি" র 'কি' হ্রস্ব উচ্চারণ করে, এই ভয়ে রবীন্দ্রনাথ 'কী পাই নি তার হিসাব মিলাতে' লিখেছেন। কিন্তু কাদের জন্য? যাঁরা 'পীতা' 'শীব' 'সম্মীলিত' 'অচ্যূত' জাতীয় সব দীর্ঘ উচ্চারণ কবেন অকারণ, তাঁরা কি ও কী-তে তফাৎ করবেন কেন? একখানা দৈনিক পত্রিকায় 'এমনকি' বানানও রাখা হয়নি। কি বাজ গণ্ডগোলে, সব "কী" বানাও। এই মনোভাব সম্ভবত। কিন্তু এরকম লেখার যুক্তি কি? "এমনকি" একটি অব্যয় শব্দ, তার 'কি' 'কী' হবে কেন বোঝা যায় না। "এমনকী" মানে তো Thus what। আর এক পণ্ডিত 'ইতোমধ্যে' "ইতঃপূর্বে' আবম্ভ করলেন, ফলে যা হবার তাই হল। 'ইতোপূর্বে'তে ছেয়ে গেল ভাষা, সুখের বিষয় আবার ইতিমধ্যে ইতিপূর্বে আরম্ভ হয়েছে। কবে আবার কোনো পণ্ডিত লিখতে আরম্ভ করবেন একা নারী (এক নারীর বদলে) অথবা মেয়েটি পতিতা হল কিংবা রমণীটি অবাকী অথবা অবাকিনী হল। কিংবা মেয়েটি বড়ই সুখিনী। সংস্কৃত না শেখার ফলে যেমন উচ্চারণ বিভ্রাট ঘটে বাংলায়, তেমনি কেবল সংস্কৃতগতপ্রাণ হলে ভাষা বিভ্রাট ঘটে বাংলায়। আরো মনে হচ্ছে, বানান বিভ্রাটও ঘটে। এক একটা দলের সবাই নিজেদের মুগ্ধবোধ বিশ্বাসী ভেবে সংস্কৃত বানানের নিয়ম না জেনেও দেখাতে চায়, সংস্কৃতে পণ্ডিত। যেমন 'মার্কিণ' 'জার্মাণ' বানানে দেখা যায়। বিদেশী নামে সংস্কৃত ষত্বণত্ব চলে না। এবং সংস্কৃত উচ্চারণ না জানার ফলে কোথায় মূর্ধন্য ণ হয় তা জানে না বলেই সংস্কৃত নিয়ম অমান্য করে হসন্ত উচ্চারণের 'ন' কে 'ণ' করে বসে। সংস্কৃত নর শব্দের রূপেই পরিষ্কার শেখা উচিত যে স্বরান্ত নরেণ (মূর্ধন্য ণ) কিন্তু হসন্ত নরান্ (দন্ত্য ন)। রয়ের পরে থাকা সত্ত্বেও হসন্ত উচ্চারণে দন্ত্য ন। তবে আর 'জার্মাণ' 'মার্কিণ' কেন?

রাজশেখর বসু আরো অনেক শব্দ বা বানান বিষয়ে অরণ্যে রোদন করে গেছেন। 'রম্য রচনা' এই নামটিও তিনি পছন্দ করতেন না বিশেষ রচনার নামরূপে। আমারই একখানা বই পড়ে তিনি লিখেছিলেন—

টেলিফোন-সাউথ ৩৫৯১
৭২ বকুলবাগান রোড, কলিকাতা-২৫
২৭।৮।৫৫

প্রীতিভাজনেষু, আপনার ২৪ তারিখের পত্র···পেয়ে সুখী হলাম।·····

ম্যাজিক লণ্ঠন···খুব ভাল লাগল। আজকাল 'রম্য রচনা' নাম সর্বত্র শোনা যায় তাতে কি বোঝায় জানি না। যা ভাল লাগে তাই রম্য, কবিতা আর গল্প রম্য রচনা না হবে কেন? আপনার বইটি বোধ হয় রম্য রচনা নয়। আপনার ইতস্ততঃতে যা অতি সংক্ষিপ্ত, 'ম্যাজিক লণ্ঠন'এ তাই বিস্তারিত হয়েছে। যে চিত্রাবলী দেখিয়েছেন তার অনেকগুলি বুঝতে কিছু বুদ্ধির দরকার হয়। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ. রূপক, ব্যাজস্তুতি, আর উপহাসের মিশ্রণ। কয়েকটি চরিত্রচিত্র আছে তাও জীবন্ত! এ ধরনের রচনা দেখা যায় না। আপনি আরও লিখবেন আশা করি।

ভ্রমণ বৃত্তান্ত আমার খুব ভাল লাগে। ভ্রমণের লোভ আছে কিন্তু সামর্থ্য নেই, তাই বই পড়েই তৃপ্ত হতে হয়। আপনার বইটি [পথে পথে] ধীরে সুস্থে পড়ব।···

আপনার রাজশেখর বসু

রাজশেখরের শেষ তিনখানি চিঠি—

৭২ বকুলবাগান রোড, কলিকাতা-২৫
১২।১।৬০

প্রীতিভাজনেষু পরিমলবাবু, আপনার ৮ তারিখের চিঠি পেয়েছি।··· আমার মৃগী বা epilepsy রোগ, মাসখানিক আগে অনেকবার আক্রান্ত হয়েছি। চিকিৎসা হচ্ছে কিন্তু জড়ভরত হয়ে আছি, সমস্তক্ষণ অস্বস্তি, সারবে আশা করি না।

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় মাসে একদিন এখানে আসেন। যদি আপনার অসুবিধা না হয়, তবে একই গাড়িতে তিনি ও আপনি এখানে আসতে (আর ফিরে যেতে) পারেন। আমি চিঠি লিখে দিন স্থির করে

আপনাকে জানাতে পারি। বেলা চারটা নাগাদ। আপনার সম্মতি পেলে সুখী হব।

'দীর্ঘজীবী দীর্ঘতরজীবী' হবার আশীর্বাদ আপনাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি, আপনি সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন করুন। আমি চটপট নিষ্ক্রান্তি চাই।

আপনার রাজশেখর বসু

দ্বিতীয় চিঠিখানি লেখেন ১৮।২।৬০ তারিখে—

প্রীতিভাজনেষু, আপনার ১৪।১এর চিঠি। আগামী শুক্রবার ২২ জানুয়ারি বিকাল আন্দাজ পৌনে চারটের সময় আপনার কাছে গাড়ি যাবে। চারুবাবু থাকবেন। আশা করি আপনি এখন সুস্থ আছেন।

আঃ রাজশেখর বসু

২২শে জানুয়ারি রাজশেখরের ছবি তুলেছিলাম, মুভিতেও তোলা হয়েছিল। সেদিনকার আসরে শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেনও উপস্থিত ছিলেন। এরপর আমার কাছে তাঁর শেষ চিঠি ১৬-৩-৬০ তারিখে লেখা, প্রায় দুমাস পরে—

প্রীতিভাজনেষু, আগামী শনিবার ২৯শে মার্চ বিকাল সাড়ে চারটে নাগাদ চারুবাবু আপনাকে নিয়ে এখানে আসবেন। ১৮ তারিখে গাড়ির অসুবিধা, সেজন্য ১৯শে ব্যবস্থা হল।

আপনার রাজশেখর বসু

এর আগের চিঠিখানা হারিয়ে গেছে। সে চিঠি অনুযায়ী ১৮ তারিখে যাওয়া স্থির হয়েছিল। ঐই শেষ চিঠিখানা এই প্রথম অন্যের হাতের লেখা, স্বাক্ষরটি শুধু নিজ হাতে।

মুভিতে তোলা ছবি তাঁকে দেখিয়েছিলাম। সে ছবিতে চারুবাবুও ছিলেন। সে দিন সন্ধ্যায় সেখানে উপস্থিত ছিলেন আরো অনেকে।

এই চিঠি লেখার ৪২দিন পরে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন আর জাগেন নি।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের একখানা চিঠি—

১।৩।১৫ সি, দমদম রোড

কলিকাতা-২

৬।৩।৬৯

প্রীতিভাজনেষু, আপনি ঠিকই লিখেছেন যে, আপনার ও আমার বাড়ীর নম্বরের প্রথম ও শেষ এক—অর্থাৎ ১ দিয়ে আরম্ভ ও 'সি' দিয়ে শেষ। অবশ্য আপনারটির মধ্যে আর কিছু নাই, আমারটায় একটা ৩ ও একটা ১৫ আছে। আশা করি আপনার বই [আমি যাঁদের দেখেছি] এতদিনে বার হয়েছে। আপনি আমার মত সামান্য একজনের কথা তবু দরদ দিয়ে লিখেছেন। আমার যদি কিছু কৃতিত্ব থেকে থাকে তার জন্য দায়ী হল আমার পারিবারিক পরিবেশ। বাড়ীর আবহাওয়া একজন সাধারণ লোককে দিয়ে যে বেশ স্থায়ী ফলপ্রসূ কাজ করার ক্ষমতা দেয় আমি তার একটা উদাহরণ। ছেলেবেলা থেকেই গৃহীত কাজ পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সঙ্গে করতে শিক্ষা পেয়েছিলাম।…বাংলার নবজীবনের ইতিহাসের অভাব আমাকে পীড়া দিয়েছিল। তাই আমার সীমিত সম্বল নিয়েও কঠোর পরিশ্রমে তার কয়েকটি দিক নিয়ে লিখতে আমাকে প্রেরণা দিয়েছিল, এবং তার ফলে আমার পরিশ্রম গুণীজন কর্তৃক আদৃত হয়েছে ও আপনাদের ভাল লেগেছে এই আমার যথেষ্ট পুরস্কার।…

ইতি শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

প্রভাতচন্দ্রকে আমি কখনো সামান্য লোক ভাবতে পারিনি। বাংলার সামাজিক ইতিহাসের বহু যুগান্তকারী ঘটনার স্রোতে ভেসে আসা কোনো ব্যক্তিকেই আমি সামান্য বা সাধারণ মানুষ মনে করিনি কখনো। প্রভাতচন্দ্রের পিতা ও মাতার ইতিহাস বাংলা দেশের স্ত্রীশিক্ষার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দ্বারকানাথ ও কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন অবাঙালীসুলভ মনোবল ও একনিষ্ঠতার মহৎ দৃষ্টান্ত। গোঁড়া ব্রাহ্মণ সন্তান, কুলীন ব্রাহ্মণ মেয়েদের বিবাহ সম্পর্কিত ট্র্যাজিডিতে বেদনার্ত এবং বিচলিত হয়ে একদিন দ্বারকানাথ সমস্ত সংস্কার বিসর্জন দিয়ে বৃহত্তর

সমাজের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন, এবং স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতার জন্য শুধু তত্ত্বগতভাবে লড়াই করলেন তাই নয়, নিজে শিক্ষিতা কাদম্বিনী বসুকে বিবাহ করে এবং বহু বাধা ও বিরোধকে বীরের মতো অগ্রাহ্য করে তাঁকে বিদেশে পাঠিয়ে বহুডিগ্রীধারী চিকিৎসক হবার সুযোগ করে দিলেন, সে কথা স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাসে লেখা হয়ে আছে। কাদম্বিনী দেবী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাঙালী মহিলা গ্র্যাজুয়েট (চন্দ্রমুখী বসুর সঙ্গে) এবং তিনিই প্রথম বাঙালী মহিলা যিনি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে শেষ পরীক্ষায় পাস করেও তখন নিয়ম না থাকায় ডিগ্রী পেলেন না, শুধু চিকিৎসার লাইসেন্স মাত্র পেলেন, এবং যার জন্য তাঁকে বিলেত পর্যন্ত ধাওয়া করতে হল। এ সব কথা আজ কজনের মনে আছে?

"না জাগিলে সব ভারত ললনা এ ভারত আর জাগে না জাগে না" —এই পরিচিত কবিতাটি যে প্রভাতচন্দ্রের পিতার রচিত, সে কথাও এ যুগের অনেকেরই জানা নেই। এঁর পরিবারের বাইরে আত্মীয়েরাও সংস্কৃতি ও শিক্ষার অতি উচ্চস্তরে অবস্থিত। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রভাতচন্দ্রের ভগ্নিপতি। তাঁদের পরিবার কল্পনা করুন এই সঙ্গে। কিন্তু শ্রুতিকথা থেকে স্মৃতিকথায় ফেরা যাক।

প্রভাতচন্দ্রের নাম 'জংলী' হল কেন, তা আমার জানা নেই। শ্রীমতী লীলা মজুমদার তার বইতে লিখেছে, "জংলু মামা"। মুখে দাড়ির অরণ্য সৃষ্টি করতে কোনো সময়ে অবশ্যই বনমহোৎসব করতে হয়নি, কারণ নামটি তাঁর শৈশব থেকেই আছে। অতএব ভবিষ্যতে কি হবে না জেনে দাড়ির নিবিড়ত্বের জন্য ইন্দ্রের কাছেও প্রার্থনা জানানো হয়নি। আর দাড়ি দেখে নাম রাখতে হলে বাংলাদেশের বহু খ্যাতব্যক্তিই জংলী হতেন। অবাঙালী গান্ধীজী যদি জাতির জনক স্বীকৃত হন, তবে বাংলাদেশের যাঁরা জাতিকে উদ্‌বুদ্ধ করার কাজে আত্মসমর্পণ করেছিলেন, জাতির সেইসব জ্যাঠা কাকা মেসো পিসে তাঁরা সবাই জংলী নামে পরিচিত হতেন। (জাতির পিতা অবশ্য দাড়ি থেকে মুক্ত ছিলেন।)

প্রভাতচন্দ্রকে প্রথম দেখি সম্ভবত বর্মণ স্ট্রীটে 'দেশ' দপ্তরে। সেখানে সন্ধ্যার দিকে আমরা অনেকে যেতাম—বেশ একটা আড্ডা জমত সে সময়। ১৯৩২ কিংবা আরো আগে। আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। ভীষণ আড্ডাবাজ ছিলেন তিনি। সে আড্ডায়

প্রফুল্লচন্দ্র সরকারও উপস্থিত থাকতেন। তিনি ছিলেন অপেক্ষাকৃত গম্ভীর প্রকৃতির। সত্যেন্দ্রনাথের কোনো কোনো কথায় কানে আঙুল না দিয়ে মৃদুমৃদু হাসতেন, এই সংযম দেখেছি তাঁর আচরণে। দীনেশচন্দ্র সেনকেও একদিন ওখানে দেখেছি। 'দেশ' দপ্তরে বৈষ্ণব সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র সেন, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং সম্ভবত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়কে দেখেছি।

প্রভাতচন্দ্র গম্ভীর প্রকৃতির। তাঁকে কখনো দেখেছি মুণ্ডিতমুখ, দাড়ি গোঁফের চিহ্ন নেই, কখনো শুধু গুম্ফ অথচ শ্মশ্রুহীন। আবার কিছুদিন পরে সমস্ত মুখ জুড়ে দেখেছি সুন্দরবন।

গম্ভীর প্রকৃতির হলে কি হয়, এখনো (১৯৭০) আমার কাছ থেকে হাল্‌কা রচনার বই চেয়ে পাঠান, সময় কাটনোর জন্য। বয়স হয়েছে ৮০ বছর।

কিন্তু নিজেকে সামান্য লোক মনে করলে কিংবা তাঁর সাহিত্যকৃতিকে সামান্য মনে করলে ভুল করা হবে। কারণ এ পর্যন্ত তিনি বহু পত্রপত্রিকায় অনেক স্মৃতিকথা লিখেছেন, এবং স্মৃতিশক্তিও তাঁর অসাধারণ। তাছাড়া যেসব পুস্তক তিনি রচনা করেছেন, অথবা সম্পাদনা করেছেন, তার মূল্য সমাজ ইতিহাসে অস্বীকৃত নেই। 'বাংলার নারীজাগরণ' বই খানার (তাঁর পিতার কর্মজীবন থেকে যার আরম্ভ, অর্থাৎ জাগরণের ইতিহাসে তিনি যেটুকু দান কবেছিলেন), পুত্র সেই দান সমেত সে যুগের নারী জাগরণ ও শিক্ষার সমস্ত ইতিহাসটাই সংগ্রহ করেছেন। প্রভাতচন্দ্রের দিদি জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় স্বাধীনতা সংগ্রামে যেমন অংশ নিয়েছিলেন. শিক্ষাক্ষেত্রেও তিনি তেমনি ছিলেন সমর্পিতপ্রাণ। প্রভাতচন্দ্রও বহুবার কারারুদ্ধ হয়েছেন ইংরেজ রাজের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য। অনেক কৌতুকপূর্ণ ইতিহাস জড়িয়ে আছে তাঁর এই সময়ের জীবনের সঙ্গে।

আমি যখন তাঁকে প্রথম দেখি, তখন থেকে তাঁর বিষয়ে একটি বিশেষ ঘটনা নিয়ে সজনীকান্ত দাসের সঙ্গে গবেষণা চালিয়েছি কতদিন। সে ঘটনা হচ্ছে এই যে, তিনি দাড়ির ঘনসন্নিবিষ্ট অরণ্যের মধ্যে সিগারেটের শেষ অংশটি পর্যন্ত রক্ষা করে টানতেন কি করে। শেষে অনুমান করেছিলাম দাড়ির মধ্যে সিকি ইঞ্চি সিগারেট প্রতি টানে যখন জোনাকির মতো জ্বলে আর নেবে, তখন ওষ্ঠাধরের চতুর্দিকের দাড়িতে নিশ্চয় কোনো ফায়ার-প্রুফ প্রলেপ লাগানো আছে। কিন্তু প্রকৃতই কি, তা জিজ্ঞাসা করিনি

কখনো। আরো একটা প্রায় অবিশ্বাস্য জিনিস দেখেছি ১৯৬৮তে। এ সময়ে সপ্তাহে অন্তত একবার আসতেন আমার কাছে। একদিন চায়ের সঙ্গে শক্ত চিঁড়ের মোয়া দেওয়া হয়েছিল। খেতে পারবেন কিনা জিজ্ঞাসা করাতে একবার তার দিকে তাকিয়ে বললেন, অসুবিধা হবেন না। বলতে না বলতে তাঁর দাঁতহীন মুখে সেটি পুরে এক চাপে ভেঙে খেয়ে নিলেন। আমার দাঁত থাকা সত্ত্বেও আমার পক্ষে সে মোয়া দাঁতে ভেঙে খাওয়া বড়ই কঠিন ছিল। দাড়ির অরণ্যে কি রহস্য আছে জানি না।

এ বয়সে দুঃসাহসের দৃষ্টান্ত আরো আছে। স্বাস্থ্যে কুলোয় না, তবু কোথাও ডাকলে না গিয়ে পারেন না। প্রমাণস্বরূপ দুখানা চিঠির অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করি—

কলিকাতা-২
৪।৯।৬৮

প্রীতিভাজনেষু,

পরিমলবাবু......আমার শরীর বিশেষ ভাল না। কিছুদিন পূর্বে বীণা দাসের পিতা স্বর্গীয় বেণীমাধব দাসের প্রতিকৃতি উন্মোচন সভায়, পুত্র ডাক্তার বিমলা দাসের একান্ত ইচ্ছায় তাঁদের সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে যাই। বক্তৃতা হয়ে গেলে কিছু পরে সহসা ব্লাডপ্রেসার অত্যন্ত কম হওয়াতে সভাস্থলেই অজ্ঞান হই। এখন অবশ্য ভাল আছি।

ইতি—ভবদীয়
প্রভাতচন্দ্র গাঙ্গুলি

তবু সভায় যাওয়ার বিরাম নেই। পরবর্তী চিঠিতেও সভার কথা।—

কলিকাতা-২
২৫।১১।৬৮

প্রীতিভাজনেষু

পরিমলবাবু, আপনার পোস্টকার্ড যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। আপনার ভগ্নিপতি সরোজ বাবুর [সরোজ আচার্য] মৃত্যু সংবাদ পূর্বেই সংবাদপত্র মারফৎ পাইয়াছিলাম। ভারতীয় সংস্কৃতিভবন হলে এদেশের লেখক সাংবাদিক ও শিল্পী সংঘ নামক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে যে স্মৃতিসভা হয় তাহাতে আমাকেই সভাপতিত্ব করিতে হয়। সভায় সরোজবাবুর বন্ধু গোপাল হালদার, মণীন্দ্র রায়, সুধাংশু বসু এবং অন্যান্যদের মধ্যে বিবেকানন্দ

মুখোপাধ্যায় গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য প্রভৃতি সকলেই সরোজের গুণাবলী ও নিজেদের নানা anecdote বলিলেন, তার মধ্যে গোপালের ও মণীন্দ্র রায়ের ভাষণ খুবই ভাল হইয়াছিল। ইতি

ভবদীয় শুভার্থী প্রভাত

প্রভাতচন্দ্রের মুখে তাঁদের আগেকার দিনের আড্ডার অনেক গল্পই শুনেছি। মন্‌-ডে ক্লাবের কাহিনী খুবই চিত্তকর্ষক, এর বিষয়ে তিনি কয়েকটি স্মৃতিমূলক রচনাও লিখেছেন। সম্প্রতি ১২।৩।৭০ তারিখে আমাকে লিখছেন, আমি বর্তমানে বহুদিন পূর্বে তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় প্রকাশিত আমার লেখা 'আত্মীয় সভার কথা' সম্পাদনে ব্যাপৃত আছি। ব্রাহ্ম সমাজ থেকে ডাঃ দেবপ্রসাদ মিত্র, রামমোহনের আসন্ন দ্বিতীয়বার্ষিকী উপলক্ষে ওটা পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে চান।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'মন্‌ডে ক্লাব'-এর উপর একটা কবিতা লিখেছিলেন— 'আমাদের মন্‌ডেসম্মিলন—আমাদের মণ্ডা সম্মিলন'—রবীন্দ্রনাথের 'আমাদের শান্তিনিকেতন'-এর প্যারডি করে। সেটা কোথাও ছাপাও হয়েছিল, কিন্তু স্মরণে আসছে না।···

ইতি প্রভাত

ক্লাবের কথায় মনে এলো—গজেন্দ্র ঘোষের বাড়ির আড্ডার কথা। বিশিষ্ট জ্ঞানী গুণীরা সেখানে এসে মিলতেন শুনেছি। আমি নিজে কখনো যাইনি সেখানে। এইখানেই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র পণ্ডিতকে বলেছিলেন, "এই যে 'বিদূষক' শরৎচন্দ্র, ভাল?" শরৎচন্দ্র পণ্ডিত তার উত্তরে বলেছিলেন, "এই যে 'চরিত্রহীন' শরৎচন্দ্র" ইত্যাদি।

প্রভাতচন্দ্রের মুখে গজেন্দ্র ঘোষের স্ত্রীর সম্পর্কে একটি কথা শুনে প্রথমে অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল। তারপর সবটা শুনে বিস্ময় বোধ করেছিলাম— স্বামীর প্রতি ভালবাসার দুর্লভ দৃষ্টান্ত রূপে। ঘোষজায়া বলেছিলেন "আমি যেন বিধবা হয়ে মারা যাই—আমি যেন আগে না মরি।"

গজেন্দ্র ঘোষের দুরারোগ্য ব্যাধি আরথ্রাইটিস হয়েছিল। স্ত্রী বলেছিলেন "আমি আগে মারা গেলে ওঁকে দেখবে কে? তাই আমি সধবা অবস্থায় মারা যেতে চাই না।" পরে এই বিষয়টিই আমি হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'যাঁদের দেখেছি-২'তে গজেন্দ্র ঘোষের বাড়ির অধ্যায়ে পড়েছি। কোনো অবস্থাতেই যে, স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর মৃত্যু আগে কামনা করা চলে, এমন কথা আগে কল্পনা করিনি কখনো। এখনো ভাবলে বিস্ময় বোধ হয়।

আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে প্রভাতচন্দ্রের কিভাবে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল সে বিষয়ে সম্প্রতি জানতে চাইলে তিনি সেকথা আমাকে একখানা চিঠিতে জানিয়েছেন। তার কিছু অংশ এই—

কলিকাতা-২

৩০।৬।৭০

পরমপ্রীতিভাজনেষু,

আপনার ২৪।৬।৭০ তারিখের চিঠির উত্তরে জানাচ্ছি যে, আনন্দবাজার পত্রিকা যখন গোলদীঘির পূর্বদিকে এক বাড়িতে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস থেকে ছাপা হয়ে বেরোত, তখন আমার তৎকালীন কর্মক্ষেত্র কাছেই, মিরজাপুর স্ট্রীটে। ওখানে আমার বন্ধু নীরদ ভট্টাচার্য এক ওষুধ তৈরির কারখানা করেছিলেন—দি ব্যাকট্রো-ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারি লিমিটেড। আমি সে কোম্পানীর অন্যতম ডিরেকটর ছিলাম, এবং প্রচার ইত্যাদি দেখাশোনার ভারও ছিল আমার উপরে। বেঙ্গল হেলথ অ্যাসোসিয়েশন নামে এক সেবাব্রতী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা গ্রাম বাংলায় রোগবিতাড়নমূলক সেবা এবং প্রচার কার্যেও তখন ব্রতী ছিলাম। সেই সময় জনস্বাস্থ্য ও কলকাতা করপোরেশন সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলি আমি বিনা দক্ষিণাতেই আনন্দবাজার পত্রিকায় লিখতাম। এই সময়ে শ্রীদ্বিজেন্দ্রকুমার সান্যাল মশাইও অনুরূপ অবৈতনিক লেখক ছিলেন অর্থনৈতিক প্রবন্ধাবলীর।

এর পর আনন্দবাজার পত্রিকায় রোটারী যন্ত্র যখন এলো এবং শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে স্থানাভাবের জন্য ১নং বর্মণ স্ট্রীটে কার্যালয় স্থানান্তরিত হচ্ছে তখন একদিন মাখনলাল সেন আমাকে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে বললেন "প্রভাতবাবু, এখন তো আপনি কোন কাগজে যুক্ত নেই। তাহলে আনন্দ-বাজার পত্রিকায় যোগ দিতে আপত্তি কি? রোজ দুপুরে যদি কিছুক্ষণ এসে লেখার কিছু সাহায্য করেন তবে খুব ভাল হয়।" তখন আমি বলি যে, "রাজি আছি তবে মাইনে হিসাব করে সময় মেপে কাজ করতে পারবো না।" মাখনবাবু রাজি হয়ে গেলেন এবং জানালেন যে, আমার কাজের কোন নির্দিষ্ট সময় থাকবে না, এবং দৈনিক খাতায় সই করে আমার হাজিরা জানাতেও হবে না।

আমাকে যে টাকা দেওয়া হবে সেটা বেতন হিসাবে গণ্য না হয়ে 'অ্যালাওয়েন্স' হিসাবে গণ্য হবে।

আমাদের ওষুধের কারখানাটি ইতিমধ্যে বন্ধু নীরদের অকস্মাৎ পরলোক-গমনের পর থেকেই নানা দুর্বিপাকের মধ্য দিয়ে অতি কষ্টে-সৃষ্টে চলছিল, সুতরাং আমার আনন্দবাজারে যোগ দিতে কোন অসুবিধা আর ছিল না।

বর্মণ স্ট্রীটের অফিসে আমার বসবার স্থান নির্দিষ্ট হল মাখনবাবুর ঘরে, তাঁর পাশের টেবিলে। তখন থেকে আনন্দবাজারের সম্পাদকীয় লেখা সুরু করি। কিছুদিন পরে যখন 'দেশ' সাপ্তাহিক প্রকাশের ব্যবস্থা হল, তখন নামে সম্পাদক নিযুক্ত হলেন বঙ্কিমচন্দ্র সেন, কিন্তু তিনি অসুস্থতা বশতঃ স্বগৃহ থেকে কিছু সম্পাদকীয় নিবন্ধ পাঠাতেন মাত্র। কিন্তু প্রকাশিতব্য রচনা সংগ্রহ ও নির্বাচনের ভার পড়ল আমার ও শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের উপরে। লেখকদের দক্ষিণার হার নির্ধারণের ভারটি কিন্তু ছিল সম্পূর্ণই আমার উপরে ন্যস্ত। আনন্দবাজারের কাজ ছাড়াও দেশের কাজটি উপরি হয়ে পড়ল আমার উপরে।

এর পর হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড বেরোল। তখন তারও কিছু কিছু কাজ এই অধমের স্কন্ধেই অর্পিত হয়। আমাকে স্ত্রীর অসুস্থতার জন্য চিকিৎসকের নির্দেশে স-চিকিৎসক বায়ু পরিবর্তনের জন্য দেওঘর যেতে হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ জরুরী টেলিগ্রাম পেয়ে কলকাতায় ফিরতে হল। অফিসে গিয়ে শুনলাম অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে নিয়মিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখতে রাজি হয়েছেন, কিন্তু সেই লেখা তিনি আমাকে ছাড়া অপর কারো হাতে দিতে নারাজ। আমাকে প্রত্যহ তাঁর বাড়িতে গিয়ে সেগুলি সংগ্রহ করে আনতে হবে। তাই এই তারবার্তা মারফৎ জরুরি প্রত্যাবর্তন নির্দেশ।

হিন্দুস্থান স্ট্যানডার্ডের ক্রমোন্নতি কিভাবে হতে পারে সে সম্পর্কে মাখন বাবু ও সুরেশ বাবু প্রায়ই আমার পরামর্শ চাইতেন। রবিবাসরীয় ক্রোড় পত্রটিকে চিত্তাকর্ষক করার জন্য আমি শ্রীঅমল হোমকে ভার অর্পণের পরামর্শ দিই। অমল মিউনিসিপ্যাল গেজেটের কার্যালয়ে বসে ম্যাগাজিন সেকশনের চার পৃষ্ঠা লে-আউট করে পাঠাত এবং শ্রীউপেন ভট্টাচার্য সেই লে-আউট অনুসারে প্রুফ দেখতেন। ছাপা হবার আগে সর্বশেষ 'ইমপোজিং' আমাকে দেখে দিতে হত। এ ছাড়া শ্রীব্রজরঞ্জন রায় আমার নির্দেশে ক্রীড়াবিভাগ দেখাশোনা করতেন। ইংরেজী ও বাংলা দুখানা দৈনিকেই বিজ্ঞান বিভাগ,

ওলিম্পিকের সংবাদ, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতার দৈনিক খবর ইত্যাদি প্রকাশের ব্যবস্থাও আমাকেই করতে হয়েছিল।······পরে আমি 'ভারত' নামক দৈনিকের সম্পাদক নিযুক্ত হই এবং সেইখানে কাজ করি।

আশাকরি আপনার প্রশ্নের উত্তর এর মধ্যেই যথসম্ভব পাবেন।

শুভার্থী শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

আমি যা জানতে চেয়েছিলাম, তারচেয়ে বেশি খবরই আছে এই চিঠিতে। এই বেশি খবরও আমি উদ্ধৃত করছি, কারণ শুধু আমার চিঠিকে ঘিরে আমার স্মৃতি নয়, অন্যের চিঠিকে ঘিরে অন্যেরও যেসব স্মৃতি জেগেছে তারও ঐতিহাসিক মূল্য হারিয়ে গেলে আর কেউ কোনোদিন জানতে পারবে না। ইতিহাস গড়ার কাজে এই সব 'মিসিং লিংক' আর কখনও মিসিং থাকবে না এই আশা পোষণ করি আমি।

মাখন সেনও আমার বিশেষ পরিচিত ছিলেন। হ্রস্বদেহ কেশহীন পালিশ-মাথা, তীক্ষ্ণনাসা, মানুষটিকে সব সময় কর্মচঞ্চল দেখেছি। যেদিন হিন্দুস্থান স্ট্যানডার্ড প্রথম বেরোল, সেদিন তার প্রথম সংখ্যাখানি হাতে নিয়ে সকাল বেলাতেই হাজির হয়েছিলেন ২৫।২ মোহন বাগান রো-তে সজনীকান্তকে দেখাতে। আমিও সেখানে ছিলাম। জিজ্ঞাসা করেছিলেন—বিলিতি ছাপার মতো হয়েছে কিনা বলুন।

পঞ্চদশ অধ্যায়

প্রভাতচন্দ্রের একখানা চিঠিতে সরোজ আচার্যের স্মরণসভার কথা উল্লেখ আছে। (সরোজের জন্ম ১৯০৫, মৃত্যু ১৯৬৮)। সরোজ পড়াশোনা করার সুযোগ পেয়েছিল রাজনৈতিক বন্দী অবস্থায় থাকাকালে। ১৯৩০-৩৮ বন্দী জীবন। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, রাজনীতি—নিরুপদ্রব পাঠ। ইংরেজীতে এম. এ. দিয়েছিল বন্দী অবস্থায়। পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিল। রচনা-পত্রে রেকর্ড মার্ক পেয়েছিল, একবার বলেছিল আমাকে। ১০০র মধ্যে ৯৮। 'আন্‌সীন' যা কিছু প্রশ্নে দেওয়া হয়েছিল তার কাছে কোনোটাই অপঠিত ছিল না।

সরোজ ১৯৩৯ সনে আমার সঙ্গে পরিচিত হয়—পরিচয়কারক চিত্তরঞ্জন দাস—আমাদের কৈলাস বসু স্ট্রীটের বাড়ির উপরের ফ্ল্যাটে থাকতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি সরোজের সহকর্মী ছিলেন। ইনি পরে বিপ্লবী শান্তি ঘোষকে বিবাহ করেন। ১৯৩৯ সনেই সরোজের সঙ্গে আমার ছোট বোনের বিবাহ হয়। সরোজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যে চাকুরি করত তাতে কৃতিত্ব বা ভবিষ্যৎ কিছুই ছিল না। কাজ করতে হত খামে ঠিকানা লেখার। বেতন ১২৫ টাকা আরম্ভ, শেষ ২৫০ টাকায়। সরোজের বিদ্যা, বিনয় ও অহঙ্কারবর্জিত আচরণ আমার কাছে আকর্ষক হয়—তার এমন লোভনীয় চাকরিটি অবশ্য নয়। সরোজ ১৯৪২ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের সঙ্গে উইমেনস কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপনা করতে থাকে। ১৯৪২এর শেষে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে হিন্দুস্থান স্টানডার্ডে সহকারী সম্পাদকরূপে যোগ দেয়। তখনো সে অধ্যাপক। তার অধ্যাপনা কাল ১৯৪২এর শেষ থেকে ১৯৪৭এর প্রথম পর্যন্ত। হিন্দুস্থান স্ট্যানডার্ডে শেষ পর্যন্ত সে ঐ প্রতিষ্ঠানের তিনখানা কাগজের (হিন্দুস্থান স্ট্যানডার্ড, দেশ, ও আনন্দবাজার পত্রিকা) সম্পাদকীয় দায়িত্বের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানে যোগ দেবার আগে হিন্দুস্থান স্টানডার্ডের সহযোগী সম্পাদক ছিলেন গোপাল হালদার। ইনি ছিলেন রাজনৈতিক কর্মী ও পরিচয় সম্পাদক। গোপালবাবুই সরোজকে এখানে নিয়ে আসেন।

কিভাবে সরোজ ওখানে যোগ দিল তা স্মরণে আনবার জন্য গোপাল

হালদারেরই শরণ নিয়েছিলাম ২৯শে জুন (১৯৭০) তারিখে। তার উত্তরে তিনি আমাকে যে চিঠিখানা দিয়েছেন তা এই—

GOPAL HALDAR, M.A.B.L.
Writer & Journalist
MEMBER LEGISLATIVE COUNCIL
(W.B.)

C. I. T. Buildings
Block H. Suite 19
Calcutta-14
29. 6. 70

সুহৃদ্বরেষু,

পরিমলবাবু······হিন্দুস্থান স্ট্যানডার্ডে'র চাকরি ত্যাগ করব ঠিক করে-ছিলাম,—পার্টির [C. P. I.] সর্বক্ষণের কর্মী হব, মালিক সুরেশ মজুমদার মশাই কিছুতেই আমাকে চাকরি ছাড়তে দেবেন না। শেষ অবধি যখন মত বদলালাম না, তখন বললেন, "বেশ, তা হলে আপনার স্থলবর্তী কে হবেন আপনি ঠিক করুন। নতুন লোক চাই।"

আমার কাজ ছিল সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখা। নানা বিষয়েই লিখতে হত। তবে দুটি বিষয় ছিল তার মধ্যে আমারই প্রায় একান্ত সাধনীয়—একটি আন্তর্জাতিক রাজনীতি (তখন যুদ্ধ চলছে, তাই সামরিক ব্যাপারও তার মধ্যে গণনীয় হত,) দ্বিতীয়টি—সাহিত্য ও সংস্কৃতি। কাজ চালাবার মত সুযোগ্য লোক সুরেশবাবুও পেতেন, কিন্তু দায়িত্বটা আমার উপরেই দিলেন। সকৃতজ্ঞ অন্তরে স্বীকার করব—তাঁর আস্থা আমি পূর্বাপরই লাভ করেছি —আর সেই সঙ্গে পূর্বাপর লাভ করেছি তাঁর কাছে আন্তরিকতা ও স্বচ্ছন্দ সৌজন্য। তাই এই দায়িত্ব পালনে আমার জ্ঞানবুদ্ধি মতে যোগ্যতম লোকের সন্ধান তাঁকে না দিলে আমি নিজে স্বস্তি পেতাম না।

কে যে যোগ্যতম লোক, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। সুরেশবাবুকে তখুনি তাঁর নাম বললাম। সুরেশবাবু তখনো তাঁকে চিনতেন না।

বল্লেন, "আমি তাঁকে চিনি না, আপনি তাঁকে নিয়ে আসুন।"

একটা সংশয় ছিল—এরূপ সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তিনি আসবেন কিনা। সুরেশবাবু বললেন, "তাঁকে রাজি করানোর ভার আপনার।"

সরোজবাবুর সম্মতি পেলাম। ইউনিভারসিটির পরীক্ষা বিভাগের দপ্তরে গিয়ে দিনও ঠিক করে সেখান থেকেই সরোজবাবুকে নিয়ে পরদিন দুজনে গেলাম সুরেশবাবুর আপিসে।

বিশেষ বলবারও সময় হল না—"এই শ্রীযুক্ত সরোজ আচার্যকে নিয়ে এসেছি।"

এর বেশি কথার আর দরকার হল না। আমার মনে হয় আমাকে বোধ-হয় তারপরেও সুরেশবাবু জানিয়েছিলেন যে, আমি যে মাইনে পেতাম সরোজবাবুও সেই মাইনেতে কাজ আরম্ভ করবেন।

বাংলাদেশের সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে আমি এই কৃতিত্বের অধিকারী—এ যুগের শ্রেষ্ঠ একজন মানুষকে আমি সেই জায়গায় আনতে পেরেছিলাম। সেই সঙ্গে একটু দুঃখও আমার আছে—এ যুগের একটি শ্রেষ্ঠ প্রতিভা এই সম্পাদকীয় দায়িত্বের গুরুভারেই তাঁর পূর্ণতম দান দেশবাসীকে দিয়ে যেতে পারেননি। অবশ্য তাঁর আয়ুও সেদিকে বাদ সাধল।

ইতি গোপাল হালদার

গোপালবাবু সরোজ সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা সত্য। মানুষ হিসাবেও সে কত চিত্তাকর্ষক ছিল তার আর একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেব।

সরোজ ছিল তত্ত্বগতভাবে মার্কসবাদী। কিন্তু তবু তার পক্ষে, যাঁরা মার্কসপন্থী নন, তাঁদের প্রীতিলাভ করায় তার কোন বাধা হয়নি। কারণ সে ছিল নির্ভরযোগ্য কর্মী, প্রতারণা বা দ্বিমুখী ব্যবহার তার ধাতে ছিল না। তাছাড়া তার সঙ্গে আলাপ করলেই তার মনের এমন একটা স্নিগ্ধ এবং প্রসন্ন ভাবের পরিচয় পাওয়া যেত, এমন একটা নিরহঙ্কার এবং নিরলস আলাপী মানুষের পরিচয় পাওয়া যেত, যাতে মনে হত এই লোকটির উপর সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায়। তার মনটা ছিল নানা তথ্য ও জ্ঞানের সম্মিলন। তার বিদ্যা তার সকল সত্তার সঙ্গে এমন ভাবে মিলিয়ে ছিল যাতে কখনো কোনো বিষয়ে অহঙ্কার বা দাম্ভিকতা প্রকাশ তার পক্ষে অসম্ভব ছিল। অন্যের প্রতি সুবিচার ও সুবিবেচনা ছিল তার আচরণের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

তবে যে দিন (১৮ ১০-৬৮) মধ্যরাত্রে অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটল, সেদিন বাড়িতে নিকট আত্মীয় বিশেষ কেউ ছিল না। স্ত্রী পুত্র পূজোর ছুটিতে বাইরে ভ্রমণান্তে দিল্লীতে আমার মেয়ের বাড়িতে এসে উঠেছে এমন সময় এমন দারুণ সংবাদ শুনেও তাদের পক্ষে অল্পসময়ে ঘরে ফেরা সম্ভব ছিল না। কিন্তু আনন্দবাজার পত্রিকার কর্তৃপক্ষ মৃত্যুসংবাদ শোনামাত্র রাত্রেই তাঁদের দিল্লী অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিমানে বিশেষ জরুরি যাত্রী হিসাবে সেই দিনই আসবার ব্যবস্থা করলেন। করলেন আপনা থেকে। এবং শুধু তাই নয়, অন্ত্যেষ্টির সব ব্যবস্থা করলেন আশ্চর্য ক্ষিপ্রতা এবং বাড়ির কারো কোনো অসুবিধা না ঘটিয়ে। এও আশ্চর্য এক কর্তব্যের দৃষ্টান্ত।

কিন্তু এ কি শুধুই একজন কর্মীর প্রতি কর্তব্য? আমি সেরকম ভাবতেই পারি না। এর মূলে যে গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতির পরিচয় আছে তা আমাকে অভিভূত করেছিল। আমি কত দিন ধরে শুধু এই বিষয়টাই সবাইকে বলে বেড়িয়েছি। এই শ্রদ্ধা ও প্রীতি সরোজ আদায় করেছিল তার নিয়োগ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। এ ঘটনা স্মরণীয়। সরোজ সম্পর্কে গোপাল হালদার যে শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রকাশ করেছেন তাঁর চিঠিতে, সেই শ্রদ্ধা ও প্রীতি সরোজ পেয়েছে সকল বন্ধুর কাছ থেকে।

আমাকে সে খুবই শ্রদ্ধা করত। কলকাতার বাইরে গেলেই আপনা থেকে চিঠি লিখত, এবং ভারতের বাইরে গেলেও তার চিঠি লেখার অভ্যাস অব্যাহত রেখেছিল। তার প্রত্যেকখানা চিঠিই আমার কাছে নানাদিক থেকে মূল্যবান বোধ হয়। খুব দুঃখের বিষয় যে তার কয়েকখানা চিঠি হারিয়ে গেছে। যে কখানা বিদেশ থেকে লেখা এখনো আমার কাছে আছে, তার কিছু কিছু অংশ উপহার দিচ্ছি—

হাইডেলবার্গ, ওয়েস্ট জারমানি

৮-১২-৫৯

শ্রীচরণেষু,······আমরা মার্কিন টুরিস্টদেরও লজ্জা দিচ্ছি। প্লেন থেকে কোলয়েন-এ নেমেই এক দৌড়ে বন্। তারপর রাজকীয় রাত্রিবাস শেষে ভোরে উঠেই রওনা ভিজবাডেনে—রাইন নদীর পাড় দিয়ে ডেলুক্স্ বাসে। ভিজবাডেনে অষ্টাদশ শতাব্দীর মারবেল মোড়া হোটেল—রোদে লান্চ, সন্ধ্যায় 'কুর' হোটেলে ককটেল, ডিনার এবং তারপর কাসিনোর জুয়া খেলা দর্শন, তবে দর্শনই মাত্র। হোটেলে ফিরে দেখি বেডসাইড টেবিলে একখণ্ড 'দি হোলি বাইবেল' জারমান ভাষায়। কাসিনো থেকে ফিরে বোধহয় লোক সর্বরিক্ত মনোভাব নিয়ে ধর্মের আশ্রয় চায়। তারপর ভোর না হতেই আবার খাওয়া এবং বাসে দৌড়, পথে বিখ্যাত শিল্পনগরী Basf পরিদর্শন। অদ্ভুত এর কাণ্ডকারখানা। Basfএ লান্চ সেরে এক দৌড়ে হাইডেলবার্গে পৌঁছতে সন্ধ্যা পার হল। অতএব আবার খাওয়ার পর্ব, এবং পরদিন দৌড়ের জন্য অপেক্ষা।

আমরা অল্পবিস্তর ভোজনবিলাসী হলেও ভোজনসর্বস্ব নই, তাই সবারই প্রাণান্তকর অভিজ্ঞতা। রাইনের তীরে তীরে এই সব প্রাচীন হোটেলগুলো পয়লা নম্বর আমিরি স্টাইলের। চার্জ দিন চল্লিশ টাকার কম নয়।······ঘরে

যেমন প্রচণ্ড গরম, বাইরে তেমনি কনকনে ঠাণ্ডা। ব্রেকফাস্টের আগে যেটুকু সময় পাই পথে পথে ঘুরি। দোকানে দুএকজন জিজ্ঞাসা করেছে আমার শীত লাগে না নাকি? আমি বলেছি শীতের দেশের লোকেদেরই শীত বেশি লাগে।

ঘরে তো পাঞ্জাবী পাজামা পরে বিনা মোজায় থাকতে হয়, লেপও দরকার হয় না। অবশ্য এরই মধ্যে কেউ কেউ ডবল মোজা, চারপ্রস্থ গরম জামা, দস্তানা, ড্রয়ার্স চড়িয়ে থাকেন। এখন ক্রিসমাসের সময়, এই আমিরি শহরের দোকান পাটের অপূর্ব শোভা। রেডিও রের্কড প্লেয়ার প্রভৃতি অনেক লোভনীয় জিনিষের দাম কলকাতার তুলনায় শস্তা। ক্যামেরা কিন্তু পকেট আন্দাজে শস্তা নয়। কন্টাফ্লেকসের দাম ৪৯৮ মার্ক, সাড়ে পাঁচশো টাকা। ……দেশ দেখা বা জানা এভাবে হয় না। বিস্তর হোটেল এবং খানাপিনার কায়দা মাত্র দেখা হল, উপায় নেই।

প্রণত সরোজ আচার্য

সাংবাদিক হিসাবে এই প্রথম তার ইউরোপ গমন। আমার যতদূর মনে পড়ে জারমান লুফটা হানসা নামক জারমান এয়ার লাইনের নতুন উদ্‌বোধন কালে, সাংবাদিকদের বিনামূল্যে ভ্রমণের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল বিমান কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে। এর পর কয়েকবার ব্রিটেন জাপান ও অ্যামেরিকা থেকে সরকারী নিমন্ত্রণ পেয়েছিল সরোজ। তারও আগে ভিয়েটনাম দর্শন হয়েছিল এইভাবেই। এর চার পাঁচ বছর পরে লণ্ডন। সেখান থেকে সরোজ লিখছে—

Mandeville Hotel
London, W. I.
4. 11. 64.

পূজনীয়েষু,

চিঠি লেখার সময় করে ওঠাই কঠিন। ম্যারাথন ভ্রমণ। লণ্ডন, ব্রিস্টল, গ্লসটারশিয়রের গ্রামাঞ্চল, এডিনবরো, গ্ল্যাসগো ইত্যাদি—এক হোটেল থেকে আর এক হোটেল, সারারাত ট্রেনে, সারাদিন মোটরে, উপরন্তু মাইলের পর মাইল কারখানা, জাহাজঘাটা, বোধনা-নিকেতন, মাতৃসদন, শিল্পপত্তন পরিদর্শন। তার উপর প্রায়ই সন্ধ্যা থেকে দশটা এগারোটা পর্যন্ত ফরম্যাল ডিনার পার্টি………সবটাই প্রাণান্তকর। ইংরেজকে আমরা যখন নিমন্ত্রণ করি

তখন তার খাওয়া থাকার অভ্যস্ত রীতি অনুযায়ী সাধ্যমত অতিথিসেবার ব্যবস্থাই করা হয়। এদের উলটো। এরা ধরে নেয় এদের মতো পোশাক, এদের মত খাওয়া দাওয়া চলাফেরা বিদেশী অতিথিকে মেনে নিতে হবে।

যা হোক অভিনয় কোন রকম চালিয়ে নিয়েছি। এখন পালা শেষের দুদিন ঠাসা প্রোগ্রাম—লান্‌চ, রিসেপশন, দর্শন ইত্যাদি। এটা শেষ হলে মস্‌কো যাত্রা, দেশের পথে। মস্‌কো থেকে ঠিক কোন রাষ্ট্রীয় নিমন্ত্রণ পাইনি তবে সাতদিনের ভিসা পেয়েছি। ৭ই নবেম্বর থেকে ১৫ই নবেম্বর। বাবলুকে [পুত্র অভিজিত, সে তখন ব্লাক সীর নিকটস্থ স্তাভরোপোল শহরের বাসিন্দা. কারখানায় ধাতুবিদ্যা শিক্ষায় রত. সে বিমানে মস্‌কোতে এসে পিতার সঙ্গে দেখা করেছিল।] এবং ননী ভৌমিককে কেব্‌ল করেছি. কালই। এয়ার পোর্টে ওরা কেউ উপস্থিত না থাকলে খুবই মুশকিল। কারণ ওদের অতিথি হিসাবেই আমার যাওয়ার অনুমতি, নতুবা নিরুপায়, কারণ মুদ্রা সংকট।

হিমুর (হিমানীশ) পরিচিত শ্রীমতী জিলিয়ানের বাড়ি একদিন ঘুরে এসেছি, লণ্ডন থেকে মাইল ত্রিশ দূরে। একদিন ব্রাইটনে ডঃ সাক্‌সটনের সঙ্গেও দেখা করে এসেছি। এ সব যাতায়াত একলাই। স্ট্রাটফোর্ড-অন-অ্যাভনে একবেলা কাটিয়েছি এবং হেনরি-৬এর অভিনয় দেখেছি। মোটের উপর এই ছুটকো ভ্রমণটুকই আনন্দের।

গরিব লোকের পক্ষে টেলিভিসন—থিয়েটার সিনেমা স্কুল এবং পার্লামেন্টের যাবতীয় আমোদ এবং শিক্ষার বাহন। গরিব লোক মানে অবশ্য এ দেশের গরিব লোক। কারণ টেলিভিসনের ভাড়া সপ্তাহপ্রতি সাড়ে আট শিলিং। নগদ দাম ষাট সত্তর পাউণ্ড।

এ দেশের গরিব লোক কিস্তিবন্দী আনন্দে উৎসাহী। খাবার দাবার শস্তা, কিন্তু অন্য জিনিস শস্তা মনে হয় না। সাধারণ একটা দাড়ি কামানোর ব্রাশ চার শিলিং, পঞ্চাশ কাঠির দেশলাই আড়াই পেনি। সিগারেট তো ডবল দামই। গরিব লোক খেটেখুটে খেয়ে পরে থাকতে পায়, আমাদের দেশের চেয়ে ভালই পায়, কিন্তু তা বলে অর্থকষ্ট যে এদের নেই সেকথা ঠিক নয়। প্রণাম নেবেন,

ইতি

সরোজ



সরোজ আচার্য

ফোটো : পরিমল গোস্বামী ১৯৫০

আবার দু বছর পরে। এবারে অ্যামেরিকা থেকে—

Sylvania Hotel
Philadelphia
20. 10. 66.

ভক্তিভাজনেষু,

বিদেশ, বিদেশী কায়দায় দৌড়ঝাঁপ. অনভ্যস্ত পোশাকের বোঝা, সব মিলিয়ে প্রায় রুদ্ধশ্বাস। তবু থামবার উপায় নেই। ওয়াশিংটনে সাতদিন নানা জায়গায় ঘোরাঘুরি, দর্শন—সব সেরে কাল এসেছি ফিলাডেলফিয়াতে। আজ সারাদিন কেটেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানে পাঁচ দিন স্থিতি। এরপর মোটরেই বস্টন, বাফোলো, নায়াগারা প্রপাত, নিউ ইয়র্ক পর্যন্ত। শিকাগোয় পৌঁছব ৪নবেম্বর নাগাদ। ভ্রমণ ও নানা রকম দেখাসাক্ষাতের সংক্ষিপ্ত সূচী এক কপি ডোভার লেনে পৌঁছবে মঞ্জুর কাছে। [সরোজ তখন ডোভার লেনে থাকত] তাকে বলবেন পড়ে শোনাতে। দেখবেন দুমাস কি এলাহি কাণ্ড। তবু সেটা সংক্ষিপ্ত সূচী, প্রত্যেক জায়গায় আমার দেখাসাক্ষাতের লম্বা ফর্দ। যেমন আজ আমাকে এখানে ইউনিভারসিটিতে সকাল দশটা থেকে বিকেল তিনটে পর্যন্ত দেখাসাক্ষাৎ, সেমিনার ও লান্চ ইত্যাদিতে লেগে থাকতে হয়েছে। এখানকার ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসে খুবই মন দিয়ে পড়ে, নোট নেয়, জিজ্ঞাসাবাদ করে। তবে ছোট ছোট ক্লাস, পরিপাটি বসবার ব্যবস্থা। ক্লাসে সিগারেট খাওয়া চলে, সত্যি নয়। বড় বড অক্ষরে লেখা NO SMOKING—তবে সেমিনারে সিগারেট খাওয়া যায়। আজ ছাত্রেরাও খাচ্ছিল, কিন্তু আমি এ ক্ষেত্রে তিনচার ঘণ্টা আদর্শ বালক ছিলাম।

এদেশের খবরের কাগজ প্রাচুর্যের গন্ধমাদন পর্বত। দিন ১০০ পৃষ্ঠা, রবিবার ২০০। কেউ পড়ে কিনা সন্দেহ, প্রথম পাতাখানার উপরেই চোখ বুলোয়। লণ্ডনে প্রায় সবাইকেই কাগজের ভাঁজ খুলতে দেখেছি, এদের কদাচিৎ। দশ থেকে কুড়ি পাতা ছোট ছোট টাইপে ঠাসা শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন। আর পুরোপাতা বিজ্ঞাপন সব—জামাকাপড়, ফুল. আসবাবপত্র, গহনা এবং খাদ্যবস্তুর। মোটর গাড়ীর বিজ্ঞাপন তো আরও বেশি। ঘণ্টায় পাঁচ সেণ্ট হিসাবে গাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়। আমরা ওয়াশিংটন থেকে এসেছি ভাড়া-করা টকটকে লাল ফোর্ড ফকনে। এই গাড়িই বদলাতে বদলাতে আমরা দেশ ঘুরব। তারপর সিকিভাগ ট্রেনে, বাকিটা প্লেনে। আমার জন্য একটু

বিশিষ্ট ব্যবস্থা। স্টেট ডিপার্টমেন্টের একজন মাঝারি কর্মচারী আগাগোড়া আমার সঙ্গী ও প্রদর্শক। তিনি গাড়ি চালাচ্ছেন। তিনি মহা খুশি, সরকারী খরচে দেশ পরিক্রমা, উপরন্তু দুমাস ডিউটি লীভ। সাত্ত্বিক লোক, সিগারেট বা সুরা কিছুই চালান না। আন্তর্জাতিক বিবাহ বিশারদ, খারাপ অর্থে নয় অবশ্য। দুটি বউ গত হওয়ার পর এখন তৃতীয় পক্ষ। প্রথম পক্ষ মার্কিন, দ্বিতীয় পক্ষ কিউবান, বর্তমান স্ত্রী ব্রাজিলিয়ান। ভদ্রলোক চার পাঁচটি ভাষা জানেন। আশা করি এর সঙ্গে ভাবী চতুর্থ পক্ষের সম্পর্ক নেই।

খাওয়ার জিনিষ এখানে রকমারি এবং শস্তাও। নিরামিষ খাদ্যও অনেক রকম। সভ্যতার শ্রেষ্ঠ বাহাদুরি বোধহয় প্যাকেজিং। চমৎকার কার্ডবোর্ডের বাক্সে আধ-পাইন্ট দুধ, ঢাকনা দেওয়া কার্ডবোর্ডের গ্লাসে গরম চা ইত্যাদি ঘরে এনে খাওয়া যায়। এদেশের হালচাল সম্পর্কে যে সব রসাল তথ্য খবরের কাগজে বার হয়, তার অনেকখানি অতিরঞ্জন। শতকরা দশজন হয়তো বেয়াড়া, অন্যদের পোষাক, চালচলন বেশ ভদ্র মনে হয়। প্রণাম নিন।

ইতি—সরোজ

এই ভ্রমণেরই শেষ পর্যায় পাওয়া যাবে পরের দু'খানি চিঠিতে।—

আল্‌বুকের্কে, নিউ মেকসিকো
২৫-১১-৬৬

পূজনীয়েষু,

ওখানে গোরু, এখানেও গোরু। ওখানে ভক্ত, এখানে ভোক্তা। আমি ভক্ত নই, ভোক্তাও হতে পারিনি রুচির বাধায়। গোরু নিয়েই বড় মুশকিল। এখানে তো মূল খাদ্য গোরুই, দোকানে দোকানে, কাগজে, টেলিভিশনে Steak, Sirloin, Hot-dog, Bologna ইত্যাদির চমৎকার প্রশস্তি। বড় শহরে মুশকিলে পড়িনি, প্রায়ই চীনে খাবার জোগাড় করেছি, নতুবা চিকেন। পথেঘাটে ছোট শহরে অথবা সরাইখানায় গোরুই একমাত্র খাদ্য। কে জানত Chili and bean মানে গোরুর কিমায় লংকা আর সিম সেদ্ধ। দু-তিন দিন নিরুপায় হয়ে তাই খেয়েছি চার-পাঁচ চামচ, কেমন গন্ধ যেন। আমার ভ্রমণের এই প্রথম পর্ব, খুব তাড়াতাড়ি মোটরে পাড়ি দিতে হচ্ছে। কখনো কখনো দু-দিনে দু'শো মাইল—গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন থেকে আলবুকের্কেতে খাই কি? অগত্যা রুটি-দুধ, আপেল, দুচকোলেট এই সবই খাচ্ছি। ফ্রায়েড-

চিকেন পাওয়া যায়, কিন্তু দু-বেলা পর পর খেলে অরুচি। সবই তো নুন-মরিচের গুঁড়োর সঙ্গে আধা সেদ্ধ কিংবা আধা ভাজা। দক্ষিণে এসে অবশ্য প্রায় রোজই একবেলা মেক্‌সিকান খাদ্য খাচ্ছি—সুস্বাদু টক্‌-ঝাল ঝোল আছে ভাতও সেই সঙ্গে। তবে দৈনিক প্রোগ্রামের পাল্লায় কখন কোথায় যে লাঞ্চ-ডিনার, তার ঠিক থাকে না। কোন কোন দিন অমলেট, চকোলেট খেয়েই কাজ চালাই। একমাত্র স্বস্তি যে সকালের ব্রেকফাস্টটা আমাদের রুচি মতই মেলে—টোস্ট, পরিজ, ডিম, ফলের রস ইত্যাদি।

দৈনিক কাগজ এদের প্রত্যেক শহরেই। তিন লাখ লোকের শহরেও দু'খানা দৈনিক, এক এক খানা পঞ্চাশ পাতার কম নয়। পোশাক, আসবাবপত্র, গাড়ি, হীরা-জহরত, ইত্যাদির বিজ্ঞাপনে অর্ধেক ঠাসা। গহনা, মণিমুক্তা, হীরার আংটিও নগদ দামে নয়, সপ্তাহে দু-চার ডলার কিস্তিতে কেনবার আমন্ত্রণ। আপনার ধার চাই? শীতের জামাকাপড় কেনবার জন্য? কিংবা মোটর গাড়ির অথবা বাড়ির অথবা আসবাবপত্রের জন্য? অথবা হলিডে ভ্রমণের জন্য? ব্যাংক দরজা খুলে সাধাসাধি করছে, আসুন, ধার নিন। ক্রেডিট কার্ড পকেটে নিয়ে সারা দেশ ঘোরা যায়, স্বচক্ষে দেখেছি।

বারনার্ড শ লিখেছিলেন Breakages Limited-এর কথা, এখানে অন্তত দু-জায়গায় মস্ত বড় দুটি Wrecker Service।—মোটর গাড়ি বাতিল করে ফেলবেন কোথায়? পথে ফেলে রাখলে মোটা জরিমানার ভয়, অতএব Wreckage Service-এর শরণ নিন। তারা অল্প দামে বাতিল মোটর কিনে নিয়ে ইস্পাতের কারখানায় বেচে দেয়। তবু পথের ধারে ধারে মোটরের মহাশ্মশান। সমস্যা এদেরও আছে, প্রাচুর্যের খেসারত দিতে হয়। প্রথমত খুন-জখমের বাড়াবাড়ি, অবশ্য শহরেই প্রায় সব। দ্বিতীয়ত বিষাক্ত বাতাস। ছোট শহরেও দেখেছি, ও শুনেছি, বাতাসে নানা রকম গ্যাস ইত্যাদির প্রকোপ প্রবল। Teenager-দের দৌরাত্ম্য কেবল বড় বড় শহরেই। এদের ও ছাত্রদের সম্পর্কে, যেখানে গিয়েছি খোঁজখবর নিয়েছি, কিছু কিছু তথ্য যোগাড় করেছি। পরে গুছিয়ে লেখার ইচ্ছে আছে। কোন কোন স্টেটের মধ্যবিত্ত মহলে ধর্মপ্রবণতা এখনও জোরালো। নৈতিক নিষ্ঠা সেবা ইত্যাদি, ভণ্ডামি নয়। তবে ভোগসুখের উপকরণ-বাহুল্য সর্বত্র। সব স্তরেই যন্ত্রের ব্যবহারে এদের আগ্রহ অন্তহীন। আমার মনে হয়

প্যাকেজিং, পোর্টেবিলিটি, মিনিয়েচারাইজেশন এদের টেক্‌নিক্যাল কালচারের মোক্ষম কৃতিত্ব। ইন্‌স্ট্যাণ্ট কফির মতন Instant lawn (বাগান সাজানো ঘাসের জমি) Instant lily pool-ও পাওয়া যায়। প্রিন্‌সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথিশালায় ছিলাম এক রাত ও এক সকাল। কোন কর্মী নেই, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র কয়েকটি আছে, যত খুশি চা, কফি, পেপসিকোলা—বোতাম টিপলেই পাওয়া যায়। অনেক প্রতিষ্ঠানের দরজা আপনা থেকেই খোলে, বন্ধ হয়, চৌকাঠের কাছে দাঁড়ালেই,—ফোটো-ইলেকট্রিক সিস্‌টেম। কাগজের গেলাসে, ঢাকনি আঁটা গরম চা স্বচ্ছন্দে সঙ্গে নেওয়া যায়। কমপিউটার যন্ত্রের সাহায্যে মনের মতন পাত্রপাত্রী নির্বাচনের পদ্ধতিও কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে। বই পড়ার দ্রুতত্ব বৃদ্ধির উপায় শেখানোর প্রতিষ্ঠানও চালু হয়েছে। লাইব্রেরি সমূহে শেষ পর্যন্ত বই-ই থাকে কিনা সন্দেহ। মাইক্রো-ফিল্‌ম্‌ এবং অটোমেশনের জন্য বড বড় লাইব্রেরিতে লক্ষ লক্ষ ডলার বরাদ্দ হয়েছে।

এত যাদের কলাকৌশল, সাধারণ লোকের চিকিৎসা ব্যবস্থা যাতে সহজলভ্য হয়, সেদিকে কিন্তু কুণ্ঠা কৃপণতার অন্ত নেই। চিকিৎসার খরচ সাংঘাতিক। সকলেই বলে ডাক্তারেরা এখানে ডাকাত। হাসপাতালে দাতব্য চিকিৎসা একেবারে নিঃস্ব ছাড়া আর কারও জন্য নয়। লেখাপড়ার খরচও বেশি। তবে ইদানিং স্কুলের লেখাপড়া প্রায় অবৈতনিক। কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে শতকরা ৪৫জন স্কলারশিপ পায়। বেকারদের ভাতা দেওয়া হয় বটে, কিন্তু তা নিয়ে নানারকম অসন্তোষ আছে। ৬৫ বছরের উপর যাদের বয়স, তাদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা সম্প্রতি চালু হয়েছে। চাষবাস ক্রমশ বড় বড় কম্পানির দখলে চলে যাচ্ছে। ছোট গেরস্ত চাষী পরিবারের সংখ্যা কমেছে। আজ এই পর্যন্ত। প্রণাম নিন। ইতি

সরোজ

এই চিঠিখানা সরোজ আচার্যের বিদেশ থেকে আমাকে লেখা শেষ চিঠি—

সান হুয়ান
পুয়ের্টো রিকো
৪।১২.৬৬

পূজনীয়েষু,

ইতিহাস বিধাতৃ এই অ্যামেরিকানদের উপর সদয়—সেই ১৮ শতক

থেকে। সেটা পরিষ্কার বোঝা গেল দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে প্রশান্ত মহাসাগরের তীর ধরে মোটরে ছয়শ মাইল আসতে আসতে। স্পেন, ফ্রান্স, রাশিয়া জোড়া দিয়ে গড়ে উঠেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সান ফ্রানসিসকো থেকে লস্ এন্‌জেলিজ, সারা পথ ধরে ছোট ছোট শহর, গ্রাম, গীর্জা, এখনও স্পেনীয় ধাঁচে। নাম ধাম, প্রাচীন ভজনালয়, আঙিনার লতাপাতা ফুল আমাদের দেশের ধর্মসংস্কৃতির মতই বিনম্র। স্পেনীয় নিষ্ঠুরতার দাগ কেবল ইণ্ডিয়ানদের জীবনে ও মনে। রাজ্য হাতবদল, হারজিত, আরও হয়েছে। যা ছিল স্পেনের এবং তারপর ফ্রান্সের, ১৯ শতকের গোড়ায় তাই আবার অ্যামেরিকার। প্রশান্ত মহাসাগরের তীর ছেড়ে মিসিসিপির মোহনায়—নিউ অরলিয়েনসে এসে সেটা ভালমত বোঝা গেল। নিউ অরলিয়েন্‌স, লুইজিয়ানা নেপোলিয়ান অ্যামেরিকাকে বেচে দেন মাত্র কয়েক লক্ষ ডলার মূল্যে। এই শহরে [সাল হুয়ানে] এখনও পুরনো ফরাসী পাড়া. পাথুরে রাস্তা, ছোট ছোট দোতলা বাড়ি, ঝুল বারান্দা, গাড়ি, ফরাসী ধাঁচে খোলা বাজার এবং অবশ্যই ফরাসী কায়দায় আমোদ-প্রমাদের উদ্দামতা। যদিও শুনি মার্কিনরা পুরনো জিনিস রাখে না, এসব অঞ্চলে পুরনো পাড়া সব এরা সযত্নে অবিকল বজায় রেখেছে। ফিলাডেলফিয়ায় ব্রিটিশ কলোনিয়াল স্টাইলের বাড়িঘর রাস্তা, নিউ মেকসিকোর সান্টা ফে শহরের আগাগোড়া স্প্যানিশ মেক্সিকান গড়ন. নিউ অরলিয়েনসের ফরাসী ও স্প্যানিশ ধাঁচ সবই নব্য মার্কিন নগর শিল্পের পাশাপাশি অবস্থান করছে।

নিউ অরলিয়েনসে শীতের ধারালো হাওয়া. কিন্তু গাছপালা সবুজ, পাতা ঝরার তাগিদ নেই. বরফ পড়ে না। সেখান থেকে আকাশপথে হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে, কিউবার পাশ কাটিয়ে জ্যামেকার মরিগো বে [মনটেগো বে ?]-তে ঘণ্টাখানেক থামতেই মনে হল দেশের কাছে এসে গেছি। সান হুয়ানে মধ্যরাত্রে পৌঁছে ভাপসা গরম. পথঘাটে বদ্ধজলের পচা গন্ধ—মার্কিন পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে বিচ্ছেদটা স্পষ্টতর করল। সান হুয়ানে অনেকদিন পর ঠাণ্ডা জলে ধারা স্নান। জানা ছিল না এই সময়টায় মার্কিন শীতকাতরদের ভিড় এখানে। সে কি ভিড়! আর কি উজ্জ্বল উচ্ছল বিলাস ব্যসন। দোষ ধরি না, এরা যেমন পরিশ্রম করে, তেমনি উপভোগেও এদের অমিত উৎসাহ। খাশ পোর্টো-রিকোবাসীরা স্প্যানিশ, ক্যাথলিক, তামাটে বাদামী রং। বেশ সাদাসিদে স্ফূর্তিবাজ। অনেকের

গলাতেই সরু সোনার হারে ক্রস চিহ্ন। সাদা মানুষদের চেয়ে এরা কথাবার্তায় অনেক বেশি অন্তরঙ্গ। সান হুয়ানের জৌলুষ মার্কিন টুরিস্টদের পয়সায়। রৌদ্র স্নান, নৌকা ও মোটর বিহারের কি ঘটা! দেশটা আমাদের মতই, তবে আরও সবুজ। আখ, ধান, আম, আনারস, কমলালেবুর ক্ষেত ও বাগান। জবা, যুঁই ঝুমকো লতা, কাঁঠালি চাঁপা, পাতাবাহার, তাল, খেজুর, নারকেল গাছের ছড়াছড়ি। গ্রামের পথে টাট্টু ঘোড়ার পিঠে সওয়ার—সব উত্তর ভারতের কোন কোন অঞ্চলের মত। ছোট ছোট শহরে জুতোপালিশ-বাচ্চারা কলকাতার মতই। ডাব কেটে বিক্রির কায়দাও। শহরের বাইরে গরিব পাড়ায় আবর্জনা স্তূপও সেই রকম। তবে এদের বাড়িঘর সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন। লেখাপড়ায় এগিয়েছে অনেকদূর, শতকরা ৯০জন সাক্ষর। বিশ্ববিদ্যালয়টিও চমৎকার। শিক্ষণ বিভাগের সহ-অধিকর্তা একজন ভারতীয়, গুজরাটি। জিজ্ঞাসায় জানা গেল পঙ্কজ [পঙ্কজকুমার রায়, বর্তমানে দিল্লী সেন্ট্রাল ইনসটিটুট অভ এডুকেশনের প্রিন্সিপ্যাল] এঁর বাড়িতে অতিথি হয়েছিল। নাম ঈশ্বর বাংডিওয়ালা। বাড়ি গুজরাটে। আজ যাব ফ্লোরিডায়। প্রণাম নিন। ইতি—

সরোজ

আরো আগের কয়েকখানা চিঠি পাওয়া গেল। তার মধ্যে থেকে দুখানা উদ্ধৃত করছি। প্রথম খানায় সাধু ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, কিছু রসিকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। মন প্রফুল্ল ছিল প্রমাণ হয়। নিউ দিল্লী-১ থেকে লেখা। এর কিছু আগে তার লেখা 'সাহিত্য রুচি'র সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে যুগান্তরে। কার লেখা সে সমালোচনা আমার ঠিক মনে পড়ছে না। আমার নিজের লেখাও হতে পারে। যাই হোক, এই সমালোচনার প্রতিক্রিয়াজাত চিঠিখানা আমাকে আনন্দ দিয়েছিল।

নিউ দিল্লী

২৫-১২-৫৮

পূজনীয়েষু......যুগান্তর রবিবাসরীয় পত্রিকায় 'সাহিত্য রুচি'র সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, অবগত হইয়া গতকল্য উহা পাঠ করিবার কৌতূহল পূরণ করিলাম। সমালোচনা মনোরম ও সযত্নরচিত সন্দেহ নাই, তবে দুষ্টলোকে বলিতে পারে নাতিদীর্ঘ পুস্তকখানির প্রায় একস্তম্ভ ব্যাপী প্রশস্তি কি সাহিত্য-

রুচিসম্মত, না স্বজন-প্রীতির পরিচায়ক? পুস্তকের লেখক স্বয়ং রাজধানীতে গুলিখোরের মত প্রায় দেওয়ালে আঁকা হইয়া রহিয়াছেন, কাজেই তাঁহার মন্তব্য আপাতত মুলতুবি রহিল।

লেখকের অবস্থা সেই দুই গুলিখোরের মত—যাহারা একদা রাজবাড়িতে নিমন্ত্রণ পাইয়াছিল। গুলিখোর মাত্রেই চিন্তাশীল—জাপানী ভাষায় togoru (togore = ধ্যানী ব্যক্তি 'u' ক্রিয়া বিশেষণ) = ধিমন্ত (জাপানী ভাষার উপর রবীন্দ্র-প্রভাব, সত্য কথা)।

গুলিখোর দুইজন চিন্তা করিয়া স্থির করিল যে রাজবাড়ির প্রধান ফটক অত্যন্ত নিচু, অতএব হামাগুড়ি দিয়া যাওয়াই সঙ্গত। দেউড়ীর দারোয়ান অবশ্যই হামাগুড়ি-রত চলন্ত গুলিখোরদের গলা টিপিয়া ধরিল। তখন একজন আর একজনকে বলিল, "দেখেছিস, ফটক কত নিচু, আগেই বলেছিলাম, আরো নিচু হয়ে আসা উচিত ছিল।" ইতি

সরোজ

প্রথম গল্পটা: এক গুলিখোর পথে একটা ষাঁড় আসতে দেখে ভয়ে পাশের দেওয়ালের সঙ্গে দুহাত মেলে চোখবুজে দাঁড়িয়ে ছিল, ভেবেছিল ষাঁড়টা তাকে আঁকা-ছবি মনে করে কিছু বলবে না।

পরবর্তী চিঠি হিমাচল প্রদেশ থেকে লেখা।—

গ্রাণ্ড হোটেল
ডালহৌসি, ৩০।৭।৫৯

পূজনীয়েষু,

ছেলেবয়সে পড়েছিলাম, রবীন্দ্রনাথ ছোট বয়সে মহর্ষির সঙ্গে এখানে ছিলেন, খুব ভোরে উঠে এক গ্লাস দুধ খেয়ে উপক্রমণিকার পাঠ মুখস্থ করতেন। মনে পড়ছে জীবন স্মৃতির সেই লাইনটা। শীতের সকালে সে কী দুঃখের উদ্‌বোধন। আমার পাঠ উপক্রমণিকা নয়, উপসংহার। দুঃখ এই যে বেশি দিন থাকতে পারব না; চিরদিন থাকতে পারলে মন্দ হত না। টমাস মানের ম্যাজিক মাউন্টেনের হান্‌স কাস্ট্রপ শেষ পর্যন্ত যাদুপাহাড়ের মায়া কাটিয়ে সমতল প্রদেশে ফিরতে পারেনি। আমাকে ফিরতে হবেই, যদি ফেরার পথে বাস্‌খানা ঘোর কুটিলপন্থের বাঁক ঘুরতে অতলাভিসারী না হয়। বাসের রাস্তা এই বর্ষায় সত্যিই ভয়াল। তবে শুকনো দিনে নয়।

কে বলে পর্বত শৃঙ্গে আশ্রয় আরামের নয়। অন্তত ডালহৌসি পাহাড়ের বর্ষায় বিশেষ অসুবিধা নেই। বৃষ্টি ঝিরিঝিরি মাঝে মাঝে, মেঘ ও রৌদ্রের

লুকোচুরি চলছে, সূর্যের আলোয় ঝলমল। দার্জিলিং-কার্সিয়ংএর তুলনায় ড্যালহৌসি নিরাভরণ, নির্জন। বাড়িঘরের জাঁকজমক কম। আর সব দার্জিলিংএর মতোই। হোটেলে 'ব্ল্যাক সীজন' আট টাকা দৈনিক—ব্যবস্থা বেশ ভাল। কুড়ি টাকা দৈনিক চার্জে, ডজন খানেক পঞ্জাবী পরিবার রয়েছেন হোটেলে। ড্যালহৌসি পঞ্জাবীদের দার্জিলিং। তফাৎ এই যে, এখানে বর্ষাকালেও কিছু কিছু শৌখিন লোক বেড়াতে আসে। বিস্তর হোটেল ও ফারনিশড ফ্ল্যাট। সাহেবলোগ চলে যাওয়ায় জায়গাটার জলুষ কমে গেছে। পাহাড়ের গায়ে অনেক রেস্ট-হাউস আছে, খাওয়া থাকার ব্যবস্থা ভাল। সঙ্গী পেলে থাকা যেত। বক্রোটা, যেখানে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন, আরো হাজার দেড়েক ফুট উঁচু, আরো নির্জন। রাস্তার নাম নর্থ টেগোর রোড। একটা বাড়ির নাম শান্তিনিকেতন হাউস। সুভাষবাবু এখানে ছিলেন ডঃ ধরমবীরের বাড়ীতে। একটা চক্করের নাম সুভাষ চক্র, আর একটা সুভাষ চৌলি।

দিল্লী থেকে এখানে আসা ঠিক করবার কারণ অনেকেই দেরাদুন সম্পর্কে বিরূপ মত প্রকাশ করলেন। দ্বিতীয়ত, এখানে অন্তত একজন পরিচিত স্থায়ী বাসিন্দার খোঁজ পেলাম অশ্বিনী গুপ্তের কাছ থেকে। আমার সেই অনেককাল আগের পঞ্জাবী ছাত্রী পরিবারের সন্তোষ পাশ্রিচা (এখন খান্না) স্বামী সন্তানাদি সহ এখানেই থাকে। মস্ত পরিবার, অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ী। কেউ পরিচিত না থাকলেও অসুবিধা হত না। ইয়াগো রডারিগোকে বলেছিলেন 'Put money in thy pocket'—ডেসডিমোনার সন্ধানেই হোক আর নির্জন বাসেই হোক, 'মানি' পকেটে দরকার মত রাখতে পারলে সব দরজাই খোলা —হৃদয়ের না হলেও আহার বিহারের। দিনপাঁচের খবরের কাগজ পড়িনি, এখানে থাকা পর্যন্ত পড়ব না। এখানে সময় সময়হীন, অতএব দুনিয়ার খবরে কাজ কি? শীত অল্পস্বল্প। আপাতত ৯।১০ তারিখ পর্যন্ত থাকবার ইচ্ছা। পারেন তো মঞ্জুকে অবিলম্বে রওনা করে দিন। পঙ্কজের [পঙ্কজকুমার রায়] এ জায়গাটা খুবই পছন্দ। দুতিনবার এসেছে। ওর কাছে ভ্রমণের টুকিটাকি খবর নিয়েছিলাম। মুশকিল এই যে একলা দূর দূর পাল্লায় দর্শনীয় জায়গায় যেতে ইচ্ছে করে না। প্রণাম নিন। ইতি

সরোজ

সরোজ বাইরে যেখানেই থাক, গেলে বড় বড় চিঠি অনেককেই লিখত, এটা ছিল তার স্বভাব। চিঠি লিখতে তাকে বলতে হত না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

১৯৩৯ বা ৪০ হবে, এক সংস্কৃতিমান মহাপণ্ডিতের বাড়িতে আর এক সততসহৃদয় মহাপণ্ডিতের সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটে। অর্থাৎ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে হারীতকৃষ্ণ দেবের সঙ্গে। ১৯৪০ ধরা যাক বছরটি। আজ ১৯৭০এ হারীতকৃষ্ণের স্মৃতি লিখছি। তাঁর মৃত্যু ঘটেছে ২২শে জুলাই ১৯৬৬। পরিচয়ের দীর্ঘ ২৬ বছর পরে। হারীতকৃষ্ণের সঙ্গে আবার দেখা হয়েছে সম্ভবত ১৯৬১-তে। তারপর তাঁর সঙ্গে, তাঁর সন্ন্যাসীসুলভ গৃহে (যদিও সেটি শোভাবাজারের রাজবাড়ি) একবার মাত্র দেখা হয়েছে। সেখানে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে গিয়েছিলাম একটি সন্ধ্যা কাটানোর উদ্দেশ্যে। এবং তাঁর সঙ্গে, আমার শেষ দেখা হয়েছে ৯।৪।৬৫ তারিখে গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর বাড়িতে গিরিজাশঙ্করের শ্রাদ্ধদিনে। সেদিন তাঁকে আমার ঘরে ধরে এনেছিলাম একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে। তাঁর সঙ্গে প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ও এসেছিলেন। আমি তখন ৬।২ কালীচরণ ঘোষ রোডে বাস করি।

এত কম দেখা হওয়াতেও হারীতকৃষ্ণ ছিলেন আমার মন জুড়ে। তাঁর কথা যখনই মনে হয়েছে, তখনই মন এক আশ্চর্য অপ্রকাশিতব্য আনন্দে ভরে উঠেছে। এমন মধুর একটি চরিত্র সব সময়েই তাঁর পরিচিত সবাইকে নন্দিত করত। একটি প্রাসাদে থাকতেন তিনি একা। সে পরিবেশ তাঁর মতো পণ্ডিত ব্যক্তি বলেই নিশ্চয় আরামের বোধ হয়েছে। তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ। প্রকাণ্ড বাড়ি, অথচ সেইখানে তাঁর একক সাধনা। এমন বিনয়ী এবং নিরহঙ্কার মধুর চরিত্র দুর্লভ। শোভাবাজার রাজবাড়ির যে কজন দেবের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে তাঁদের প্রত্যেকের মধ্যে এই বিনয়, এই মাধুর্য অনুভব করেছি (বিনয়কৃষ্ণ দেবকে দেখিনি, তিনি তো নামেও বিনয় ছিলেন—আচরণে সম্ভবত আরো।)

আমার যে উদ্দেশ্যের কথা বলেছি—সে হচ্ছে তখন আমি সাপ্তাহিক বসুমতীতে "আমি যাঁদের দেখেছি" পর্যায় আরম্ভ করেছি, এবং সেই পর্যায়ে তাঁকে স্থান দেব এটাই ছিল ইচ্ছা। এবং আমার এই পর্যায়ের চরিত্রচিত্রে ব্যক্তিগত অনেক কথাই জানা দরকার ছিল। হারীতকৃষ্ণ দেবের অ্যানাগ্রাম রচনায় ছিল বিশেষ কৃতিত্ব। তাঁর মুখেও শুনেছি, কিন্তু সেসব দীর্ঘদিনের

ব্যবধানে ভুল হয়ে গেছে, তাঁকে সেজন্য আরো একদিন আমাদের বাড়িতে আসতে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল তাঁর একখানা ফোটোগ্রাফ আমি নিজে তুলে তাঁর বিষয়ের রচনাটির সঙ্গে ছাপব, কিন্তু অল্পদিনের ব্যবধানে তাঁকে আর পাওয়া গেল না।

আমি যখন তাঁকে আসতে চিঠি লিখি তখন তিনি তার উত্তরে আমাকে যে চিঠি লেখেন তা এই—

৮-এ রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট

২২।৫।৬৬

পরিমলবাবু

আপনার পত্র পেলুম। আমার অ্যানাগ্রামে হাত আছে এ কথা আপনি বলায় আমি খুশী। আপনার ফোটোগ্রাফিতে হাত আছে সকলেই জানে। পর্বতের কাছে মহম্মদ যেমন গিয়েছিলেন, আমাকেও সেরকম আপনার কাছে ডেকেছেন, সুতরাং যাবো। অবশ্য হিঁদুয়ানি যথাসম্ভব বজায় রেখে, যদিচ মহম্মদের একটা আদর্শ আমি মেনে চলি, অর্থাৎ নিজের ঘর নিজেই পুঁছি। অচল অবস্থা মাঝে মাঝে হয় বটে, সেটা বাতব্যাধির ফলে। তারও একটা ওষুধ পেয়েছি, কাঁচা রসুন যা নাকি খাঁটি হিঁদুয়ানী রাখতে গেলে খাওয়া যায় না, এবং মহম্মদ ভক্তরা খুবই খান। যাক, যেহেতু আপনি স্থানু, আমি একদিন হঠাৎ হাজির হবো, যেদিন আপনার প্রতিবেশী শ্রীমান্ সুশীত রায় আমায় গাড়ী করে নিয়ে যাবে। 'বাহনে বহন করগো মোরে, বেঁধেছ কঠিন প্রণয় ডোরে'—আপনার আর এক প্রতিবেশীকে বলেছিলেন তাঁর সহধর্মিণী শ্রীমতী শোভা রায় একটি অ্যানাগ্রামের অনুসরণে, হয় তো জানেন।

ইতি

ভবদীয় শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব

অপেক্ষায় ছিলাম। আমার এই সময়ে হৃৎপিণ্ডে মাঝে মাঝে ব্যথা হত তাই বাইরে যাতায়াত নিষেধ ছিল। এই চিঠিখানা লেখার তারিখ ২২শে মে, আবার তাঁর মৃত্যু ঘটল ২২শে জুলাই। বলা বাহুল্য আমার পরিকল্পনা সফল হল না।

সুশীত রায়ের বিবাহে তাঁর ও তাঁর স্ত্রী মানসী চৌধুরীর নাম মিলিয়ে একটা ইংরেজী অ্যানাগ্রাম তিনি করে দিয়েছিলেন। শোভা রায় তাঁর স্বামীকে কি বলেছিলেন, তাঁর চিঠিতে উল্লেখ থাকলেও আমি তাঁর সন্ধান

নিতে পারিনি।

হারীতকৃষ্ণ ছিলেন শোভাবাজারের রাজা অপূর্বকৃষ্ণ দেবের প্রপৌত্র। আমাকে এ সব তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছে শ্রীমতী অপর্ণা দেব ও তার জ্যেষ্ঠ অমল দেব। এরা রাজা সার রাধাকান্ত দেবের পরবর্তী পঞ্চম পুরুষের স্তরে। অবশ্য হারীতকৃষ্ণ অথবা অমল, অপর্ণা, সবাইয়েরই ঊর্ধ্ব-পুরুষ রাজা নবকৃষ্ণ দেব।

অপর্ণা হারীতকৃষ্ণকে পরম শ্রদ্ধেয় ও আত্মীয় জ্ঞানে তাঁর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট ছিল, এবং হারীতকৃষ্ণ তাঁর অনেক কথাই তাকে বলতেন। বাইরে গেলে পরস্পর চিঠিও চলত। অপর্ণা নিজে সাহিত্যের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট বলেই রাজবংশের জীবিতদের মধ্যে ঐ একমাত্র লেখকের প্রতি সে এতখানি শ্রদ্ধা পোষণ করেছে। এবং অপর্ণার অক্লান্ত চেষ্টাতেই আমিও হারীতকৃষ্ণের অনেক দুর্লভ লেখা চোখে দেখতে পেয়েছি। মূলে আছে অমল দেবের প্রেরণা।

হারীতকৃষ্ণের পরম বন্ধুদের মধ্যে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নাম করতে হয় আগে। সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ ছিল গভীর। এক জায়গায় দু'জনের চরিত্রের মিল দেখা যায়, সরলতার দিক থেকে, অনাড়ম্বরতার দিক থেকে। হারীতকৃষ্ণের একটি লেখা প্রকাশিত হয় 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' মাসিকের ১৯৬৪-র জানুয়ারি সংখ্যায়। লেখাটির নাম 'সত্যেন বোস আমার কে?' এই ছোট্ট রচনায় উভয়ের সম্পর্কের কথা জানা যাবে, আর ঐ সঙ্গে হারীতকৃষ্ণের সরস রচনা ভঙ্গির কথা। নমুনা—

"আর একজন বোস—রসরাজ অমৃতলাল আমাকে এই প্রশ্ন করেন ১৯১৮ সালের ১লা জানুয়ারী, যখন প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ সবুজ দলকে আহ্বান করি আমি আমাদের বাড়ীতে, সত্যেন বোসের জন্মদিন পালন উপলক্ষে। প্রশ্নটি নিভৃতে করেন এবং তার ভাষা ছিল ইংরেজী—What is Satyen Bose to you? আমি উত্তর দিই ইংরাজীতে—I place him next to my father এখন এ কথা বললে অহঙ্কার প্রকাশ করা হবে, কিন্তু বলবো তবু, কারণ আমার বিশ্বাস পুরুষমাত্রেই অহঙ্কার-প্রিয়, যেমন নারীমাত্রেই অলঙ্কারপ্রিয়। অন্তরের দিক থেকে বাবার সঙ্গে সত্যেনের সাদৃশ্য আমি উপলব্ধি করতুম পদে পদে, আর পদস্খলিতের প্রতি অনুকম্পায় তাঁদের উভয়ের যে সমদৃষ্টি

সেটাও আমার দৃষ্টিবহির্ভূত ছিল না।

"বিজ্ঞানের যে স্তরে সত্যেন বোস আজ রয়েছে, সে স্তরে পর্যবেক্ষণের জন্যে যাওয়ার শক্তি আমার নেই। বিজ্ঞানীদের কারো কারো শ্যেনদৃষ্টি আছে শোনা যায়। আমার আছে শুধু সাধারণ মানুষের শ্রুতি-বোধ। পাখীর ডাক আমি শুনি। সুরেলা আওয়াজে মন সাড়া দেয়। কে জানে, হয়তো বা পাখীর গলায় সুর শুনে সেকালের ঋষিরা সুর-লোকের কল্পনা করেছিলেন আকাশ-মণ্ডলে। লক্ষ্য করবার বিষয়, মহাভারতের সভাপর্বে নারদ ঋষি যুধিষ্ঠিরকে যে চারটি দেব-সভার বর্ণনা দিচ্ছেন তারা সবাই নৃত্য-গীতে মুখরিত। অবশ্য তাদের মধ্যে কুবেরের সভাতেই নাচ-গান বেশী, কেননা কুবের হচ্ছেন ধনপতি। আর যমের সভায় বড় বড় রাজ-রাজড়াদের ভিড়, যেমন ইন্দ্রের সভা সব ব্রাহ্মণে পরিপূর্ণ। আজকালকার বিজ্ঞানী ঋষিরা নারদকে রদ করে দিয়েছেন। তাঁদের বাহন ঢেঁকি নয়, বুদ্ধির ঢেঁকিকে তাঁরা ঘৃণা করেন। বাদুড়কে আদর্শ ধরে রাইট সায়েব নাকি প্রথম অ্যারোপ্লেন তৈরী করেছিলেন। এখন বায়ুমণ্ডল অতিক্রম করে কেউ কেউ মহাকাশে বিচরণ করেন। সত্যেন বোস গাগারিনকে অভিনন্দন জানিয়েছে বটে, কিন্তু তার নিজের গতিবিধি বায়বীয় স্তরে নিবদ্ধ। বিজ্ঞান জানলেও এ জ্ঞান সে হারায় নি যে, গান শুনতে গেলে হাওয়া চাই এবং গানের হাওয়া সে ভালবাসে, যখন তখন এসরাজ বাজায়। পঞ্চাশ বছর আগে হেদোয় বসে যে সব গান গাইতুম, সে সব গান গাইতে এখনো আমি ফরমাস পাই তার কাছে।

"গানের যা বিজ্ঞান তা' না জেনেও সত্যেনের পোষা বেরালদের কেউ কেউ তন্ময় হয়ে প্রভুর হাতের এসরাজ বাজনা শোনে, এটা আমি স্বচক্ষে দেখেছি।...তবে বেরালের নিজ মুখে যে সুর শুনি তা থেকে বাদ্যযন্ত্র তৈরী করা আরো শক্ত। একটা আশ্চর্য গল্প বাল্যকালে শুনেছি। বাবার এক বন্ধু ছিলেন, গৌর মুখুজ্যে, যিনি বিভিন্ন বেরালের স্বর সহযোগে এক সপ্ত-স্বরা পরিকল্পনাকে সার্থক করেছিলেন। সত্যেনের মতন তিনি বেরাল ভালবাসতেন। জোয়ারীসাফ তম্বুরোর তা'র থেকে মূল সুর ছাড়া (upper partials) বের করে আমায় একদিন শুনিয়েও দিলেন। তিনি নাকি জোগাড় করেছিলেন এমন কয়েকটি বেরাল যাদের লেজ ধরে টানলে তাদের ম্যাও শব্দগুলো সা রে গা মা পা ধা নি ইত্যাদি সুর মাফিক বেরুতো। কিন্তু

গৌরবাবু ঐ সব সুরেলা বেরালের সাহায্যে নাকি একটা মীটিং-এ ইংরাজদের জাতীয় সঙ্গীত শুনিয়েছিলেন। আমাদের জাতীয় সঙ্গীত বা জাতীয় অধ্যাপক তখনো জন্মলাভ করেনি। সাদা বাঘও তখন আলিপুরে আসে নি।"...

সমগ্র লেখাটিতে যেমন সত্যেন্দ্রনাথের প্রতি গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি হারীতকৃষ্ণের কৌতুকবোধ ও ভাষা কৌশলও কম প্রকাশ পায় নি। সবটা রচনা এখানে উদ্ধৃত করা সম্ভব হল না, কিন্তু যেটুকু হল, তাতে হারীতকৃষ্ণকে অনেকখানি বোঝা যাবে।

হারীতকৃষ্ণের পূর্বপুরুষ রাজা রাজকৃষ্ণ দেব ও অপর্ণাদের পূর্বপুরুষ রাজা রাধাকান্ত দেব। দুদিক থেকে দুই বংশের ধাপ নেমে এসে হারীতকৃষ্ণের সঙ্গে অপর্ণার কি সম্পর্ক দাঁড়ায় তা হিসাব করতে গিয়ে নিশ্চয় অনেকে পাগল হয়ে গেছেন। এ অনুমানের কারণ, আমিও ছাপা বংশ তালিকা দেখে চেষ্টা করেছিলাম, পারিনি। কেউ বলেন হারীতকৃষ্ণ ওর জ্যাঠামশাই। কিন্তু তা সম্পূর্ণ বিশ্বাস না হওয়াতে সবাই হারীতদা বলে, কারণ সেটাই নিরাপদ। হারীতকৃষ্ণ বাইরে প্রায় সবারই দাদা ছিলেন।

হারীতকৃষ্ণ সম্পর্কে অপর্ণার কাছে দু-একটি মজার গল্প শুনেছি। একবার হারীতকৃষ্ণ এক দোকানে প্রবেশ করে জিজ্ঞাসা করলেন এখানে নারী পাওয়া যায় ব্যাপারটা কি? তারপর দোকানীকে বাইরে এনে দেখালেন। নতুন একটা তেল না কি এক জিনিসের পৃথক একটা বিজ্ঞাপন ঝোলানোতে ষ্টেশনারীর প্রথম দুটি অক্ষর ঢাকা পড়ে গেছে—তাই সাইনটি 'নারী পাওয়া যায়' হয়ে গেছে। আর একবার এক ওষুধের দোকানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হাজার ওষুধ পাওয়া যায় এখানে? এত ওষুধ তৈরী হয় তা তো জানা ছিল না? বিক্রেতা বিভ্রান্ত। তারপর বোর্ডের লেখাগুলির অর্থ ঐ বিক্রেতার মর্মে প্রবেশ করল। হাজা নামক চর্মরোগের ওষুধের নামের সঙ্গে র-যুক্ত হয়ে ঐ মানে হয়েছে। পরে 'হাজা'-র করেছিলেন একটি হাইফেন বসিয়ে।

নিজের বাড়ির নম্বর সম্বন্ধে একবার অপর্ণাকে "এইটে" মনে রেখো বলেছিলেন। বাড়ির নম্বর 8/A,—বাংলা উচ্চারণে এইট-এ—'এইটে' হয়েছে। অন্যকে বুড়ো-আঙুল দেখিয়ে বলতেন 'এইটে' মনে রেখো। শোভাবাজার রাজবাড়ি সমূহের বহু ভাগ। নম্বর মনে রাখা শক্ত। ক্রমাগত

চিঠি লিখলে তবে তো মনে থাকে। তাই নিজের জ্ঞাতিদেরও নম্বর বলতে হয়।

উপরের ঐ রসিকতাগুলি শরৎচন্দ্র পণ্ডিতকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ভাষার দিক থেকে তাঁর যে চাতুর্য ছিল—সেদিক থেকেও শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের সগোত্র ছিলেন তিনি। উদ্ধৃত প্রবন্ধের ('সত্যেন বোস আমার কে?') সামান্য অংশেও তার পরিচয় আছে, যেমন 'পদে পদে'র পরেই 'পদস্খলিত' অথবা 'নারদকে রদ করা' অথবা 'বিজ্ঞান জানলেও এ জ্ঞান সে হারায় নি' অথবা 'গান শুনতে গেলে হাওয়া চাই এবং গানের হাওয়া সে ভালবাসে' (দ্বিতীয় 'হাওয়া' আবহাওয়া বা পরিবেশ অর্থে)। কিন্তু তিনি যে লিখেছেন 'পুরুষ মাত্রেই অহঙ্কারপ্রিয়,—যেমন নারী মাত্রেই অলঙ্কারপ্রিয়'—তাঁর নিজের ভাষালঙ্কার প্রিয়তা কিন্তু এ কথার প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

শ্রীমতী অপর্ণার মুখে তাঁর অনেক কাহিনীই শুনেছি, কিন্তু তার অংশমাত্র দেওয়া সম্ভব হল। তার কাছে হারীতকৃষ্ণ চিঠি লিখতেন, তার মধ্যে কিছু সংবাদও আছে, যেমন শোভাবাজার থেকে ২৬।১।৬৪, ২৬শে লেখা ও ২৯শে পোস্ট করা তারিখ সম্বলিত চিঠির অংশ (অপর্ণা তখন রিখিয়াতে):—"১৮ই কোন লেখ-চার [লেকচারের অনুকরণে নতুন তৈরি শব্দ লেখ-চার অর্থাৎ চিঠি লেখা] দিতে পারিনি কেননা তখন সায়েন্স কলেজে জঙ্গী পাহারা।

"২২শে হঠাৎ সত্যেনের [সত্যেন্দ্রনাথ বসু] আমন্ত্রণে মুরশিদাবাদ চলে গেলুম তারই সঙ্গে। ২৪শে ফিরেছি হাজার দুয়ারী দেখে। সেখানে ভাল উর্দু লাইব্রেরী আছে, রাজা. অপূর্বকৃষ্ণের [হারীতকৃষ্ণের প্রপিতামহ] কোন কেতাব পেলে ওরা জানাবে বলেছে। আসবাব অনেক কিন্তু মেরামত হয় না—ফ্যাশান আমাদের পুরোনো বাড়ীর মতন। কামান, বন্দুক, আর অস্ত্র-শস্ত্রের সমাবেশ প্রচুর রয়েছে একতলায় সাজানো।—নবাব-বাদশাদের প্রাচীন শৌর্যবীর্যের প্রতীক। আকবরের একটি বল্লম ত্রি-ফলা, কিন্তু তা ভিজিয়ে জল খাওয়া যায় না, কেবল কথাটা শুনলে মন ভেজে। শিবের ত্রিশূলের মতন তার চেহারা। অসীমা গোস্বামীর এক মামা জীবন আচার্য্য-চৌধুরীর এক প্রাইমারী স্কুলের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করলে সত্যেন। জীবন-বাবুর বাড়ীরই সংলগ্ন সে স্কুল,...তাঁরই অতিথি ছিলুম আমরা, রাজার হালে রেখেছিলেন।"

এ চিঠিতেও কিছু কথার খেলা আছে। ত্রিফলা দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয় চিঠিখানা মৃত্যুর ৩২ দিন আগে লেখা। (লেখার তারিখ শোভাবাজার, রথযাত্রা ১৩৭৩, অর্থাৎ ইংরেজী ২০শে জুন ১৯৬৬)। চিঠির অংশবিশেষ এই--

······"ওখানকার [হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি] ছবি যা এঁকেছ কালি কলমে, সেটি গ্রুপ-ফোটো হলেও ফোকাস্ ভাল। সত্যেনের কাছে অনেকদিন বাদে সেদিন (৮।৯ জুন) গিয়েছিলুম। সুনীতি চাটুজ্যের সঙ্গে সেখান থেকে ফোনে কথা হল আধঘণ্টা ধরে। সে ৬ই জুন হঠাৎ আমার এখানে এসে দেখা না পেয়ে ফিরে গেল একটা নোট (টাকা নয়) রেখে এই মর্মে যে, দুমাস কাল বারোটা শহরে ঘুরে আমায় ভাঙিয়ে খেয়েছে। ভাষাটা তারই, ব্যাখ্যাটা পেলুম ফোনে। কায়রো প্রভৃতি সহরে সে বক্তৃতা দিয়েছে আমার ঐতিহাসিক থিয়োরি নিয়ে। আবার শীঘ্রই যাবে ইরানে, সেখানেও ঐভাবে ভাঙিয়ে খাবার ইচ্ছা নিয়ে। কিন্তু সিরাজী পান করবার আশা দেয়নি আমায়, যদিও রাজা রাজকৃষ্ণের বংশধর হিসাবে দাবী জানিয়ে রেখেছি।" ·········

হারীতকৃষ্ণ প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস নিয়ে অনেকদিন গবেষণা চালিয়েছিলেন, তার সব প্রমাণ রয়ে গেছে এশিয়াটিক সোসাইটির জারনাল ও অন্যান্য দেশী ও বিদেশী পত্রিকায়। তাঁর মৃত্যুর পর সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁর পরিচয় সহ শ্রদ্ধাপ্রীতি নিবেদন করেছিলেন তাঁর উদ্দেশে, তার কিছু অংশ এই—

········ "হারীতকৃষ্ণ জন্মেছিলেন শোভাবাজারের প্রসিদ্ধ রাজপরিবারে ৩০শে মার্চ ১৮৯৪ সনে। প্রাচীন কালের সমৃদ্ধি ও সমারোহ অনেকাংশে অন্তর্হিত হলেও তাঁদের পৈতৃক ভবনে সাহিত্য ও সঙ্গীতচর্চার আবহাওয়া তখনও বর্তমান ছিল। পিতামহ বাংলায় সামাজিক উপন্যাস লিখেছিলেন। শৈশবে হারীতকৃষ্ণ অন্যান্য নাতি নাতনিদের সঙ্গে তাঁর কাছে অনেক রঙ্গ-রসের কাহিনী শুনতেন। হারীতের শ্লেষ ও কৌতুকপ্রবণতা হয়তো এইভাবে শিশুকাল থেকে লালিত ও পুষ্ট হয়েছিল। পিতা অসীমকৃষ্ণের লাইব্রেরিতে নানা দেশের প্রাচীন ইতিহাসের সংগ্রহ ছিল। এই সব বই তিনি আগ্রহের সঙ্গে পড়তেন।

"শোভাবাজারের রাজবাটিতে বৈঠকী নৃত্যগীত—সাহিত্য নাটক আলোচনার ঐতিহ্য বহুদিনের। ······হারীতকৃষ্ণ এই আবহাওয়ার মধ্যে

মানুষ হয়েছিলেন, নিজে ভাল গাইতে পারতেন, যত্ন করে শিখেছিলেন টপ্পা ঠুংরী ও রবীন্দ্রসঙ্গীত। সমকালীনদের মধ্যে সমজদার বলে তাঁর সুখ্যাতি ছিল।

"প্রথম কয়েক বৎসর স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়াশুনা করে শেষে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরাজীতে এম. এ. পাস করেন। আইনশিক্ষা শুরু করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেই সময়ে প্রমথ চৌধুরী মশায় ল' ক্লাসে অধ্যাপনা করতেন।

"বীরবলী প্রবন্ধগুলি বের হয়ে গিয়েছে, চলতি বনাম সাধুভাষা আন্দোলনে দেশে তখন ভরা জোয়ার। 'সবুজ পত্র' বের হচ্ছে। চৌধুরী মশায়ের ব্রাইট স্ট্রীটের বাড়ীতে প্রতি হপ্তায় বসতো সাহিত্যের আসর। রবীন্দ্রনাথকে কখনও সেখানে দেখা যেত, সঙ্গীতের আসরে দিলীপ রায় প্রমুখ অনেকে গানবাজনা করতেন। ......নবীনদের মধ্যে ধূর্জটিপ্রসাদ তখন প্রমথ চৌধুরীর বিশেষ স্নেহের পাত্র—তাঁর সঙ্গী হারীতকৃষ্ণও সেখানে যাওয়া আসা করতেন। ......এই ভাবে তাঁরই উৎসাহে হারীত এবং আরও অনেকের বাংলা লেখায় হাতেখড়ি হয়।"......

এই নিঃসঙ্গ, স্বনির্ভর, আত্মতৃপ্ত এবং পরম অমায়িক ব্যক্তিটিকেই স্মরণ করেছিলাম—আমার 'এবারে আসি ভাই ?' নামক গল্পটি ('শুভবিবাহ ও অন্যান্য গল্প') লেখার সময়।



অমল হোম ও পত্নী ইলা হোম

ফোটো : পরিমল গোস্বামী, ১৯৩৯

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

অমল হোমের অনেক চিঠি। নানাভাবে আমাকে তাঁর সংস্পর্শে আসতে হয়েছিল। প্রথম পরিচয় ১৯৩৩ থেকে, অর্থাৎ আমি যখন সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করলাম তার কিছু পর থেকে।

১৯৫০-এ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে একটি রচনা লিখি যুগান্তরে তাঁর মৃত্যুর পর। তারও আগে ১৯৩৩ সনে, একটি ভ্রমণ স্মৃতি লিখি যার মধ্যে বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান। ১৯৩৭ সনে পাটনা ভ্রমণের স্মৃতি লিখি তার মধ্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, বনফুল প্রভৃতির কথা ছিল। ১৯৩৭ সনে রবীন্দ্রনাথের কথা লিখি।

সম্ভবত সেই সব স্মরণ করেই অমল হোম আমাকে লিখলেন—

১৩৯ বি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা-৪
৯ই অকটোবর, ১৯৫২

পরিমলবাবু,

আপনি আমার বিজয়ার সম্ভাষণ ও আলিঙ্গন গ্রহণ করিলে সুখী হইব।··· সময় ও সুবিধামত একদিন আসিবেন। অনেকেরই তো "স্মৃতিকথা" ছাপিলেন ও ছাপিতেছেন—অমল হোমের স্মৃতিকথার মূল্য তাঁহাদের সকলের অপেক্ষাই অধিক, এই সামান্য কথাটি যে কেন, পরিমলবাবু, আপনি এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না তাহা আমার দুর্বোধ্য !!! সাক্ষাতে আপনাকে বুঝাইয়া দিব। আপনি বুদ্ধিমান, বেশি দেরী হইবে না ! ! !!

আপনার প্রীতিবদ্ধ
অমল হোম

১৯৫৬ থেকে আমি মাসিক বসুমতীতে আমার স্মৃতিকথা লিখতে আরম্ভ করি প্রাণতোষ ঘটকের প্রস্তাবে। আমার স্মৃতিকথার যে, কোনো মূল্য থাকতে পারে এমন কল্পনা আমার তার আগে কখনো হয়নি, কিন্তু প্রাণতোষ আমার সমস্ত যুক্তি খণ্ডন করে আমাকে লিখতে বাধ্য করল। তারপর দুএক কিস্তি লিখেই আমার নিজের কাছে স্মৃতিকথা লেখার একটা নেশা ধরে গেল।

মাসিক বসুমতীতে তখন থেকে ১৮ মাস 'স্মৃতিচিত্রণ' (স্মৃতির ছবি আঁকা অর্থে) এই নামে, ও পরে দ্বিতীয় স্মৃতি (১৯৬১ থেকে) আরম্ভ করি। স্মৃতি-চিত্রণে অমল হোম সম্পর্কে যা লিখেছিলাম তার অংশ—

"১৯৩৩ সনে রামমোহন স্মৃতি শতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান হয়। এই শত-বার্ষিকীর এক প্রধান উদ্যোক্তা ও প্রচার সচিব অমল হোমের সঙ্গে এই সময় আমার পরিচয় ঘটে। তখন তিনি ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের সম্পাদক। মধুরভাষী, দীর্ঘদেহ এবং ব্যক্তিত্বে অতি স্বতন্ত্র। তিনি যেখানে উপস্থিত থাকেন সেইখানে তিনি তাঁর চার ধারে একটি অনুপেক্ষণীযরূপে আকর্ষক আবেষ্টন ফুটিয়ে তোলেন, তাঁর প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারা যায় না। ক্রমে তাঁর আরো কাছে আসবার সুযোগ ঘটেছে নানা উপলক্ষে, এবং তাঁর বন্ধুবাৎসল্যে মুগ্ধ হয়েছি। অমল হোম বাংলা রচনাতেও সিদ্ধহস্ত, সম্প্রতিকালে প্রকাশিত তাঁর 'পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ' তার সাক্ষ্য বহন করছে।"···

এইটি আমার স্মৃতিচিত্রণ পর্যায়ে মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হওয়ার পর অমল হোম লিখছেন—

Damodar Valley Corporation
Anderson House, Alipur.
Calcutta-27
৬।৩।৫৮

প্রিয়বরেষু,

ভাই পরিমলবাবু, আপনি বন্ধুবৎসল···আমার সম্বন্ধে আপনার স্মৃতি-কথায় যে কটি কথা লিখেছেন—এর চাইতে বেশি কিছু আপনি লিখতে পারতেন না—তাতে আপনার প্রীতির অকুণ্ঠ প্রকাশ। এ প্রীতি চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকুক আপনার আমার মধ্যে।···ইতি

আপনার অমল

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের একটি রচনায় (যুগান্তরে ছাপা হচ্ছিল তাঁর 'যাঁদের দেখেছি' পর্যায়ে যতদূর মনে পড়ে। পরে ছাপা বইতে তা আর দেখিনি।) লিখেছিলেন সুরেশ সমাজপতি রবীন্দ্রনাথকে মদ্যপান করতে দেখেছিলেন। (এই সময়ে আমি কয়েকজন শিল্পীকে নিয়ে রচনা লিখি সে কথা আগে বলা হয়েছে।) অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যা লিখেছিলাম সে সম্বন্ধে, ও হেমেন্দ্রকুমারের স্মৃতিকথা সম্পর্কে, একখানা চিঠির অংশ বিশেষ এই—

সেপটেম্বর ৫
১৯৫০

প্রিয়বরেষু,

পরিমলবাবু, যুগান্তরের রবিবাসরীয়তে অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আপনার লেখাটি বড় ভালো লাগল! অমন অল্প পরিসরে আপনি পূর্ণতা দিয়েছেন আপনার বক্তব্যকে—'মিনিয়েচার' ঠিক। তাছাড়া আপনি ওঁর ছবির শিল্পসৃষ্টির ব্যাকগ্রাউণ্ডটি ধরেছেন চমৎকার।...

আমার বন্ধু হেমেন্দ্রকুমারের অতি সুন্দর স্মৃতিকথা আর একটু বেশি দিলে—মানে, হেমেন্দ্র আর একটু বেশি লিখলে বড় চমৎকার হয়! অমন মিঠে-কড়া হাত—খুব কম লোকেরই আছে। তবে সমাজপতি রবীন্দ্রনাথকে কোন এক সময়ে সুরা পান করতে দেখে থাকবেন—বিচিত্র নয়। রবীন্দ্রনাথ যৌবনে মদ্যপান করেছেন—হুইসকি ব্র্যান্ডি নয়—শেরি বরগণ্ডি। তিনি spirits সহ্য করতে পারতেন না, কিন্তু wine-এ তাঁর এক সময়ে অরুচি ছিল না। কিন্তু অমিতাচারী যেমন কোন বিষয়েই হওয়া তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল মদ্যপান সম্বন্ধেও ঠিক তেমনই ছিল তাঁর মিতাচার। অনাচার যেকোন বিষয়েই তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। ১৯২৬-এ য়ুরোপ ভ্রমণের সময় হাংগারির একটি মধ্যযুগীয় মোনাস্টারিতে মংকদের চোলাই, সারা কনটিনেন্টে লোক-প্রসিদ্ধ TOQUAI নামে একটি পরম স্বাদু সুগন্ধ পানীয় তিনি উপহার পান। সে দেবভোগ্য সুরার প্রসাদ পেয়েছি তাঁর কাছ থেকে, সে সৌভাগ্য ঘটেছে আমার। হেমেন্দ্র যদি আসেন, বলবেন তাঁকে আমার ভালবাসা জানিয়ে।

যাক এ সব কাহিনী। আমার দরকার আপনার কাছে আমার হিন্দু মুসলিম মৈত্রী সাধক বন্ধু অতুলানন্দ চক্রবর্তীর ঠিকানা, আমার সরকারী কাজে প্রয়োজন। ..অতুলানন্দবাবুকে বিশেষ প্রয়োজন আমার।

আপনার প্রীতিমুগ্ধ অমল হোম

আর একখানা চিঠির কথা বলতে আগে আমার 'স্মৃতিচিত্রণ' থেকে আরো একটি অংশ উদ্ধৃত করতে হল:

..."১৯৩৮-৩৯ সনে ক্যামেরার কাজে একটু বেশি মাত্রায় আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। ১৯৩৬ সনেই এর আরম্ভ, আধুনিক একটি [রিফলেক্স] ক্যামেরা কেনার পর থেকে। নীরদচন্দ্র চৌধুরী আমার কয়েকটি ছবি বাংলার শ্রী এই নামে [তৎসম্পাদিত] 'নূতন পত্রিকা'য় ছাপেন। সেগুলো অবশ্য

দশবছর আগে [ফিলড্ ক্যামেরায়] তোলা। ছবিগুলি ছিল ধানচাষ সম্পর্কে। সেই সময়ে শম্ভু সাহার কয়েকখানি চমৎকার ছবি এই কাগজে ছাপা হয়। ফোটোগ্রাফে চিত্রধর্মিতা ফোটাতে পারলে এদেশে তার কিছু মূল্য হয়...পূর্বে কিছু দেখেছি। কিন্তু ফোটোগ্রাফির আধুনিক পর্যায়ে 'নূতন পত্রিকা'য় নীরদচন্দ্র চৌধুরী আমাদের ছবি ছেপে এক নতুন যুগের সূচনা করলেন। তিনি পরের বছর অমল হোম সম্পাদিত [অমলবাবু তখন ছুটিতে ছিলেন] মিউনিসিপ্যাল গেজেটের বার্ষিক সংখ্যা সম্পাদনকালে আমার কয়েকখানা ছবি আর্ট প্লেটে ছাপেন। তারপর থেকে কয়েক বছর স্বাস্থ্য সংখ্যা ও বার্ষিক সংখ্যায় অমল হোম আমার অনেক ছবি ছাপেন। তাঁর পরিকল্পনায় পরে ছাপার বৈচিত্র্য এবং ছবির মর্যাদা এবং আমার উৎসাহ আরো বেড়েছিল। এই কাগজেই শম্ভু সাহার ছবি দেখে আমি তাঁর ভক্ত হয়েছিলাম। অধ্যাপক হিরণকুমার সান্যালেরও কয়েকখানি অতি সুন্দর ছবি দেখেছি মিউনিসিপ্যাল গেজেটে।"

ফোটোগ্রাফিতে অমল হোমেরও যথেষ্ট দখল ছিল, কিন্তু এই সময়ে তিনি কয়েকখানি ফোটোগ্রাফে আমার উপর নির্ভরশীল হয়েছিলেন। এ সম্পর্কে তাঁর এই চিঠিখানিতে তার কিছু প্রমাণ মিলবে—

৯৯।১-এন কর্নওয়ালিস স্ট্রীট
কলিকাতা
মার্চ ৩১, ১৯৩৮

ভাই পরিমলবাবু,

আজ রাত্রিতে সুভাষবাবুর এলগিন রোডের বাড়িতে তাঁহার একখানি ছবি তুলিতে হইবে। আপনাকে চাই। আজ দুপুরে আমার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা করিবেন, কখন কোথায় আপনাকে যাইতে হইবে সব ব্যবস্থা করিয়া দিব। আমাকে let down করিবেন না।

আপনার অমল

আমি অমলবাবুকে let down করিনি। আমার উপর নির্ভরশীল ছিলেন তিনি এ বিষয়ে, অতএব আস্থা ভঙ্গ করার অথবা বিব্রত করার কথা আমার পক্ষে অকল্পনীয়। তাছাড়া এই উপলক্ষে সুভাষচন্দ্রের কাছাকাছি আসার প্রথম সুযোগ আমার পক্ষেও কম আকর্ষক ছিল না।

অতএব অমলবাবুর কাছ থেকে এই চিঠি পাওয়া গেল—

The Municipal Gazette etc
Calcutta March 31, 1938

My dear Subhas Babu,

As arranged I am sending my friend Mr. Parimal Goswami, M.A, for the special sitting for a photograph for the Ninth Health Number of the "Calcutta Municipal Gazette", which you have so kindly promised to give.

I have asked Mr. Goswami to take a photograph of yours at your writing table,—in the act of writing a message for the Special Number, for which I shall see you on the 5th after the meetings of the Working Committee are over.

I shall try to come at 8-30; in case, however, I am unable to turn up, I do hope Mr. Goswami will be given the necessary facilities.

With kindest regards
I am yours v. sincerely
Amal Home

Sri Subhas Chandra Bose

এ চিঠি পেয়েছি, কিন্তু সুভাষচন্দ্রকে আর তা দেবার অবকাশ ঘটল না, কারণ এলগিন রোডে গিয়ে পাছে আমার কোনো অসুবিধায় পড়তে হয়, সেজন্য অমলবাবু নিজেই আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন। এ সময়ে আমি ব্রিটিশ ইনডিয়ান স্ট্রীটের আর্ট প্রেসে সচিত্র ভারত সম্পাদনে নিযুক্ত। কিন্তু তবু ক্যামেরা নিয়ে পথে পথে ঘোরার সময়ের অভাব হত না। ক্যামেরা কিছুকাল আমাকে নেশার মত পেয়ে বসেছিল। মিউনিসিপ্যাল গেজেটে আমার এবং অধ্যাপক হিরণকুমার সান্যাল, অথবা শম্ভু সাহা ও হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (শনিমণ্ডলের পুরাতন পাপী, এ সময় নিউ থিয়েটার্সে'র প্রচার সচিব) প্রভৃতির তোলা কলকাতার নানা দৃশ্য অতি উচ্চাঙ্গের মুদ্রণে ছাপা হত, সেজন্য ক্যামেরা নিয়ে অবসর পেলেই পথে পথে ঘোরার উৎসাহ পেয়েছি খুব। আইকোফ্লেক্স, কন্‌ট্যাক্স, লাইকা, রোলিফ্লেকস পর পর ব্যবহার করেছি। এ সব ছোট ক্যামেরা ছবি তোলার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল।

সুভাষচন্দ্রের ফোটোগ্রাফ তুলেছিলাম ফ্ল্যাশ লাইটে, রোলিফ্লেকস ক্যামেরায়। তিনি উপর থেকে নেমে এসে তাঁর লেখাপড়ার ঘরে বসলেন।

বললেন একটু জ্বর হয়েছে। আমরা তুজনে বসবার ভঙ্গিটি ঠিক করে দিলাম। তিনি হাসিমুখে পোজ দিলেন। ছবিটি ভাল হয়েছিল, অনেক জায়গাতেই ছাপা হয়েছে। (শুনেছি তা থেকে ক্যালেণ্ডারও তৈরি করেছে কোনো অসাধু ব্যবসায়ী।)

অমল হোমের মনটা কতখানি উদার ছিল তার একটি দৃষ্টান্ত দেব। আমার লেখা তিনি ভালবাসতেন। আমার 'স্মৃতিচিত্রণ' বিষয়ে তাঁর প্রশংসা আমাকে অনেকখানি উৎসাহ দিয়েছিল। আর একখানি বই, নাম 'সপ্তপঞ্চ' তাঁকে দিয়েছিলাম। তিনি সে বই যত্ন করে পড়ে আমাকে চিঠি দিয়েছিলেন। সে চিঠিতে ঐ বইয়ের বিষয়ে যে সব কথা তিনি বলেছেন, তা অবশ্যই বই-এর সমালোচনা নয়। আমার লেখা তাঁর ভাল লেগেছে, এই কথাটা তিনি প্রাণ খুলে প্রকাশ করেছেন। এই প্রকাশের ভিতর দিয়ে অমলবাবুর মনের অনেকখানি পরিচয় পাওয়া যায়, অন্তত আমি পেয়েছি। ভাল লাগলেও জোরের সঙ্গে তা বলায় মনের খুব জোর দরকার। লজ্জা-সংকোচ ত্যাগ করা দরকার। যথেষ্ট মনোবল না থাকলে এ কাজ করা যায় না।

আগেই বলেছি, 'সপ্তপঞ্চ' (মিত্র ও ঘোষ প্রকাশিত, এখন বাজারে নেই) বইখানি বিষয়ে অমলবাবু যা লিখেছেন তা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। চিঠিখানা উদ্ধৃত করার আগে এই ভূমিকাটা দরকার মনে হল। তাঁর চিঠি—

১৬১।বি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা—৪
৫।১২।৫৭

প্রিয়বরেষু,

আপনার বইখানি—'সপ্তপঞ্চ'—পেয়ে বড় ভালো লাগলো। আপনার এ স্মরণে আমি সুখী। দেখা-সাক্ষাৎ আজকাল তো হয়ই না—কিন্তু নানা-ভাবে অনুভব করিনি কি আমাদের তুজনের অন্তরে স্থান রয়েছে তুজনার। অনুরাগ ও শ্রদ্ধা এই তুটি বন্ধনেই আমরা বাঁধা।

"সপ্তপঞ্চ"—সাতপাঁচ-এর লেখার প্যাঁচ আপনার হাতে একেবারে অমোঘ। Between the lines (বাংলা কী?) যারা না পড়বে তারাই হবে বঞ্চিত। আপনি যা বলেছেন তা তো অতি চমৎকার করেই বলেছেন, কিন্তু যা

বলেননি, তা আরো ভালো করে বলেছেন, এমনটি আর কারুর লেখায় দেখিনি।

সবচেয়ে ভালো লাগে আপনার লেখার urbanity (বাংলা কী?) এমন ভদ্র, এমন সৌজন্যপূর্ণ। যেখানে কশাঘাত, সেখানেও অমায়িকতা। রচনার সৌষ্ঠব বড় জিনিষ, কিন্তু তার চাইতে এ বস্তু এতটুকুও কম নয়।...

আপনার এ বই আমার Bedside Books-এর মধ্যে আসন পাতলো। রাত্রে যখন ঘুম আসবে না—প্রায়ই আসে না—তখন বাঁ-হাতে সুইচ টিপবো আর ডান হাত বাড়িয়ে নেব আপনার বইখানি। এ দুটি লেখার—'কি বই পড়ব' আর 'কি লেখা পড়ব' জুড়ি মেলা ভার। ইতি

আপনার প্রীতিমুগ্ধ অমল হোম

এই দুটি রচনার কথায় মনে পড়ে মাসিক বসুমতী সম্পাদক প্রাণতোষ ঘটকের কথা। এই রচনা দুটি ১৯৫৪ সনে মাসিক বসুমতীতে ছাপা হয়েছিল, এবং উভয়ের বিষয়বস্তুই প্রাণতোষের অনুরোধে। প্রবন্ধের দুটি শিরোনামও সে-ই আগে বলে দিয়েছিল।

প্রাণতোষের কাছে আমি আমার স্মৃতি-বিষয়ক রচনাগুলির জন্য একান্তভাবে ঋণী। ১৯৫৬ সনে সে-ই আমাকে ক্রমাগত প্রেরণা দিয়ে "স্মৃতিচিত্রণ" লিখিয়েছিল। আমার স্মৃতি-কথার কি নাম হবে এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল, এ বিষয়ে দ্বিধা ছিল, এবং লিখব যে, তা কখনো চিন্তাও করিনি। কিন্তু প্রাণতোষকে এড়ানো গেল না। স্মৃতিচিত্রণ নাম দিয়ে লিখতে আরম্ভ করলাম। ১৯৫৬ ডিসেম্বর থেকে ছাপা শুরু হল। ১৭টি কিস্তি লেখার পর আমি বললাম,—এবারে থামি। প্রাণতোষ বলল, না—আরো লিখতে হবে। শেষে একটা রফা হল। বললাম আপতত আর একটি কিস্তি দিয়ে শেষ করি, পরে দ্বিতীয় স্মৃতি লিখব।

প্রাণতোষের চাপে ১৮টার কিস্তি ১৯৫৮ সনের মে মাসে সেটি প্রকাশিত হল। শেষে মনে হয়েছিল এই অধ্যায়টা না লিখলে আমার লেখা অসম্পূর্ণ থেকে যেত। সম্ভবতঃ 'স্মৃতি-চিত্রণ' পুস্তকের মর্যাদা বাড়িয়েছিল ঐ শেষ কিস্তিটি। ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায় আমাকে লিখেছিলেন, "তোমার সার্থকনামা স্মৃতি-চিত্রণ পড়ে গাইড নিয়ে তীর্থ পর্যটনের আনন্দ ও পুণ্য সঞ্চয় করলুম। তুমি আত্ম-চরিত লিখতে চাও নি এবং লেখনি। নিজেকে তুমি পাঁচজনের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছ...এতে অত্যন্ত সুখী হয়েছি।

একটা গুরুগম্ভীর বক্তৃতা ক'রে তোমাকে তাক লাগাতে পারলুম না, কারণ তোমার শেষ পর্ব আমার মুখ ভোঁতা করে দিয়েছে।"

দ্বিতীয় স্মৃতি লেখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। মাসিক বসুমতীতে এটি লিখতে আরম্ভ করি ১৯৬১ থেকে। কিন্তু বছরখানেকের মধ্যে চীনের আক্রমণে এবং মনোজ বসুর আক্রমণে তাড়াতাড়ি শেষ করতে হল। বই সে ছাপাতে চায় অবিলম্বে।

প্রাণতোষের একান্ত আগ্রহে যা লিখতে আরম্ভ করেছিলাম, এবং যে লেখা আমার কল্পনার বাইরে ছিল, তা ক্রমে এত ভাল লাগতে লাগল যে সেই প্রেরণা থেকেই পরে 'আমি যাঁদের দেখেছি' এবং বর্তমান 'পত্রস্মৃতি' লিখতে সাহসী হয়েছি। মনে হচ্ছে সাহিত্য ক্ষেত্রে না হোক, এক একটা কালের নানা কথার অংশ জুড়ে জুড়ে এই সব স্মৃতিকথা লেখার অন্য দাম আছে। সে দাম কি, তা অনেক দিন পার হলে নিশ্চয় বোঝা যাবে। প্রথম দুখানা স্মৃতিকথা লেখায় প্রাণতোষের যে তাড়া ছিল তাতে তার সম্পাদকীয় মন কোন্ পথে চলত তারও কিছু আভাস অবশ্য পাওয়া যায়। 'আমি যাঁদের দেখেছি' লেখার মূলে পুলিনবিহারী সেনের প্রেরণা। 'পত্রস্মৃতি'তে আত্ম-প্রেরণা। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ স্মৃতিচিত্রণ প্রাণতোষের নামে উৎসর্গ করেছিলাম। সেও তার 'রাজায় রাজায়' নামক বড় উপন্যাস আমার নামে উৎসর্গ করেছিল। 'আমি যাঁদের দেখেছি' পুস্তকখানা, প্রেরণাদাতা পুলিনবিহারী সেনের নামে উৎসর্গ করেছি।

এই প্রসঙ্গে আমার নামে যাঁরা বই উৎসর্গ করেছেন তাঁদের নাম উল্লেখ করে এখানেই আমার কিছু ঋণ শোধ করি, কারণ আমার গ্রন্থ সংখ্যা খুবই কম, তাই প্রত্যুৎসর্গের কাজটা অনেক নতুন বই ছেপে আর হবার সম্ভাবনা নেই। ১৯৩৭ থেকে ১৯৭০-এর মধ্যে আমাকে যাঁরা বই উৎসর্গ করেছেন তাঁরা:

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, বনফুল, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, অন্নপূর্ণা গোস্বামী, নবেন্দু ঘোষ, অনিলবরণ ঘোষ, বাণু ভৌমিক, সরোজ আচার্য, মায়া বসু, প্রাণতোষ ঘটক, সুধীররঞ্জন মুখোপাধ্যায়, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, মনোজ বসু, জ্যোতির্ময় ঘোষ (ভাস্কর), হেমেন্দ্রকুমার রায়, মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য, বিনয় ঘোষ (২ খানা), রণজিৎ কুমার সেন, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বাণী রায়, তারকমোহন দাস, আবদুল আজিজ আমান, কালিদাস রায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, কনক মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, লীলা মজুমদার।



বিক্রমখোলের পথে : প্রমোদ দাসগুপ্ত কিরণকুমার রায় ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ফোটো : পরিমল গো[illegible], ১৯৩৩

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একখানা চিঠি দেখছি। চিঠিখানা— "From the Headmaster"-ছাপা লেটার হেডে। ঠিকানা বা তারিখ নেই, প্রাপ্তির তারিখটি আমি লিখে রেখেছিলাম—২১৷৩৷৪১। চিঠিটি এই—

প্রিয় পরিমলবাবু,

আমার ফটো একখানি পত্র বাহকের হাতে দিলে বিশেষ বাধিত হবো।···

ভবদীয়

বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়

ইতিপূর্বে বিভূতিবাবুকে তাঁর জীবিতকালেই ব্যাখ্যা করেছি আমি নানা ভাবে, নানা লেখায়। তবে "আমি যাঁদের দেখেছি" বইতে যেভাবে করেছি তেমন সামগ্রিকভাবে অন্য কোথাও করিনি। তাঁর ফোটোগ্রাফের কথাও সেই লেখায় আছে। আমি অনেকদিন থেকেই বলছিলাম, আজকাল খুব ফোটো তুলছি, আপনার ছবি তুলব, তৈরি হয়ে আসবেন। কিন্তু তিনি গরজ করেননি। আমরা দুজনে বন্ধু ফণীন্দ্রনাথ রায়ের ব্যবস্থায় পাবনা গিয়েছিলাম অন্নদাগোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে। তারিখ ১৯৩৯, ৩০শে জুলাই। বিভূতিবাবু প্রধান অতিথি, আমি অপ্রধান অতিথি। সেখান থেকে ফিরে আসার পরেও বিভূতিবাবুকে অনেকদিন বলেছি এবারে আসুন। আসেন মাঝে মাঝে, কিন্তু সম্পূর্ণ অপ্রস্তুতভাবে। অন্য উপলক্ষে। হঠাৎ ১৯৪১ সনে এসেই নিজে থেকে বললেন, আজ ছবি তুলে দিন। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখি, মুখ আগের মতোই ক্ষুরস্পর্শহীন। হয়তো দুদিন দাড়ি কামাননি। বললাম, চলবে না, বহু দিন বলেছি দাড়ি কামিয়ে আসবেন। বিভূতিবাবু দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, এতে কোনো ক্ষতি হবে না। আমি দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম সামনে এগিয়ে দিলাম, বিভূতিবাবু অসহায়ের মতো আমার আদেশ পালন করলেন। তারপর সে ফোটো তাঁর এমন পছন্দ হয়েছিল যে পরে অতিরিক্ত কপি দুএকখানা চেয়ে নিয়েছিলেন। উপরের চিঠি সেই ফোটোগ্রাফের প্রসঙ্গেই।

বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রথম ভ্রমণ আমার ১৯৩৩ সনে। সম্বলপুর জেলায়, বিক্রমখোল নামক স্থানে। সেস্থান লোকালয়ের বাইরে—অরণ্য দেশে। সেখানে এক অদ্ভুত শিলালেখ আবিষ্কৃত হয়েছিল, তাই দেখতে গিয়েছিলাম, সঙ্গে আমার দুজন বন্ধু ছিলেন কিরণকুমার রায় (তখন বঙ্গশ্রীর সহকারী সম্পাদক) ও প্রমোদ দাসগুপ্ত (তখন সাব ডেপুটি, বিভূতিবাবুর বিশেষ বন্ধু)।

এই ভ্রমণে বিভূতিবাবুর চরিত্রের বহু দিক এক সঙ্গে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম। তাঁকে ভাল করে জানা সত্ত্বেও এমন নিবিড়ভাবে দেখবার সুযোগ আর পাইনি। বিপজ্জনক অভিযান ছিল এটি। আদি যুগের দেহরক্ষী সঙ্গে নিয়ে বহুদূরের হাঁটা পথে অরণ্যে প্রবেশ করেছিলাম আমরা। বিস্তারিতভাবে 'পথে পথে' বইতে স্থান পেয়েছিল এর সমস্ত বৃত্তান্ত। তারপর প্রসঙ্গত "আমি যাঁদের দেখেছি" বইতে। পথে পথে এখন আর ছাপা নেই। তবে সে সময় যে ছবি তুলেছিলাম (তা আমার কাছে এতদিনও আছে—৩৭ বছর পরেও) সেগুলি "আমি যাঁদের দেখেছি" বইতে পুনরায় দিতে পেরেছি।

কিন্তু ভ্রমণ কাহিনী বর্ণনায় দুজনের লেখায় মিল হল না। বিভূতিবাবু যদিও ভ্রমণ শেষে বঙ্গশ্রীতে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখেছিলেন, তবু পরে 'অভিযাত্রিক' বইতে তা বিস্তার করতে গিয়ে অনেক তথ্য ভুলে গিয়েছিলেন। আমি কয়েককটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

আমরা বেলপাহাড় স্টেশন থেকে রওনা হবার সময়ের কথা একটি স্থানে বিভূতিবাবু অভিযাত্রিক পুস্তকে লিখছেন—

"আমাদের সঙ্গে রইল গ্রাম্য পাটোয়ারী ও দুজন ফরেস্ট গার্ড—একখানা গরুর গাড়িতে আমাদের জিনিসপত্র চললো, কিন্তু আমরা পায়ে হেঁটে যাওয়াই পছন্দ করলুম।"...

আমি লিখছি ('পথে পথে' বইতে)—"আমি বললাম আমরা পায়ে হেঁটেই যাব, কিন্তু সঙ্গে অন্তত একখানা গোরুর গাড়ি থাক, যদি সামর্থ্যে না কুলোয়, তখন ব্যবহার করা যাবে। বিভূতিবাবুর তাতেও আপত্তি ছিল, কিন্তু আমি জোর করে বলাতে একখানা গাড়ি আমাদের সঙ্গে যাবে ঠিক হল।...সঙ্গে দুজন ভারী (অর্থাৎ বাহক) বাঁকে করে আমাদের বিছানা ব্যাগ ইত্যাদি বয়ে নিয়ে চলল। গোরুর গাড়িতে আর কিছু দিলাম না, খালি গাড়ি আগে রওনা হয়ে গেল।"

অর্থাৎ গোরুর গাড়ি খালি ছিল, যদিও আসবার সময় নয়। তারপর বিভূতিবাবু লিখছেন, "আমরা পথের মাঝখানে বসে ফ্লাস্ক থেকে টিনের কাপে চা খেলাম।" এটি কিন্তু সম্পূর্ণ ভুলের ব্যাপার। আমাদের সঙ্গে চায়ের থারমস ফ্লাসক বা অন্য কোনো রকম ফ্লাসক বা টিনের কাপ একটিও ছিল না। এবং হাঁটা পথের মাঝখানে বসে কিছুই খাইনি।

বিভূতিবাবু লিখছেন "আমাদের সঙ্গে ফ্লাসকে চা ছিল আর ছিল মারমালেড ও পাঁউরুটি। মারমালেডের টিনটি এই প্রথম খোলা হল। প্রমোদ পরিমল রুটি কেটে বেশ করে মারমালেড মাখিয়ে সকলকে দিলে। কিরণ চা দিল সবাইকে টিনের কাপে।

"কিছুক্ষণ পরে কিরণ রুটিতে মুখ দিয়ে বলল—এত তেতো কেন?…

"আমিও রুটি মুখে দিয়ে সেই কথাই বললুম। ব্যাপার কি? শেষে দেখা গেল মারমালেডটাই তেতো। মারমালেড নাকি তেতো হয়, পরিমল বললে। কি জানি বাপু; চিরকাল পড়ে এসেছি মারমালেড মানে মোরববা....পরিমল এটা কিনে এনেছিল—তার উপর সবাই খাপ্পা।"…

সমস্ত ব্যাপারটাই বিভূতিবাবু ভুলে গিয়ে এরকম ওলট পালট করেছেন। চা প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ কাল্পনিক, কিন্তু মারমালেড প্রসঙ্গে আমি যা লিখেছি তা এই—

"চক্রধরপুর স্টেশনেই বিভূতিবাবুর দৃষ্টি সম্পূর্ণ ঘুরে গেল। বাইরের দৃশ্যে তাঁর মানসিক সোডার বোতল থেকে আর বুদ্‌বুদ উঠছে না। তিনি কেমন যেন দমে গেছেন। তাঁর যে চোখ ছিল এতক্ষণ বাইরের ফুলের দিকে, সেই চোখ ফিরল ফেরিওয়ালাদের ফলের দিকে। লজিক ঠিক আছে, ফুল থেকেই ফল। বিভূতিবাবু নৈসর্গিক অভিব্যক্তিধারা অনুসরণ করে বললেন 'পেঁপে খাব।'…ইতিমধ্যে মারমালেড নিয়ে যে গোলমালের সূত্রপাত হয়েছিল তা বলা হয়নি। ঐ টিনটা যখন প্রথম খোলা হয় তখন বিভূতিবাবু তার স্বাদ গ্রহণ করে ভয়ানক ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন।…তিনি বললেন খাবার ব্যাপারে এই চালিয়াতি তিনি দুচক্ষে দেখতে পারেন না। সব বিষয়ে parvenu হব কেন?—ইত্যাদি।…তিনি টিনটি আমাদের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে পকেটে পুরলেন। মারমালেড তিনি কাউকে খেতে দেবেন না।"

অর্থাৎ মারমালেডের টিন ট্রেনের মধ্যে খোলা হয়েছিল, বেলপাহাড়ে

বিক্রমখোলের হাঁটা পথে নয়। এবং ফরাসী 'পারভেন্যু' কথাটি তিনি ঐ মারমালেড প্রসঙ্গেই বলেছিলেন, এবং তাঁর মুখেই আমি প্রথম শুনি এটা।

বেলপাহাড়ে বিভূতিবাবুর 'কিছু খাবনা' এই পূর্বনির্দেশ মতো কোনো ব্যবস্থা ছিল না; অথচ তিনিই ক্ষুধাক্ষিপ্ত হলেন প্রথমে। শেষে রান্নার জোগাড়ও করতে হয়েছিল। আমরা পরে স্নান সেরে এসে দেখি বিভূতিবাবু সেই একটিন মারমালেড শেষ করে টিনের ভিতর জিব ঢুকিয়ে চেটে চেটে খাচ্ছেন। আমাদের দেখে হেসে বললেন, "সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি তেতো লাগছে।" —বিক্রম খোল রওনা হই এর পরদিন।

আমার লেখা প্রথমে পাটনার 'প্রভাতী' মাসিকে ধারাবাহিক বেরিয়েছিল। সবই তাঁকে পড়ে শুনিয়েছিলাম। উপভোগও করেছিলেন, কিন্তু নিজের লেখা বদলান নি। আরো এ রকম বহু মজার ঘটনা আছে।

বিভূতিবাবুর সঙ্গে আমার দ্বিতীয় ভ্রমণ ছিল পাটনায় ১৯৩৭ সনে, পাবনা ভ্রমণের দুবছর আগে। পাটনায় 'প্রভাতী' দলের মধ্যমণি ছিল মণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দার। তার উদ্যোগে যাওয়া। এ ভ্রমণে কলকাতা থেকে আমাদের সঙ্গে ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস ও নীরদচন্দ্র চৌধুরী। নীরদবাবুই ছিলেন পাটনার সেই সভার সভাপতি। সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক অনুষ্ঠান। যে কদিন পাটনায় ছিলাম নানা স্থানে নিমন্ত্রণ ও অতিভোজের আয়োজনে আমার দেহ ও মন প্রায় অসাড় হয়ে গিয়েছিল। বিভূতিবাবু ও আর সবার পাকস্থলী যে এত প্রসার- এবং সহনশীল তা আমার জানা ছিল না। ঈর্ষা হয়েছিল খুব। সভায় দুদিন গিয়েছি, রচনা পাঠও করেছি, কিন্তু মনে হয় যেন সেসব স্ব-জ্ঞান নয়, মোহাবিষ্ট অবস্থায়।

তাই বিভূতিবাবু, যিনি উদরস্থ বস্তুসম্ভারের ঊর্ধ্বেও চেতনা জাগ্রত রাখতে পেরেছিলেন, সে সময়ের একটি ছোট্ট স্মৃতিকথা লিখেছিলেন 'সোম' নামক একখানি পত্রিকায়। এবং তা থেকে, তাঁর লেখা যে দুটি পৃষ্ঠায় আছে, তা আমাকে দিয়েছিলেন। পাতার শিরে 'সোম' কথাটি লেখা আছে, অন্য কোনো পরিচয় আমার জানা নেই। তা থেকে আমি কিছু অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি। বিভূতিবাবুর এই লেখাটির নাম "পাটনায় দুইদিন"। বিভূতিবাবু লিখছেন—

"পাটনায় গিয়ে আমরা নামলুম বেলা সাড়ে আটটায়।

"রাত্রে ট্রেনে ঘুম হয়নি, কেউ কাউকে ঘুমুতে দেয়নি। নীরদ [চন্দ্র

চৌধুরী] কয়েকবার ঘুমুবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সময় বুঝে ব্রজেনদা [ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়] এমন প্রাচীন বাংলাগ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করলেন সজনীবাবুর সঙ্গে যে, সেও চোখ বুজতে পারল না।

"স্টেশনে আমাদের নিতে এসেছিলেন অধ্যাপক রঙীন হালদার ও প্রভাতী সংঘের তরুণ উদ্যোক্তাদল। দুখানা মোটর আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। গাড়ী দুখানায়, ভাগকরে আমরা সকলে উঠলাম।

"উঃ কি ভীষণ শীত পাটনায়! ছায়ায় থাকার সময় মনে হচ্ছে যেন হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে বরফের মতো হয়ে আসছে।

"কদমকুঁয়ার পরলোকগত ঐতিহাসিক অধ্যাপক যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয়ের গৃহে আমাদের বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল। সমাদ্দার মহাশয়ের লাইব্রেরি দেখে আমরা পথকষ্ট ও স্নানাহারের কথা ভুলে গেলুম। এত ঐতিহাসিক গ্রন্থের একত্র সমাবেশ কোন ব্যাক্তিবিশেষের লাইব্রেরিতে দেখেছি বলে মনে হোল না। শুধু ঐতিহাসিক গ্রন্থ নয়, সব রকম বাংলা নতুন ও পুরানো মাসিক পত্রিকা বাঁধানো আছে দেখে বড় আনন্দ হোল। কয়েকখানি দুষ্প্রাপ্য তিব্বতী ছবি লাইব্রেরিতে সংগৃহীত ছিল। শ্রীমান মণির [মণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দারের] সৌজন্যে সেগুলি ভাল করে দেখার সুযোগ ঘটল।

"বেলা প্রায় এগারটা বাজে। কিন্তু শীত কমেনি বরং পশ্চিমে হাওয়া-ঝড় বয়ে সঙ্গে সঙ্গে তা বেড়েই চলেছে। দলের কেউ দেখলুম এই ভয়ানক শীতে স্নান করতে রাজী নয়। সজনীবাবু বললেন—না হয় কদিন নাই বা নাইলুম, কি বলেন বিভূতিবাবু?

"সকলেই এতে সায় দিলে। যদিও প্রস্তাবটা কারো যেন মনঃপূত হোল না।.........

"সাড়ে দশটার ট্রেনে বলাইবাবু আসবেন ভাগলপুর থেকে। তাঁর সঙ্গে আসবার কথা আছে মুঙ্গের থেকে শরদিন্দুবাবুর [শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের]। সজনীবাবু ও পরিমল গোস্বামী ওঁদের নামিয়ে নিতে চলে গেলেন স্টেশনে। আমি চিঠি লিখতে বসলাম রোদে পিঠ দিয়ে।

"......ইতিমধ্যে হৈ হৈ করতে করতে বলাইবাবুকে নিয়ে সবাই এসে পড়ল। শরদিন্দুবাবু আসতে পারেননি, শুনলুম তিনি অসুস্থ। [শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধ্যায়ে ২৪।৩।৩৭ তারিখের পত্র দ্রষ্টব্য।] পরস্পর কুশল প্রশ্নের পর আর এক প্রস্থ চা, খাবার.........।

"স্নানাহার সেরে পার্কটায় গিয়ে বসলুম। মনে পড়ল ১৯২৭ সালের পর এতদিন পর এই আবার পাটনায় এলাম। তখন থাকতাম ভাগলপুর, আপিসের কাজে মাঝে মাঝে এখানে আসতে হোত। তখন সবে লেখা আরম্ভ করেছি, কয়েকটি ছোট গল্প মাসিক পত্রিকায় বেরিয়েছে, 'পথের পাঁচালী' তখনও কল্পনায় আসেনি, তখন জীবন ছিল আরও স্বচ্ছন্দ, আরও মুক্ত।.........

"ব্রজেনদা পেছনে থেকে এসে বললেন—কি ভাবছেন বসে বসে? বলাই-বাবুর নভেল পড়া হচ্ছে ওপরে। সবাই শুনবে, আপনাকে ডাকতে পাঠালে সজনী।

"বড্ড শীত করছে ব্রজেনদা, ছায়ায় যেতে পারচিনে। এখানেই একটু বসুন না? গল্প করা যাক।

"বসবার সময় নেই। আপনিও উঠুন, তৈরি হয়ে নিন। মিহিরবাবুর বাড়ীতে চায়ের নেমন্তন্ন আছে, চারটের সময়, মনে নেই? সময় নেই, সাড়ে তিনটে তো বাজে।.........

"সন্ধ্যার সময় বি. এন. কলেজের হলে প্রকাণ্ড সভা। নীরদের অভি-ভাষণ বেশ চিন্তাপূর্ণ হয়েছিল, সকলেরই ভাল লাগলো। সভায় সকলেরই মুখে একটা উৎসাহ ও আনন্দের চিহ্ন দেখে মনে হোল সাহিত্য সভায় এত আগ্রহ বাংলাদেশে কোথাও দেখিনি, এমন জনসমাবেশ তো নয়ই।

"সভা শেষ করে যখন বাইরে কলেজের সুদীর্ঘ বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছি, তখন ফুট-ফুট করছে জ্যোৎস্না, শীত কিন্তু খুব।

"সুশীলমাধব [মল্লিক, পাটনার অ্যাডভোকেট] বাবুর বৈঠকখানায় [নৈশ নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে] একটা রীতিমত তর্কসভা বসলো। পাটনা কলেজের অধ্যাপক ফণীবাবু [ফণীন্দ্র মিত্র], নীরদ, ব্রজেনদা, সজনী, পরিমলবাবু, অধ্যাপক রঙীন হালদার ও আমি। পরে আরও অনেকে এসে যোগ দিলেন।···আমাদের আদর-আপ্যায়নে সকলে এত ব্যস্ত যে, আমাদের লজ্জার কারণ ঘটল।

"সুশীলমাধব বাবুর বৈঠকখানার সে তর্ক-সভায় উঠল না এমন কথাই নেই। আনাটোল ফ্রান্সের সাহিত্য সৃষ্টি নিয়ে কথা উঠে ক্রমে দর্শন, রামমোহন রায়, শরৎচন্দ্র, বিহারীদের বাঙালী বিদ্বেষ, রাজনীতি, ইলেকৃশন,

লক্ষ্ণৌ, একজিবিশন, পাটনাই ফুলকপি, প্রভৃতি বিষয়ে গভীর আলোচনা হবার পরে আমাদের খাওয়ার ডাক পড়লো।

"সে এক বিরাট আয়োজন। এত খাবোই বা কি করে আমরা, আজ সারাদিনই তো কেবলই খেয়ে বেড়াচ্ছি। না খেয়ে যে ফাঁকি দেবো তার উপায় নেই। সুশীলমাধববাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সকলের পাতের দিকে লক্ষ্য রাখছেন।...

"আহারাদির পর বৈঠকখানায় ফিরে এসে পরিমলবাবু আমায় চুপি চুপি বললেন—চলুন বিভূতিবাবু, আমরা কাল সকালের ট্রেনেই পালাই। আমি বললুম আমার আপত্তি নেই। এর ওপরে যদি কালও কোথাও নিমন্ত্রণ থাকে তবে আমরা আর বাঁচবো না।

"পরিমলবাবু বললেন, 'নিমন্ত্রণ থাকে' মানে? কাল তিন জায়গায় নিমন্ত্রণ। সকালে এক জায়গায় চা পার্টি, দুপুরে অধ্যাপক কমল বাবুর বাড়ীতে খেতে হবে, বিকেলে বি. এন. কলেজের হোষ্টেলে রঙীনদার চা-পার্টি। চলুন পালাই। যঃ পলায়তি স জীবতি।"...

বিভূতিবাবু এর পর অনেক ঘটনাই লিখেছেন, কারণ পাটনাতেই তাঁর মুখে প্রথম শুনি যে তিনি প্রতিদিনের ঘটনার ডায়ারি লিখে রাখেন। আমি নানা স্থানের ভ্রমণে তাঁর পদ্ধতি অনুসরণ করেছি, সেজন্য পরে আর কিছুই লিখতে হয় নি। ১৯৪৬ সনে জলপাইগুড়ি থেকে জয়ন্তীতে ট্রাকে যেতে যেতে লিখেছি, জয়ন্তীর ডাক-বাংলোয় লিখেছি। খুড়ুলঝোরা হাতী-খেদায় হাতী ধরা ও হাতীর গলায় দড়ি পরানো দেখে সমস্ত দিনের ক্লান্তির পরেও ডায়ারি লিখেছি। ১৯৪৯এ ল্যানস্‌ডাউনে লিখেছি। সেখান থেকে নেমে সিমলা যেতে যেতে লিখেছি। ঠিক যেমন লিখেছি তেমনি 'প্রবাসী'তে পাঠিয়েছি এবং মাসে মাসে ছাপা হয়েছে। পরে 'পথে পথে' বইএর অন্তর্ভুক্ত।

বিভূতিবাবু পাটনা থেকে একা বকতিয়ারপুর চলে গেলেন এবং পরদিন আমরা যে গাড়িতে এলাম, তিনিও সেই গাড়িতে বকতিয়ারপুর থেকে উঠে আমাদের সঙ্গী হলেন। সঙ্গে নিয়ে এলেন এক ঝুড়ি গজা জাতীয় মিষ্টান্ন। বলাই-এর নভেল পড়া শেষ হয়নি তখনো। ট্রেনের মধ্যে পড়ছিল, বলাইকে ঘিরে সজনীকান্ত, নীরদবাবু, ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোঃ ও বিভূতিবাবু। বিভূতিবাবু অবশ্য শ্রোতা নন। তিনি শীতের মোটা কোট চাপিয়ে মুখে চুরুট টানতে

টানতে কোনো মিলিটারি ক্যাপটেনের চেহারায় নিস্প,হভাবে বসে আছেন। সেই সময় চলন্ত ট্রেনে পাঠরত বলাই ও তার শ্রোতাদের একখানা ফোটো-গ্রাফ তুলেছিলাম। শীতে কাঁপা ও ট্রেনের গতিতে কাঁপা অবস্থাতেও ছবিখানি ভাল হয়েছিল। ('আমি যাঁদের দেখেছি' পুস্তকে ছাপা হয়েছে সেখানা) নেগেটিভখানা হারিয়ে গেছে, পুরানো প্রিন্ট ছিল একখানা তাই থেকে ব্লক করা। সমাদ্দার বাড়িতে রাত্রে এই দলেরই একটি গ্রুপ তুলেছিলাম ম্যাগনেসিয়াম রিবন জ্বালিয়ে, খুব ভাল হয়েছিল সে ছবি। কিন্তু আমার কাছে তার নেগেটিভ বা প্রিন্ট কিছুই আর এখন নেই।

আগেই বলেছি অতি-ভোজনে আমি অত্যন্ত অলস হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, ট্রেন পাটনা ছাড়ার পরে নতুন একটা উদ্যম যেন হঠাৎ ফিরে এলো। এবং বিভূতিবাবু ঘুমিয়ে পড়লে তাঁর মিষ্টান্নের হাঁড়িতে আমার এবং আরো দু-একজনের হাত প্রবেশ করেছিল সম্ভবত ঠিক এই কারণেই। হাঁড়ির ওজন প্রায় সবটাই কমে গিয়েছিল। কিন্তু বিভূতিবাবুর মনে তার কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা জানি না, তবে অনুমান করতে পারি। জানি না, কারণ বলাই আমাকে ভাগলপুরে তাঁর সঙ্গে নামতে বাধ্য করেছিল। দু-একদিন ভাগলপুরে থেকে শেষে একা ফিরেছিলাম কলকাতায়। আজ ১৯৭১ থেকে ৩৩ বছর আগের স্মৃতি, অথচ মনে হচ্ছে যেন এক সপ্তাহ আগে ঘটেছে।

১৯৪২ সনে যখন জাপানী বোমা পড়েছিল কলকাতার উপর হাতীবাগানে, বৌবাজার স্ট্রীটে, ড্যালহৌসি স্কয়ারে, গার্স্টিন প্লেসের রেডিও বাড়ির পিছনে, এবং যখন অতি ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষে কলকাতার পথে পথে এক একটা বহিরাগত পরিবার আসন্ন মৃত্যুর মুখে ধুঁকছে, সেই সময় (১৯৪৩) কয়েকজন তরুণ— সুধীর ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে নূতনপত্র নামে একখানা মাসিক প্রকাশ করা স্থির করে কলকাতা থেকে যথারীতি আইনসিদ্ধ ডিক্লারেশন নিয়ে এলো আমার কাছে—সম্পাদক হতে হবে। সুধীর ভট্টাচার্য এম. এ. বসুবিজ্ঞান মন্দিরের গোপাল ভট্টাচার্যের পুত্র।

এই মাসিকের মান বেশ উঁচুই হয়েছিল, বিখ্যাত লেখকদের সহযোগিতা পেয়েছিলাম। কিন্তু হঠাৎ পুলিস বিভাগ থেকে খবর এলো, যুদ্ধকালীন নতুন নিয়মে দিল্লীর অনুমতি না নিয়ে কোনো কাগজ বার করা চলবে না। এ পর্যন্ত যে চার মাস প্রকাশিত হয়েছে তা বে-আইনি হয়েছে। তবে যদি

অবিলম্বে কাগজ বন্ধ করে দেওয়া হয়, তবে কাগজের বিরুদ্ধে কিছু করা হবে না। আর চালাতে হলে এখুনি দিল্লী গিয়ে অনুমতি আনতে হবে।

কাগজ না চালানোই ঠিক হল। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় এই মাসিকে ধারাবাহিক ভাবে লেখা আরম্ভ করেছিলেন রহড়াগড়া নামক স্থানের কথা দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে। কিন্তু যখন মাসিক খানা বন্ধ হয়ে গেল তখন তা শুনে তিনি ঘাটশিলা থেকে লিখলেন—

Ghatsila
9-2-44

প্রিয় পরিমলবাবু,

পত্র পেয়ে দুঃখিত হলুম। অমন পত্রখানি বন্ধ হয়ে গেল যে কেন বুঝতে পারলুম না। নূতন পত্র পাইনি। 'ভিড' গল্পের টাকা মনি অর্ডার করবেন বারাকপুরের ঠিকানায় কিংবা আপনার কাছে রেখে দেবেন গিয়ে নেবো। আমরা পরশু বারাকপুর যাচ্ছি সস্ত্রীক।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা নেবেন। দেখা করবো কলকাতায়। ইতি

ভবদীয়
শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

PO. Gopalnagar
Vill. Barakpur
Dist. Jessore

ভিড় গল্পটির সম্পর্কে এখন কিছুই আমার মনে পড়ে না। এটি নূতন পত্রের চতুর্থ সংখ্যায় বেরিয়েছিল। নূতন পত্র যে চার সংখ্যা বেরিয়েছিল তাই আমার সম্পূর্ণ ভুল হয়ে গিয়েছিল। ভিড় গল্পের উল্লেখ থেকে সুধীর ভট্টাচার্যকে টেলিফোন করে তবে নিশ্চিত হওয়া গেল। আমার কাছে বরাবর তিন সংখ্যা ছিল, এখন প্রথম সংখ্যাখানাও নেই। আমার স্মৃতি-চিত্রণ বইতে প্রথম তিন সংখ্যার পুরো সূচি দিয়েছি, তখনও আমার ধারণা ছিল তিনখানা বেরিয়েছিল। স্মৃতি না থাকার স্মৃতি।

বিভূতিবাবু ১৯৪৩ সনের অকটোবর মাসে আমাদের বাড়িতে এসে জানালেন তাঁর "অনুবর্ত্তন" নামক একখানা বই অনেকদিন বেরিয়েছে, সেখানা আমাকে তিনি পড়াতে চান। আমি বললাম সে তো খুব ভালই হবে, আপনার বিষয়ে আমি একটা রচনা লিখতে চাই, তাতেও কাজ লাগবে,

তাছাড়া নূতন পত্রেও সমালোচনা করা যাবে। বিভূতিবাবু নিজে থেকে তাঁর বই পড়াতে চান, এমন কথা আগে কখনো বলেননি, তাই খুব ভাল লাগলো কথাটা। কোথায় বই সংগ্রহ কবতে হবে চিঠি দিলেন আমাকে। বললেন, চলে যাচ্ছি একটু কলকাতার বাইরে। সঙ্গে বই নেই, আপনি এই চিঠি দেখালে বই পাবেন। কিন্তু চিঠি দিয়ে লোক পাঠিয়েও বই সংগ্রহ করতে পারিনি। তাই বিভূতিবাবুকে চিঠি লিখেছিলাম। আমার চিঠির তারিখ ৩০-১০-৪৩, বিভূতিবাবু তার উত্তরে যা লিখেছিলেন, অথবা আমি তাঁকে যা লিখেছিলাম, তার সবখানি প্রকাশিতব্য নয়, বিশেষ করে আমার চিঠির কোনো কথাই নয়। আমার চিঠির অপর দিকেই তিনি আমার চিঠির উত্তর লিখে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। চিঠির শেষে পুনশ্চ দিয়ে লিখেছিলেন, "আপনার চিঠিখানা আমার কাছে রাখবো না, মনে কষ্ট হয়, তাই চিঠিখানাই ফেরৎ দিলুম। বন্ধুর দক্ষিণ মুখই দেখতে চাই কিনা, তাই।" এ চিঠি পেয়েছিলাম ৫।১১।৪৩ তারিখে। বিভূতিবাবুর চিঠির অংশ বিশেষ এই—

ঘাটশিলা, বুধবার

(তারিখ সম্ভবত ৪ নবেম্বর ১৯৪৩)

প্রিয়বরেষু,

টাটানগরে কালীপূজার আনন্দ সম্মেলনে এসে পরশু আপনার চিঠি পেলাম রাত্রে। আমি অত্যন্ত দুঃখিত ও লজ্জিত হয়েছি।...আমার সমস্ত দোষ ত্রুটি ক্ষমা করে···যদি বইটি আনিয়ে নেন তবে বিশেষ বাধিত হব।

আপনাকে আমি পরম বন্ধু বলেই চিরকাল জেনে এসেছি, আপনাকে আমার বইখানা পড়াবো এবং আপনার কেমন লাগলো জানতে চাইবো—এ আমার আন্তরিক ইচ্ছা। নয়তো আমি বইএর কথা তুলবো কেন? আপনি রসিক ও গুণী বলেই আপনার হাতে আমার বইখানির সমালোচনা আমি চেয়েছিলুম। অদৃষ্টক্রমে সব দেখচি বিপরীত হয়ে দাঁড়ালো, জানবেন এ একটা ভ্রমপ্রমাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। বন্ধু বলেই জানি আপনাকে, আমার সদিচ্ছায় সন্দেহ করবেন না। আমার অনবধানতার জন্য পুনরায় আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

ভবদীয়

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

এটি একটি অত্যন্ত সাময়িক ভুল বোঝার ব্যাপার। এর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে

নির্ভুল বোঝার পালা এসে গেল। আমি তাঁর "অনুবর্ত্তন'' উপন্যাসের সমালোচনা লিখলাম নূতন পত্র মাসিকের অগ্রহায়ণ ১৩৫০ সংখ্যায়। এক সঙ্গে অনেকগুলি বইএর সমালোচনা লিখেছিলাম এই সংখ্যায়—সবই স্বাক্ষরিত। অনুবর্ত্তন সম্পর্কে লিখেছিলাম—

"আমাদের নিত্য পরিচিত মধ্যবিত্ত সংসারের নিত্য নৈমিত্তিক দুঃখদৈন্যের চাপে মানুষের কি পরিমাণ বিকার ঘটতে পারে—পৃথিবী তাদের কাছে কত সংকীর্ণ হয়ে আসে—যখন পৃথিবীর আলোবাতাস আর উদার আকাশ কোনো অর্থই তাদের মনে বহন করে না, সমাজ এবং পরিবেশ ভুলে সবাই কেমন ঘোর স্বার্থপর এবং আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে, তার ছবি আঁকতে বিভূতিবাবু সিদ্ধহস্ত। ভাগ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শক্তি যাদের নেই, ভাগ্যের হাতে পদে পদে যারা বিড়ম্বিত, অথচ তারই মধ্যে অন্যকে ঠকিয়ে উদ্বৃত্ত দুটো পয়সা কেমন করে পকেটে পুরবে সে বিষয়ে উৎসাহের যাদের অন্ত নেই, সকল দুর্ভাগাকে অপমানকে অম্লানবদনে হজম করে যারা বংশ বংশ অন্ধকার গলিতে অন্ধকার ঘরে এবং নিজের রচা অন্ধকার জগতে জীবন কাটিয়ে যাচ্ছে, তাদের নিখুঁত ছবি ফুটে ওঠে বিভূতিবাবুর হাতে।...

"হাইস্কুলকে কেন্দ্র করে তার শিক্ষকদের নিয়ে এই গল্প রচনা। হেডমাস্টার ইংরেজ। তাঁকেই কেন্দ্র বলা যেতে পারে। তাঁর বাঁধা চরিত্রের কোন গতি বা পরিবর্তন নেই সুতরাং তাঁকে সূর্য ধরলে, হাইস্কুল-জগৎটাকে সৌরজগৎ বলা চলে। এই জগতের গ্রহগুলিই হচ্ছে আসল মানুষ এবং তারা বাঙালী মধ্যবিত্ত। বাঙালী মধ্যবিত্ত বলতে অবশ্য মধ্য অবস্থার লোক বেশির ভাগ সময়েই বোঝায় না। তারা আসলে হচ্ছে বিত্তহীন, বড় জোর নিম্নবিত্ত। এরা শুধু যে দরিদ্র তাই নয়—সব দিক দিয়ে এমন হতভাগ্য সংসারে আর কেউ আছে কিনা সন্দেহ।"

দীর্ঘ সমালোচনার একটুখানি নমুনা দেওয়া গেল। বিভূতিবাবু খুব তৃপ্ত হয়েছিলেন এটি পড়ে। এই সমালোচনাটি অনুবর্ত্তনের দ্বিতীয় সংস্করণের।

আমি একবার বিভূতিবাবুর কাছে গল্প চেয়ে চিঠি দিই দুখানা। তার জবাব না পেয়ে জোড়া কার্ডে চিঠি লিখি তাঁকে। এবং তাঁর উত্তরের জন্য যে কার্ডখানি শাদা ছিল তাতে যথারীতি আমার নাম ঠিকানা লিখেও মনে হল, এতেও হয়তো চিঠির উত্তর লেখার যথেষ্ট প্রেরণা বিভূতিবাবু পাবেন না। তাই যেদিকে তিনি আমাকে লিখবেন. সেদিকে আমিই 'বারাকপুর ৬।৯।৪৫' এবং সম্বোধনের স্থানে 'পরিমলবাবু' লিখে দিই। তারিখটি বসিয়েছিলাম যাতে ঐ তারিখে চিঠি ডাকে দেন। ফল ফলল আশাতীত। এ রকম রিপ্লাই কার্ড তাঁর মগজের কৌতুক কেন্দ্রকেও কিঞ্চিৎ উত্তেজিত করে তুলেছিল। তিনি ঐ কার্ডে লিখলেন—

আশ্চর্য কথা। বিশ্বাস করুন একখানা চিঠিও পাইনি। মাইরি বলছি। আপনার চিঠি পেয়ে উত্তর দেব না আপনি বিশ্বাস করেন? দিন দশেক অপেক্ষা করুন, নিশ্চয়ই পাঠাবো।

ইতি
বিভূতি

বিভূতিবাবুর কথায় অনেক স্মৃতি জেগে ওঠে, কিন্তু অন্যত্র অনেক লিখেছি, যে সব কথা আগে সব বলা হয়নি, এখানে তাই বেশি বলা গেল।

কিন্তু এতদূর লেখার পর হঠাৎ-আবিষ্কৃত ৩৭ বছর আগের একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ লিপির উল্লেখ প্রয়োজন বোধ করছি। তখন অবশ্য 'সাংস্কৃতিক সভা' ইত্যাদি নাম প্রচলিত হয় নি। 'সোশ্যাল গ্যাদারিং' অনুষ্ঠিত হত তখন। ইংরেজ আমলের ব্যাপার—১৯৩৩ সনের ঘটনা।

এই আমন্ত্রণলিপি থেকে মনে পড়ল বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এটি আমার দ্বিতীয় ভ্রমণ। আগে বরাবর তিনটির উল্লেখ করেছি—বেলপাহাড়, পাটনা ও পাবনা। কিন্তু দ্বিতীয় ভ্রমণটি নতুন আবিষ্কার করা গেল। মিলন স্থান লিলুয়া, ই. আই. আর. রেলওয়ে ইন্‌স্টিট্যুট। স্বাক্ষরকারী ভুপেন্দ্রনাথ নন্দী, অনরারি সেক্রেটারি। নির্দিষ্ট তারিখ ২৯শে মার্চ ১৯৩৩ সন্ধ্যা ৬টা। সোশ্যাল গ্যাদারিং-এর প্রোগ্রাম আংশিকভাবে উদ্ধৃত করছি। এসব ইতিহাস 'কার বা এখন মনে আছে?'

1. Mr. Nalinikanta Sarkar—Opening Song
2. Mr. Parimal Goswami,—Editor, Sanibarer Chithi, on a travel.
3. Mr. Nripendrakrishna Chatterjee—Some accounts of ancient Bengali literature.
4. Mr. Bibhutibhusan Banerjee—Author of Pather Panchali—-A talk.
5. Mr. Sajanikanta Das—Editor, Bangasri—Kankal Mangal (a poem)
6. Mr. Nripendranath Majumdar—Clarionet. Interval.
7, Mr. Nalinikanta Sarkar—Comic song.
8. Mr. Birendrakrishna Bhadra—Recitation from the late Rabindra Maitra's work.

9. Mr. Krishnadhan De—A ghost story. Speeches on Modern Bengali literature by Kirankumar Ray, Pramathanath Bisi etc.

এই মার্চ মাসেই (৩ থেকে ৬ তারিখ পর্যন্ত) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে অন্যান্য বন্ধুসহ বেলপাহাড়-বিক্রমখোল ভ্রমণ করেছিলাম। উক্ত প্রোগ্রামে উল্লেখিত আমার "ভ্রমণ" সেই বিষয়েই। কিন্তু এই প্রসিদ্ধ লিলুয়া ভ্রমণটাই এতদিন মনে ছিল না!

আমন্ত্রণ লিপির স্বাক্ষরকারী ভূপেন্দ্রনাথ নন্দীর বিবরণ এবং তাঁর নিজের বাড়িতে যে সব মজার ঘটনা ঘটেছিল একটি সাহিত্য সভা উপলক্ষে তা স্মৃতি-চিত্রণে বলা হয়েছে। এই সাহিত্যিক ভক্ত ভূপেন নন্দী গ্রীষ্মকালে বিনাস্নানে থাকতেন এবং শীতকালে প্রতিদিন স্নান করতেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

শিশিরকুমার ভাদুড়ির সঙ্গে আমার প্রথম সম্পর্ক শিক্ষক ও ছাত্রের ; ১৯১৭-১৮ সনে, মেট্রোপলিটান ইনস্টি-বিদ্যাসাগর কলেজে। দ্বিতীয় সম্পর্ক যতদূর মনে হয় ১৯২৩ কিংবা ২৪, অভিনেতা ও দর্শকের। তৃতীয় সম্পর্ক ১৯৫১-থেকে সুহৃদের। প্রথম দুটিতে ব্যক্তিগত পরিচয় শূন্য বলা চলে। তৃতীয়টিতে আমি প্রায় তাঁর সুখদুঃখের অংশীদার। আমার উপর তিনি অনেকখানি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন তাঁর কতগুলো কাজে। অনেক বিষয়ে তাঁকে উপদেশ দিতে হত তাঁর নানা সমস্যাপীড়িত অবস্থায়। অবশ্য তার একটা সীমা ছিল। তাঁর নিজের বহু বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য ছিল, যাকে বলা চলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। তার বাইরে তাঁর পক্ষে যাওয়া সম্ভব ছিল না।

আমার কাছে তিনি অধিকাংশ সপ্তাহে পাঁচবার আসতেন, তিনবার অন্তত বাঁধা ছিল। আবার কখনো বিশেষ প্রয়োজন বোধ করলে এবং নিজে আসতে না পারলে সময় বাঁচানোর জন্য আমার কাছে তাঁর গাড়ি পাঠাতেন। অবশ্য এমন অবস্থা খুব কমই এসেছে। তিনি নিজেই আসতেন চলে--এবং প্রায় সব সময়ই সকালের দিকে। আমি তখন থাকতাম কৈলাস বসু স্ট্রীটে, আর তিনি থাকতেন শ্রীরঙ্গমে, তাঁর স্টেজের পিছনে ছিল তাঁর বাসস্থান। গাড়িতে পাঁচ মিনিটের ব্যবধান। একখানা চিঠি এই—

SRIRANGAM
24, RAJA RAJKISSEN STREET,
Calcutta. 3. 2. 53
Phone Barabazar 556

পরিমল,

বইখানা পাঠালাম। আমি আজকে বোধহ তোমার সঙ্গে দেখা কোরতে পারবো না। কাল সকালে ৮টা ৮-৩০এর সময় কিছুক্ষণের জন্য যেতে পারি। তারপর আলোচনা কোরব। ইতি

শিশিরকুমার

নানা বিষয়ে আলোচনা তাঁর প্রয়োজন ছিল। তার জন্য আমি প্রায় প্রতি রবিবার তাঁর কাছে যেতাম সন্ধ্যার দিকে। সে সময়ে তিনি অভিনয়ের

জন্য সজ্জায় ব্যস্ত থাকতেন, সাজঘরেই বসতাম। মাঝে মাঝে সেখানে আরো অনেকে আসতেন। অর্থাৎ তখন কাজের কথার বদলে আড্ডা জমত। আবার যেসব দিন অভিনয় থাকত না, সে সব দিন মাঝে মাঝে যুগান্তর থেকে ফেরবার পথে তাঁর কাছে যেতাম। তাঁর অভিনয়ে বাড়ির সবার আমন্ত্রণ থাকত। না গেলে দুঃখিত হতেন।

থিয়েটার ছিল তাঁর প্রাণের জিনিষ। থিয়েটারের ভবিষ্যৎ নিয়ে—বাংলাদেশে ন্যাশনাল থিয়েটার গড়ার কল্পনা নিয়ে—তাঁর অনেক সময় কাটত।

রাজশাহীর বিখ্যাত জমিদার ও দানবীর কিশোরীমোহন চৌধুরীর পুত্র সুরেন্দ্রমোহন চৌধুরী, অ্যাডভোকেট, ছিলেন আমার শুভাধ্যায়ী। তিনি নিজে অভিনয়প্রিয় ছিলেন, শিশিরকুমারের সঙ্গে তাঁর বিশেষ হৃদ্যতা ছিল, পরমাত্মীয়ের মতো দুজন দুজনের শ্রদ্ধাপ্রীতিতে আবদ্ধ ছিলেন। ১৯৫১ সনের প্রথমেই সুরেন্দ্রমোহন সোজা শিশিরকুমারকে নিয়ে এলেন আমাদের বাড়িতে। সেই দিন থেকে শিশিরকুমারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেলাম।

তখন প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর তখৎ-এ-তাউস নাটক আরম্ভ হয়েছে। প্রথম দিনের অভিনয়ে আমার ডাক পড়ল। আমি দেখার পর সামান্য দুএকটি পরিবর্তনের প্রয়োজনের কথা বললাম, এবং তা করা হল। কিন্তু দ্বিতীয় অভিনয় দেখার পর ছোটখাটো ত্রুটি আরো যা চোখে পড়ল তা খুব বিস্তারিতভাবে বলা দরকার মনে করে লিখিতভাবে একটা সমালোচনা শিশিরকুমারকে পাঠিয়ে দিলাম ১৩-৫-৫১ তারিখে।

তখৎ-এ-তাউস বাহাদুর শার দ্বিতীয় পুত্র জাহান্দার শা ও অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যকার ষড়যন্ত্রের ছবি। মোঘল সাম্রাজ্যের চরম অধঃপতনের যুগের ঘটনা। এতে যথেষ্ট নাটকীয় গুণ ছিল, এবং শিশিরকুমারের দিক থেকেও তাঁর অভিনয় জীবনের প্রায় ৩০ বছর অতিক্রান্ত এবং পরিবেশ প্রতিকূল থাকা সত্ত্বেও মোটের উপর দর্শন উপযোগী করতে পেরেছিলেন নাটকখানি। ত্রুটি বিচ্যুতি কিছু কিছু ছিল যা আগের যুগের শিশিরকুমার হলে থাকত না, থাকার কল্পনাও করা যেত না। যুবকোচিত উৎসাহ এবং অভিনবত্ব সৃষ্টির উগ্র আকাঙ্ক্ষার যুগে যা সম্ভব ছিল, শেষ জীবনের ক্লান্ত শিশিরকুমারের পক্ষে তা স্বভাবতই সম্ভব ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্টেজে এসে নামলে বয়স ভুলে যেতেন। যে সব শুভকামী শিশিরকুমারের

পরিকল্পনাকে রূপায়িত করবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাঁরা অকালমৃত্যু বরণ করাতে শিশিরকুমার প্রায় নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন। থিয়েটার ছাড়া আর কোনো দিকে তাঁর আর কোনো মোহ অবশিষ্ট ছিল না। সরকারী খ্যাতি তাঁর পক্ষে অসহ্য বোধ হয়েছিল, জনসাধারণের প্রকাশ্য অভিনন্দনও তাঁর পক্ষে রুচিকর ছিল না। থিয়েটার তাঁর ছিল প্রাণ, শুধু তারই জন্য সকল প্রতিকূলতা ঠেলেও নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিলেন।

তখৎ-এ-তাউস অভিনয় দ্বিতীয় বার দেখার পরে আমি তাঁকে আমার মতামত যা লিখে জানিয়েছিলাম, তার অংশ বিশেষ এই—

তখৎ-এ-তাউস দ্বিতীয় অভিনয়ে অঙ্কভাগের পরিবর্তন, এবং পথিক গায়ক গায়িকার নৃত্য, কিছু পরিমাণ অন্তত পথের সঙ্গে সম্পর্কিত করায় এবং জাহান্দার শা'র ছদ্মবেশের পরিবর্তন মনে হল **definite improvement.**

আমি দর্শকের চোখে এবং আগাগোড়াই উপভোগের মন নিয়ে দেখেছি, এবং আরো যে সব ত্রুটি চোখে পড়ল বলি।

১। প্রথম অঙ্কে নর্তকীদের সঙ্গে নৃত্যরত অবস্থায় জাহান্দার যেখানে 'ফেন্ট' করলেন, সেখানে যে পাত্রে জল এলো, তার নিশ্চিত পরিবর্তন দরকার। ইম্পিরিয়াল প্যালেসে হঠাৎ দরকারেও হাতের কাছে ওরকম একটি বদনার আবির্ভাব, এটি দৃষ্টিকটু বোধ হয়েছে। সেখানে সম্রাটের উপযুক্ত জিনিসই থাকা উচিত আশেপাশে। এটি তাই বেসুরো বোধ হয়েছে উজ্জ্বল পটভূমিতে। এখানে ঐ রকম একটি পাত্র দেখানোর কোন সার্থকতা নেই, জরুরিত্বও নেই। অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে আবৃত থাকলেও চলত। অথবা cut glass অথবা নক্সা আঁকা রঙীন বা শাদা কাঁচের পাত্র।

২। যেখানে জাহান্দার শার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, সেখানে পরিবেশে আরো কিছু ব্যাকুলতা ফুটলে ভাল হত। ইমতিয়াজ একা থাকলে তা সম্ভব নয়, সেজন্য উদ্‌বিগ্ন অন্য লোকেদের সেখানে ছুটে এসে খবর দেওয়া বা নেওয়া দেখলে তা সম্ভব হত। নিয়ামত খাঁকে আরো খাটো করা দরকার। তার বেশিক্ষণ অবস্থান নাটকের গতি বিলম্বিত করে।.........

৩। ......যুদ্ধের কামানের শব্দ আমাদের দেশের কোন রঙ্গমঞ্চেই সৃষ্টি করা যায় না। তার আওয়াজের একটা গাম্ভীর্য থাকে, পটকায় তা হয় না।.........স্টেজ অভিনয়ের পটভূমি একেবারে শাদাসিদে যখন নয় তখন এই ত্রুটিই বা থাকবে কেন। এবং যদিও শব্দের অনুকরণ বাস্তব শব্দের ঠিক ভ্রান্তি ঘটাতে পারে না, তবু এমন কিছু ব্যবস্থা দরকার যাতে অনুকৃত শব্দকে যুদ্ধের শব্দ কল্পনা করা দর্শকের পক্ষে আরো সহজ হয়।

৪। জাহান্দার শার স্বগতোক্তি দৃশ্যে যখন ইমতিয়াজ প্রবেশ করল, তখন তার রাত্রি জাগার কৈফিয়ৎ স্বরূপ বলেছে—খুব গরম মনে হল, তাই সে ছাতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। অথচ খড়ের গাদায় জাহান্দার শা দারুণ শীতে কষ্ট পেয়েছেন বলেছেন। দিল্লীর শীতকালে ছাতে বেড়ানোর মতো গরম বোধ কখনো হয় না। এই ত্রুটি সহজে সংসোধনযোগ্য।

৫। খড়ের গাদায় শুয়ে থাকার পর খড়ের চিহ্ন কিছু কিছু চুলের সঙ্গে ও দেহে বহন

করে আনা সঙ্গত হয়েছে। কিন্তু ইমতিয়াজের সঙ্গে প্রথম দেখা হতেই ইমতিয়াজের দৃষ্টিতে এটি ধরা পড়া উচিত ছিল, এবং প্রেমিকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তার উচিত ছিল ওগুলো গা ও মাথা থেকে একে একে ঝেড়ে ফেলা। তা হলে খুব স্বাভাবিক হত। এবং তাতে স্বভাবতই কথার কিছু বদল ঘটত। ......সমস্ত দৃশ্যের সবখানি সময় দেহে খড় বহন করা একটি কৃত্রিম pose বলে মনে হয়েছে।

৬। জাহান্দারের ছদ্মবেশে যে সামান্য বদল ঘটেছে, তাতে সেই পরিমাণ উন্নতি ঘটেছে।.........

৮। শেষ দৃশ্যে জিন্নৎ উন্নেসার উপস্থিতি দরকার ছিল। তাঁর এত বড় ষড়যন্ত্র সফল হল, অথচ তিনি হঠাৎ লুপ্ত হয়ে গেলেন, এটা স্বাভাবিক বোধ হল না। তাঁর বিজয়গর্বের মূর্তিটা দেখালে সম্পূর্ণতা ঘটত নাটকে।

৯। দিল্লীর জ্যোতির্ষীর চেহারা পুরো বাঙালীর চেহারা হয়েছে। পঞ্জাবী চেহারা করলে আরো স্বাভাবিক হত।

এ সমালোচনার ফলে সামান্য কিছু বদল ঘটেছিল, সবটা নয়। কারণ ইতিমধ্যে নাটকটি একটা চেহারা পেয়ে গেছে; তাই সম্ভবত আর বদলানো হল না।

আমার এই সমালোচনা শিশিরকুমারকে দিয়েছিলাম ১৩-৫-১৯৫১ তারিখে। পরদিন যুগান্তরের জন্য একটি সমালোচনা লিখি. সে সমালোচনা কোন্ তারিখে ছাপা হয়েছিল তা আমার মনে নেই. তার নকলটি আমার কাছে আছে। তার শেষ প্যারাগ্রাফে লিখেছিলাম—"শিশিরকুমারের প্রতিভা স্পর্শে নাটকখানি এমন একটি উচ্চস্তরে উন্নীত হইয়াছে যে, দর্শকদের তরফ হইতে যাহাকে বলে collective response, সে সম্পর্কে কোনো ভবিষ্যদ্‌বাণী করিতে না পারিলেও একথা জোরের সঙ্গেই বলা যায় যে যাঁহার কিছুমাত্র শিল্পরসবোধ আছে তাঁহারই কাছে এ নাটকটির অভিনয় এক নূতন স্বাদ ও বিস্ময় বহন করিবে।"

এর দুবছর পরে 'প্রশ্ন' নামক একটি নাটক বিষয়ে আমি যুগান্তরের জন্য সমালোচনা লিখেছিলাম। আমার হাতের লেখা কপিটির উপরে তারিখ লেখা আছে ১৬-১-৫৩। এই সমালোচনার শেষের কিছু অংশ এই—

..."নাটকটি অভিনয়ের দিক দিয়ে সরল সুন্দর এবং জটিলতা বর্জিত হওয়া সত্ত্বেও এতে একটি জিনিসের অভাব বোধ হয়। সে হচ্ছে দুটি নর-নারীর জীবন ব্যাখ্যার অভাব। নতুন কোনো পথের ইঙ্গিতের অভাব। নাটকের কাহিনী কিছুদূর এগিয়ে যাবার পরই যে পরিণতি ঘটবে মনে হয় শেষ পর্যন্ত তাই ঘটে, অপ্রত্যাশিত নতুন কিছুই ঘটে না। নীতীনের চরিত্রে

কোনো পরিবর্তন নেই। সে সমাজেরই একজন হয়ে রইল শেষ পর্যন্ত, তার বৈশিষ্ট্য কিছুই রইল না, এটাই নাটকের একমাত্র ত্রুটি। নাট্যকারের সাহসের অভাবই সম্ভবত এর জন্য দায়ী। তিনি সমাজ ধর্মের দিকে তাকিয়ে শিল্পীর নিরপেক্ষ উচ্চতায় উঠতে পারেন নি।

"কিন্তু তবু এ কথা মানতেই হবে, আধুনিক নাটকের এক্‌সপেরিমেণ্ট হিসাবে 'প্রশ্ন' নতুন ইতিহাস রচনা করবে। এমন সরল এবং বাহুল্য-বর্জিত নাটক বাংলা মঞ্চে এই প্রথম। এর মধ্যে অনঙ্গ পর্বটা অবশ্য আরো কমিয়ে দেবার সুযোগ আছে. কিন্তু মূল নাটকের গতি এবং পাকে পাকে মণিকার অতীত জীবনের উদ্‌ঘাটন সুন্দর, স্বতঃস্ফূর্ত। মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। এই জন্যই শেষ পর্যন্ত অতৃপ্তিও থেকে যায়, মনে হয় এক নিঃশ্বাসে শেষ হয়ে গেল।"

—অর্থাৎ নাটক শেষ হলে আমরা সবাই পরস্পর জিজ্ঞাসা করেছিলাম (৩।১।৫৩) এ কি হল? মাঝখানে হঠাৎ কেটে গেল?

বক্স-অফিসের কথা না ভেবে এ রকম নাটক মঞ্চস্থ করা শিশিরকুমারের সঙ্গত হয় নি। তারাকুমার মুখোপাধ্যায় এ নাটকের রচয়িতা। তাঁর প্রতি শিশিরকুমারের অবশ্য স্নেহের টান ছিল। আগে জিতেন মুখুজ্জের 'পরিচয়' নাটকও ছিল দুঃসাহসিক সামাজিক সমস্যামূলক। তার আবেদন-ব্যাপকতা এর চেয়ে বেশি ছিল। নাটকটি ছিল সম্পূর্ণ এবং অতি চমৎকার ছিল তার প্রোডাকশন। কিন্তু সমস্যাটি ছিল এমন যে, ধর্মপ্রাণ হিন্দুর (প্রায় সবাই তো তাই) পক্ষে সহ্য করা কঠিন হয়েছিল। আমি এ নাটক দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম এবং রেডিওতে সমালোচনা করেছিলাম। রায়বাহাদুর-বেশী শিশিরকুমার এতে যে অভিনয় করেছিলেন, তেমন অভিনয় তাঁর অন্য কোনো নাটকে দেখিনি। তাঁর এই চরিত্রটি ছিল সম্পূর্ণ নাটকীয়তা বর্জিত, অতি সাধারণ। কিন্তু এই অতি সাধারণ চরিত্র যে কি আশ্চর্য রকমের অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে তা সেদিন বুঝতে পেরেছিলাম শিশিরকুমারের নতুন ভঙ্গির অভিনয় দেখে।

আমার সমালোচনা শিশিরকুমারের কাছে অপ্রীতিকর হয়নি, কোনোটাই না। বরং তিনি উৎসাহ দিয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ডের নাট্য সমালোচনার যে পৃথক সাহিত্য মূল্য আছে তার দৃষ্টান্ত দেখানোর জন্য তিনি ২৩।৮।৫৩ তারিখে এ. সি. ওঅর্ড সংকলিত ও সম্পাদিত Specimens of English

Dramatic Criticism XVII—XX Centuries (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস) নামক একখানি সুমুদ্রিত বই কিনে আমাকে উপহার দিয়েছিলেন।

সমালোচনা চাওয়া এবং তা নিয়ে আলোচনা এবং সংশোধনের চেষ্টা যেটুকু সম্ভব এ কাজ শিশিরকুমার ভাদুড়ি করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল আর এক সমালোচনার কথা, মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত 'তিতাস একটি নদীর নাম' (লিটল্ থিয়েটার গ্রুপ) অভিনয়ে, শ্রীমতী শোভা সেন ব্যক্তিগত ভাবে নিজে এসে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সমালোচনার জন্য নয়, দেখার জন্য। কিন্তু দেখার পর সৌজন্য স্বরূপ আমার মতামত একখানা চিঠিতে জানিয়ে দিয়েছিলাম। বড় বা ছোটখাটো ত্রুটি যা মনে হয়েছিল তাও লিখেছিলাম। কিন্তু দেখলাম আমার সমালোচনা ভালভাবেই গৃহীত হয়েছিল এবং সেজন্য খুশি হয়েছিলাম। শোভা সেনের কাছ থেকে যে চিঠিখানা পেয়েছিলাম সেখানা এই—

Minerva Theatre
6 Beadon Street
Calcutta-6

Phone : 55-4489
[22-4-63, as post mark]

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার পত্র যথা সময়ে পেয়েছি। উৎপল [দত্ত] ও অন্যান্য সভ্যরাও যথেষ্ট আগ্রহ সহকারে পড়েছে। এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে না, আপনার পত্র সত্যিই আমাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। নাটকে দোষ-ত্রুটি বহু আছে তা আমরা জানি। কিন্তু আপনাদের মত শিল্পরসিকদের কাছে তার গুণটুকুই বড হয়ে দেখা দিয়েছে তাতেই আমাদের মুগ্ধ করেছে। দেখা করবার ইচ্ছা আছে এক দিন। নমস্কার ও প্রীতি গ্রহণ করবেন।

ইতি—

বিনীতা শোভা সেন

আমি একদা শিশিরকুমারের রীতিমত নাটকের বেশ কিছু বিরূপ সমালোচনা করেছিলাম। ঐ নাটকে নাটকের অপেক্ষা স্টাণ্ট বড হয়ে উঠেছিল তা আমার ভাল লাগে নি। আমার সমালোচনা নীরদচন্দ্র চৌধুরী সম্পাদিত 'নূতন পত্রিকা' নামক সাপ্তাহিকে (পরিচালনা : সজনীকান্ত দাস) প্রকাশিত হয়েছিল। এটি লিখেছিলাম নীরদবাবুর অনুরোধে, ১৯৩৬ সনে।

তারপর সমালোচনার দিক থেকে যা যা করেছি, তা এই অধ্যায়ে বলেছি। সব মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যাঁরা নাটক ভালবাসেন, তাঁরা এ জাতীয় সমালোচনা পছন্দ করেন।

ন্যাশন্যাল থিয়েটার গড়ার সংকল্প ছিল শিশিরকুমারের, এবং তা নিয়ে অনেক চিন্তাও করেছিলেন। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে যে জাতীয় প্রস্তাব উঠেছিল, (শিশিরকুমারের মুখে শোনা, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের বাড়িতে একটা বৈঠকও হয়েছিল)—কিন্তু এ প্রস্তাব তাঁর প্ল্যানের সঙ্গে মেলেনি বলে তিনি আর সরকারী প্ল্যানের বিষয়ে কিছু ভাবেন নি। কিন্তু তার আগে, তিনি ন্যাশন্যাল থিয়েটার বিষয়ে তাঁর নিজের যে পরিকল্পনা ছিল, (নিজ হাতে লেখা) তার একটি খসড়া আমাকে দিয়েছিলেন। তা এখনও আমার কাছে আছে।

আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার যুগে (১৯৫১ থেকে) আমি শিশিরকুমারের মধ্যে একটা কঠোর ডিসিপ্‌লিন লক্ষ্য করেছি প্রায় সব বিষয়ে। সৌজন্য, প্রতিশ্রুতিপালন, পড়াশোনা করা, আহার-বিহার প্রভৃতিতে নিয়মনিষ্ঠার কোনো ব্যতিক্রম আমার চোখে পড়েনি। স্পষ্টই বোঝা যায় এর অনেকগুলি গুণই তাঁর জন্মগত এবং মজ্জাগত ছিল। যৌবনের উন্মাদনার দিনে (শিশির-কুমার যাকে বলতেন তাঁর salad days) নিজেকে দু'হাতে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেই সবই আবার যেন কুড়িয়ে পেয়েছিলেন শেষ বয়সে। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে বিদায় নেবার সময় তিনি দোতলা থেকে নিচে নেমে এসে শ্রীরঙ্গমের (বর্তমান বিশ্বরূপা) স্টেজের ভিতর দিয়ে সোজা বাইরের গেট পর্যন্ত সঙ্গে আসতেন। এটি আমার কাছে বড়ই সঙ্কোচের কারণ ছিল, কিন্তু এর ব্যতিক্রম ছিল না। আমাদের বাড়িতে একদিন মধ্যাহ্ন ভোজনে দেখেছি—সমস্ত নির্দিষ্ট মাপে খাওয়া। সে অত্যন্ত সামান্য, তাঁর নিজেরই লজ্জা হত সে রকম খেতে। বই পড়তে নিতেন আমার কাছ থেকে নিয়মিত, এবং নির্দিষ্ট তারিখে ফেরৎ দিতেন। একদিন ফেরৎ দেবার দিন, বইখানা খুঁজে না পেয়ে আমাকে লোক মারফৎ চিঠি পাঠালেন, "অমূল্য রত্ন খুঁজে না পাওয়াতে পাঠাতে পারলাম না আজ, পেলেই পাঠিয়ে দেব।"

ওঁর বয়স সম্পর্কে "শেষ বয়স" কথাটি ব্যবহার করেছি বটে, কিন্তু উৎসাহ উদ্দীপনা এবং দৈহিক শ্রমের দিক দিয়ে শিশিরকুমার ছিলেন যৌবনধর্মী।

দৌড়ে দোতলায় উঠতে দেখেছি কতবার—যা আমার পক্ষেও অসাধ্য ছিল। আরো একটি চরিত্রগত গুণ আমার খুব ভাল লেগেছিল, তা হচ্ছে তাঁর প্রচণ্ড ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। পয়সার লোভে অন্যের কাছে নতিস্বীকার তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাঁর ব্যক্তিত্ব সত্যই ছিল অতি প্রবল। যে পরিবেশেই তিনি থাকতেন, সেইখানেই তিনি নিজ অধিকারেই প্রধানতম। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে এই ব্যক্তিত্বের মূলে ছিল শিক্ষা, গঠন ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতা। আত্মবিশ্বাস ছিল ভেজালহীন, তাই সর্বত্র গুরুস্থানীয় হতেন তিনি স্বভাবতই। থিয়েটার বিষয়ে তাঁর যে পরিকল্পনা ছিল, তা রূপ গ্রহণ করলে তাঁর শ্রেষ্ঠ দান তিনি জাতিকে দিয়ে যেতে পারতেন।

৩০শে জুন ১৯৫৯ তারিখে শিশিরকুমারের মৃত্যু ঘটল। ঐ তারিখেই শিশিরকুমারের অন্তরঙ্গ সুহৃৎ হেমেন্দ্রকুমার রায় আমাকে লিখলেন—

২৩০।১ আপার চিৎপুর রোড

৩০।৬।৫৯

সুহৃত্তম, সূর্যোপাসনা সমাপ্ত, জীবন মহীরূহ থেকে আর একটি ভাস্বর শিশিরবিন্দু ঝরে পড়ল ধরার মৃত্তিকায়। নিয়তির এই অমোঘ বিধানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা বৃথা। ব্যাধি আমাকে শয্যাগৃহে আবদ্ধ করে রেখেছে।

তৈরি ক'রে রেখেছি ভাই মনটা

সাড়া দেব বাজলে পরেই ঘণ্টা।

আয়ু ফুরিয়ে গেছে, যেটুকু জীবন আছে সেটুকু ফাউ। ইতি

শুভার্থী

হেমেন্দ্রকুমার রায়

বিংশ পরিচ্ছেদ

চিঠি লিখতে মনের অবকাশ দরকার, সেই অবকাশের অভাব ঘটেছে এখন। পনেরো কুড়ি বছর আগেও এ অবকাশ পাওয়া যেত, পূর্বে উদ্ধৃত অনেক চিঠিতেই এর প্রমাণ মিলবে। আগের যুগের লোকেরা এখনো পান। পত্রস্মৃতির আরম্ভে কালিদাস রায়ের প্রসঙ্গে কিরণকুমার রায়ের নাম করেছি—তার চিঠিতে চিন্তার যে সরসতা এবং সজীবতা আছে (অধিকাংশ উনিশ বছর আগের) তা আজও উপভোগ করি। কিছু নমুনা দিচ্ছি—

সিমলা

১০।১২।৫১ রাত্রি

পরিমলদা,

…শীত মাঝখানে নিদারুণ পড়েছিল, (এখন একটু কমেছে) যার ফলে একদিন খানিকটা তুষার পাত হয়ে গেল। সিমলার শীত এমনি যে তার মধ্যে দস্তানা থেকে হাত বার করা প্রায় যুদ্ধের ব্যাপার, কলম ছোঁয়া প্রায় রাইফেল ছোঁড়ার মতো। সুতরাং শীতপ্রধান দেশে যারা জন্মায় নি তারা অবস্থাচক্রে এখানকার বাসিন্দা হলে বাধে মুশকিল। লেপ মুড়ি দিয়ে হি-হি করে কাঁপা ছাড়া তখন আর এতটুকু কর্ম-সামর্থ্য থাকে না তাদের। সুতরাং দেরী হবার একটা কারণ ঘটেছিল।…এখন টেম্পারেচার চল্লিশের কোঠায়। এই সময়টা সত্যকার উপভোগ্য ব্যাপার। এখনও গাছের পাতা ঝরতে শুরু করেনি। অথচ দূরে স্নো-রেঞ্জ অত্যন্ত সুস্পষ্ট, মনে হয় ড্রীম ল্যাণ্ড—যদি না মাসের শেষে টাকার টানাটানি ঘটে, (যা প্রায় অনিবার্য), এবং হজম হয়—

আচ্ছা, একটা সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছুতে পারলে কি জীবনে ?—আমাদের শরীরটাই শেষ কথা, না মন বলে কোনো একটা পৃথক ব্যাপার আছে ? না ফিফটি-ফিফটি ?

নীরদবাবু [নীরদচন্দ্র চৌধুরী]-কে যদি দৃষ্টান্ত ধর, তা হলে তো মনে হয় শরীরটা নিতান্ত অবান্তর ব্যাপার। হৃদ্‌রোগে ভুগতে ভুগতে যিনি একখানা ৪৫০ পৃষ্ঠাব্যাপী দুর্দান্ত আত্মজীবনীর জনক হতে পারেন তাঁর পক্ষে দিল্লীর 'লু'কে অবজ্ঞা করা তো তুচ্ছ ব্যাপার।

তুমিও খানিকটা নীরদ চৌধুরীর ক্যাম্পের লোক। জীবনের অর্ধেকটা কাল তো কাটালে রোগে ভুগে। অথচ খেলও তো কিছু না দেখালে এমন নয়।

নীরদবাবুর বইখানা পড়বার ইচ্ছা আছে, কিন্তু একেবারে ২১ শিলিং খরচ করতে পারি কই? সেদিন বি-বি-সি থেকে খানিকটা অংশ প'ড়ে শোনালে, কিশোরগঞ্জের নদীতে কৈশোর কালের কিঞ্চিৎ।

...বইখানার থীসিস ইংরেজ মাত্রেরই আত্মপ্রসাদ সূচক (স্টেটস্‌ম্যানের আলোচনায় যেটা মারাত্মক রকমে ফুটে উঠেছে)। আশংকা হচ্ছে হৈ-চৈটা এই থীসিসের জন্য কিনা। ব্যক্তিগত ভাবে এ থীসিসের খানিকটা আমিও মানি। অর্থাৎ ইংরেজের সংস্পর্শে এসেছিলাম বলেই আমরা আজ জাতে উঠেছি। কিন্তু সেইটেই তো একমাত্র কথা নয় আমাদের সম্বন্ধে।

কিন্তু নীরদবাবুর বই না পড়ে এ সম্বন্ধে আর কোনো মন্তব্য করা অন্যায়। ইতিমধ্যে হয়তো তোমার হাতে বইখানা এসেছে। পড়বার সময় হয়েছে কিনা জানিনে। হলে জানিয়ো কেমন লাগল। বই তাঁর যাই হোক, একটা কথা সব সময়েই মনে হয় যে, খুব বেশী লোকের সঙ্গে মিশিনি, কিন্তু যাঁদের সঙ্গে মিশেছি, তাঁদের মধ্যে নিছক শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে যাঁরা রয়েছেন মনে, আজ পর্যন্ত তাঁরা অত্যন্ত মুষ্টিমেয়; এবং তাঁদের মধ্যে নীরদবাবু একজন। অনেক দিন অনেক কারণে তাঁর কাছে গিয়েছি (তুমি আমি একসঙ্গে), যার প্রায় প্রত্যেকটা দিন মনের মধ্যে আজও উল্টে-পাল্টে দেখি, বেশ লাগে।

ইতি—

কিরণকুমার রায়

কিরণকুমারের আর একখানা চিঠি—

সিমলা, ৫।১০।৫২ (রাত ১০টা)
রেডিও'তে পান্নু ঘোষ দরবারী
বাজাচ্ছেন আড়-বাঁশীতে।

পরিমলদা,

তোমার চিঠি আমাকে চিন্তিত করেছে, "নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি নাহি শশাঙ্ক সুন্দর"...স্বামী বিবেকানন্দের সাধন পথের উপলব্ধি। তোমার দেখছি যেদিন সৌরজগৎ সৃষ্টি হয়েছিল—উপলব্ধি সেই পর্যন্ত পৌঁছেছে।...

কিন্তু অ্যাবস্ট্র্যাক্ট চিন্তা কেন? নাইট্রাস অক্সাইড ইন্‌হেল করেছ? শুনেছি ওতে একেবারে বেহেস্তের হুরী-পরী দেখিয়ে ছাড়ে। মেটিরিয়াল কারণে মেণ্টাল অবস্থার এই পরিণতি। পৃথিবীর যাবতীয় মেণ্টাল ব্যাপার ম্যাটারের খেলা, নার্ভের কারচুপি। সুতরাং মন নিয়ে মাথা ঘামাবার আগে ম্যাটার বিশ্লেষণ করো।···

রবীন্দ্রনাথের 'মন' বিজ্ঞানের বিষয় নয়। বাজারে যা অচল তা তুমি যত খুশি পারো যাকে-তাকে দাও, যার-তার কাছে নাও, তাতে বস্তু-বিশ্বের ইতর বিশেষ হবে না। যে বিশ্বের মূল কথা হচ্ছে Law of Supply and Demand, Marginal Utility ইত্যাদি ব্যাপার। বৈজ্ঞানিক পরিমিতিতে মনকে আমরা ম্যাটারের "কন্‌শাস্‌নেস্‌" বলে বুঝতে শিখেছি। ম্যাটারকে বাদ দিয়ে তার কনশাসনেসকে ছড়িয়ে দেওয়া চলে না। অর্থাৎ আমার মনকে যদি ছড়াতে হয় তা হলে আমাকে নিয়ে টানাটানি পড়বে।

এখন আমি কি?

অ্যাবস্ট্র্যাক্ট চিন্তায় তার যে চেহারাই দাঁড়াক, কংক্রীটে আমি পঞ্চাশোর্ধ প্রৌঢ়—বৃদ্ধও বলতে পার—ভারত সরকারের কেরানি।···আমার নিজস্ব সত্তা নেই। এমন অবস্থায় নিজেকে বিলি করবার অধিকার আছে কিনা, সেটা ভারত সরকারের fundamental rules-এর ব্যাপার। যে fundamental rules ব্রিটিশ জাতির সৃষ্টি। আমি তারই অধীন। আমার চাইতে কি তবু রবি ঘোষকে তোমার দুঃখী বলে মনে হচ্ছে?

ইতিমধ্যে পান্নালাল ঘোষ দরবারী এবং আড়ানা শেষ করে তেলং ধরেছেন।

অ্যাবস্ট্র্যাক্ট শব্দ তরঙ্গ কংক্রীট হচ্ছে। যা ছিল হাওয়ায় তা ইথারের পথে তোমার আমার কর্ণে অমৃত পরিবেশন করছে। যদি না আমি যৌবনের আবেগ ছাড়িয়ে এসে থাকি, তা হলে এ সুর আমাকে মাতাল না ক'রে ছাড়বে না। একটু মন দিয়ে শুনলেই দেখি মাতাল হই। বয়সের পরিধির মধ্যে নিজেকে রাখতে পারিনে। অথচ পরিধি ছাড়ালেই বিপদ। হাড়গোড় ভাঙার সম্ভাবনা রয়েছে। পরিধিটা পদার্থ বিজ্ঞানের প্রহরী। মাতাল হওয়াটা তাই সয় না। পদার্থবিজ্ঞানের এইসব প্রহরীদের ঘুষ দেওয়া যায়



কিরণকুমার রায়

ফোটো : পরিমল গোস্বামী
সিমলা, ১৯৪৯

কি ক'রে? ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান সেই সব আইন-কানুন আবিষ্কার করবে। অর্থাৎ আয়ুটাকে ইলাস্টিক ও যৌবনটাকে চিরন্তন করবে।

ইতি

তোমাদের কিরণ

কিরণকুমারের চিঠি ছোট হোক বা বড় হোক (কোনো চিঠি ৬ পৃষ্ঠাও আছে) প্রত্যেক খানাতেই এমন একটা সরসতা এবং অনেক সময় চিন্তার পরিচয় থাকে যা আমার কাছে সব সময়েই প্রিয়। বনফুল, অতুলানন্দ চক্রবর্তী ও কিরণ এদের সঙ্গে আমার জীবনের অনেকখানিই কেটেছে, অনেক স্মৃতিই আমার মনের ভাণ্ডারে জমা হয়ে আছে এদের ঘিরে। কিন্তু তবু মজার ব্যাপার এই যে অতুলানন্দের কাছ থেকে ইংরেজী বহু চিঠির মধ্যে যে একখানি মাত্র রসসমৃদ্ধ বাংলা চিঠি গত ৫৫ বছরের মধ্যে পেয়েছি (১৯১৫ থেকে আরম্ভ করে) সে চিঠি আধুনিক ভাষায় 'মিনি' চিঠি। এর অপেক্ষা ছোট চিঠি বোধহয় পৃথিবীতে অদ্যাবধি আর লেখা হয় নি। আমার কিছু প্রশ্নের উত্তরে অতুলানন্দ শুধু একটিমাত্র কথা লিখেছে, 'হঃ।' পূর্ব-বঙ্গীয় অনুকরণে। অন্য অনেক চিঠি সে লিখেছে কাজের কথায় ভরা, কিন্তু কাজের বাইরে এসে (যদিও সম্পূর্ণ নয়)—'হঃ' লেখার সময় সে এর মধ্যে কৌতুকরস পূর্ণ করে দিয়েছিল। অবশ্য তার ইংরেজী চিঠিই বেশি, এবং তার অনেকগুলি চাপা কৌতুকপূর্ণ।

কিরণের চিঠি সংক্ষিপ্ত নয়, অনেক সময় দার্শনিকতায় বিক্ষিপ্ত। আমি ১৯৪৯ সনের জুন মাসে কালীকিঙ্কর ঘোষদস্তিদারের সঙ্গে পশ্চিম হিমালয় (ল্যানস্‌ডাউন) ভ্রমণে গিয়ে সিমলা-প্রবাসী কিরণকে চিঠি দিই। তার উত্তরে তার কাছ থেকে যে চিঠি এলো তা অগ্রাহ্য না করে দু'জনে সিমলা গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। এই ভ্রমণ কাহিনী তখন ধারাবাহিক ভাবে প্রবাসীতে ও পরে 'পথে পথে' নামক বইতে বেরিয়েছিল। সে কাহিনীতে কিরণদের পাচক কৃপারামের কথাও কিছু ছিল। পরবর্তী চিঠিতে তার কথা আছে।

সিমলা

২।১০।৪৯ (রাত্রি)

পরিমলদা,

তোমার চিঠি এবং প্রবাসী পেয়েছি। প্রথমাংশের সঙ্গে শেষাংশের

'টেম্‌পো'র তফাৎ বেশ স্পষ্ট। প্রথমাংশ ধীরেসুস্থে আরম্ভ করে শেষার্ধে hurry up করতে গিয়ে যেটুকু দোষ হয়েছে।…কৃপারাম একটি চাপরাশীর চাকরী পেয়েছে, আমাদের এখানে এখন নেই—সুতরাং তাকে তার সার্টিফিকেটটা শোনানো গেল না। শোনা যাচ্ছে সে নাকি ছুটি নিয়ে দেশে গেছে আর একটা বিয়ে করতে। একটা বউ আছে, সেটা এখন আর ভাল লাগছে না।

এখানে পাহাড়ীরা বিয়ে ব্যাপারটিকে প্রায় জুতোমোজার সামিল করে দেখে। একটা পুরনো হ'লে—কিংবা না হলেও—নিতান্ত 'হবি' হিসেবে আরও গোটাকয়েক বিয়ে করে ফেলবে। আমাদের বাড়িওলার সাত সাতটা বিয়ে। তার মধ্যে দুটো ওর ঘর-সংসার করছে, আর পাঁচটা খসেছে। অথচ শোনা যায় পঞ্জাবে স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষের তুলনায় কম। তদুপরি এমনি maldistribution, সুতরাং পঞ্জাবী মাত্রেই নিজেদের lover of girls বলে পরিচয় দেয়।

মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটা কখনও ভেবে দেখেছো? তোমার সঙ্গে আমার, আমার সঙ্গে সুধাংশুর [সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরীর]? দিব্যি লাগে ভাবতে।

সরোজের [সরোজ আচার্যের] 'শ্রদ্ধা'টা এই সম্পর্কের ব্যাকগ্রাউণ্ডে দেখছি। সরোজ যখন 'হাবু' [ডাকনাম] ছিল,—১৯২১ সনের কথা বলছি—সরোজের পিতা দক্ষিণাবাবু (what a character!) ৫০০০ টাকা থোক এবং সরোজকে আমার কাছে ট্রাস্ট হিসেবে গচ্ছিত রেখেছিলেন, নন-কো-অপারেশনের যুগে।— আমি তখন স্কুল-বয়কট আন্দোলনের পতাকা নিয়ে কুষ্টিয়ায় গিয়েছিলাম। দক্ষিণাবাবু সরোজকে শান্তিনিকেতনে কিংবা যেখানে হোক দিয়ে দেবার ভার আমাকে দিয়েছিলেন। তারপর ১৯২৬ সনে আমি কুষ্টিয়ায় 'জাগরণ'-এর সম্পাদক, কমিউনিজম প্রচার করি, সরোজ 'জনমত'-এর সম্পাদক—এ কাগজ ও কাগজে ঝগড়া। তারপর, আমি উপাসনা বঙ্গশ্রী ইত্যাদি—সরোজ রাজবন্দী। ………আমার স্নেহটার এবং সরোজের শ্রদ্ধাটার origin and growth—তথা decline সম্বন্ধে একটা গ্রাফ আঁকা যেতে পারে। দেখা যাবে শ্রদ্ধা ইত্যাদি এই সব অ্যাবস্ট্রাকট্‌ ব্যাপারের উঠতি পড়তি—মানুষে মানুষে—কতগুলো বাস্তব ঘটনার নিয়মাধীন। সেখানেও materialistic interrelation। থিসিস আছে, অ্যানটিথিসিস

'আছে, সিনথিসিস আছে। তা থাকুক, সরোজের লেখাটা পাঠিও।······

সরোজ অবিশ্যি বাংলার চাইতে ইংরেজী ভাল লেখে।—

ইতি কিরণ

৬ পৃষ্ঠার দীর্ঘ চিঠির অংশ এটি! শেষাংশে বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে মূল্যবান কিছু আলোচনা আছে, অথচ এমন কথা যা নিরাপদে প্রকাশ করা চলে না, তাই বিরত রইলাম।

পরবর্তী চিঠিখানা এর তিনবছর পরে লেখা—

সিমলা

২৮-৩-৫২

শুক্রবার, রাত্রি

পরিমলদা,

হিংসে হচ্ছে তোমাদের—তোমাকে, সুধাংশুকে, রবিকে [রবীন্দ্রনাথ ঘোষ] হাজারীবাগের ক'দিন মনে পড়ছে। রামগড়ের রাস্তা। তুমি যে ছবিটা তুলেছিলে, রাজরাপ্পা মন্দিরে আমরা তিনজন, সুধাংশু, রবি আর আমি, সেটা রয়েছে দেখছি। দুঃখ হচ্ছে বেলপাহাড়ের তোলা ছবিগুলো নেই। [বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমোদ দাসগুপ্ত ও কিরণ সহ আমি ১৯৩৩ সনে যে ভ্রমণে গিয়েছিলাম বেলপাহাড়ে। ছবি কিছু আছে আমার কাছে।] ১৯২৮।২৯ (?) মনে আছে একবার আমি তুমি আর সাবিত্রীপ্রসন্ন [চট্টোপাধ্যায়] গিয়েছিলাম, সাহেবগঞ্জে, তখনকার একটি ছবি থাকলেও ভাল হত। আর দার্জিলিঙের ভ্রমণ শেষে ফেরার পথে [১৯৩৯] বাংকে শুয়ে [শিলিগুড়িতে, দার্জিলিং মেল ছাড়বার সময়] তুমি স্টিফেন লীকক পড়ছো দেখা যাচ্ছে—রেলগাড়ী, বাংক। সবাই [কিরণ, অতুলানন্দ চক্রবর্তী, সুধাংশুপ্রকাশ ও আমি] শুয়ে আছি। কোথাও না কোথাও যেতে হবে, কোথায় ঠিক নেই—এই রকম একটা পরিস্থিতি মনকে নাড়া দিচ্ছে বেশি। দিব্যি লাগে ভাবতে। শুধু অতীত নয়, বর্তমানেও যদি বলো,—আর কিছুই চাইনে। বাংকে শুয়ে থাকতে চাই। তুমি স্টিফেন লীকক ইচ্ছে করলে পড়তে পারো। সুধাংশু ইচ্ছে করলে ঘুমোতে পারে।

বিভূতিবাবুকে প্রায় ভুলতে বসেছি। তোমাকে লিখেছিলাম কিনা মনে নেই, তাঁর সঙ্গে আমার কথা ছিল, যেই আগে পারি, ম'রে প্রমাণ করবো যে মরাটা মিথ্যা। অর্থাৎ বন্ধুবান্ধব সবাইকে দেখা দিয়ে বেড়াবো। তাঁর মৃত্যু

সংবাদের পর [মৃত্যু ১৯৫০] বহুদিন এখানে দুর্গা ভিলার বারান্দায় রাত্রে একা একা দাঁড়িয়ে থেকেছি, কিন্তু কোথায় কে ?

তোমার স্বাস্থ্যটা একটা কণ্টক হয়ে রইল দেখছি। নইলে, মনে হচ্ছে জীবনকে এক রকম সায়েস্তা করে এনেছিলে। অর্থাৎ একটা পরিপ্রেক্ষিত তৈরি করে ফেলেছিলে। আমার মুশকিল হয়েছে এই যে, পরিপ্রেক্ষিতটা দিনে দশবার বদলায়। কখনও সোজা কখনও বাঁকা..... ....।

ইতি কিরণ

সাবিত্রীপ্রসন্ন, কিরণ ও আমি সাহেবগঞ্জে গিয়েছিলাম ঠিকই, তবে বছরটা কিরণেরই ভুল হয়েছে মনে হয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ১৯২০ সনে। সাবিত্রী-প্রসন্নের জন্যই যতদূর মনে হচ্ছে বিবাহযোগ্যা মেয়ে দেখতে যাওয়া হয়েছিল। তবে জোর করে বলতে পারছি না। আমার স্মৃতিচিত্রণে (১৯৫৮) এই প্রসঙ্গে যেটুকু লেখা আছে তার অংশ তুলে দিচ্ছি—

"এই মেসে [সাবিত্রীপ্রসন্ন পরিচালিত] থাকতে একদিন এক বিশিষ্ট বন্ধুর জন্য ক'নে দেখার ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লাম।......যেতে হল সাহেবগঞ্জ পর্যন্ত।.........দুই বোন সেজে এসে বসল সম্ভাবিত খদ্দেরের কাছে। দুজন একসঙ্গে বসে একই সুর বাজাল সেতারে।"... ...

মনে হচ্ছে আমার হিসাবটাই ঠিক। কিন্তু বিষয়টি ঐতিহাসিক নয়, তাই সাহেবগঞ্জে যাওয়াটা মান্য করে তারিখটি ভুলে গেলে ক্ষতি নেই। আর একটা চিঠি কলকাতা থেকে লেখা কিন্তু তারিখ থাকলেও বছর উল্লেখ এ চিঠিতে বাদ পড়েছে। ডাকঘরের ছাপ অস্পষ্ট। লিখছে—(১।১১)

এই দুই মাসের মধ্যে অনেক কিছু ঘটেছে। শেষ ঘটনা আজকের কাগজে unmanned space ship-এর—

হঠাৎ এই পর্যন্ত লিখে মনটা শূন্যে উড়ে গেল, যেখানে স্যাটেলাইটে-স্যাটেলাইটে কথা চলছে। না পেসিমিস্ট, না অপ্‌টিমিস্ট, কেউ নেই সেখানে।...

ফকিরচাঁদ মিত্র স্ট্রীটে (১৯২০) আমার সঙ্গে তোমার যখন দেখা হয়, তখন কে জানত এমনটি ঘটবে। তুমি হয়তো জানতে, নইলে ক্যামেরা কাঁধে ঘুরতে কেন ?

....আমি জানতাম না। জানলে কি আর সাংবাদিকতার জীবন আরম্ভ

করি? তখনই যে করে হোক কস্‌মস্‌ নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করতাম। এখন তো অনেক দেরী হয়ে গেছে।...

—কিরণ

আর একখানি মাত্র চিঠির অংশ উদ্ধৃত করব। কিরণের অনেক চিঠির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়: বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে লাফিয়ে যাওয়া। মন যখন প্রফুল্ল থাকে তখন এ ভঙ্গি তার হাতে খোলে ভাল। ক্যামেরা নিয়ে ঘোরার কথায় মনে পড়ছে, কিরণও অনেকদিন আমার সঙ্গে ঘুরেছে। আমার কয়েকখানি ভাল ছবি কিরণ সঙ্গে না থাকলে তোলা সম্ভব হত না। ঘোরা বিষয়ে কিরণ ছিল অক্লান্ত।

এখন যে চিঠির অংশ উদ্ধৃত করছি, এই চিঠিতেই কিরণের অধ্যায় শেষ করছি—

৭৩-এল মনোহরপুকুর রোড
কলিকাতা-২৯
২৩।৩।৬৮

তুমি ট্র্যান্‌সেনডেন্টাল মেডিটেশনের অ আ ক খ-ও রপ্ত করনি। নইলে তোমার ২।১১।৬৭ তারিখের চিঠির আমি যে জবাব ট্রান্‌স্‌মিট করেছি, তা পেতে। সুতরাং নির্দেশ এই যে তুমি অবিলম্বে মহাঋষির সঙ্গে পত্রবিনিময় কর।...তোমার দরকার মহেশের ঠিকানা।...আমি মনে মনে চিঠি লিখি আর তুমি তা পাও না, একি আমি জানতাম? না তুমি ডাকঘরের এজেন্ট প্রোভোকাটুর—আমাকে এই চিঠি লেখার ভাইস থেকে মুক্তি দেবার বিরুদ্ধে?

যাওয়ার অবস্থা আর হবে না। ট্রামে বাসে চাপতে ভয় হয়। তার উপর সুধীনের (সুধীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, আকাশবাণী, আমাদের বন্ধু) তো সুবুদ্ধি হ'লো না একটা গাড়ি কিনতে। গাড়ি আগে, না বাড়ি আগে?—নজরুল তার উদাহরণ দেখিয়েছে। বাগচীদাদার [কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী] যে জন্য অনুযোগের অন্ত ছিল না। মুসলমানের ছেলের নাকি সব আগে দরকার সাড়ে তিন হাত জমি কিনে রাখা। নজরুল সেটা না করে এইচ-এম্‌-ভির প্রথম চেক্‌ দিয়ে কিনলো হিলম্যান গাড়ি। পেট্রল যোগাল সব গোপালদা [গোপালদাস মজুমদার], আর পরিবর্তে নিল বইগুলোর কপিরাইট।

ধরো, তুমি যদি গাড়ি কিনে সোজা ড্রাইভ করে আমার এখানে চলে আসতে, তা হলে অসুখ-বিসুখ কোথায় পালাত। উপরন্তু brandy and water এর fifth stageএ—আর কোন স্টেজ দরকার হত না—অনায়াসে পৌঁছে যেতে। মনে রেখো ট্র্যান্সেনডেণ্টাল মেডিটেশনই একমাত্র পন্থা···

কিরণ

মহাঋষি মহেশের এই সময় একটা বিরাট সমৃদ্ধির মরশুম চলছিল দুনিয়া জুড়ে—তাঁর ছবি ইউরোপ, আমেরিকায় ও অন্যান্য দেশের কাগজে কাগজে। তিনি তাঁর ট্যান্সেনডেণ্টাল মেডিটেশনের সাহায্যে মানুষকে দুঃখ থেকে মুক্তি দেবার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। চিঠিতে তাঁরই নামের উল্লেখ। আর শেষের উক্তিটি একটি ইংরেজী কৌতুক বই-এর থেকে এসেছে। আমি অনেক সময়েই কিরণকে ইংরেজী কৌতুক একটা করে আমার চিঠির সঙ্গে উপহার দিতাম। ব্র্যান্ডি অ্যাণ্ড ওঅটার বিষয়ে খুবই মজার একটি কৌতুক পাঠিয়েছিলাম। সেটি এইখানে পুনরায় উদ্ধৃত করছি, এতে চিঠির শেষের কথাগুলি বোধ্য হবে।

কৌতুকটি এই—

There are five stages of Brandy and Water.

The first is "Brandy and Water"

The second is "Bran and Warwer"

The third, "Bran·Warr"

Fourth, "Brrorr"

And the fifth "Collapse".

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল নিখিলচন্দ্র দাসের কথা। নিখিলবাবুকে হাসিয়ে দিলে পাশের লোকের কিছু অসুবিধা হয়। পত্রস্মৃতির অন্যত্রও বলেছি এঁর কথা। স্মৃতিচিত্রণেও সেসব কথা বিস্তারিত লিখেছি। তাঁর কথা আশু দে অমৃতবাজার পত্রিকায় "দি টেরিবল মিস্টার দাস" নামে লিখেছিলেন। এক বন্ধু তাঁকে হাসাতে গিয়েছিলেন, ফলে দেহের নানা স্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে হয়েছিল। পরদিন তা দেখে নিখিলবাবুর কৌতুকবোধ হওয়ায় সেই ব্যাণ্ডেজের উপর হাসতে হাসতে আরো কয়েকটি ঘুসি চালিয়ে তবে তৃপ্ত হয়েছিলেন। নিখিলবাবুর কথা মনে এলো, কারণ উপরে উদ্ধৃত ঐ কৌতুকটি আমি নিজে খুব উপভোগ করেছিলাম, তাই তখনই নিখিলবাবুকেও

এটা পাঠাই। শুনেছিলাম, ফলে তাঁর হাতের কাছে যে সব হতভাগ্য উপস্থিত ছিলেন তাঁদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। আমার উদ্দেশ্যও ছিল তাই।

প্রমথনাথ বিশীর 'পুরাতন পঞ্জিকা'য় বহু চরিত্রচিত্র, তার ভিতরে নিখিল বাবুর চরিত্রটিও যথাযথ—

"ক্ষতির যা কিছু ভার নিখিল দাসের
খিলভাঙা কিল-চড়ে বিষম ত্রাসের
যখন সঞ্চার করে। অমৃতে গরল
অসম্ভব নহে বুঝি! মুখে খলখল
অবিরাম হাসি আর হাতে চলে কিল
বহু দ্বন্দ্ব এ জীবনে, এই তো নিখিল॥

(শনিবারের চিঠি—১৯৩৫)

কিন্তু নিখিলবাবুর আর একটি পরিচয় আছে যা কেউ জানে না। সেটি চাঁদের অদৃশ্য দিকের মতো তিনি সেটি আর প্রকাশ করেন না। করলে তাঁর নাম ডুবতে পারে। কিন্তু সে দিকটি আমি জানি। নিখিলবাবু প্রথম জীবনে কারলাইলের ভক্ত ছিলেন। কারলাইলে রসিকতা নেই, নিখিল-বাবুতেও ছিল না। নিখিলবাবু পরে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তৃপ্তি খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর মধ্যে সব আছে। আমার কাছে লেখা একখানি চিঠিতে নিখিলবাবুর গোপন পরিচয় পাওয়া যাবে। সে চিঠি আমার লেখা "রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান" পুস্তক পাঠাস্তে।

গড়িয়া
পি-১৮ বরদা অ্যাভিনিউ
৮.৩.৭১

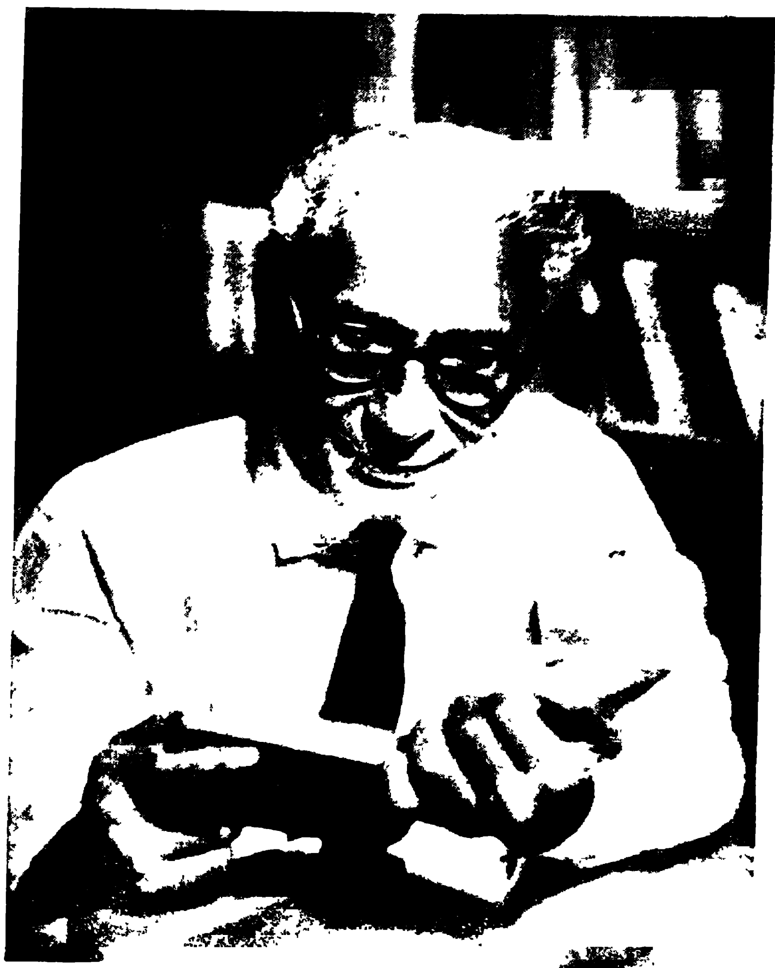
পরিমলবাবু, বইখানা শেষ করেছি গতকাল।…আর একবার বলছি চমৎকার। রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্ব-পরিচয়' অনেকদিন আগে কিনেছিলাম এবং পড়েছিলাম। মনে কোন বিস্ময় জাগেনি। কারণ মনের মধ্যে এমন একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল এবং আজও আছে যে রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান কিংবা যে কোন বিষয়ের আলোচনার মধ্যে কোন অস্বাভাবিকত্ব নেই। যে কোন বিষয়ের অন্তর্নিহিত সত্যে পৌঁছান এবং অন্যের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া তাঁর পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক। এর মধ্যে আশ্চর্যান্বিত হবার কি আছে? রবীন্দ্রনাথ যদি অ্যালজেব্রা, জিওমেটরি, জিওলজি,

উপনিষদ, গীতা, পতঞ্জলি বা অন্য যে কোন দুরূহ বিষয়ে কিছু লিখতেন এবং আমি তা পড়তাম, তা হলেও তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধার মাত্রা নিশ্চয়ই বেড়ে যেত, কিন্তু কিছুই অস্বাভাবিক বোধ হত না। কারণ দ্রষ্টার এবং সত্য উদ্ঘাটন করবার চাবিকাঠি ছিল তাঁর হাতে। তাঁর "ছন্দ" বইখানাও ত ধ্বনি বিজ্ঞানের বই কিন্তু কত সহজ। সবই মনের মধ্যে নিয়েছিলাম সহজভাবে, যেমন নিই আলো বাতাসকে। কিন্তু আপনার বইখানা সব জিনিসটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া অনেক বিষয় পড়িনি এবং জানতাম না। আপনার জ্ঞানের পরিধি এবং গভীরতা অনেক বেশী এবং তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি ও বিশ্লেষণ শক্তির তুলনা পাই না। কাজেই অনেক জিনিস যা চোখে পড়ত না, তা বইখানা পড়ে চোখে পড়েছে। আজই সকালে রেডিওতে "ফল ফলাবার আশা আমি মনে রাখিনি রে" গানটা শুনেছি। আপনার বইখানা পড়বার আগে শুনলে এর অন্তর্নিহিত সত্য ও মাধুর্যের কথা মনেও আসত না এবং··· আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতাম নিশ্চয়ই।···

ইতি

নিখিলবাবু

খুব বড চিঠির অংশ এটি। আশা কবি এ সব কথা প্রকাশ হওয়াতে নিখিলবাবুর প্রতিষ্ঠার কোনো হানি হবে না এবং তাঁকে অতঃপর দেখে কেউ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যাবেন না। একটু হাসিয়ে দিয়ে পরীক্ষা করতে পারেন। চিঠির মাথায় ঠিকানা দেওয়া আছে।



একবিংশ পরিচ্ছেদ

সার চন্দ্রশেখর বেংকটরামন্-লিখিত একখানি চিঠি সামনে খোলা আছে চিঠিখানি এই—

Sir C. V. Raman
DIRECTOR

RAMAN RESEARCH INSTITUTE
HEBBOL POST, BANGALORE—6
29th March, 1967

Ref No-198
Mr. Parimal Goswami
Calcutta—50

Dear Sir

I am writing in reply to your letter of the 27th instant. My name as written in Sanskrit is "রামন্" which also indicates the pronunciation.

Yours truly
C. V. Raman.

(মূল চিঠিতে 'রামন্' নাগরী অক্ষরে ছিল)

আমি সার চন্দ্রশেখরকে এই মর্মে লিখেছিলাম যে, আমি আপনার পদবী-নাম রামন্ বলে জানি। এটি শিখেছিলাম প্রবীন সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। কিন্তু বর্তমান বাংলা কাগজে ও বইতে আপনার পদবী "রমণ" লেখা হয়। এ বিষয়ে আমি অনেক আলোচনা করেছি কাগজে. কোনো ফল হয়নি। তাই আমি ঠিক করেছি আপনার নামের উচ্চারণ আপনার নিজের কথাতেই পাঠকদের মধ্যে প্রচার করব।

আমার চিঠি লেখার চারদিন পরে উপরের ঐ উত্তরটি পাই, এবং তা যুগান্তরে আমার লেখার সঙ্গে ছেপে প্রচার করি। কিন্তু তাতেও যে খুব ফল হয়েছে তা মনে হয় না। প্রমাণ, গত ১৯৭১ জানুয়ারি-২ সংখ্যক বেতার জগতে "আচার্য রমণ" নামক প্রবন্ধ বেরিয়েছে। . এই আচার্য রমণকে আশা করি কেউ মহর্ষি রমণের সঙ্গে ভুল করবেন না। ইনি সার চন্দ্রশেখর বেংকট-রামন্। বেতার জগতে 'রমণ' চেহারা পেয়েছেন। এবং হয় তো ভবিষ্যতেও পাবেন।

বাংলা বানানে বা উচ্চারণে অনাচার আছে, কিন্তু আমাদের দেশের বিখ্যাত একজন বিজ্ঞানীর নামই ঠিকমতো জানি না, এটি বড়ই দুঃখের বিষয়।

প্রসঙ্গত বলা যায় হরীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিজে চেষ্টা করেও নিজের নামের "হারীন্দ্র"-রূপ বীভৎস অর্থহীন বিকৃতি বন্ধ করতে পারেননি। সহজ হরি+ইন্দ্র, তবু হরি হারি কি করে হয় বোঝা শক্ত। কিংবা হয় তো শক্ত নয়। কারণ আকাশবাণী থেকে ইংরেজীতে যে খবর প্রচারিত হয় তাতে আমাদের জানা হরিজনকে হারিজন বলা হয়ে থাকে, শুনেছি নিজ কানেই। সম্ভবতঃ বলার উদ্দেশ্য হাড়ীজন। তা হলে হয়তো ডোমজন মুদ্দফরাসজন বা মেথরজনও শোনা যাবে। ভারতীয়ের মুখে হরি যদি হারি হয় তা হলে বাংলায় হরীন্দ্রকে হারীন্দ্র বলায় আর আপত্তি কি? মৃতদেহ বহনের সময় 'বল হারি' বলা হয় না, অথবা কীর্তনের সময়ে। 'হরীন্দ্র' প্রচারে তিনি নিজে ও আমি চেষ্টা করেছি, ফল হয়নি। এর সঙ্গে আরো দুতিনটি বিষয় ছিল আমার আপত্তিকর তালিকায়। মনে পড়ে সব। যেমন অ্যাটমিককে পারমাণবিক না বলে 'আণবিক' বলা। হিন্দিওয়ালারা আণবিক বলে। মোলিকিউলারের স্বীকৃত বাংলা আণবিক। অতএব মোলিকিউলারের প্রচলিত এবং গৃহীত বাংলা 'আণবিক' শব্দকে যদি পছন্দ না হয় তাহলে মোলিকিউলারের জন্য নতুন একটি বাংলা শব্দ তৈরি করা দরকার। নইলে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচার সম্পূর্ণ অসম্ভব হবে। হিন্দিতে molecule-এর প্রতিশব্দ কি করা হয়েছে জানতে ইচ্ছা হয়। শুধু মনে রাখতে বলেছিলাম পারমাণবিক ও আণবিক ইনটারচেন্‌জেবল শব্দ নয়। এ চেষ্টায় খুব ফল হয়নি। এ ছাড়া ছোট বড় শিক্ষিত অশিক্ষিত অনেকেরই ধারণা জগদীশচন্দ্র বসু গাছের প্রাণ আবিষ্কার করেছিলেন। এ ধারণাও বদল করা সম্ভব হয়নি। জগদীশচন্দ্র নিজেও যে-খবর জানতেন না, তা বাংলাদেশের এত লোক, বিশেষ করে ছোটদের জন্য রচিত জ্ঞান বিজ্ঞানের লেখকেরা, জানল কি করে ভাবলে অবাক হতে হয়। আরো একটি বিষয় (অবশ্য দেশী ব্যাপারেই এত গণ্ডগোল, বিদেশী ব্যাপারে তো হবেই) সে হচ্ছে ডাক্তার ফ্রাংকেনস্টাইনকে দানব মনে করা। এ ভুলও ভাঙা সহজ নয়।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

বিভূতিভূষণকে একবার বলেছিলাম, (পূর্ববর্তী অষ্টাদশ পরিচ্ছেদের ১৩৭ পৃষ্ঠার শেষ লাইন দ্রষ্টব্য) আমি তাঁর সম্পর্কে কিছু লিখব। আমার ঐ সময়ে ইচ্ছা হয়েছিল জীবিত বন্ধুদের সম্পর্কে একখানা বই লিখব। সেই উদ্দেশ্যে তথ্য সংগ্রহ করছিলাম। গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর জীবন বিষয়ে আমাকে যা বলেছিলেন, নোট করে নিয়েছিলাম, এবং তা আমার স্মৃতিচিত্রণে ছাপা হয়েছে। বিভূতিবাবু ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে যে সব কথা শুনেছিলাম,—দুর্ভাগ্যের বিষয় দুজনেরই মৃত্যুর পরে সেই সব উপকরণ নিয়ে দুটি রচনা লিখতে হয়েছিল, পরে দুটি রচনাই আমার সপ্তপঞ্চ নামক বইতে ছাপা হয়েছে। সরোজকুমার রায়চৌধুরী সম্পর্কে যা লিখেছিলাম তা তার প্রকাশক একখানি পুস্তিকাকারে ছেপেছিলেন। আর কিছু সংগ্রহ করা হয়নি, তাই তখন লেখাও হয়নি।

তাই মানিকের একখানি চিঠি পড়তে পড়তে আবার অনেক কথা মনে পড়ছে। চিঠিখানা অবশ্য তুচ্ছ, তার ইচ্ছার প্রকাশ মাত্র—

আলমবাজার

১৪. ১২. ৫৩.

পরিমলদা,

"পাশাপাশি" বইখানার একটি সমালোচনা যুগান্তরে বার করলে সুখী হব। আপনি নিজে করলে সবচেয়ে ভাল হয়।

শরীরটা এখনো সম্পূর্ণ সারেনি, কাজের চাপও বড় বেশী। ইতিমধ্যে একদিন গিয়ে উঁকি দিয়ে আসব। কেমন আছেন?

ইতি প্রীতিকামী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

পুঃ—সমালোচনা একটু তাড়াতাড়ি বার হলে ভাল হয়।

মানিকের মধ্যে একটা প্রচণ্ড অস্থিরতা ছিল তা আমি অনুভব করতাম। ওর প্রতি আমার মনের গভীরে এমন একটা বিস্ময় মিশ্রিত শ্রদ্ধার ভাব জাগত, এবং যুগপৎ এমন একটা করুণা জাগত, যা আমি ভাষায় প্রকাশ

করতে পারি না। মানিক ছিল বিভূতিবাবুর ঠিক বিপরীত চরিত্রের। বিভূতিবাবুর মধ্যে একটা প্রশান্ত গাম্ভীর্য ছিল। মানিকের মধ্যে ছিল এক অশান্ত ঝঞ্ঝার আবহাওয়া। দু'জনেরই শিল্পদৃষ্টি ছিল অতি গভীরে ব্যাপ্ত, কিন্তু দু'জনের মানস ও শিল্পভঙ্গি ছিল পৃথক। কালীকিঙ্কর ও গোপাল ঘোষের শিল্পদৃষ্টি যেমন পৃথক। কালী হিংস্রতার ছবি আঁকলেও তার মধ্যে থাকে একটা প্রশান্তি। আর গোপালের শিল্পে প্রশান্তির মধ্যে থাকে একটা হিংস্রতা। বিভূতিবাবু শিল্পীসুলভ প্রেরণা থেকে লিখেছেন, সে লেখার কখনো কোনো বাজারদর হবে কিনা সে কথা ভাবেন নি। মানিকেরও প্রথম আরম্ভে নিজের প্রকৃত ক্ষমতা বিষয়ে সচেতনতার সম্পূর্ণ অভাব দেখেছি।

মানিকের প্রতি করুণা জাগত বলেছি। সে তার উদ্দাম ঝঞ্ঝাধর্মী জীবনের জন্য। সে যে স্থির হয়ে বসে বড উপন্যাস লিখতে পারে, তাকে দেখে তা মনে হত না। রেস-খেলার মধ্যেই যেন মনপ্রাণ সমর্পণ করেছিল, তার কথায় ও আচরণে তাই মনে হত।

বলত, রেস-খেলা আর আমার কাছে চান্‌সের খেলা থাকবে না, আমি বহুদিনের খেলা চর্চা করে এর মধ্যে একটা নিয়ম আবিষ্কারের চেষ্টা করছি।

বড় একখানা খাতায় সে সব দেখিয়েছিল। তাইতে সে ঘোড়াব হিসাব রাখত। কি রীতিতে সে এসব করত বুঝতে পারিনি, কিন্তু তাব সেই মোটা খাতাখানা ঘোড়ার দৌড় রীতির অঙ্কে ভরা ছিল।

মানিক সম্পর্কে যা বলেছিলাম ১৯৫৬-তে, তার মৃত্যুর পরে. সেই কথার কিছু আবার বলি :

"১৯৩৫ সনের কথা। ২৫।২, মোহনবাগান রো-তে সজনীকান্ত থাকতেন দোতলায়, আমি একতলায়। কয়েকদিনের জন্য দোতলায় আড্ডা জমানোর সুযোগ ঘটেছিল। মানিক আসত, দেবিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (আই. টি.) তখন নিকটতম প্রতিবেশী, সেও আসত। আমরা বাজি ধরে তাস খেলতাম। দিন দশেক ছিল তার আয়ু। পরিকল্পনাটা মানিকের মাথা থেকেই বেরিয়েছিল।

"এই ঘটনা থেকেও মানিককে আরো একটু চেনার সুযোগ ঘটল। ওর বাজি ধরার ধরন ছিল বেপরোয়া।—সবটাই যেন চোখ বুঁজে ঝাঁপিয়ে পড়া। সহধর্মী সজনীও তার কাছে এ বিষয়ে পরাজিত। অজানা অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়াই ওর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

মানিক প্রতি রাত্রে বাস-ভাড়ার পয়সা ধার নিয়ে দোতলা থেকে নেমে যেত। পিছনে কোনো টান রেখে যাওয়া ওর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল।

১৯২৬ সনে মানিক ম্যাট্রিকুলেশন পাস করার পর বাঁকুড়া কলেজ থেকে আই. এসসি পাস করেছিল। এই কলেজে জ্যাক্‌সন নামক এক অধ্যাপক ওকে খুব যত্ন করে বাইবেল পড়িয়েছিলেন। অতঃপর মানিকের মন থেকে ধর্মীয় সব রকম গোঁড়ামি দূর হয়ে যায়। প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এসসি পড়বার সময় সাহিত্য আলোচনায় যোগ দিত। একদিন কথায় কথায় বলেছিল একটুখানি বুদ্ধি থাকলে যে কোনো লোক পড়বার মতো গল্প লিখতে পারে। অনেকে চ্যালেঞ্জ করেছিল, মানিক বলেছিল, আচ্ছা দিন-তিনেক সময় দাও। বন্ধুরা এই তিনদিন ওকে খুব খাইয়েছিল। তিনদিনে গল্প লেখা শেষ করে নিজে গিয়ে দিয়ে এলো বিচিত্রায়। কলেজে মানিক নাম তার ছিল না। প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই সেদিন 'মানিক বন্দ্যো-পাধ্যায়'—এই ছদ্মনাম নিয়েছিল। তারপর থেকে আসল নাম লোকে গেল ভুলে। প্রথম গল্পটি পরের মাসেই ছাপা হল—অতসী মামী। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় স্বয়ং এলেন মানিকের কাছে, বিচিত্রা একখণ্ড ও গল্পের জন্য পনেরোটি টাকা নিয়ে। ভেবেছিল বয়স ৩০ না হওয়া পর্যন্ত গল্প আর লিখবে না, কারণ তার ধারণা ছিল তার আগে মনের বয়স বাড়ে না। কিন্তু উপেনবাবু ছাড়লেন না। ৩০ বছর বয়সে ছদ্মনাম ছেড়ে আসল নামেই লিখবে, কিন্তু 'মানিক' নাম আর বদলানো গেল না। মানিক ঐ যে গল্প লিখতে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিল, ঐ চ্যালেঞ্জ সে ক্রমে নিজের জীবনকেই করতে লাগল। তারপর ভাগ্যের সঙ্গে সংগ্রামের পালা।

"বাস্তব জীবন থেকে দূরে সরে গিয়ে শিল্পীর ধর্মকে পরিত্যাগ করা তার পক্ষে অসম্ভব—এই পণ নিয়ে সে এলো উন্মুক্ত জীবন-প্রাঙ্গণে। তার ক্ষমতা ছল অসাধারণ, কিন্তু সে ক্ষমতাকে সে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখেনি। লড়াই করতে হলে যে কৌশলের প্রয়োজন, তা আর তার আয়ত্ত করা হল না। সে ধৈর্যও তার ছিল না। তাই সে মাঝপথে গিয়ে পরাজিত হল, বাস্তবের পূজারী বাস্তবের বিভীষিকা থেকে শেষে পলায়নের পথ খুঁজতে লাগল। তারপর যেমন সে রেস খেলতে গিয়ে শূন্য পকেটে ফিরত, যেমন সে বাজি ধরে তাস খেলতে গিয়ে শূন্য পকেটে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যেত, আজও সে তেমনি জীবনের সঙ্গে বাজি ধরে হেরে ফিরে গেল।

"ফিরে গেল, কিন্তু অনুশোচনা নিয়ে নয়। কোনোদিন সে বাজি ধরে অনুশোচনা করেনি। তার মধ্যে অনুতাপের স্থান ছিল না। মানিক শেলির ভাষায় কখনো চীৎকার করে বলতে পারল না—I fall upon the thorns of life! I bleed! সে কার কাছে কাঁদবে? সে নিজেই ছিল অবাধ্য ওয়েস্ট উইণ্ড।

"তার জয়ও এইখানে। তাকে শূন্য পকেটে ফিরে যাবার হাত থেকে বাঁচাবার উপায় ছিল না। তার জীবন নিয়ে যে ব্যঙ্গনাট্য রচিত হয়েছিল, তার অনিবার্য পরিণতি এটাই। তার মধ্য-দৃশ্যের উপর যবনিকা টেনে দেওয়া নাটকের দাবিতেই প্রয়োজন ছিল, আর সে কাজ সে নিজহাতেই করে গেছে।"

মানিকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মনে পড়ছে ঔপন্যাসিক স্বর্ণকমল ভট্টাচার্যের কথা। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় যুগান্তরে। আমার বিভাগে তিনি মাঝে মাঝে আসতেন, এই সূত্রে। তাঁর সঙ্গে আমার কখনো পত্রালাপ হয়নি, মৌখিক আলাপ হয়েছে। কিন্তু একখানা ছাপা চিঠিতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর নাম একসঙ্গে দেখে একটি বিশেষ কৌতুককর ঘটনা মনে পড়ল।

তিনি একদিন আমাকে তাঁর জীবনের যে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন, তা, আমাদের দেশের সাহিত্যিকরা সাধারণভাবে বাজারে কি সম্মান পেয়ে থাকেন তার একটি অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত বলেই আমার মনে হয়েছে। কিন্তু ছাপা চিঠিখানাকে আগে উদ্ধৃত করি, কারণ এ চিঠিতেও ১৯৪৭ সনের একটি প্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যাবে। আমি যে চিঠিখানা পেয়েছিলাম তা ইংরাজী ও বাংলায় রচিত। আমি বাংলা অংশটি মাত্র তুলে দিচ্ছি—

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

স্বাধীনতা উৎসব উপলক্ষে আমরা আগামী ৩০শে আগস্ট শনিবার বিকাল সাড়ে পাঁচটায় ইউনিভারসিটি ইনস্টিট্যুট হল্-এ বাংলা হিন্দী ও উর্দুভাষী লেখক ও শিল্পরসিক বন্ধুদের একটি প্রীতি সম্মেলনের আয়োজন করিয়াছি।

আপনি অনুগ্রহ করিয়া উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করিবেন ইহা আমাদের সকলের বিনীত প্রার্থনা। ইতি— ৫।৮।৪৭

চারুপ্রকাশ ঘোষ
সম্পাদক
বঙ্গীয় গণনাট্য সঙ্ঘ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য
যুগ্ম-সম্পাদক
বঙ্গীয় প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ

স্বর্ণকমলবাবু যে গল্পটি বলেছিলেন তা এই—

আমি ভবানীপুর অঞ্চলে থাকি। যদুবাবুর বাজারের কাছে দেখলাম একটি নতুন চায়ের দোকান খুলেছে। সকালে একদিন গেলাম সেখানে চা খেতে। সেখানে সেই আমার প্রথম যাওয়া। খাওয়া শেষে আমি চা ও টোস্টের দাম দিতে গিয়েছি, কিন্তু দোকানের মালিক কিছুতেই দাম নিতে চান না। বললেন, আপনার মতো একজন গুণীলোক আমার এখানে এসে চা খেয়েছেন, এ আমার ভাগ্য। পয়সার কথা তুলে আমাকে লজ্জা দেবেন না। আমি বললাম, কিন্তু এ ভাবে ব্যবসা চালাবেন কি করে, পয়সা আপনার নেওয়া উচিত। কিন্তু তিনি পয়সা নিলেন না, উপরন্তু জোড় হাতে অনুরোধ জানালেন, আপনি রোজ এসে চা খেয়ে যাবেন।

আন্তরিকতার কাছে হার মেনে স্বর্ণকমলবাবু প্রতিদিন সকালে সেখানে হাজিরা দিতে লাগলেন। একজন সাহিত্যিককে এমন সম্মান বোধহয় সহজে কেউ দেয় না। এ আনন্দ নোবেল প্রাইজ পাওয়ার আনন্দ থেকে কম কিসে? বরং এ সম্মানের আনন্দ মনে হয় আরো বেশি।

স্বর্ণকমলবাবু বলতে লাগলেন, বাংলাদেশের ছোট এক চায়ের দোকানের মালিক নিতান্তই সাহিত্যপ্রীতি থেকে একজন লেখককে চা খাওয়াচ্ছেন এটা সত্যিই আমার কাছে একটা গর্বের কারণ হয়ে রইল। বাংলাদেশে এমন মানুষের অস্তিত্ব আমার কল্পনার বাইরে ছিল।

কিন্তু কল্পনার রঙীন ফানুসটা একদিন এক দুর্ঘটনায় ফেটে গেল। স্বর্ণকমলবাবু বলতে লাগলেন—আমি যখন যেতাম তখন অন্য খদ্দেরও উপস্থিত থাকতেন। হঠাৎ একদিন এক খদ্দের চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, মশাই, আপনার চা-টোস্ট একেবারে অখাদ্য।

মালিক খুব বিনীতভাবে বললেন, কি বলছেন আপনি, আমাদের এ দোকানে বহু গুণী লোক আসেন। তারপর আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে সেই ভদ্রলোকটিকে বললেন, এই যে দেখছেন, উনি কে জানেন? উনি বিখ্যাত নবদ্বীপ হালদার। এখানে রোজ চা-টোস্ট খান, কৈ তিনি তো কখনো বলেন না এসব খারাপ? খারাপ হলে কি উনি রোজ আসতেন?—

আমার তখন মনের অবস্থা কি, বুঝতে পারছেন। আমি তখন না পারলাম প্রতিবাদ করতে, না পারলাম নিজের পরিচয় দিতে। আমি

নবদ্বীপ হালদার নই বললে অনেক জটিলতার সৃষ্টি হত। প্রথমত, দোকানী মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হতেন এবং স্বর্ণকমল ভট্টাচার্যকে এতদিনের বিল শোধ করতে হত। দোকানীর অবশ্য দোষ নেই, নবদ্বীপ হালদার তাঁর কাছে মহা সম্মানিত। তিনি জ্ঞাতসারে স্বর্ণকমলবাবুকে অসম্মান করেন নি।

এঘটনার কথা বলতে গিয়ে শিবরাম চক্রবর্তীর ব্যক্তিবদলের একটি চমৎকার রসিকতার কথা মনে পড়ল। আমি তাঁর একখানা ফোটোগ্রাফ তুলেছিলাম সম্ভবত ১৯৬০ সনে কিংবা আরো আগে। ফোটোখানায় শিবরামের চেহারা একটু বেশি ফর্সা দেখাচ্ছিল। আমি কয়েক বছর পরে তাঁর দাবিতে যখন সে ফোটো তাঁকে পাঠাই তখন লিখেছিলাম ফোটোতে শিবরাম শুধু শিব হয়েছেন, রাম বাদ পড়েছেন। তাই আর একবার আসবেন। তার উত্তর পেলাম এই—

কলকাতা, ২৭।১২।৬৫

শ্রদ্ধাস্পদেষু, ঠিকই লিখেছেন, শিবের ফোটোই বটে। কিন্তু রামের চেহারা নেই বলে তেমন খুব আরাম হল না। প্রতিকৃতি হিসেবে খারাপ নয় কিছু, কিন্তু এটাকে আমার প্রতীকরূপে ভাবতে পারছিনা কিছুতেই। পিছনে ভারী ভারী বইয়ের সমারোহ। এই পণ্ডিতম্মন্য পরিবেশে ভাব-নিমগ্ন পঠদ্দশায় আমি—এ তো নিজেকে ভাবাই যায় না কিছুতেই। আমার খুদে খুদে পাঠক পাঠিকারা তো ভাবতেই পারে না। তাই আবার একদা আপনার কাছে যেতে হবে—এই তুষারকান্তিকে তরুণকান্তিতে রূপান্তর লাভের জন্যই—যে প্রলোভন আপনি দেখিয়েছেন! মরার পরে যেন সেই ফোটোটাই বেরয় এই আশা নিয়ে মরব।

শিবরাম

'তুষারকান্তিকে তরুণকান্তিতে রূপান্তর'—এমন চমৎকার রূপান্তর চায়ের দোকানের মালিক স্বর্ণকমল ভট্টাচার্যকে নবদ্বীপ হালদারে করতে পারবেন কেন? ভাষাচাতুর্যের কাছে চা চাতুর্য স্বভাবই পরাজিত।



আশু দে

ফোটো : পরিমল গোস্বামী ১৯৩৮

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

ইতিপূর্বে নিখিলচন্দ্র দাস সম্পর্কে আশু দে'র নাম উল্লেখ করেছি। ইংরেজীতে এনটারটেনার বলতে যা বোঝায় আশু দে'র আসল পরিচয় তাই। তাঁর কাছে কয়েক বছর ধরে তাঁর বহু কৌতুক কাহিনী শুনেছি—তা এমনই নিটোল এবং উদ্দামরূপে কৌতুককব যে, এক একটি সম্পূর্ণ ছোটগল্পের আকারে প্রকাশিত হলেও তা তাঁর মুখে প্রায় কাব্যের মতো বহুবার আবৃত্তির যোগ্য। তাঁর মুখে এ সব না শুনলে বর্ণনার সাহায্যে তা বোঝানো যাবে না। আমার স্মৃতিচিত্রণে তাঁর সম্পর্কে অনেকখানি বলা আছে। ভাগলপুরে ওকালতি করতেন, ওখানেই বাড়ি ছিল তাঁর। পরে কলকাতায় রজনী সেন রোডে বাড়ি করে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ছিলেন, আমি ভাগলপুরে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হই। ১৯৩২-৩৩ সনে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে প্রায়ই যেতাম, এবং তারই ল্যাবরেটরির বারান্দায় আড্ডা জমত। পরে ১৯৬৩ পর্যন্ত যুগান্তরে মাঝে মাঝে আসতেন এবং আমার ঘরে বসে তাঁর কাহিনীর সাহায্যে সবাইকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতেন। এবং দু'ঘন্টার নিচে তা শেষ হত না। তাঁর একখানি চিঠি এখানে আমি উদ্ধৃত করছি, এই চিঠির পিছনে কিছু কাহিনী আছে।

৭, রজনী সেন রোড
কলিকাতা-২৬,

প্রিয় পরিমলবাবু,

সময় ও স্মরণ থাকিলে আগামী রবিবার অর্থাৎ ২৩শে ফেব্রুয়ারির "প্যাটার"টি (অমৃতবাজার পত্রিকায়) পড়িবেন। টেলিফোনে কারণ জানাইয়াছি।···

ইতি
আশু দে

আশু দে ফোন করেছিলেন ১৪ই ফেবরুয়ারি তারিখে, সকাল বেলা। ফোনে এই রকম কথা হল—

আশু। আপনি কে?—আমি আশু দে বলছি।

আমি। আমি পরিমল গোস্বামী বলছি।

আশু। (বিস্ময়ে চমকিত হয়ে) আপনি পরিমলবাবু ?

আমি। গলা শুনে বুঝতে পারছেন না ?

আশু। কি সর্বনাশ! আমি যে রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি আপনি মারা গেছেন, আপনাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

আমি। আমি মারা যাইনি। কথা বলছি।

আশু। আমি স্পষ্ট দেখেছি। তা হলে তো ভাববার কথা। আমি ভয়ে ভয়ে ফোন করেছি—জানি আপনি নেই, অন্য কেউ ধরবে ফোন। তা হলে আমার নিজের মৃত্যু আসন্ন।

আমি। বলেন কি ? স্বপ্ন স্বপ্নই।

আশু। অন্যের মৃত্যুর স্বপ্ন দেখলে সেটা না মিললে, স্বপ্ন যে দেখে তার মৃত্যু হয়।

.আমি। মৃত্যু স্বপ্ন দেখলেও হয়, না দেখলেও হয়—আমার আপনার এবং দুনিয়াসুদ্ধ লোক—সবারই কোনো না কোনো দিন হবে। তা নিয়ে ভাববেন না।

আশু। আপনি তো বলছেন ভাববেন না, কিন্তু সবই যে গোলমেলে হয়ে গেল।

এর কিছুদিন পরেই আশু দে যে চিঠি লিখলেন আমাকে, সেই চিঠিই কিছু আগে উদ্ধৃত করেছি।

আশু দে'র "প্যাটার" আমি প্রায় সবসময়েই পড়তাম। তিনি ২৩শে তারিখের যে প্যাটারটি পড়তে বলেছিলেন, সেটিও পড়লাম। তিনিও একটি অতিরিক্ত ক্লিপিং আমাকে পাঠিয়েছিলেন। তাতে তিনি ১৪ই তারিখে ফোনে আমাকে যেসব কথা বলেছিলেন, আমার মৃত্যুর স্বপ্ন, এবং আমি মারা যাইনি বলে তাঁর নিজের মৃত্যুভয়, সবই লিখেছিলেন। যে ক্লিপিংটি ছিল তা ছিঁড়ে গেছে, এবং অনেকখানি অংশ কোথায় হারিয়ে গেছে। "প্যাটার"টির নাম ছিল "Do Players Please ?" এর মধ্যে আমার প্রসঙ্গে যেটুকু ছিল তার আরম্ভটা ছিল এই—At 2-30 this morning I got the news that Parimal Goswami was dead.

আশু দে'র মৃত্যু ঘটল আমাকে ফোন করার ৮৪ দিন পরে ৯ই মে ১৯৬৪। মনে হয় মৃত্যুর পূর্বাভাস মনে জেগেছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন প্রধানত কৌতুকপ্রিয়, এই কৌতুককে তিনি শিল্পের পর্যায়ে তুলেছিলেন।

আমি ভাগলপুর থাকতে তাঁর মুখে একটি কাহিনী শুনেছি এই রকম একটা ধারণা থেকে পরবর্তী কাহিনীটি ইতশ্চেতঃতে আশু দে'র বলে উল্লেখ করেছিলাম।

বিষয়: ঢাকার মশা। আমি লিখেছিলাম, আশু দে মশারির মধ্যে প্রবেশ করে দেখেন সেখানেও মশা। তখন মশারিটি ফুটো করে কিছুক্ষণ শুতেই ঘরের সব মশা সেই ফুটো দিয়ে হুড়মুড় করে ভিতরে ঢুকে গেল, তখন তিনি মশারি থেকে বেরিয়ে এসে ফুটোটি বন্ধ করে বাইরে শুয়ে রইলেন। সব মশা তখন মশারির ভিতরে বন্দী।

আশু দে এটি পড়ে আমাকে ১৬৷৩৷৬৪ তারিখে লিখলেন—

"প্রতিবাদ করিতে আর প্রবৃত্তি নাই। কিন্তু রবিবারের ইতশ্চেতঃতে (১৫-৩-৬৪) মশক লইয়া আমার সম্বন্ধে কিছু মুখরোচক মন্তব্য করিয়াছেন। সেটি অপরের সহিত আমিও উপভোগ করিয়াছি, কিন্তু ভোগান্তে একটু বিমর্ষ বোধ করিতেছি। কারণ এই কাহিনীটি উপাদেয় হইলেও ইহাতে বোধ হইতেছে যুগান্তকারী স্মৃতি-চিত্রকরের স্মৃতিতে বোধ হয় ঘুণ দেখা দিয়াছে। কারণ আমি জীবনে ঢাকায় যাই নাই এবং আপাততঃ সেরূপ কোনো আকাঙ্ক্ষাও পোষণ করি না।

"মশক ও মশারি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা আমার মাদ্রাজের অভিজ্ঞতার কাহিনী। তাহাতে মশারি সম্বন্ধে কোনো তথ্য ছিল না। মশক সম্বন্ধে এবং মাদ্রাজী মশক সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান সংবাদ ছিল। "মূল্যবান" বলিলাম কারণ যে "প্যাটার"টি মাদ্রাজের "হিন্দু" এবং "স্পোর্ট অ্যাণ্ড প্যাস্টাইম" কাগজে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল। লেখাটির শিরোনামা ছিল The Masakams of Madras.

"মাদ্রাজে মশক বলিলে কেহই বুঝিবে না। মশকম্ বলিলেই বুঝিবে। ম-কার বাক্যের পুরোভাগে বসিয়া অনেক খেলা দেখায়! কিন্তু পশ্চাদ্‌ভাগে জুড়িয়া দিলে তাহার চাইতে কত চমকপ্রদ ম্যাজিক দেখাইতে পারে তাহা মাদ্রাজে না গেলে বোঝা অসম্ভব। বিস্কুট চাহিলে ওয়েটার বা হোটেলের পরিবেশক ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকিবে, বিস্কুটম্ বলার সঙ্গে সঙ্গে বাক্স আনিয়া হাজির করিবে। এটি শিখিবার পর হইতে টীয়ম্, টোস্টম্, মাখনম্, মারমালেডম্—কোনো জিনিসেরই অভাব ভোগ করি নাই। এ সমস্ত তথ্যই লেখাটিতে ছিল।

"আপনার স্মৃতিচিত্রণ এখনও মাঝে মাঝে পড়ি, তাহার মুখপত্রকারের সমালোচনায় (অমৃতবাজার পত্রিকায়) যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা নয়। কারণ আপনার "অহম্"-দানবের নিগ্রহ ঐ "চিত্রণে" যেরূপ পাইয়াছি তাহা রিটায়ার্ড ডেপুটি, জজসাহেব, কমিশনার মহোদয়দের সখের ডায়ারিতে কোথাও পাই নাই। আশা করি এই প্রশস্তিতে সে মাথাচাড়া দিয়া উঠিবে না।" ইতি—

আশু দে

(রোগশয্যায় প্ররোচিত)

কৌতুক সৃষ্টি সাধারণ কথায় নয়; বহু জনকে একসঙ্গে হাসাবার জন্য আশু দে অনেকগুলি মজার গল্প রচনা করে নিয়েছিলেন, তার মধ্যে 'শূটার শশী' আমার কাছে সবচেয়ে ভাল লেগেছিল—তাঁর লেখা ইংরেজীর চেয়েও তাঁর মুখে বাংলায় গল্পটি শোনা। একটি অতি উচ্চাঙ্গের ছোট গল্প এটি। শশী রায়বাহাদুর হয়েছেন অথচ বন্দুক ছুঁড়তে জানেন না, এ জন্য তিনি বন্ধুজন কর্তৃক ধিক্কৃত। এই লজ্জা দূর করার জন্য বন্দুক কেনা হল, কিন্তু ট্রিগারে হাত দেওয়ার ভীতি যায় না। শেষে ঠিক হল ট্রিগারের সঙ্গে দড়ি বেঁধে দূর থেকে টেনে ফায়ার করবেন এবং প্রতিদিন এইভাবে একটু একটু করে কাছে আসা অভ্যাস করবেন। শেষ পর্যন্ত ভয় দূর হল। এবারে লক্ষ্যভেদ অভ্যাস। কিন্তু ফায়ার করতে হাত কাঁপে। পাখী মারতে বেরোন, কিন্তু পাখীরা তাঁর ক্ষমতা জানে, ডালে নিশ্চিন্ত মনে বসে থাকে। পাখীর দিকে লক্ষ্য করে যে দিন বন্দুক তোলেন, সেদিন নিচে কোনো কুকুর থাকলে পালিয়ে যায়। আবার যেদিন নিচের কোনো জন্তু মারতে বেরোন, সেদিন পাখীরা পালায়। অবশেষে একদিন কয়েকটা হাঁস হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে এলেন শিকার শেষে। এবং সেইদিন প্রথম তাঁর স্ত্রী মাথায় ঘোমটা তুললেন।

একটি পূর্ণাঙ্গ ছোটগল্প।

আশু দে'র যে চিঠিখানা শেষে উদ্ধৃত করেছি—ওখানা মৃত্যুর প্রায় দু মাস আগে লেখা। রোগশয্যায় শুয়েও কিঞ্চিৎ কৌতুককর স্মৃতি জেগে উঠেছিল, এবং আমার ভুলই তাঁকে ঐ চিঠিখানা লেখায় 'প্ররোচিত' করেছিল।

আমি ঢাকার মশার গল্পটি শুনেছিলাম ভাগলপুরে বলাইচাঁদের ভাই ভোলানাথ মুখুজ্জের কাছে, পরে মনে পড়েছে।



সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

ফোটো : পরিমল গোস্বামী ১৯৫৪

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

১৯৬৪ সনে অশু দে'র জীবনাবসনের পর ১৯৬৫ সনের ৫ই অকটোবর আর এক বন্ধুর জীবনাবসান ঘটল।

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর কথা বলছি। তাঁর একখানি চিঠি—আমার এক প্রশ্নের উত্তরে লেখা। আমার প্রশ্নটি ছিল: রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে যে তাল যোজনা করেছেন, শুনেছি তাঁর কোনো কোনো গানে সেই তালে সাধারণ সঙ্গীতে যে তাল ব্যবহৃত হয় তা থেকে পৃথক, অতএব সেই পৃথক তাল গানের ক্ষেত্রে মানা চলে না। তাল তত্ত্ব আমার জানা নেই, অতএব জানতে চাই।

সুরেশচন্দ্র তার উত্তরে লিখেছেন—(৩-৩-৬৩) "কবিতার ছন্দ আর সঙ্গীতের তাল এক বস্তু নয়। দৃষ্টান্ত: ছন্দের সমাপ্তি যেখানে চার মাত্রায় হয় (যথা ১টি গুরু + ২টি লঘুবর্ণ) সেখানে এই চার মাত্রার বিন্যাস কতবার আবর্তিত হবে তার নির্দিষ্ট নিয়ম নেই, রচয়িতা ইচ্ছামত যেখানে যতবার ইচ্ছা আবর্তন করতে পারেন। তালের বেলায় এই আবর্তনের সংখ্যা নির্দিষ্ট, তার কম বেশী হলে তাল ভুল হবে। রবীন্দ্রনাথ কোন কোন স্থানে তালের বদলে কবিতার ছন্দকেই গানে তাল রূপে ব্যবহার করেছেন। এটি তালজ্ঞ ব্যক্তির কাছে ত্রুটি মনে হতে পারে।"

আমার পরিচিত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী অন্তত পাঁচজন. (তার মধ্যে কাশীর উত্তরা সম্পাদক সুরেশ চক্রবর্তী এখনো জীবিত।)—এত সুরেশ চক্রবর্তী থাকায় নামে বিভ্রান্তি ঘটতে পারে। কিন্তু ঘটা উচিত নয়, কারণ ইনি সঙ্গীত-শাস্ত্রী, মিউজিকে ডকরেট প্রাপ্ত. বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এল, এবং কিছুদিন আদালতে আইনজীবীর কাজও করেছিলেন।

সুরেশবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় ১৯৩৭ থেকে। এই সময়ে আমি একটি সঙ্গীতযন্ত্র ও রেকর্ড তৈরির প্রতিষ্ঠানে মাসিক বিজ্ঞাপন পুস্তিকা লেখার কাজ করতাম। সুরেশবাবু এঁদের প্রতিষ্ঠানের রেকর্ড সঙ্গীতের শিল্পীদের মনোনয়ন এবং কোনো কোনো রেকর্ডে সুর যোজনা করতেন। এখানে আরো যাঁরা একাজ করতেন তাঁদের দুজনের অকাল মৃত্যু ঘটেছে। একজন উমাপদ

ভট্টাচার্য (এম-এ, ইংরেজী) অন্যজন শৈলেশ দত্তগুপ্ত। জীবিত আছেন ধীরেন ভট্টাচার্য ও নিতাই ঘটক। সুরেশবাবু আমার একখানি ছোটদের জন্য রেকর্ডের সুর যোজনা ও পরিচালনা করেছিলেন। অবশ্য উচ্চ সঙ্গীতের বিচারে তার কোনো দিক দিয়েই কোনো ওস্তাদি ছিল না, এবং সে সুর সঙ্গীত-সভায় গাওয়ার যোগ্য নয়। কারণ রেকর্ডের বিষয়বস্তু ছিল নাটিকা আকারে, এবং যিনি তাতে নাচ ও গানের অংশ নিয়েছিলেন, তিনি মানুষ নন, একটি গাধা। সেই গাধার নাচ ও গান, এবং তা একটি শেয়ালের প্রবোচনায়। কিন্তু সমস্ত নাটিকাটির সাফল্য সেই নাচগানের উপর ছিল বেশি নির্ভরশীল। কারণ তা ছোটদের কাছে আদরণীয় হওয়ার প্রয়োজন ছিল। এদিক থেকে সুরেশবাবুর হিসাব ছিল নিখুঁত। তিনি ছোটদের আরো একখানি রেকর্ডে ঠিক এমনি সুর সংযোজন করে রেকর্ডখানি বিখ্যাত করেছিলেন এই প্রতিষ্ঠানেই—কাহিনীটির নাম ছিল স্বপনবুড়ো। অখিল নিয়োগী শেষে এই নামেই যুগান্তরের ছোটদের আসর চালিয়েছিলেন।

অল ইণ্ডিয়া রেডিও-তে সুরেশবাবুর কর্তৃত্ব ছিল অনেকখানি। সঙ্গীতের অডিশন নিতেন তিনি একা। এবং অন্য বিভাগেরও কাজ করতেন মাঝে মাঝে। নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার ছিলেন ক্লারিওনেট বাদক; তিনি শিশিরকুমার ভাদুড়ির সীতা নাটকে ক্লারিওনেট বাজিয়ে নাটকখানির উজ্জ্বলতা বাড়িয়েছিলেন। পরে তিনি হয়েছিলেন অল ইণ্ডিয়া রেডিও-র প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর (বাংলা)। নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার ও সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মিলে প্রোগ্রাম ঠিক করতেন অনেক সময়। একবার আমাকে অনুরোধ জানালেন ২০ মিনিটের নাটিকা চাই অনেকগুলি। তিনটি মাত্র চরিত্র থাকবে, দুজন পুরুষ, একজন নারী। এবং বলে দিয়েছিলেন অভিনয় করবেন ইন্দু মুখোপাধ্যায়, শৈলেন চৌধুরী ও ঊষাবতী।

পিপাসা, স্বামীসন্ধান, সাপ্তাহিক সমাচার প্রভৃতি কয়েকখানা নাটিকা লেখা হয়েছিল এই উপলক্ষে। সুরেশবাবু ছিলেন খুব রসিকতা প্রিয়, তিনি একদিন বললেন "এইটে কি কম?" এই নামে একটি নাটিকা লিখুন এই পর্যায়ে। লিখেছিলাম। পরে 'ঘুঘু' নামক একটি নাটিকা সংকলনের বইতে এই নাম বদল করে 'গুপ্তধন' করেছিলাম। 'সাপ্তাহিক সমাচার' নামক এই পর্যায়ের নাটিকাটি একাঙ্কিকা নাটিকা সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন—ডকটর অজিত ঘোষ তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থে।

একটা কথা এ প্রসঙ্গে মনে এলো। অন্যত্রও বলেছি। ইন্দুবাবু, শৈলেন-বাবু, দুজনেই তখন খ্যাতিমান অভিনেতা। কিন্তু তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ অহঙ্কারহীন। কোনো দিকেই তাঁদের কোনো দাম্ভিকতা ছিল না। এবং অভিনয় যাতে ভাল হয় সেজন্য সবগুলি নাটিকার রিহারসালেই আমাকে ডেকেছেন, এবং আমি নাটিকায় যে কথা যেভাবে বলতে চেয়েছি তা ঠিক হচ্ছে কিনা, বার বার জিজ্ঞাসা করে নিয়েছেন আমার কাছ থেকে। ইন্দুবাবু ছিলেন খুব নামকরা রস-অভিনেতা। (তিনি ছিলেন ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের জ্যাঠতুত বড ভাই)। নিউ থিয়েটার্স'র তিনি ছিলেন একজন সম্পদ। কিন্তু তাঁদের সবারই শিক্ষার্থীরূপে আমার নির্দেশ মান্য করার মধ্যে তাঁদের যথার্থ পরিচয় আমি পেয়েছিলাম।

সুরেশবাবু 'এইটে কি কম?' নামে যে নাটিকাটি আমাকে লিখতে দিয়ে-ছিলেন, সেও তাঁর রসিকতার একটি রূপ—বিষয় না বলে শুধু শিরোনাম, প্রবন্ধ লেখায় যা চলে অনেক সময় (আমি তাঁর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে তাঁকে খুশি করতে পেরেছিলাম)।

সুরেশবাবুর সঙ্গীত বিষয়ে যে পাণ্ডিত্য ছিল, তা তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে প্রায় ত্রিশ বছর মেলামেশা করে উপলব্ধি করেছিলাম। তিনি নিজে খুব ভাল এসরাজ বাজাতেন, এবং একবার শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গভীর মনোযোগ দিয়ে তাঁর এসরাজ শুনেছিলেন এবং মুগ্ধ হয়েছিলেন। সুরেশবাবু কোনো স্মৃতিমূলক রচনায় একথা লিখেছিলেন, আমাকে মুখেও বলেছিলেন।

১৯৪৫ সনে আমার খুব ইচ্ছা হয়েছিল একটা কিছু বাজনা শিখব। আমার পিতা সেতার এবং বেহালা দুইই বাজাতেন, অতএব আমারই বা শেখায় বাধা কোথায়? যখন ইনটারমীডিয়েট পড়ি তখন এক তবলা শিক্ষার্থীর তাল ঠিক রাখার জন্য আমাকে তাঁর দুএকজন শুভার্থী হারমোনিয়ামে দুএকটি গৎ বাজাতে শিখিয়ে দিয়েছিলেন, আমি সেই উৎসাহী তবলাবাদকদের মেট্রোনো-মের কাজ করেছিলাম কিছু দিন। তার অনেক বছর পরে ৪২ হ্যারিসন রোডে ইনটারন্যাসনাল বোরডিংএ এনজিনিয়ার তারাচরণ গুঁই—যিনি গানে ওস্তাদ ছিলেন, তাঁর শখ হল তবলা শিখতে। তিনিও আমাকে একটি গৎ শেখালেন হারমোনিয়ামে। মাঝে মাঝে তাঁর সামনেও মেট্রোনোম হয়ে বসতাম। অবশ্য আমার নিজেরও বাজনার দিকে কিছু শখ জেগেছিল, এবং

তাল আয়ত্ত করায় বেশ আনন্দও হয়েছিল আমার বাজনা শেখার পটভূমি মাত্র এইটুকুই।

সুরেশবাবুকে জানালাম, ইচ্ছার কথা। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কি শিখতে ইচ্ছা হয়? বললাম ভায়োলিন। সুরেশবাবু কিঞ্চিৎ আপত্তি জানালেন। বললেন, ওর চেয়েও ভাল হয় যদি এসরাজ শেখেন। এসরাজের ওজন এবং আকারে আমার কিছু বিরূপতা ছিল মনে মনে। কিন্তু সুরেশ-বাবুর নির্দেশ অগ্রাহ্য করাও সম্ভব ছিল না। তাছাড়া সুরেশবাবু নিশ্চয় আমার এদিকের একটি ভবিষ্যৎ আছে এমন একটা আশা করে বসেছিলেন। তাই একটি এসরাজ কিনলাম। এবং ফল হল আশাতীত। আমার স্কুলে পাঠরত দুটি মেয়েকে দিলাম সুরেশবাবুর অধীনে এসরাজ বাজনা শিখতে। আমি একদিনও তাতে হাত দিই নি। মেয়েরা কয়েক বছর ধরে শিখেছিল।

সুরেশবাবু বাংলা রচনায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত, ইংরেজীও ভাল লিখতেন। খুব সংযত কৌতুকমিশ্রিত রচনা তিনি লিখেছিলেন বেতার স্টেশনের তাঁর নানা অভিজ্ঞতা বিষয়ে। আমি তাঁর নানা-প্রসঙ্গে লেখা রচনা অনেকগুলি ছেপেছি। তিনি দিল্লী স্টেশনে চলে যাবার পর কিছুকাল তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ব্যাহত হয়েছিল। তার পর ফিরে এসে তাঁকে দিয়ে আবার কিছু কিছু লেখাই। লেখার ভঙ্গি বিশেষ প্রশংসাযোগ্য ছিল, আর তা ছিল নির্ভর-যোগ্য, সব সময়।

সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তিনি সর্বজনমান্য ছিলেন, এটি আমার অভিজ্ঞতা।



'এইটে কি কম ?' অভিনয়ে রত, উষাবতী, শৈলেন চৌধুরী ও ইন্দু মুখুজ্জে

ফোটো : পরিমল গোস্বামী, ১৯৪০

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

যদুনাথ সরকারের শিষ্য, লুপ্তপ্রায় উনিশ শতকের বাংলা গ্রন্থ ও গ্রন্থকার-দের পুনরুদ্ধারে অক্লান্তকর্মা গবেষক 'ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১নং গার্স্টিন প্লেসের ইনডিয়ান স্টেট ব্রডকাসটিং সারভিসের ষ্টুডিওতে মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে বই বাজিয়ে গান গাইছেন, কল্পনা করতে পারবেন কেউ ? ১৯৩৬ সনের (রবীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষে) এক রাত্রে বৈকুণ্ঠের খাতা অভিনয় হয়েছিল, আমিও ছিলাম তার মধ্যে—আর ছিল শরদিন্দু, মনোজ, প্রমথ বিশী, বীরেন্দ্র ভদ্র, সজনীকান্ত। ব্রজেন্দ্রনাথ বিপিনের ভূমিকায় বেশ জমিয়ে তুলেছিলেন সে দিন। তিনি বই বাজিয়ে যখন 'ভাবতে পারিনে পরের ভাবনা' সুর করে গাইতে লাগলেন তখন তিনি অন্য মানুষ।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ছিল তাঁর প্রাণ। তাঁর গবেষণার কেন্দ্র ছিল এটি যদিও এই কেন্দ্র থেকে তাঁর অনুসন্ধানী ব্যাসার্ধ ছিল সব দিক থেকেই দূরবিস্তৃত।

সাহিত্য-সাধক চরিতমালা পর্যায়ে তিনি যে সব লেখকদের জীবন ও সাহিত্য পরিচয় সম্বলিত ছোট ছোট পুস্তিকা রচনা আরম্ভ করেছিলেন, সাহিত্য বিষয়ে কিছু কিছু লিখতে গেলে রেফারেন্স হিসাবে তা যে কত মূল্যবান মনে হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে, তা যাঁরা সমধর্মী তাঁরা আমারই মতো উপলব্ধি করে থাকেন। আমার পিতার সম্পর্কে তাঁর এই পর্যায়ে যে বইখানা লেখার ইচ্ছা ছিল, সে ইচ্ছা পূরণ হয় নি। এ বিষয়ে আমাকে তিনি যে চিঠিখানা লিখেছিলেন তা এখানে উদ্ধৃত করছি—

Brajendra Nath Banerjee

75, Indra Biswas Road
Belgachia P. O.
Calcutta, 3. 6. 1946.
সোমবার

পরিমল-দা,

বিহারীলাল গোস্বামী সম্বন্ধে সাহিত্য-সাধক চরিতমালায় কিছু লিখিতে ইচ্ছা করি। তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী আপনি দিতে পারিবেন। উহা আমাকে

সুবিধামত লিখিয়া পাঠান। তাঁহার প্রকাশিত অপ্রকাশিত গ্রন্থগুলি আমার একবার দেখা প্রয়োজন। তাহারও ব্যবস্থা করুন।

আশা করি কুশলেই আছেন।

ভবদীয়

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়

অনিবার্য কারণে সব সংগ্রহ যথা সময়ে ঘটে ওঠেনি। দেশের একটা ক্রান্তিকাল চলছে এ সময়ে, মনোযোগ অন্যদিকে, এবং প্রাণরক্ষার দিকেও কম নয়। তবে মুদ্রিত বই তাঁকে দিয়েছিলাম দু-খানা। আমাকে তথ্য সংগ্রহ করতে কিছু সময় লেগেছে, এবং শেষ পর্যন্ত আমাকেই লিখতে হয়েছে পিতার জীবন কথা। মাঝখানে যাঁর উপর তথ্য সংগ্রহের ভার দিয়েছিলাম, তিনি সঠিক তথ্য আমাকে দেন নি, সেজন্য আমার কিছু ক্ষতিও হয়েছে। যাই হোক শেষ পর্যন্ত আমার রচনাটি আমার বই—"আমি যাঁদের দেখেছি"-তে স্থান পেয়েছে।

জীবনকথা পূর্ণাঙ্গ করতে হলে যে সব উপকরণ সংগ্রহ করা দরকার, তাতে অনেকটা সময় দরকার ছিল। অনেক উপকরণ হারিয়ে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে। জন্মের তারিখ ও স্থান পাওয়া যায়নি। সেসব চিরকালের জন্যই হারিয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি মূল্যবান পত্রও আর উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তার অধিকাংশই আমার পিতা যেখানে (পোতাজিয়া, পাবনা) কাজ করতেন, সেইখানে এক বিরাট অগ্নিকাণ্ডের ফলে তাঁর ব্যক্তিগত অনেক সম্পত্তির সঙ্গে নষ্ট হয়ে যায়। সম্পত্তি মানে, বহু পাণ্ডুলিপি। চিঠিও ছিল তার মধ্যে। একখানা চিঠিতে আমার, ও আমার যে ভাই পরে ৮ বছর বয়সে মারা যায় তার নাম উল্লেখ করে কুশল জানতে চেয়েছিলেন। আমার তখন বয়স বোধহয় আট কি নয়, বাবা আমাকে সেই অংশটি দেখিয়েছিলেন এইটুকু স্পষ্ট মনে পড়ে, আর মনে পড়ে চিঠিখানা আকারে বড় ছিল, মনে হয় তিন পৃষ্ঠা, চিঠি লেখার কাগজের। চিঠিতে কি ছিল বা অন্যান্য চিঠিতে কি ছিল তা আমার বুদ্ধির অগম্য ছিল তখন। তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের যে তিনখানি চিঠি শেষ পর্যন্ত আমার কাছে ছিল, তা এখন বিশ্বভারতীতে সংরক্ষিত আছে। তাঁর মৃত্যুর পর আমাকে যে চিঠিখানা লিখেছিলেন, সেখানাও। সে চিঠিখানি এই—

দার্জিলিং

কল্যাণীয়েষু,

তোমার পিতার মৃত্যু সংবাদে দুঃখিত হইলাম। একদা তিনি আমার সুপরিচিত ছিলেন এবং তাঁহার রচনানৈপুণ্যে বিস্ময় বোধ করিয়াছি। সাধারণের কাছে তাঁহার লেখার যথেষ্ট প্রচার হয় নাই, তিনি জনতা হইতে দূরে ছিলেন—আশা করি তাঁহার কীর্তি সাহিত্য ক্ষেত্রে অগোচরে থাকিবে না।

তোমাদের জন্য আমি সান্ত্বনা ও কল্যাণ কামনা করি। ইতি—৫ আষাঢ় ১৩৩৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যাই হোক পিতার সম্পর্কে যে রচনাটি "আমি যাঁদের দেখেছি" বইতে আছে, তাতে তাঁর দুই ভূতপূর্ব প্রিয় ছাত্র নলিনীরঞ্জন রায় ও ফণীন্দ্রনাথ রায়ের সহযোগিতায় তাঁর মোটামুটি একটা পরিচয় দিতে পেরেছি।

ব্রজেন্দ্রনাথ আমাকে চিঠিতে পরিমলদা সম্বোধন করতেন, ডাকতেনও ঐ সম্বোধনে। তিনি আমার চেয়ে প্রায় সাত বছরের বড় ছিলেন।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

১৯৪৬-এ লেখা ব্রজেন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত চিঠিখানি থেকে ১৯৪৬-এর দুটি স্মৃতি মনে জাগছে। দুটিই ভ্রমণ। একটি হাজারীবাগ জেলায়, অন্যটি জলপাইগুড়ি জেলায়। প্রথমটি মার্চ মাসের শেষে, তখনও জানি না কয়েক মাস পরেই কলকাতা শহরে কি বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হবে। সেই স্মরণীয় কলঙ্কময় ১৬ই অগস্টের কথা বলছি। এই সময়ের কিছু সংবাদ আমি খবরের কাগজ থেকে সংগ্রহ করে আমার "দ্বিতীয় স্মৃতি"তে ছেপেছিলাম। সে ভয়াবহ খবরগুলির পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

এর পর অনেক ঘটনা। এবং এর দেড়মাস পরে নোয়াখালির ট্র্যাজিডি। ইংরেজ রাজত্ব তখনও চলছে। এমন মর্মান্তিক অবস্থা খুব বেশি দিন না চললেও তখন সাধারণ শান্তিপ্রিয় হিন্দুমুসলমানের আহত মনেও যে রক্তপাত ঘটেছিল, তা থেকে মুক্তিলাভ সহজ ছিল না। তবু জোর করে সব ভুলে থাকার চেষ্টা করেছিলাম। এবং প্রথম সুযোগেই কলকাতার বাইরে চলে গেলাম, জলপাইগুড়িতে, নবেম্বর মাসে। ডুয়ার্সে হাতী খেদা আছে, এবং হাতী ধরার কাল সেটা। যদি হাতী ধরা পড়ে, তবে দেখার সুযোগ পাওয়া যাবে—অনেকদিন আগে থাকতেই সে সময়ে জলপাইগুড়ি নিবাসী অশোক মৈত্রের সঙ্গে কথা হয়েছিল।

সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী ও আমি ২৩শে নবেম্বর (১৯৪৬) তারিখে রাত্রে দারজিলিং মেলে চেপে শিয়ালদহ স্টেশন থেকে সোজা জলপাইগুড়ির ঊষায় চোখ মেললাম। ইংরেজ রাজত্বে আমাদের সেই শেষ ভ্রমণ। তৃতীয় শ্রেণীতেও সম্ভবত সেই শেষ দীর্ঘ ভ্রমণ। পরবর্তীকালে ট্রেনের কামরায় লোক বাহুল্যের আতঙ্কই ভ্রমণ স্থগিত রাখার প্রধান কারণ। বয়স বাহুল্যও বটে।

দারজিলিং আমার প্রথম জীবনের বিস্ময়। তার কাছাকাছি এসে হিমালয় দর্শন, এবং তুষারমৌলি কাঞ্চনজঙ্ঘা চূড়া সমূহের ব্যক্তিগত দৃষ্টির সীমার মধ্যে বাস করার রোমাঞ্চ আমার কাছে অপরিসীম। এই পরিবেশে কলকাতায় কি হচ্ছে না হচ্ছে তার সংবাদ বা স্মৃতি সবই ক্ষীণ হয়ে এসেছে।

আরণ্যক অশোক মৈত্রের পরিচালনায় আমরা হাতী খেদা দেখতে পাব, এই উৎসাহে দৃষ্টি অতীত ও বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে নিবদ্ধ হয়ে রইল।

জলপাইগুড়ি ডুয়ার্স ভ্রমণ সংক্রান্ত চিঠির ফাইল খুলতেই প্রথমে যে চিঠিখানা হাতে এলো সেখানা শীতলাকান্ত শীলের লেখা।•এ চিঠির সূত্র ধরে অনেকটা পথ ঘুরে আসা যাবে। শীতলাকান্তবাবু এ চিঠি লিখেছেন আমাদের দুজনের চলে আসবার দুইমাস পরে। শীতলাকান্তবাবু ছিলেন রেলওয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইনসপেকটর অভ ওয়ার্কস।

জয়ন্তী পোঃ
(জলপাইগুড়ি)
২৭।২।৪৭

প্রিয় পরিমলবাবু,

আপনার ২৪-২-৪৭ তারিখের পত্র পেয়ে আনন্দিত হলেম।…অদ্য এই সঙ্গে 'প্রবাসী' ভি-পি করে পাঠাতে পত্র দিলাম।…আমি খুব আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করব।

…মিস্টার মৈত্র গতকল্য প্রকাণ্ড হরিণ সেই লেকে মেরেছেন। তার শিং ৩০ ইঞ্চি। এরূপ বড হরিণ এখানে সচরাচর দেখা যায় না। আমরা সকলেই খুব আনন্দিত হয়েছি। ইতিমধ্যে তিনি একটা প্রকাণ্ড রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে গুলি করেছিলেন, দুর্ভাগ্যবশত: তার চামড়টা পাওয়া গেল না, কারণ বাঘটার মৃতদেহ কয়েকদিন পর কিছু দূরে পাওয়া গেল, কিন্তু পচে গিয়েছিল।

বিনীত শীতলাকান্ত শীল

এই চিঠিখানা জয়ন্তী থেকে লেখা। আমরা তিনজনও জয়ন্তীর ডাকবাংলোয় ছিলাম. ঐটি হয়েছিল আমাদের 'বেস্ ক্যাম্প।' শীতলাকান্ত কাছাকাছি না থাকলে এই ভ্রমণ আমাদের অসম্পূর্ণ থাকত, তিনি নানা দিক থেকে আমাদের সাহায্য করেছিলেন, এবং তাঁরই আগ্রহে ট্রলিতে চেপে জয়ন্তী থেকে নানা দিকের দর্শনীয় অনেক স্থান দেখেছিলাম। আমার এই ডুয়ার্স ভ্রমণ প্রচুর ফোটোগ্রাফ সহ প্রবাসীতে চার মাস ধরে বেরিয়েছিল, সেই জন্যই শীতলাকান্তবাবুর প্রবাসীর গ্রাহক হওয়া। জলপাই-গুড়িতে যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হয়েছিল সবার বিষয়েই ঐ রচনায়

উল্লেখ ছিল। তা ছাড়া স্থানীয় হাট-বাজারের কথা, পরিবেশের কথা, শহরের কথা, সবই ছিল ফোটোগ্রাফ সহ। এবং খুড়ুলঝোরার হাতী খেদায় বন্দী হাতীদের ছবি, তাদের গলায় ফাঁস পরানোর ছবি—প্রভৃতি অনেক ছবি ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার জন্য জলপাইগুড়িতে সে সময় প্রবাসী দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছিল, শীতলাকান্তবাবু জানিয়েছিলেন।

তাঁর ঐ চিঠিতে যে হ্রদের কথা আছে সে এক আশ্চর্য হ্রদ, (একে কি tarn বলা যায়?) যা আমি শীতলাকান্তবাবু ও সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরীর সঙ্গে দেখব বলে যাত্রা করেও দেখতে পাইনি। কেন পাইনি, তা পরে বলছি।

আমরা জলপাইগুড়ি থেকে কিভাবে জয়ন্তীতে গেলাম, তার কথা মনে হলে আজও ঠিক সেই সব অ্যাডভেনচারের যুগে ফিরে গিয়ে যেন তার মধ্যে বাস করতে থাকি। মনে হয় তার সজীব স্পর্শ এখনও গায়ে লেগে আছে।

জলপাইগুড়ি শহরে কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল। পাঁচটি রাত্রির পরে ৩০শে নবেম্বর জয়ন্তীর দিকে যাত্রা। কিন্তু এই কয়েক দিনে জলপাইগুড়ি ও তার আশেপাশে অনেক কিছু দেখার সুযোগ হয়েছিল।

আমাদের জয়ন্তী যাত্রাও একটি অ্যাডভেনচার। জলপাইগুড়ি থেকে ট্রাকে করে প্রায় ৯০ মাইল ভ্রমণ। ট্রাকের মালিক অশোক মৈত্র। অ্যামেরিকান মিলিটারি ট্রাক ভারী মজবুত, তার কলকব্জা—আর চলা কি সুন্দর। আমরা তাতে বসেছি ডেক-চেয়ার, প্যাকিং বাক্স, বিছানা প্রভৃতির আসনে। সঙ্গে বহু জিনিস—কয়েকদিনের উপযুক্ত চাল, ডাল, ঘি, তেল, তা ছাড়া অশোকের বন্দুক ও অন্যান্য শিকারের সরঞ্জাম। হাওয়া গরমও নয়, ঠাণ্ডাও নয়, অথচ সম্পূর্ণ মাঝামাঝিও নয়, ঠাণ্ডার দিকেই একটু বেশি, এবং ঘন অরণ্যের ভিতর দিয়ে মাঝে মাঝে যাবার সময় শীতকালের শীত অনুভব করছিলাম। ট্রাকে চড়ে এত দূরের পথ চলায় প্রথমে মনে হয়েছিল কষ্ট হবে, কিন্তু ঠিক তার বিপরীতটাই হয়েছিল। নদী ছোট বড়, কত। জলঢাকা নদীটাই সবচেয়ে প্রশস্ত। কখনো গভীর জঙ্গলের পথে, কখনো সম্পূর্ণ জলহীন বসতিহীন পথে, প্রতি মুহূর্তে সব অভিনব লাগছে। শিলিগুড়ি, ময়নাগুড়ি, দলগাঁও, তারপর এখান থেকে ফালাকাটার পথে, চিলাপাতা ছাড়িয়ে সন্ধ্যার দিকে এসে পৌঁছলাম নীলপাড়া। এইখানে চা বাগানের (সৌদামিনী টী এসটেট) বাংলোয় আরামের রাত্রিবাস, এবং পরদিন রাত্রিও

ঐখানেই। অশোক, সুধাংশু, হাতীতে উঠে গণ্ডার দেখতে অরণ্যে প্রবেশ করেছিল, আমি হাতীর পিঠে সামান্য দূর গিয়ে ফিরে এলাম। কলকাতার পথে ট্রাম বাসের ভিড় দিনের পর দিন সহ্য করার পর নীলপাড়া সৌদামিনী টী এসটেটের হাতীতে উঠেও যদি সেই ভিড় সহ্য করতে হয় তবে এতদূর আসার সার্থকতা কোথায়? অরণ্যাবাসে গণ্ডার দর্শনের পুণ্য এজন্য আমার স্থগিত রইল।

আমি নেমে এসে ভালই করেছিলাম। দুটি চা-বাগান দেখা হল, কি করে চা প্রথম থেকে শেষ পর্যায়ে আসে এবং প্যাকেট-বন্দী হয়, তার সমস্ত অঙ্গই দেখার সুযোগ পেয়ে গেলাম। পরদিন (১লা ডিসেম্বর) সকালেই রাজাভাত-খাওয়ার পথে জয়ন্তীর উদ্দেশে চলতে লাগলাম। আমরা কিন্তু সন্ধ্যা অবধি ভাত না খেয়েই কাটিয়ে দিয়েছিলাম। তবে রাত্রে জয়ন্তীর বাংলোয় যে ভাত খেয়েছিলাম যে কোনো রাজার ভাগ্যে তার চেয়ে ভাল ভাত খাওয়া জোটে কিনা সন্দেহ। এবং সেই রাজাভাতখাওয়ার ফরেস্ট অফিসার (বীরেন্দ্রনাথ রায়) মেসেজ পাঠালেন, খেদায় হাতী ধরা পড়েছে—পরদিন যেমন করে হোক খেদার দিকে রওনা হয়ে যান।

'যেমন করে হোক' গিয়েছিলাম। তারিখ ২রা ডিসেম্বর। সেই জয়ন্তীর বাংলো থেকে আবার ট্রাক। কিন্তু কিছুদূর গিয়েই আবার নদী। নৌকায় নদী পার। সেখান থেকে মোটরে খেদায়। খেদার সঙ্গে বাঁধা বাঁশের মাচায় পাঁচঘণ্টা দাঁড়িয়ে বন্দী হাতীদের ছবি তোলা। তাদের গলায় ফাঁস পরানোর নিষ্ঠুর দৃশ্য আজও ভুলতে পারিনি। এ সব বৃত্তান্ত নতুন করে আর বলব না। কিন্তু যে পাহাড়ী হ্রদের কথা গোড়ায় বলেছি, সেই হ্রদ পর্যন্ত পৌঁছানো কেন সম্ভব হয় নি, সে ব্যর্থতার স্মৃতি আজও মনে জাগলে দুঃখ হয়। কিন্তু তবু সেই ব্যর্থতার মধ্যেও এমন একটি অনির্বচনীয় অনুভূতি মনকে আচ্ছন্ন করেছিল যা আনন্দের। সেই কথাটিই বলতে হবে এই প্রসঙ্গে।

হাতীখেদা দেখার মারাত্মক ক্লান্তি ভোগের পর দিনই শীতলাকান্তবাবুর নেতৃত্বে সুধাংশুপ্রকাশ ও আমি রওনা হলাম ট্রলিতে ডিমা কোয়ারি দর্শন উদ্দেশ্যে। এবং সেই সঙ্গে জনহীন পাহাড়ী অরণ্যে কি ভাবে রিজারভয়ার তৈরি করে, পাহাড়ী ঝরণার জল ধরে, এবং তা থেকে পাইপে করে বহুদূর লোকালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, সে কৃতিত্ব দেখলাম। শীতলাকান্তবাবুর নিজ

হাতে গড়া এই ব্যবস্থা। এরপর একদিন বিশ্রাম করেই চললাম সেই হ্রদের উদ্দেশে। এই অজানা পথে রওনা হওয়া আমার উচিত হয়নি সেদিন। কিন্তু তরুণ ডিসেম্বরের রৌদ্র-মধুর অতি উৎসাহজনক হাওয়ায় আমার নিজের উৎসাহকে উদ্দীপিত করে তুলল। সেখানে যাবার একটা মোটামুটি ভাল পথ ছিল, কিন্তু অ্যাডভেনচার কিনা, তাই দুর্গম পথ বেছে নেওয়া হল। শুনলাম সেটাই শর্ট-কাট। সেই শর্ট-কাটের প্রথম অধ্যায়েই এক শুকনো পাহাড়ী নদীপথ। শুকনো, কিন্তু শত শত বৃহদাকার পাথর-খণ্ড (বোলডার) বোঝাই। এরা বর্ষার প্রখর স্রোতে পাহাড় থেকে নেমে আসছে বছরের পর বছর। হঠাৎ পাহাড়ের উপর থেকে তার একটা ধ্বসে' পড়লে একসঙ্গে ৫০ জন মানুষ পিষ্ট হতে পারে। হয় তো ওরা প্রতি বর্ষায় একটু একটু করে সরে। হয়তো, যে অষ্টাদশ বা ঊনবিংশ শতকের একটা পাথর-চাঁইয়ের উপর এক পা রেখে ডন দেওয়ার ভঙ্গিতে আর একটা পাথর-চাঁইতে অতি সাবধানে আর এক পা রাখছি—তারা একেবারেই জানত না যে, ১৯৪৬ সনের ৫ই ডিসেম্বর দুই নবাগত সমতলবাসী এইখানে তাদের পদস্পর্শ রেখে যাবে।

শীতলাকান্তবাবু এখানে প্রায় পাহাড়বাসী হয়ে পড়েছেন, তাই তাঁর কোনো ক্লান্তি নেই। আর সুধাংশুপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিউট্রাল, সর্বাবস্থায় নীরব, অন্যের দ্বারা পরিচালিত হলে সে অসাধ্যসাধন করতে পারে। আমাদের সঙ্গে ছিল শীতলাকান্তবাবুর একটি পোস্টকার্ড সাইজের কুকুর, তার ক্লান্তির প্রশ্নই ওঠে না, কারণ সে প্রায় হাওয়ায় উড়ে চলছিল।

নদীর বুকে পাথরের চাঁইয়ের সংখ্যা অগণিত, কিন্তু আমরা পার হয়েছিলাম সম্ভবত দুই ডজন। তাতে অন্তত ৬০টি ডন দেওয়ার পরিশ্রম হয়েছিল। অ্যাডভেনচারটা এইখানে শেষ হলে ভাল হত। কিন্তু জোর করেই চলছি। গ্রেডিয়েন্ট যদিও খুব চড়া নয়, তবু তো উপরের দিকে ওঠা। পা অবশ হয়ে আসছে ক্রমে; মনে হচ্ছে পৃথিবীর চুম্বক ক্ষেত্রটি আমার পায়ের নিচেই এসে বাসা বেঁধেছে। সেদিন ডিসেম্বরের হাওয়াকেও abetting and inciting-এর চার্জে ফেললে তাকে কঠিন শাস্তি পেতে হত সন্দেহ নেই। যাই হোক প্রায় একঘণ্টা চলবার পর অতিকায় এক কচ্ছপের পিঠের মতো পাহাড় খণ্ডের উপর গিয়ে বসে পড়লাম। ভেবেছিলাম একটু বিশ্রাম করলে আরো উর্ধ্বে ওঠা যাবে। কিন্তু হল না। আমার পক্ষে সেখান থেকে ওঠাটাই অত্যন্ত ক্লান্তিকর বোধ হচ্ছিল।



হাতীখেদার পথে পরিচারক ও পরিচালক বেষ্টিত রায়ডাক নদীতীরে
সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী, অশোক মৈত্র, শীতলাকান্ত শীল

ফোটো : পরিমল গোস্বামী, ১৯৫৬

সেই জনমানবহীন গভীর হিমালয়ের আদিকালের অরণ্য পরিবেশে তিনটি নিরস্ত্র মানুষ ও একটি সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি কুকুর। সমস্ত ভয়াবহ পরিবেশের প্রভাব সম্ভবত একমাত্র আমারই মনকে অধিকার করেছিল সে সময়। এবং মনে হচ্ছিল আমি একা বসে আছি সেখানে। হেজলিট সাহেব বলেছিলেন "I can enjoy society in a room, but out of doors, nature is company enough for me. I am then never less alone than I am alone." আমারও ঠিক এই মত, কিন্তু তবু হেজলিটের সঙ্গে আমার কিছু পার্থক্য আছে। হেজলিট একা ভ্রমণ পছন্দ করতেন, তাতে প্রকৃতিকেই সঙ্গীরূপে তিনি বেশি উপভোগ করতে পারতেন। কিন্তু প্রকৃতিকে উপভোগ করতে আমার সঙ্গী চাই-ই। হেজলিট হিমালয়ের পাশের এ রকম হাতী, সাপ, বাঘের আতঙ্কপূর্ণ জনহীন অরণ্য-প্রকৃতির কথা অবশ্যই কল্পনা করতে পারেন নি। কি করেই বা পারবেন, ইংল্যাণ্ডের অরণ্যে হাতী নেই, বিষাক্ত সাপ নেই, বাঘ নেই। বাংলাদেশের ১৯৭১-এর ইলেকশন নেই।

জয়ন্তী সব দিক থেকে আমাকে জীবনের এক অভিনব অভিজ্ঞতা-সম্পদ দান করেছে। আমি সেদিন সেই ৫ই ডিসেম্বর—সেই সভ্যতার চিহ্নহীন, মানুষের চিহ্নহীন, আদিম পরিবেশে একটুখানি বসামাত্র মনের দিক থেকে সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়েছিলাম। আমি যে আধুনিক যুগের কৃত্রিম অভ্যাসের অধীন লজিক-পড়া ভদ্রলোক, তা সহসা বিস্মৃত হয়েছিলাম, এবং তা একটি সত্যস্বপ্ন। মন আলোর গতির চেয়ে অধিকতর গতিতে ছুটতে অভ্যস্ত, নইলে এমন সম্ভব হত কি করে? আমার পাশের সঙ্গীদের বিষয়ে সেই ক্ষণকালের জন্য কোনো চেতনা ছিল না। সেই ক্ষণকাল যে কত অল্পকাল তা ঠিক ধারণায় আসে না। হয়তো পাঁচ সেকেণ্ড, হয়তো দশ সেকেণ্ড। এবং পরে অনেক ভেবে দেখেছি, আমার সচেতন মনের পিছনের স্তরে পাগলা হাতী বাঘ ও বিষাক্ত সাপের একটা মিশ্র ভীতিই আমাকে অতি দ্রুত আদিম যুগে নিয়ে পৌঁছে দিয়েছিল। ওরা তো আর লজিক জানে না। তবে যে-কোনো জাতীয় রোমাঞ্চের সঙ্গেই কিছু ভয় জড়িত থাকে। জয়ন্তীর এই অরণ্যেই হোক, বা খুড়ুলঝোরার হাতী খেদার সামনেই হোক, অথবা ডিমার জঙ্গলে হোক, অথবা কাঠের ডোঙায় করে খরস্রোতা রায়ডাক নদী পার হয়ে ভূটানের জমিতে গিয়ে দাঁড়ানোই হোক, সব পরিবেশেই যেমন রোমাঞ্চ

অনুভব করেছি, তেমনি প্রত্যেক স্থানেই জীবনের আশঙ্কাও অনুভব করেছি পদে পদে। যেখানে গিয়েছি, হিংস্র জন্তুর অতর্কিত আক্রমণ অথবা বিপজ্জনক নদীতে নৌকাডুবির আশঙ্কাজনিত মৃত্যুভয় আমাকে অনুসরণ করেছে। একই সঙ্গে আনন্দ-শিহরণ ও আতঙ্ক-শিহরণ—জীবনের স্বাদকে একেবারে বদলিয়ে দিয়েছিল।

পাহাড়ের উপরের যে হ্রদ দেখা হল না তার নাম ইয়ারো নয়, এবং আমিও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ নই, তবু সেই হ্রদ না দেখার আনন্দ আমি যে পরিমাণে পেয়েছি, সে পরিমাণে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ পেয়েছেন কিনা সন্দেহ।

শীতলাকান্তবাবুর চিঠিতে উল্লেখিত আমাদের 'হোস্ট' অশোক মৈত্রের হাতে যে বাঘটি গুলি খেয়েও চামড়া দেওয়ার ভয়ে চালাকি করে অন্য স্থানে গিয়ে মরে রইল. সে বাঘ ঐ হ্রদের ধারের বাসিন্দা। আর সেইখানেই আমরা বিনা অস্ত্রে অথবা বিনা অস্ত্রধারীর রক্ষণাধীনে যেতে উদ্যত হয়েছিলাম।

অশোক মৈত্র ডিমা-যাত্রায় অথবা হ্রদ-যাত্রায় সঙ্গী ছিলেন না, কারণ তাঁর জয়ন্তীতে আসার উদ্দেশ্য শিকার। শিকার-চিন্তায়, ও সম্ভবত শিকার সন্ধানে, একাগ্রতা চাই। আমরা চলে না আসা পর্যন্ত সেই একাগ্রতা তাঁর সম্পূর্ণ আসে নি—যদিও যে দিন রওনা হব, তার পূর্বদিন তিনি হরিণ শিকার করে তার মাংস খাইয়েছিলেন। হয়তো প্রমাণের জন্য যে, তাঁর বন্দুক বহন করা নিতান্তই লোক দেখানো নয়। কিন্তু তাঁর মূল লক্ষ্য তো বাঘ।

শিকারের সঙ্গে অশোক মৈত্রের সম্পর্ক উত্তর বঙ্গের এই অংশে খুবই প্রচারিত। সে কথা কিছু জানা যাবে তাঁর চিঠিতে। একখানি চিঠি এই—

পার্বতীগ্রাম
শেভক রোড, শিলিগুড়ি
৬।১।১৯৫১

প্রীতিভাজনেষু,

…প্রচণ্ড শীত। আমার মত বড় সাহেবকেও এখানে লেপ করাতে হয়েছে। শিলিগুড়ির ফাঁকা মাঠে যে আমার অন্ধকারময় ভবিষ্যতের মত গাঢ় আঁধার নামে সন্ধ্যার পর, তাও ভাবিনি। কোথায় অরণ্যের পরিচিত গলিঘুঁজি—কোথায় নিশীথে মাচার উপর প্রেয়সী শয্যাসঙ্গিনী 'বনোরমা' ক্ষীণকটি রাইফল-এর স্পর্শসুখ? সন্ধ্যার পর নিজেকে নিশাচর বোধ হয়।

এক আড্ডায় গিয়েছিলাম। শিকারের কথা আমার বিনা উৎসাহে শচীন তুলল। তারপর শুনুন—এক ভদ্রলোক কোন্ অজ্ঞাত মহারাজার সম্বন্ধে বললেন, বর্তমান মহারাজার প্যালেসে এক বিরাট বাঘ (স্টাফ করা) দেখে তার বৃত্তান্ত জানতে ইচ্ছা হোল, মহারাজা বাহাদুর বললেন তাঁর ঠাকুরদাদা এক সাহেবের সঙ্গে শিকারে গিয়েছিলেন। সাহেবের হাতে রাইফ্‌ল, তাঁর হাতে তরওয়াল। বাঘটা হঠাৎ চার্জ করবার উদ্যোগ করতে সাহেব তো মূর্চ্ছা যান আর কি! তখন বীর রাজা এক লাফে এগিয়ে এসে বললেন (হুঙ্কার দিয়ে), 'উল্লুকা বাচ্চা. বিল্লিকো সাথ খেল্ করনে আয়া ?—বলেই এক কোপে তরওয়াল দিয়ে দু'খানা করে ফেললেন।

আর একজন তখন শুরু করলেন, Bradley Bert সাহেবকে সুন্দরবনে শিকারে নিয়ে গিয়েছিলেন। বাঘ দেখে সাহেব কিছুতেই গুলি করতে চান না। শেষে তাঁরা নিজেরাই বাঘ খুঁজে একেবারে ডাবল ভাইটাল শট করলেন। বলা বাহুল্য বাঘ একবারেই মরল। মেপে দেখা গেল ? মেপে দেখা গেল—দশ হাত। কোথাকার বাঘ কোথায় গড়ায় বলুন দেখি ?
··কি মশাই, আমি কি মোবাইল চিড়িয়াখানা ? আমাকে দেখলেই কারও হাতীর কথা. কারও বাঘের গল্প মনে পড়ে ? আপনার 'দোয়া'তে আমার এই অবস্থা।···ভাবছি থিওসফিক্যাল সোসাইটির মেম্বার হয়ে মৃত ব্যাঘ্রাত্মাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে জিজ্ঞাসা করব. মহাশয়েরা দয়া করে বলুন, জ্যান্ত অবস্থায় আপনারা কত হাত ছিলেন ? এবং কি করে মরেছেন ?····

ইতি অশোক দেবশর্মণ :
(আরণ্যক নয়, নয়. নয়)

'আরণ্যক' এই ছদ্মনামেই অশোক মৈত্রের কয়েকটি শিকার কাহিনী ছেপেছিলাম যুগান্তর শারদীয় সংখ্যায়। যতদূর মনে পড়ে রবিবারেও। জন্তু-সচেতনতা এবং অরণ্যপ্রীতির মূলে আছে অশোকের সত্যের প্রতি নিষ্ঠা। শিকার বিষয়ে নাটকীয়তা সৃষ্টি এবং আত্মগৌরব জাহির করায় তাঁর বিরূপতা আছে। তাই শিকার করা বাঘের দৈর্ঘ্যকে যারা তার প্রজাতিগত দৈর্ঘ্য না মেনে অকারণ বাড়িয়ে ১০ হাত পর্যন্ত করে. তাদের প্রতি বিদ্রূপ বর্ষণ করতে তাঁর কৃপণতা নেই।

শিকারীমহলে এজন্য অশোক সবারই শ্রদ্ধেয় ছিলেন। তবে আমি আমার

ডুয়ার্স ভ্রমণে, প্রবাসীতে চার মাস ধরে যে সব কথা লিখেছিলাম তাতে তাঁর শিকারপ্রিয়তার কথা উত্তরবঙ্গের অশিকারীমহলেও অনেকের জানা হয়ে থাকবে। চিঠিতে তার কিছু উল্লেখ আছে। অর্থাৎ তাঁকে দেখলেই অনেকের শিকারের কথা মনে পড়ে। আমার মনে পড়ে হিংস্র জন্তু অধ্যুষিত হিমালয়ের অরণ্যদেশ, আর উত্তর-জলপাইগুড়ি ও দক্ষিণ-দারজিলিঙের মধ্যবর্তী উত্তর-দক্ষিণে (in depth) প্রসারিত এই অরণ্য। আমার মনে এর প্রভাব ভয়ানক। যে-কোনো প্রকৃতিই হোক, উন্মুক্ত বা অরণ্যঘন, দুইই আমার কাছে আকর্ষক। আকাশের নিচেই বাধাহীন প্রকৃতির বুকে জীবন কেটেছে পল্লীগ্রামে। তাই সম্ভবত অশোকের চিঠির জবাব লিখতে বসে বাল্যস্মৃতির মধ্যে কিছু ডুবে গিয়েছিলাম। তবে ভরসা ছিল এই যে. যাঁকে লেখা তিনিও পল্লী প্রকৃতির বুকে মানুষ, অতএব আমার সেনটিমেন্ট তাঁরও মনে বাল্যস্মৃতি জাগিয়েছিল কিছু। আমার লেখাটা তাই বৃথা হয়নি। আমার চিঠিতে অশোকের চিঠির প্রশ্নের কিছু উত্তর ছিল, অর্থাৎ তাঁকে দেখে জীবজন্তুর কথা কেন মনে পড়ে, তার উত্তর। আমার চিঠির শেষ অংশ এই—

"..... তাই আপনার কথা মনে হলে আপনার চারিদিকের সমস্ত পাহাড় অরণ্য—সমস্ত উদার পরিমণ্ডল মিলিয়ে আপনার কথা মনে পড়ে। আপনি যখন এখানে আসেন, তখন মনে হয় যেন সমস্ত জলপাইগুড়ি দারজিলিং আপনার সঙ্গে এসেছে, আপনার আশেপাশে দুচারটে হরিণ কিংবা বাঘও যেন দেখা যায়।"

চিঠিটা লিখেছিলাম ১৫-২-৫১ তে। আমার চিঠির স্মৃতি-অংশ কিভাবে অশোকের বাল্যস্মৃতি জাগিয়েছে তার নির্দশন আছে তাঁর চিঠিতে। সে চিঠি উল্লেখযোগ্য। তার অংশ এই—

পার্বতীগ্রাম
শেভক রোড, শিলিগুড়ি
২৪-২-৫১

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার চিঠি পেয়ে খুব খুসী হোলাম। আপনি যদিও সহরবাসী, তবুও সহুরে নন। পদ্মার উদাসী জলকল্লোল আপনার চিঠির ছত্রে ছত্রে মূর্ত হয়ে উঠেছে। বিচ্ছেদের ব্যথা আপনার হৃদয়ে পদ্মার মতই সুগভীর। আমার বাড়ি গোড়াই নদীর উপর। আমিও আপনার বেদনার অংশ কিছু পেলাম।

তবে প্রায় ১১ বছর বাড়ি ছেড়েছি নানা কারণে, মনের ভিতর অনেকখানি চর পড়ে গেছে, স্রোত ব্যাহত। প্লেন থেকে নেমে ক্রমে ভারী হয়ে উঠেছি, আর হাল্কা রস যোগাচ্ছে না। এসে অবধি অজগরী আলিঙ্গনে মনের অবস্থা নিষ্পেষিত মৃগশিশুর মত হয়ে উঠেছে। বেশ হাত পা ছড়িয়ে নবীন বসন্তের চাঞ্চল্যকর আগমন লক্ষ্য করবার অবসর পাচ্ছিনা। ·· ······মাইল দুই দূরে গভীর জঙ্গলের শালের জমাট শ্যামলিমা বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি আর ভাবি কবে ওর ভিতর স্বেচ্ছাচারী মন ছুটি পাবে।

বহুদিন আগের গিরিডির কথা মনে পড়ে। পূজোর ছুটিতে যেতাম, ছোট বেলায় মুক্তির আনন্দে ভরপুর। কিন্তু বিধি বাম। বাবা [হেরম্বচন্দ্র মৈত্র] সারা বছরে কোনো খবরই নিতেন না, ছুটির সময়ে পুত্রের সম্বন্ধে তিনি খুব কর্তব্যপরায়ণ হয়ে উঠতেন। বাড়ির সামনের ঘনশ্যাম শালের সারির উপর অস্তমান সূর্য নামছে, আর বাবার পড়ার ঘরে তিনি বিরক্ত হয়ে ইংরেজী ব্যাকরণের অতি সাধারণ সূত্রগুলি আমার ভোঁতা মাথায় ঢুকোবার চেষ্টা করছেন। দূরে রাস্তায় দেখেছি খেলার সাথীরা হাতে ফুটবল নাচাতে নাচাতে চলে গেল। ছুটি পাবার কামনা ও ভীতি মিশে নেস্‌ফিলডকে অতি দুর্বোধ্য করে তুলেছে, হয়ত পুত্রের মূঢ়তায় হতাশ হয়ে পিতৃদেব ব্যাকরণ খানা সজোরে বাইরের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, কম্পিত পদে কুড়িয়ে এনে আবার পাঠ নিতে লাগলাম। ইতিমধ্যে শালবনের পাতার ভিতর সূর্যের লাল আভার টুকরো দেখা যাচ্ছে। ফুটবল খেলার হাফ-টাইম পার হয়ে গেছে। তখন শালের সারি যেন ঘন ঘন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কিন্তু ছুটি হোল, যখন গোধূলি গত প্রায়। অভিমান ভরে আর বাড়ির থেকে বেরোলাম না। চুপচাপ বারান্দায় বসে পশ্চিম আকাশের আলোর বিলীয়-মান মৃত্যু দৃশ্য দেখলাম। জীবনের একটা মূল্যবান অপরাহ্ণ পার হয়ে গেল। এই রকম কত সকাল, কত দুপুর, কত রাতই আমাদের এড়িয়ে যে চলে যায় সেই বঞ্চনার খেসারত কে দেয়? হয়ত প্রাপ্তির মূল্যবান স্মৃতির ভাণ্ডার দেয়।

যাক্ চিঠিখানা যেন একটু নাটকীয় হয়ে উঠেছে। করি কি মশায়, সীজন শেষ হতে চলল, একটা টোটা ছুঁড়তে পারিনি এখনও। ·········জঙ্গল থেকে প্রায় রোজই চাঞ্চল্যকর খবর পাচ্ছি। আরও মর্মদাহ।·········

ইতি আরণ্যক (নকল)

বাল্যস্মৃতি থেকে হঠাৎ চেতনা ফিরে এসো, শিকারী সত্তা জেগে উঠল। প্রকৃত শিকারীর লক্ষণ অবশ্যই। পরবর্তী চিঠিখানাও সাহিত্যিকের না শিকারীর অথবা পঞ্চাশ-পঞ্চাশ পড়লেই বোঝা যাবে।

Rupshi [Goalpara]

2. 12. 53.

প্রীতিভাজনেষু,

অনেকদিন আপনাদের কোন খবর জানি না। আমি বন্য অঞ্চলে মনের আনন্দে ঘোরাঘুরি করছি—বন্দুকহীন অবস্থায়। মনোভাব হচ্ছে অর্থহীন অবস্থায় বড় ডিপার্টমেণ্ট স্টোরে ঘোরা ফেরা করার মত। মানে, টাকা নিয়ে যখন আসব তখন কত জিনিস কিনব। গারো পাহাড়ের বন্য রূপে মুগ্ধ হয়েছি। রাত্রে আকাশের নীচে তাদের পরিবেশে গারোদের নাচ ও মাদকতাপূর্ণ ঢোলকের বোল শুনে ভেবেছি যত শীঘ্র পারি আবার আসব। এ যেন এক অদ্ভুত নেশা। তাড়াতাড়ি ফিরব, সব বল্‌ব। সভ্যতার সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ না ঘটলে এ রস পান করা যাবে না।

ইতি

আরণ্যক

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

অক্ষয়কুমার নন্দীর নাম বাংলাদেশে এককালে সর্বত্র পরিচিত ছিল--যে সময় তিনি প্রথম ব্রন্‌জের উপরে গিনি সোনার পাত মুড়ে খুব শস্তায় বাংলার মেয়েদের গহনা পরার সাধ মিটিয়েছিলেন। তাঁর একখানা চিঠিতে অনেক কথাই মনে পড়ছে। চিঠিখানা এই—

C/o শ্রী অশোক নন্দী
৪ যতীন চন্দ রোড, লালপুর
রাঁচী, ২৬।৮।৬৬

শ্রদ্ধেয় গোস্বামী মহাশয়,

[সাপ্তাহিক] বসুমতী ২৪শে জুলাই সংখ্যায় আপনার লেখা "আমি যাঁদের দেখেছি"তে নলিনীকান্ত সরকার পড়লাম। কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে আমাদের ইকনমিক জুয়েলারি ওয়ার্কস মাতৃমন্দির মাসিকপত্র কার্যালয়ে বহু সাহিত্যিকের সঙ্গে তিনি আমার সাক্ষাত করতেন। বেশীর ভাগ নজরুলকে সঙ্গে আনতেন। ১৯৪৯ কি ৫০ সনে আমি কিছুদিনের জন্য সস্ত্রীক পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে ছিলাম। তথায় বহু বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে নলিনীকান্ত সরকারের নিকট হতেই বেশী সহায়তা পেয়েছি। তাঁর কুমারী কন্যা আমার স্ত্রীকে ওখানকার নানা দর্শনীয় বিষয় দেখাত। তারপর কলকাতায় ও তাঁদের পত্রাদি পেয়েছি—এখন খবর জানিনা।

আপনার বাড়ির ঠিকানা পেলে আমি আপনার সহিত নানাভাবে যোগাযোগ করতে ইচ্ছা করি। আপনি ইচ্ছা করলে আমার দ্বিতীয়া কন্যা অমলাশঙ্করের সহিত ফোনে যোগাযোগ করবেন।·········বর্তমানে রাঁচীতে জ্যেষ্ঠপুত্রের বাসায় মাসাধিক কাল এসেছি।

অক্ষয় নন্দী

১৯১৭ সনের ছবিটি ভেসে উঠল মনের চোখে। অক্ষয়কুমার নন্দীর ইকনমিক জুয়েলারি তখন ছিল কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে, আমাদের মেসের কাছে। কলেজ মেস ছিল ৩০ নম্বরে তার পাশেই দীনবন্ধু লেন বেরিয়ে গেছে। তার পরেই একখানা কি দুখানা বাড়ির পরে ছিল ঐ দোকান। আমি কয়েকবার

গিয়েছি সেখানে। আমার "স্মৃতিচিত্রণ" থেকে কয়েকলাইন আবার বলছি এখানে—"একদিন একটি মজার জিনিষ দেখেছিলাম। কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে আমাদের মেসের কাছে ছিল ইকনমিক জুয়েলারী, দুই বন্ধু সেখানে গিয়েছিলাম বাইরের কারো অর্ডারি জিনিষ কিনতে। খুব কমিক শোনাবে তবু বলা দরকার যে সেই ১৯১৭ সনে সেই দোকানে একটি মহিলাকে দেখেছিলাম [তখন পথে মহিলা দুর্লভদর্শনা] যিনি স্বাধীনভাবে একা এসেছিলেন সেখানে। দ্বিবিধ কারণে এটা মনে আছে। প্রথমত দুর্লভ বলে, দ্বিতীয়ত (এবং প্রধানত) তাঁর অঙ্গে দুটি ঘড়ি ছিল বলে। এ রকম কখনো দেখিনি। একটি হাতে, অন্যটি বুকে—আঁচলের পিনের সঙ্গে ঝোলানো। বুকেরটি আমরা দেখছি, হাতেরটি তিনি নিজে।"······

এবারে ১৯৩৩ সনের অগষ্ট মাসে শনিবারের চিঠিতে মুদ্রিত অক্ষয়কুমার নন্দীর একখানা চিঠি উদ্ধৃত করছি। তিনি আমাকে লিখেছিলেন—

সবিনয় নিবেদন,

শনিবারের চিঠি—বৈশাখে, 'কন্যাবাসরে' আমার কন্যা কুমারী অমলা নন্দীর নাম দেখা গেল। প্রথম কথা, আমাদের আশঙ্কা হয়, আপনারা অমলার সম্বন্ধে না জেনেই পাছে কিছু লিখে বসেন। কিছু জানবার আবশ্যক হলে, আমাদের কাছে পরিষ্কার ভাবে জেনে নেবেন।

'গীতা রায়' নামটিতেই সম্ভবতঃ আপনারা ভুল করেছেন। গীতা দাশ আছে, রেবা রায় আছে। সম্ভবত এরই খিচুড়ী করে ফেলেছেন।

অমলা এক্ষণে বিদ্যালয়ের ছাত্রী। কোন নৃত্যের দলের সঙ্গে তাহার কোন যোগ নাই।

—শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী

যে জন্য এই চিঠি তার হেতু কন্যাবাসর নামক একটি ধারাবাহিক উপন্যাসের প্রথম কিস্তি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় এবং পরবর্তী কিস্তি আর লেখা হয়নি। লেখক সজনীকান্ত দাস। প্রথম কিস্তির প্রাসঙ্গিক অংশটি এই—

······"ততক্ষণে একেবারে সদর দরজার কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছি, ভীষণ ভিড় সেখানে, একেবারে ঠেলাঠেলি মারামারি ব্যাপার। আমাদের রবীন্দ্রনাথ ও শরৎ চন্দ্র, সুশীল মিত্র ও নীরদ দাশগুপ্ত, নরেন্দ্র দেব ও কান্তিচন্দ্র, দিলীপকুমার ও অন্নদাশঙ্কর—সকলেই আছেন বলিয়া বোধ হইল। একটু দূরে রাইবিশে দত্ত মহাশয় কোটপ্যান্ট শোভিত হইয়া একাই নাচিতে-

ছেন। [রাইবিশে নৃত্যের পুনঃপ্রচলনকারী গুরুসদয় দত্তকে রাইবিশে দত্ত বলা হয়েছে।]

"আমার ভুল হইয়াছিল, উদয়শঙ্কর-সিমকি নয়—শ্রীমতী অমলা নন্দী ও শ্রীমতী গীতা রায়।......"

অক্ষয়কুমার নন্দীর সঙ্গে আমার অল্প পরিচয় ছিল। সে পরিচয় কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের। তারপর তিনি প্রথমে এই রাস্তারই অন্য বাড়িতে ও পরে ১০ নম্বর চৌরঙ্গীতে উঠে যান। ভাল লোক ছিলেন, এবং দেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি বিষয়ে তিনি অনেক চিন্তা করেছেন। দুবার (লণ্ডন ১৯২৪, প্যারিস ১৯৩১) তিনি ইউরোপের শিল্প প্রদর্শনীতে যোগ দেন এবং তাঁর অভিজ্ঞতা বিষয়ে বিলাত ভ্রমণ নামক একখানা বই লেখেন। মাতৃ-মন্দির নামক মাসিকপত্র প্রকাশ করেছিলেন সে কথা তাঁর চিঠিতেই আছে।

এরপর তাঁর ২৭-৩-৬০ তারিখে ৮০ বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে আমাকে, রোমান লিপি বাংলায় প্রবর্তন করতে হলে তা কেমন হলে সহজ হয়, সে বিষয়ে তাঁর মুদ্রিত পরিকল্পনা সম্বলিত একখানা পোস্ট কার্ড পাঠান, এবং এ বিষয়ে গঠনমূলক কোনো বক্তব্য থাকলে তা জানাতে বলেন। এ কার্ড অনেকেই পেয়ে থাকবেন।

রোমান স্ক্রিপ্‌ট বাংলা হরফের বদলে ব্যবহার করার আমি পক্ষপাতী বহুকাল থেকে। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যখন প্রথম (১৯৩৩-৩৪ ?) তাঁর মত ব্যক্ত করেন, তখন আমি তাঁকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলাম। অতএব অক্ষয়বাবুও এ নিয়ে চিন্তা করেছেন দেখে তাঁর প্রতি আমার খুব শ্রদ্ধা হয়েছিল। এবং যদিও তাঁর পদ্ধতির ভিতর যথেষ্ট পরিবর্তনের অবকাশ ছিল, তবু এ জিনিস চালাতে হলে মিলিত চেষ্টা দরকার। সে চেষ্টা এদেশে কখনো হবে বলে আমার বিশ্বাস নেই।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

আমার ভাণ্ডারে পাটনার মণি সমাদ্দারের অনেক চিঠি জমা হয়ে আছে। মণি ছিল ইতিহাসের এম-এ, বিখ্যাত ঐতিহাসিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ্ যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের পুত্র। তাঁকে আমরা ছেলেবেলায় 'সমসাময়িক ভারত' নামক গ্রন্থের রচয়িতা রূপে জানতাম।

মণি 'প্রভাতী' মাসিক ও বিহার হেরাল্ড নামক ইংরেজী সাপ্তাহিকের সম্পাদক ছিল। অত্যন্ত অমায়িক এবং তার চেয়েও বেশি, কর্মতৎপর। তার পকেটে সম্ভবত সব সময় ডজন খানেক খাম, পোস্টকার্ড, চিঠির কাগজ প্রভৃতি মজুত থাকত, যে জন্য চিঠি পাওয়া মাত্র সে জবাব লিখত। আর শুধু তাই নয়, চিঠি না পেলেও বহু কাজের কথা বা সমস্যার কথা ভরা চিঠি লিখত। প্রয়োজনের বাইরে একটি কথাও থাকত না। ইতিপূর্বে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে মণি সমাদ্দারের কথা বলেছি। বিভূতিবাবুর লেখা যেটুকু উদ্ধৃত করেছি, তার মধ্যেও মণির কথা আছে। ১৯৩৭ সনে প্রভাতী সঙ্ঘের নিমন্ত্রণে আমরা পাটনা গিয়ে মণির আশ্রয়েই উঠেছিলাম।

প্রভাতীতে আমি অনেক লেখা লিখেছি, বিভূতিবাবুর সঙ্গে প্রথম সম্বলপুর ভ্রমণ কথা পুনর্লিখনান্তে ধারাবাহিক ভাবে প্রভাতীতে প্রকাশিত হয়। তারপর দারজিলিং ভ্রমণও। কিছুকাল সম্পাদকীয়ও লিখেছিলাম প্রভাতী মাসিকের। একটি সম্পাদকীয় পড়ে বাইরের এক পাঠক প্রভাতী সম্পাদককে এক চিঠি লেখেন, তাঁর লিখিত প্রশংসা আমারই প্রাপ্য বলে, মণি সে চিঠি আমাকে পাঠিয়ে দেয়। মণির চিঠির নমুনা—

কদমকুঁয়া, পাটনা

৫।৩।৪৯

পরিমলদা,

…অনেকদিন প্রভাতীতে আপনার কোনও লেখা বেরোয় নি। একটা লেখা চাই—সে গল্পই হোক, কবিতাই হোক, আর প্রবন্ধই হোক—ছোট হোক, বড় হোক। আপনার নাম সম্বলিত, অর্থাৎ signed লেখা।

—মণি

কদমকুঁয়া, পাটনা
১৩।৩।৪৯

পরিমলদা,

১২।৩এর পোস্ট কার্ড পেলাম। …চৈত্রের কাজ চলছে—top speed-এ। সুতরাং পত্রপাঠ লেখা পাঠাবেন।

—মণি

১৯৪৭ সনেই বেশি লিখেছিলাম প্রভাতীতে। বেহার হেরালডে আমার কয়েকটি গল্প শশিশেখর বসুর অনুবাদে ছাপা হয়েছিল। আমি নিজের গল্পের একটি অনুবাদ পাঠিয়েছিলাম—ওদের বিশেষ সংখ্যার শিশুবিভাগে। আমার মূল লেখা বেহার হেরালডে প্রকাশিত হয় মণির মৃত্যুর পরে—মণির বিষয়ে।

মণি বিহারবাসী হলেও সে বাংলাদেশ ও বাঙালী সম্পর্কে গভীর ভাবে চিন্তা করেছিল, বিশেষ করে প্রবাসী বাঙালীদের সম্পর্কে। ১৯৩৫ সনে আমি তখন শনিবারের চিঠির সম্পাদক, সেই সময় প্রথম আমি মণির রচনা ছাপি। (পৌষ ১৩৪২), রচনার নাম 'বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ।' পরে ১৯৩৬ সনে তার দ্বিতীয় রচনা ছাপি, নাম 'সম্মেলন কথা' (চৈত্র ১৩৪২)। প্রথমটিতে বাঙালী জাতির সম্পর্কে গভীর বেদনা বোধ। যথা—

…বাঙলার দিক্‌পালগণ এক পা বাড়াইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। কোন্‌দিকে দেখিব? সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিজ্ঞানে জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, ব্যবসায়ে রাজেন্দ্রনাথ, সকলেই সেই একই।

"কিন্তু তাহার পর?—তাহার পর নীরন্ধ্র অন্ধকার। দূরে ক্ষীণ চিতারশ্মি হইতে নির্গত ক্ষীণ ধূমরেখা আকাশমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে। শৃগালেরা কি যেন লইয়া কোলাহল করিতেছে—বোধহয় অর্ধদগ্ধ মাংসপিণ্ড। পৃথিবীর গলদেশ হইতে কাঁটার মত বাঙালী জাতিটাকে তুলিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। মেজর গুপ্তের অপারেশন সাক্‌সেসফুল হইয়াছে।"

দ্বিতীয় রচনা থেকে পরে কিছু নমুনা দেব। তার অন্যান্য কয়েকটি রচনা (সবই বাঙালী ও প্রবাসী বাঙালীর বিষয়ে) এবং তার স্ত্রী শ্রীমতী কমলার একটি রচনা (বিহারে মেয়েরা) যুগান্তরে প্রকাশ করি। এই সব রচনার সংকলন সে "প্রবাসী বাঙালীর কথা"—এই নামে প্রকাশ করে (ফাল্গুন

১৩৬৪)—প্রকাশক, 'জিজ্ঞাসা' কলিকাতা। এই বইয়ের একটি মূল্যবান ভূমিকা আছে, প্রমথনাথ বিশীর লেখা।

প্রবাসী বাঙালীদের সম্পর্কে এমন বহুমুখী চিন্তা আর কেউ করেছেন কিনা আমার জানা নেই। এ বইখানা সম্ভবত ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়নি, এ থেকে অন্তত গৌণভাবে প্রমাণ হচ্ছে যে এ বইখানা উচ্চস্তরের চিন্তাজাত। আমি এ বইয়ের সূচিপত্রটি এখানে উদ্ধৃত করি, যাতে অন্তত মণির 'বাঙালী'-চিন্তার ব্যাপ্তির পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। সূচিপত্রটি এই—প্রবাসী বাঙালী, প্রবাসী কারা? প্রবাসী কিসে? আসল সমস্যা, বঙ্গ ভঙ্গের প্রতিরোধ, কাদের জোরে, সংস্কৃতির কথা, বিপ্লব ও বিবর্তন, বাংলা ভাষার প্রচার, বাঙালীর ভাষাসংকট, প্রাদেশিকতা, বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ, সম্মেলন কথা, বিহারের মেয়েরা (কমলা সমাদ্দার) ও প্রসঙ্গত।

এবারে 'সম্মেলন কথা' থেকে ব্যঙ্গের সুরে বলা কিছু উদ্ধৃত করছি--

"...প্রথমেই নাম সমস্যা। প্রচলিত কথাটি "প্রবাসী বাঙালী"। ইহার অর্থ এই রূপও দাঁড়াইতে পারে যে, বাঙালী দুই প্রকার—এক [স্বদেশী] বাঙালী, অন্য প্রবাসী [বাঙালী]। এ যেন দেশী গাই ও বিলাতী গাই (বিলাতী গাই বলাই সঙ্গত—কারণ তাহা হইলে পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হইবে)। এতকাল জানিতাম তিন প্রকার বাঙালী আছে বাঙাল, বাঙালী ও ইঙ্গবঙ্গ। এবার আর একটি বাড়ল।

"প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন বলিলে কি ইহাই বুঝায় না (অন্তত আমার নিকট বুঝায়) যে, বঙ্গ সাহিত্য দুই বা ততোধিক প্রকারের—অর্থাৎ বাঙালীরা যে-সাহিত্যের চর্চা করে বা রসগ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা বাংলার বাহিরের বাঙালীদের হইতে বিভিন্ন।

"তবে ভাষা যখন মোসলেম বাংলা ও হিন্দু বাংলা পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে, তখন প্রবাসী বাংলায় উঠিতে বোধ হয় কাহারও আপত্তি থাকিবে না।"

মণীন্দ্রচন্দ্রের 'প্রবাসী বাঙালীর কথা' বাঙালীদের স্বার্থেই প্রাবাসী অপ্রবাসী সবার পড়া উচিত বলে মনে করি। কারণ এতে বহু সমস্যার আলোচনা আছে, এবং অনেক ক্ষেত্রে সমাধানেরও ইঙ্গিত আছে। এবং এ বইএর প্রয়োজন এখন আরো বেড়েছে।

মণির অকাল মৃত্যুর বেদনা বহুদিন আমি ভুলতে পারিনি।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যের নাম এখন অনেকের অজানা, কিন্তু এককালে প্রায় ৬০ বছর আগে তিনি 'জাতিভেদ' নামক একখানি বড় বই লিখে বাংলাদেশে কিছু চাঞ্চল্য জাগিয়ে তুলেছিলেন। আমার স্কুলজীবনে এই বইয়ের প্রভাব কম ছিল না। চিন্তার দিক থেকে যুক্তির পথে চিন্তার পথে চলতে এখনো চেষ্টা করি। এই বোধ আমার প্রায় প্রথম জীবন থেকেই সুপ্ত ছিল। 'জাতিভেদ' বইতে আমি একটা বড সমর্থন পেয়েছিলাম প্রচলিত বিধি ভঙ্গের। নানা শাস্ত্রীয় নিষেধ আমার কাছে তখন সেই স্কুল জীবন থেকেই খুব অস্বাভাবিক লাগত, এবং যা কিছু নিষিদ্ধ ছিল, ঠিক সেইগুলিই করতে একটা উল্লাস অনুভব করতাম। তখন স্পষ্ট বিচার বুদ্ধি ছিল না, শুধু ছিল নিষেধ ভাঙার আনন্দ।

এটা বলছি আমার নয় দশ বছর বয়সের কথা। এই সময় আমার উপনয়ন পর্ব শেষ হয়। দিন দশেক ঘরে বন্ধ করে রাখা হল। আত্মীয়েরা বললেন, ব্রাহ্মণেতরের মুখ দেখতে নেই এ সময়। এ কথা শোনামাত্র জানালা দিয়ে সবার মুখ দেখাই হল আমার প্রধান কাজ। দেখতাম এবং একা একা খুব হাসতাম। প্রতিমাকে প্রণাম করিনি কখনো। সবাই করত বলে, না করার আনন্দটা আমি উপভোগ করতাম। পূজার একমাত্র আকর্ষণ ছিল মাংস খাওয়া, বিশেষ করে কালীপূজায়। গ্রামে অনেক বাড়িতে কালীপূজা হত। মাংস রান্না হতে হতে রাত্রি শেষ হয়ে যেত। বাড়িতে ঘুমিয়ে থেকে রাত দুটো তিনটেয় উঠে গিয়েও খেতাম। একবার ভোরবেলা খেয়েছি। পূজা ছাড়া মাংসভক্ষণের আর কোনো উপায় ছিল না পাড়াগাঁয়ে।

ব্রাহ্মণেতরের হাতের ভাত খাওয়া নিষেধ ছিল বলে ঐটির দিকে ঝোঁক ছিল। কিন্তু চাইলেও কেউ দিত না, পাপ হবে বলে। তাই ১৯১০-১১ সনে কলকাতা এসে প্রথম সবার সঙ্গে পংক্তি ভোজনে তৃপ্তিলাভ করে একটা মস্ত বড় কাজ করেছি মনে হয়েছিল। বন্ধুদের কাছে গর্বের সঙ্গে একথা প্রচার করেছি, এবং তারা প্রচার করেছে আমার নিন্দা।

ভাতের হাঁড়িতে যে ধর্ম নেই একথা বিবেকানন্দের লেখা পড়বার আগেই মনে মনে বিশ্বাস করেছি, এবং দিগিন্দ্রনারায়ণের বই পড়ে বিশ্বাস দৃঢ়

হয়েছে। আমি ১৯১৬ কিংবা ১৭ তে ছুঁৎমার্গ নিয়ে ব্যঙ্গ করে ছোট্ট একটা লেখা সঞ্জীবনী কাগজে পাঠিয়েছিলাম, সেটি ছাপা হওয়াতে আরো উৎসাহিত হয়েছিলাম।

'জাতিভেদ' বইখানা ঘিরে অনেক স্মৃতিই জাগছে। একবার একটি বিবাহের যাত্রীরূপ সিরাজগঞ্জে গিয়ে দিগিন্দ্রনারায়ণের আশ্রম দেখতে গিয়েছিলাম। তাঁর একটি পাচক ছিল, অন্য জাতের! সে সময় কোনো হিন্দু ব্রাহ্মণের পক্ষে এমন কাজ বড়ই দুঃসাহসিক ছিল। একথা সবাই ফিরে এসে খুব উত্তেজনার সঙ্গে সবাইকে বলেছিলেন, মন আছে।

আমি যে সময়ের কথা বলছি, সে সময়ে কলকাতার সাধারণ 'পবিত্র হিন্দু হোটেল' গুলিতেও ব্রাহ্মণেরা পৃথক বসতেন। আমি গোয়ালনন্দ ঘাটের ঐ রকম 'পবিত্র' হোটেলেও এই নিয়ম দেখেছি। কুষ্টিয়ার এক হোটেলে রাত্রিবাসের দুর্ভাগ্য হয়েছিল একবার (১৯১৬)—সেখানেও তাই। ব্যবসায়ীদের প্রতারণামূলক ভণ্ডামি ও ক্রেতাদের অজ্ঞতামূলক এবং অনেক ক্ষেত্রে সজ্ঞান ভণ্ডামি অসহ্য বোধ হত। পাবনা কলেজে ১৯১৫তে ভরতি হওয়ার একবছর পরে হস্টেলে গিয়ে প্রথম মুক্তির স্বাদ অনুভব করলাম। কি আনন্দ যে হয়েছিল। এবং চরম মুহূর্তটি এলো যখন ১৯১৭ সনে পাবনা থেকে স্টীমারে আসতে স্টীমার চড়ায় আটকে গেল। আমরা কয়েকজন ছাত্র মিলে খালাশিদের রান্না খিচুড়ি পরম তৃপ্তির সঙ্গে খেলাম স্টীমারে বসে। আজ এ সব কথা কাউকে বলতে গেলে বিশ্বাসই করবে না যে, এই বাংলাদেশে ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারটা এমন হাসির ব্যাপার ছিল এককালে।

পল্লীবাসী দিগিন্দ্রনারায়ণের মনে সামাজিক অন্যায় চিন্তা কি করে উদয় হল, ভাবতে অবাক লাগে। তাই তাঁর কথা আমি স্মৃতিচিত্রণে উল্লেখ করেছিলাম। এই সময় (১৯৫৮) নবদ্বীপ থেকে লেখা তাঁর একখানি চিঠি পেয়ে বিস্মিত হই। কারণ প্রায় ৪৫ বছর তাঁর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই এবং তিনি কোথায় কি ভাবে আছেন সে বিষয়ে আমার কোনো ধারণা ছিল না। তাঁর চিঠির অংশবিশেষ এই—

নবদ্বীপ
৬।৪।৫৮

পরম স্নেহাস্পদেষু,

বহুকালের কথা, রতনদিয়া তোমার মাতামহের বাটীতে তোমার সঙ্গে

আমার প্রথম ও শেষ দেখা। তখন তুমি হাইস্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর [ক্লাস এইট] ছাত্র। আমার প্রথম প্রকাশিত 'জাতিভেদ' মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। নবদ্বীপে তোমার একজন আত্মীয় থাকেন।......তাঁহার সঙ্গে একবৎসর পূর্বে হঠাৎ রাস্তায় দেখা হয়, তাঁহার মুখে শুনিলাম তুমি নাকি মাসিক বসুমতীর ১৩৬৩ সালের ফাল্গুন মাসের সংখ্যায় আমার সম্বন্ধে কিছু লিখিয়াছিলে, কিন্তু আমি দেখি নাই।.........আমি এই সুদীর্ঘ দিনে জাতিভেদের পর ক্রমে আরও ৫৭ খানা ছোট মাঝারি বড় বই লিখিয়া ছাপাইয়াছি। সবই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে অনেক দিন। বইগুলির আশাতীত সুনাম ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ১৯০৫ হইতে স্বদেশী আন্দোলনে ও ১৯২০র পর কংগ্রেস আন্দোলনে ১৯২১। ১৯৩১। ১৯৪২ সালে কারাদণ্ড ও নানারূপ নিগ্রহ ঘটে। আমার বইগুলির মধ্য হইতে দশ বারো খানা বই উপযুক্ত প্রকাশক পাইলে গ্রন্থ স্বত্ব বিক্রয় করিয়া দিতাম। নিজে প্রায় দশ সহস্র টাকা সংগ্রহ করতঃ খরচ করিয়া প্রায় পৌনে তিন লক্ষ বই ছাপাইয়া বঙ্গ বিহার উরিষ্যা আসাম এবং সমগ্র ভারতে প্রচার করিয়াছি, কিন্তু পুনর্মুদ্রণের সামর্থ্য নাই।.........

ইতি চিরশুভার্থী দীন দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

আমি যখন মাতুলালয়ে তখন দিগিন্দ্রনারায়ণ সেখানে কিছুকাল ছিলেন। হয়তো তখন তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রই ছিলাম—বর্তমানের ক্লাস এইট। আমি তখন ছোটদের দলে, তাই আমার বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট কিছু মনে থাকবার কথা নয়। সিরাজগঞ্জেও যে তাঁকে দেখেছি, তাও ঐ একই কারণে ভুল হওয়া সম্ভব। আমি দিগিন্দ্রনারায়ণের রাজনৈতিক আদর্শের দিকটি কিছুই জানতে পারিনি। তখনো না, পরেও না। এই চিঠি থেকে জানতে পারলাম। শুধু তাঁর অতি গৌরবর্ণের চেহারাটা মনে আছে। ঘনকৃষ্ণ খাটো দাড়ির কৃষ্ণত্ব সে মুখের ঔজ্জ্বল্য আলো বাড়িয়ে দিয়েছিল। নাম স্বাক্ষরের আগে 'দীন' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, তাতে বোঝা গেল সমাজ সেবার পথেই তিনি নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন।

তাঁর ঐ চিঠির উত্তর দিয়েছিলাম, এবং ২৬।৫।৫৮ তারিখে তার উত্তরে জানিয়েছিলেন, সম্ভব হলে দেখা করবেন। দেখা এখনো হয়নি।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

এখন যে চিঠিখানি উদ্ধৃত করেছি, তার সঙ্গেও কয়েকটি মধুর স্মৃতি জড়িয়ে আছে—এবং স্মরণমাত্রে আনন্দ এবং দুঃখ দুইই মনে একটা মিশ্রভাব জাগিয়ে তোলে। দুঃখ এ জন্য যে পত্র লেখক অকালে মৃত্যুবরণ করলেন। চিঠিখানি এই—

৯ সত্যেন দত্ত রোড
কলিকাতা-২৯
২৫-৯-৫১

প্রিয় পরিমলবাবু,

একটি নূতন সংবাদ দিতেছি·········'ভাস্কর' হোমিওপ্যাথ হইয়াছে। আমার টেবিল এখন অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, মেডিসিন, মেটিরিয়া মেডিকা, থেরাপয়টিক্স প্রভৃতি গ্রন্থরাজিতে সমাকীর্ণ এবং আমি উহার মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত রহিয়াছি। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব এবং পরিচিত অপরিচিত বহু ব্যক্তিকে ঔষধ দিতেছি এবং বহু ক্ষেত্রে উত্তম ফল পাইতেছি। আপনার পরিচিত কাহারও কোন অসুখ যদি থাকে—তাহা হইলে তাঁহার চিকিৎসা করিবার সুযোগ পাইলে কৃতার্থ হইব। আপনি হয়তো হাসিতেছেন, কিন্তু I am perfectly serious about it.

ভবদীয় শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ

ডক্‌টর জ্যোতির্ময় ঘোষ, এডিনবরোর পিএইচ. ডি. উপাধির সদ্‌ব্যবহার এ ভাবে করবেন তা ভাবিনি। এবং ঐ সত্যেন দত্ত রোডের বাড়িতে যুদ্ধপূর্ব কোনো দিনে, যে টেবিলে অতিভোজে কাতর হয়েছিলাম, সম্ভবত সেই টেবিলেই এখন চিকিৎসার বই। চিকিৎসাটিও বোধহয় সেদিন খাওয়ার পরে আমার তখন-তখনই দরকার ছিল, তাই দীর্ঘকাল পরে এমন একখানা চিঠি পেয়ে সে দিক থেকে আর কোনো লাভ হল না।

১৯৩৫ সনে ফিরে যাই। তখন আমি শনিবারের চিঠির সম্পাদক। জ্যোতির্ময়বাবুর কাছ থেকে একটি প্রবন্ধ ও একখানি চিঠি পাই। তিনি তখন আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত, চিঠি ও প্রবন্ধ হুগলী মহসীন কলেজ থেকে

লেখা। যতদূর মনে হয় তখন তিনি ওখানে প্রিন্‌সিপ্যাল। পরে প্রেসিডেনসি কলেজের প্রিন্‌সিপ্যাল পদে অধিষ্ঠিত থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

হুগলী থেকে লেখা চিঠিতে তাঁর প্রবন্ধটি বিবেচনার জন্য অনুরোধ ছিল, এবং যদি মনোনীত না হয় তবে ছিঁড়ে ফেলতে বলা হয়েছিল। প্রবন্ধটির নাম 'আহারে বর্বরতা'। কিন্তু পড়ার পরে আর ছিঁড়ে ফেলা গেল না, খুব প্রয়োজনীয় একটি লেখা, এবং বাংলা দেশে বিশেষ ভাবে প্রচার যোগ্য বলে মনে হল। ওটি পেয়েছিলাম ১৯৩৫ মার্চ মাসে, পরবর্তী এপ্রিল সংখ্যাতেই রচনাটি প্রকাশিত হল। (চৈত্র ১৩৪১)

বাঙালী সমাজে খাওয়া বা খাওয়ানোর কোনো নির্দিষ্ট রীতি নেই। স্বাস্থ্যকে তুচ্ছ করে ভরপেট খাওয়ার পরেও কোনো নিমন্ত্রণ বাড়িতে মিষ্টান্ন খাওয়ার প্রতিযোগিতা চলে অনেকের মধ্যে, এবং তাতে উৎসাহ দেওয়া হয়। অথবা কোনো বন্ধুবান্ধব বা অতিথি বাড়িতে এলে তার খাওয়ার প্রয়োজন থাক বা না থাক, খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এবং খাওয়া শেষ হলেও 'এটা খাও, ওটা খাও' বলে প্রায় জোর করে অতিরিক্ত খাওয়ানো হয়। এইভাবে যত রকমে আমাদের পাকস্থলীকে অকারণ পীড়িত করা হয়, ঐ প্রবন্ধে তার সবই প্রায় ছিল।

এই প্রবন্ধ ছাপার পর জ্যোতির্ময়বাবুর সঙ্গে ক্রমে বন্ধুত্ব হয়। এবং 'আহারে বর্বরতা' দিয়ে যে পরিচয়ের সূত্রপাত, সেই পরিচয়ের সূত্রেই জ্যোতির্ময়বাবু আমাকে তাঁর নিজের বাড়িতে যে পরিমাণ খাইয়েছিলেন, তাতে আমার যত অস্বস্তিই হোক, তবু ভাবতে পারিনি যে তিনি বর্বরতার সীমায় পৌঁছেছেন। এই খাওয়ার পর আমার হাঁটতে কিছু কষ্ট হয়েছিল।

জ্যোতির্ময়বাবুর ঐ প্রবন্ধের শেষ দিকে একটি মজার গল্প ছিল। সেইটুকু এখানে উদ্ধৃত করছি—

"নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে যথাসাধ্য আকণ্ঠ ভোজন করাইবার জন্য পরিবেশককে যে উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে—

হাঁ-হাঁ দদ্যাৎ হুঁ-হুঁ দদ্যাৎ দদ্যাচ্চ করকম্পনে
শিরসশ্চালনে দদ্যাৎ ন দদ্যাৎ ব্যাঘ্রঝম্পনে—

তাহা একেবারে অতিরঞ্জিত নহে। কোন কোন স্থানে অবশ্য ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, কিন্তু তাহা নিমন্ত্রিতদিগের স্বাস্থ্য রক্ষার্থে নহে, অন্য কারণে।

"অত্যধিক আহার করিয়া, আকণ্ঠ উদর পূর্ণ করিয়াও আমাদের আহারের আকাঙ্ক্ষা মেটে না। এই সম্বন্ধে একটি সুপ্রচলিত গল্প বলিয়াই এ প্রসঙ্গের শেষ করিব। এক শ্রাদ্ধ বাড়ীতে কয়েকজন নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে স্থানাভাব বশতঃ পৃথক ভাবে বাহির বাটীতে আসন দেওয়া হইয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে একজন ইহাতে অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইলেন, কারণ তাঁহার ধারণা জন্মিল যে যাঁহারা ভিতর বাটীতে বসিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ইঁহাদের অপেক্ষা বেশী যত্ন পাইবেন। সেইজন্য তিনি আহারের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটি জিনিসই চাহিয়া লইয়া খাইলেন, যাহাতে কিছুতেই যেন ভিতর বাটীর ব্যক্তিগণ অপেক্ষা কোন বিষয়ে তাঁহার কম না থাকে। এইরূপে ক্রমাগত নানা আহার্যে উদর পূর্ণ করিয়া শেষ মিষ্টান্নটি কণ্ঠাগ্রে করিয়া ঊর্ধ্বমুখে বাহিরে আসিতেই একটি শায়িত গাভীতে পদস্পর্শ হইল। মুখ নীচু করিবার উপায় নাই, সুতরাং হাত দিয়া গাভীর উদরদেশ অনুভব করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'কে হে বাপু, খেয়ে এসেই শুয়ে পড়েছ, তুমি বুঝি ভিতর-বাড়ীতে বসেছিলে'?"

জ্যোতির্ময় ঘোষ 'ভাস্কর' এই ছদ্মনামে লিখতেন। আমি ১৯৩৬এর শেষে শনিবারের চিঠির সম্পাদনা ত্যাগ করি। ১৯৩৮ সনে সচিত্র ভারতের সম্পাদক হই। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীটের আর্ট প্রেস থেকে এই সচিত্র সাপ্তাহিক খানা প্রকাশিত হত। প্রেস ও কাগজের মালিক ছিলেন নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। খুব বড় আকারের আর্ট পেপারে ছাপা, অজস্র ফোটোগ্রাফ কিন্তু দাম মাত্র চার পয়সা।

এই কাগজে ছাপা হলে পাঁচ টাকা দক্ষিণা দেওয়া হত গল্পের জন্য। ভাস্করও লিখতেন, কিন্তু টাকা নিতে অস্বীকার করেছিলেন— সম্ভবত পাঁচ টাকার জন্য। ১৯৪৩ সনে 'নূতন পত্র' নামক মাসিক পত্র সম্পাদনা করি, (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে এই পত্রের কথা বলা হয়েছে ১৩৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য) সে সময় "ভাস্কর" 'এক তরফা' নামক একটি গল্প লেখেন। স্কুলের একজন মহিলা সেক্রেটারির চিঠিই গল্পের উপাদান। এক পক্ষের চিঠি—মোট ১৫ খানা, সমস্ত গল্পটা ঐ চিঠিতেই প্রকাশ। প্রথম চিঠির সম্বোধন "মহাশয়"—এবং শেষ চিঠির সম্বোধন "ওগো।" পত্রের উদ্দিষ্ট জনৈক পদস্থ ব্যক্তি, তাঁকে বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তারই পরিণাম গল্পেরও পরিণাম।

প্রেসে মাসিক ছাপার সময় সাধারণত এক বা দুই ফর্মার পর থেকে আরম্ভ করতে হয়। পরে প্রথম দিকের কাজ আরম্ভ হয়। ঐ গল্পটি নতুন পত্রের তৃতীয় সংখ্যায় কম্‌পোজ হয়েছিল। প্রথম প্রবন্ধ ছিল বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের। সব কম্‌পোজ হওয়ার পর সহকারী সম্পাদক সুধীর ভট্টাচার্য এসে বলল প্রায় সাত পৃষ্ঠার মতো একটি রচনা ফাইল থেকে বেছে দিন, প্রথম ফর্মা পূরণ করতে ঐ পরিমাণ লেখা দরকার। ফাইল খুঁজে ঐ মাপের কোনো লেখা পাওয়া গেল না। আমি বললাম বিকেলে এসো, আমিই লিখে দিচ্ছি কিছু। তখন আমার জ্বর চলছে প্রায় ১০২ ডিগ্রী ফারেনহাইট। মনে কৌতুক জাগল জ্বরের তাপের সঙ্গে। আমি 'আর এক তরফা' নাম দিয়ে আর একটি পাল্‌টা গল্প লিখে শূন্যস্থান পূরণ করে দিলাম। ভাস্করের গল্পের নাম 'এক তরফা' কারণ মণিকা দত্ত ১৫ খানা চিঠি লিখেছে, কিন্তু কোনোটার উত্তর পায়নি। আর আমি আর এক তরফার লিখলাম মণিকার চিঠির উদ্দিষ্ট মহেশ বসুর জবানীতে। মহেশ বসু মণিকার প্রত্যেকখানা চিঠির উত্তর লিখেছে কিন্তু ডাকে দেয়নি। মহেশের প্রথম চিঠির সম্বোধন 'মহাশয়া'—আর শেষ চিঠির সম্বোধন 'লক্ষ্মীটি'। দুটি মিলে বেশ জমেছিল গল্পটি।

মধুর কৌতুক গল্প ভারী সুন্দর লিখতেন জ্যোতির্ময়বাবু। যুগান্তরে তাঁর 'ভজহরি' পর্যায়ের অনেক গল্প ছেপেছি। তাঁর লেখা আমার খুব ভাল লাগত। আমার কাছে তিনি মাঝে মাঝে আসতেন। বাড়িতে অথবা যুগান্তর অফিসে। মস্তবড় একখানা গাড়ি ছিল।

তাঁর গাড়ি শেষ দিকে একটি বিশিষ্ট কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁকে একবার বাগবাজারের বেগুনি খাইয়েছিলাম। প্রথমত সংকোচ করেছিলেন, কিন্তু একটা খেয়ে দ্বিতীয়টি চেয়ে নিয়েছিলেন। গম্ভীর ভাবে বলেছিলাম বাগবাজারের সমস্ত তেলেভাজার দোকান তুষারকান্তি ঘোষের, অতএব নিঃসংকোচে খেয়ে যান। মালিকানার কথাটা অনেককেই বলতাম, কেউ কেউ বিশ্বাসও করেছিল। একটু চাপা গলায় বললেই বিশ্বাস করে।

জ্যোতির্ময়বাবু শেষে সপ্তাহে প্রায় একবার করে আসতে লাগলেন বাগবাজারে এবং প্রত্যেকবার এক টাকার বেগুনি কিনে নিয়ে যেতেন। গাড়ির সদ্‌ব্যবহার সন্দেহ নেই। আমার আরো দু-একজন বন্ধু শুধু ঐ জন্যই আমার কাছে আসতেন। আগে দুআনায় বেশ বড় বেগুনি পাওয়া যেত একটা,

সেই আকারের বেগুনি বারো-তেরো খানা একসঙ্গে খেতে দেখেছি এক বন্ধুকে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনা মনে পড়ল। আমরা বেগুনি খাচ্ছিলাম, এমন সময় তৎকালীন যুগান্তর সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় নিচে আমাদের ঘরে এসে হাজির। বললাম, নিন, খান। বিবেকানন্দ বললেন তেলেভাজা খেতে আমার ভয় হয়। আমি কিন্তু তাঁকে অতি সহজে দীক্ষিত করলাম।

আমি তাঁকে মনে করিয়ে দিলাম—ভয় কেন? বাড়িতে তো পটল ভাজা, বেগুন ভাজা, শাকভাজা, মাছ ভাজা সবই খেয়ে থাকেন, এবং সে সবই তেলে ভাজা। এ কথায় সম্পাদক বললেন, তাই তো! এ কথা তো মনে আসেনি। দিন, খাওয়া যাক।—সেই থেকে বিবেকানন্দ বাগ-বাজারের তেলেভাজা দেখে আর ভয় পাননি।

ভাস্কর হোমিওপ্যাথ হয়ে সংকোচের সঙ্গে চিঠি দিয়েছিলেন। ভেবে-ছিলেন, শুনে হাসব। হাসিনি। কারণ আমি জানি অনেক মানুষেরই জীবনে—বিশেষ করে নাস্তিকদের জীবনেও এমন একটা কাল আসে যখন হোমিওপ্যাথি ও ভগবানে বিশ্বাস জন্মাতে থাকে—সত্য কথা এটি।

জ্যোতির্ময় বাবুর মেধা পৈতৃক বলে মনে হয়। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। তাঁর পিতার মেধা ছিল অসাধারণ। তিনি ২য় শ্রেণীতে (বর্তমান ক্লাস নাইন) পড়বার সময় গ্রে'জ এলিজির—অনুবাদ করেছিলেন সংস্কৃত পদ্যে। আশ্চর্য কাণ্ড। জ্যোতির্ময়বাবু তাঁর পিতা গোপালচন্দ্র ঘোষের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখছিলেন একখানা, নাম 'বাংলার একটি বিস্মৃত রত্ন।' এ বইতে পুরো অনুবাদটাই দেওয়া আছে।

জ্যোতির্ময়বাবু গণিতের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর মৃত্যু হয়েছে ১৯৬৫ সনের জুন মাসে।

জ্যোতির্ময় বাবুর কথা বলতে মনে এলো তাঁর ভাস্কর নাম ও কৌতুক রচনার সঙ্গে পাঠকদের যে কিছু পরিচয় ছিল, তার প্রমাণ একজন পাঠক লিখেছিলেন, "শ্রদ্ধেয় এককলমী, আপনিই যে জ্যোতির্ময় ঘোষ ওরফে ভাস্কর তা সম্প্রতি জানলাম।"…(২৯।৩।৬১)।

এই চিঠিখানা এখনো আমার কাছে আছে। আর একখানা চিঠি

"পরিমল গোস্বামী (শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী)" এই রকম লেখা ছিল খামে। চিঠিখানা আমি শিবরামকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

এটি ১৯৪৩ সনের কথা। এই সময় নূতন পত্রিকার প্রকাশ, এবং শিবরাম চক্রবর্তীকে আমার ঐ চিঠিখানা পাঠিয়ে দিয়েএকটি লেখা চেয়েছিলাম। তার উত্তরে শিবরাম লিখছেন—

১৩৪, মুক্তারামবাবু স্ট্রীট

১৭।১০।৪৩

প্রীতিভাজনেষু,

কাল সন্ধ্যায় ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটের গেটে আপনার ছেলের হাতে আদিত্যকুমার ওরফে বাদলের redirect করা চিঠিখানা পেলাম, সেই সঙ্গে আপনার কাগজে গল্প লেখার আমন্ত্রণ। ধন্যবাদ—আমন্ত্রণের জন্যও এবং আদিত্যের জন্যও বইকি। ঐ ছেলেটির খাতায় 'গয়াকৃত্য বনাম মৃগয়াকৃত্য' শিরোনামে দু ছত্রের পয়ার বোধ হয় আমিই লিখেছিলুম নিজের নাম স্বাক্ষর করেই। (অনেকের মৃগয়ার ফলে তখন ওর গয়ার নামটা করারই কেবল বাকী আছে বলে' আমার মনে হয়েছিল!) কিন্তু দেখুন ওর কাছে নাম মাহাত্ম্যের কোনো দাম নেই—

পরিমল শিবরামে প্রভেদ নেই কোনো—অসার মায়ার ছলনামাত্র। এর থেকে আপনি এবং আমি বাঙালী পাঠক-সমাজে কতটা স্বনামধন্য তারও একটা পরিচয় পাওয়া যাবে। যাই হোক পরিমল গোস্বামী ওরফে শিবরাম এই স্বাক্ষর করে ওর এই চিঠির একটা জবাব দেব কিনা ভাবছি। আবার ভয়ও হচ্ছে গয়া-কৃত কারুকে সাধ করে ঘাড়ে ডেকে আনা নিরাপদ হবে তো? আদিত্যের আদি লাভ করতে গিয়ে শেষে হয়তো অন্ত পাওয়া যাবে না। অতলে গিয়ে পড়ব!··· ইতি—

শিবরাম চক্রবর্তী

তৃতীয় আর এক চিঠিতে এক পাঠক অনুমান করেছিলেন আমি প্রমথনাথ বিশী। কিন্তু এমন কল্পনাতে প্রমাণ হয়, পত্রলেখকেরা উক্ত তিনজন খ্যাত লেখকের লেখার চরিত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত নন, নইলে তাঁদের প্রতি এমন অন্যায় করতেন না।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

২২শে সেপটেম্বর ১৯৭০ তারিখে রেডিওতে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু সংবাদ শুনলাম। অনেকদিন দু'জনের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ ছিল না। ১৯৬২ সনের ১৩ই মে তারিখে দেখা হবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু হয় নি। যুগান্তর অফিসে সেদিন সে আমার কাছে এসেছিল, কিন্তু সেই সময়টায় আমি অনুপস্থিত ছিলাম। এক লাইন চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিল—

পরিমল,

আমি এসেছিলাম।

—শরদিন্দু, ১৩।৫।৬২

এই তার শেষ চিঠি। আগের অনেক চিঠিই এখন দেখছি হারিয়ে গেছে, কয়েকখানা মাত্র আছে, তা থেকে একটা মধুর সম্পর্কের কথা দাঁড় করানো যেতে পারে। আমরা একসঙ্গে একই কলেজে বি-এ পড়েছি (১৯১৭-১৮তে) কিন্তু তখন আমাদের পরিচয় হয়নি, হওয়া সম্ভবও ছিল ছিল না। নানাস্থান থেকে আগত ১৫০ জনের একটি ক্লাসে, প্রত্যেকেরই ভবিষ্যৎ যখন অদৃশ্য, এমন অবস্থায় একমাত্র অনেকদিন পাশাপাশি ক্লাসে বসলে হয়তো কিছু আলাপ হতে পারত, কিন্তু তা হয়নি। একসঙ্গে হস্টেলেও থাকি নি। কিন্তু পরে দু'জনের বৃত্তি যখন প্রায় এক, এবং এই উপলক্ষে পরিচয়ের সুযোগ ঘটল, তখন কথায় কথায় একসঙ্গে এককালে পড়েছি আবিষ্কৃত হয়েছিল। এবং আমি শরদিন্দুর লেখার বিশেষ অনুরক্ত ছিলাম বলে আমাদের মধ্যে বেশ একটা আত্মীয়তাও গড়ে উঠেছিল। শেষে নিয়মিত চিঠিপত্র লেখা, এবং আমি এ সময় (১৯৩২—৩৬) ভাগলপুরে প্রাচীনতর বন্ধু বনফুলের কাছে মাঝে মাঝে যেতাম. এবং ১৯৩৫ সনের কোনো একদিন মুঙ্গেরে শরদিন্দুর বাড়িতে গিয়েও হাজির হয়েছিলাম বলাইচাঁদ (বনফুল) ও কপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্যের সঙ্গে। প্রায় সন্ধ্যায় অতর্কিতে এভাবে যাওয়াতে শরদিন্দু ভীষণ খুশি। আমরা অবশ্য ঘণ্টা দুই পরেই ফিরে এসেছিলাম। ১৯৩৪ জানুয়ারির মারাত্মক ভূকম্পে শরদিন্দুদের বাড়ির কিছু ক্ষতি হয়েছিল, তাও দেখলাম। সে ভূকম্পে বলাই-পরিবারও খুব দৈবক্রমে রক্ষা পেয়েছিল।

অতি প্রখর শীতের সেই ভূকম্পে বাইরে রাত কাটানোতে সমস্ত বিহারের মানুষদের দেহকম্প কি পরিমাণ হয়েছিল, সহজেই অনুমানযোগ্য।

১৯৩৬ সনের শেষে আমি শনিবারের চিঠির ভার পুনরায় সজনীকান্তের হাতে তুলে দিয়ে নানা স্থানে খণ্ড কাজে নিযুক্ত হয়েছিলাম, তার মধ্যে, একটি বাদ্যযন্ত্র ও রেকর্ড প্রস্তুতের কারখানার মাসিক বিজ্ঞাপন পুস্তিকা লিখনের কাজেও কিছুদিন নিযুক্ত ছিলাম। এই উপলক্ষে আমি লেখকদের সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ ঘটিয়ে দিলাম। স্বত্বাধিকারী বিভূতিভূষণ সেন অতি অমায়িক ব্যক্তি, তিনি পরীক্ষামূলক ভাবে বনফুলের কবিতার আবৃত্তি, আশু দে'র কৌতুক কাহিনী এবং শরদিন্দুর নাটক রেকর্ড করতে রাজি হলেন। তার পৌরাণিক নাটক শিব-উমার পরিণয় যে-কোনো রেকর্ড প্রতিষ্ঠানেরই গ্রহণীয় ছিল। কিন্তু তার 'ডিটেক্‌টিব' নামক নাটক রেকর্ড করায় কিছু সাহসের পরিচয় ছিল সন্দেহ নেই।

বনফুলের কবিতা ('শালা') বাজারে চলল না। সে সময় বকবিতা বা এ রকম নাটকের ক্রেতা জোগাড় করা সহজ ছিল না। (কবিতা হঠাৎ কিছুকাল হল খুব ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে, ক্রেতাও জুটছে অনেক। আশঙ্কা আছে খবরের কাগজও অতঃপর কবিতায় লেখা চলবে।) বনফুলের 'শালা' এ যুগে রেকর্ডে পুনর্মুদ্রিত হলে ভাল চলতে পারত, বিশেষ করে সে কবিতা যখন কবিকণ্ঠেরই আবৃত্তি।

শরদিন্দুর 'বন্ধু' নামক নাটক প্রথমে শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত হয়. পরে ১৯৩৭ সনের ১৮ই অগস্ট তারিখে রঙমহলে প্রথমে অভিনীত হওয়ার পর পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। নাটকখানি আমার নামে এইভাবে উৎসর্গ করা হয় :

বন্ধু শ্রীপবিমল গোস্বামী

করকমলেষু

আমার কাছে তার স্বাক্ষরিত ১৯৫২ সনে মুদ্রিত এর চতুর্থ সংস্করণ খানি আছে। আমাকে বন্ধুরূপে এভাবে স্মরণ করাতে আমি তার প্রীতিতে বিশেষ ভাবে মুগ্ধ এবং অভিভূত হয়েছিলাম। তারপর সে আমাকে উপহার দিল একখানা সুন্দর ছড়ি, যার বুকে রূপার ব্যাণ্ডে আমার নাম খোদাই করা ছিল। এই দুটি জিনিস নিয়েই তাকে মাঝে মাঝে চিঠি লিখেছি। তার চিঠির উত্তর পাঠাতে দেরি হলে বলতাম, যত দেরি হচ্ছে তত তোমার

ছড়িখানা আমার বিবেকের পিঠে আঘাত করছে, অথবা ছুরিখানা হৃৎপিণ্ডে খোঁচা দিচ্ছে ইত্যাদি।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্‌স ছিলেন শরদিন্দুর প্রকাশক। বই বেরুলে বম্বে থেকে শরদিন্দুর নির্দেশ আসত প্রকাশকদের কাছে, আমাকে একখণ্ড পাঠিয়ে দিতে। কলকাতা এলে ওখানে শরদিন্দু অনেকের কোষ্ঠী-বিচারে লেগে যেত। জ্যোতিষীরূপে ওখানে তার খুব প্রতিষ্ঠা ছিল। রত্নধারণ বিষয়েও শরদিন্দু ছিল বিশেষজ্ঞ। তবে আমি তার কাছে এ সব বিষয়ে কোন সাহায্য বা পরামর্শ নিইনি কখনো। বিশ্বাস না থাকলে ওতে কোনো ফল হয় না।

তার কণ্ঠস্বর ছিল গাঢ় ও মধুর। উপরন্তু গোঁফ ছিল। অভিনয় করতেও দেখেছি—রেডিওতে ১৯৩৬ সনে, রবীন্দ্র জন্মদিন উপলক্ষে, বৈকুণ্ঠের খাতায় কেদারের ভূমিকায়। এই অভিনয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিপিনের ভূমিকায় নেমেছিলেন। শরদিন্দু আমার লেখা একখানা কৌতুক নাটিকার রেকর্ডেও সরযুবালা, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ও অন্যান্যের সঙ্গে অভিনয় করেছিল।

মিথিলার মানুষ, মৈথিলী ভাষা তার সম্পূর্ণ আয়ত্ত ছিল, মৈথিল পদকর্তাদের অনুকরণে সে অনেক কবিতা লিখেছিল। পুণায় বাড়ি করে তারও নাম রেখেছিল মিথিলা। এবং মৈথিলী ভাষায় পদাবলীর অনুকরণে দুর্দান্ত কৌতুক কাব্যও লিখেছিল কয়েকটি। তার 'তনুমন' (করুণা প্রকাশনী) নামক একমাত্র কবিতার বইতে এই কৌতুক কবিতাগুলি নেই। থাকলে ভাল হত। তবে বিশুদ্ধ বাংলা 'শালী' কবিতাটি আছে, এবং অন্য কৌতুক কবিতাও দু-একটি আছে।

মৈথিলী ভাষায় কৌতুকটি শরদিন্দুর কৌতুক প্রবণতার অন্যতম দৃষ্টান্ত। স্মৃতি চিত্রণে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছি এই কবিতাটি নিয়ে।

শরদিন্দুর স্বতঃস্ফূর্ত সরসতা অথবা কৌতুক আমার বিশেষ প্রিয় ছিল। একটি তিন লাইনের কবিতা বেশ মজার (তিন লাইনের লিমেরিক?)।

শিল্পীর শিরে পিলপিল করে আইডিয়া
লেখেন যখন পুস্তক তিনি তাই দিয়া,
উই পোকা কয়, চল এইবার খাই গিয়া।

১৯৩৬, ৩রা সেপটেম্বর শরদিন্দু আমাকে একটি প্যারডি পাঠায়,



শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ফোটো : পরিমল গোস্বামী, ১৯৩৮

রেকর্ডে স্থান পেতে পারে কিনা এই উদ্দেশ্যে। রেকর্ডে দেওয়া সম্ভব হয়নি। সেটি এই—

তোমার এ মহাবিশ্বে ছাতা হারায় খালি প্রভু,
আমরা কাতর ছাতার শোকে, তাইত জবুথবু।
তোমার মতই তোমার ভুবন চোরে পূর্ণ,
চোরে পূর্ণ হে চোরপতি,
(দেখতে না পাই কখন সরায়)
তাই এ দুঃখ প্রভু।
হারায় ছাতা ট্রামে-বাসে—হয় না তবু হারা
ঐ আর একজনের মাথায় চড়ে ঘুরে বেড়ায় তারা।
হারাল মোর ছাতা যত
হিসাব তাহার দিব কত
চোরের রাজা হে ননীচোর, তুমিই জান প্রভু।

সঙ্গের চিঠিখানা এই ;—পরিমল, মৃণাল ঘোষ কর্তৃক গীত নজরুলের "তোমার এ মহাবিশ্বে কিছু হারায় নাকো প্রভু" গানের প্যারডি লিখে পাঠালুম।···তোমার চিঠি পাইনি কেন ? আশা করি গল্পটা পেয়েছ। গত রবিবারে বলাইয়ের কাছে গিয়েছিলুম। সব শুনলাম, তোমার চিঠির প্রত্যাশায় বইলুম। 'হিমালয়' কতদূর ?—তোমার শরদিন্দু।

শনিবারের চিঠি ছাড়বার পর 'হিমালয়' নামে একখানা মাসিক প্রকাশের ইচ্ছা ছিল। বলাইচাঁদেরও উস্কানি ছিল এতে। কিন্তু হিমালয়ের কল্পনাটা হিমঘরেই রয়ে গিয়েছিল।

আরো কয়েকখানি চিঠির অংশ উদ্ধৃত করছি, এতে তার ব্যক্তিগত, অথবা রচনাগত, খণ্ড ইতিহাস পাওয়া যাবে।—

ব্যানার্জী লজ
মুঙ্গের, ৭ই ভাদ্র ১৩৪৩
[অগস্টের শেষ সপ্তাহ, ১৯৩৬]

পরিমল,

তোমার চিঠি পাইলাম। বীরেনবাবুর (বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র) suggestionsএর প্রতীক্ষায় রহিলাম। তা যদি গ্রহণীয় হয় অবশ্যই গ্রহণ করিব, কিন্তু শিব-উমা রেকর্ডিং সম্বন্ধে কি suggestion থাকিতে পারে

ভাবিয়া পাইতেছি না। ১২ টা রেকর্ডে [সাইডে] ৬ টা গান স্তব ইত্যাদি আছে, ইহার বেশী গান থাকিলে গল্প বলিব কি করিয়া? আমি আধুনিক রেকর্ডে পালা শুনিয়াছি, কিন্তু আমার পছন্দ হয় নাই।…শিব-উমা আমি যেভাবে লিখিয়াছি সেই ভাবেই রেকর্ড করিয়া দেখ না? আমার বিশ্বাস টেকনিকের দিক দিয়া অন্যান্য পালার চেয়ে ভালই হইবে। রেকর্ডে যাঁহারা পালা লেখেন তাঁহারা গল্প বলিবার টেক্‌নিক জানেন না, তাই তাঁহাদের পালা ভাল উৎরায় নাই, ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কথাটা চিন্তা করিয়া দেখিও।…

তুমি পত্রিকা বাহির করিতে চাও জানিয়া তোমার মস্তিষ্ক সম্বন্ধে চিন্তিত হইলাম।

এই শিশু-মৃত্যুর দেশে অমন কাজ করিও না, তুমি যদিচ শিশু নও, তবু তুমিও মারা যাইবে।…তবে অল্প মূল্যের একটি 'সরেস' পত্রিকা বাহির করিলে চলিতেও পারে। যা হোক যদি কাগজ বাহির করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া থাক, তবে আমার যতদূর সাধ্য তোমাকে লেখা দিয়া সাহায্য করিব।

ইতি—তোমাদের শরদিন্দু

বলা বাহুল্য, কাগজ বার করা হয়নি। সে অনেক কথা। আর একখানি চিঠি "বন্ধু" নাটক বিষয়।

মুঙ্গের

২১।১।৩৮

পরিমল,

তোমাকে চিঠি দিই নাই। যেহেতু তোমার উপর অতিশয় রুষ্ট হইয়াছিলাম। কিন্তু প্রবাসীতে "শীতের রিক্ততা" দেখিয়া ক্রোধ কিঞ্চিৎ কমাইয়াছি।…

বীরেনবাবুর মুসাবিদা অনুযায়ী পত্র দিলাম—যাহা করিবার করিও। তোমাদের উপর কার্যভার ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। বীরেন্দ্রবাবুই উদ্যোগী হইয়া "বন্ধু" রঙমহলে দিয়াছিলেন, সুতরাং টাকা আদায় করিবার ভার তাঁরই।

ইতি—শরদিন্দু

প্রবাসীতে আমার একখানি ফোটোগ্রাফ ছাপা হয়েছিল তার নাম শীতের

রিক্ততা। ফোটোগ্রাফ খানি ভাগলপুরের গঙ্গার ধারে তোলা—শীতকালে। রিক্ত এই হিসাবে যে, আকাশে মেঘ ছিল না, নদীতে নৌকা ছিল না, গাছে পাতা ছিল না। এবং সে গাছের নিচে যে বসে ছিল তার মনটাও ছিল উদাসীন, শূন্য। এই ব্যক্তিটি 'বনফুল'। প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউতে এই ছবিখানি তখন বেরিয়েছিল। চিঠির আরম্ভে এই ছবিখানার কথাই শরদিন্দু উল্লেখ করেছে। অন্য চিঠিতেও শিব-উমা বিষয়ে আরো সংবাদ আছে—

ব্যানার্জী লজ

মুঙ্গের ২৪।৩।৩৭

পরিমল,

শেষ পর্যন্ত শিব-উমাকে...উদ্ধার করিতে পারিয়াছ ইহা অত্যন্ত সুখের বিষয়। সেনোলা [প্রতিষ্ঠান] উহা গ্রহণ করিয়াছে জানিয়া আরও আনন্দিত হইলাম। তোমার ভালবাসার ঋণ শোধ দিবার নয়।...

এবার ভারতবর্ষে তোমার 'রবীন্দ্র সঙ্গমে' কথা পড়িলাম। আরো দীর্ঘ হইলে ভাল হইত। মন ভরিল না। তুমি বড় চমৎকার রিপোর্টার।

এবারে পাটনায় বা চন্দননগরে তোমাদের সঙ্গী হইতে পারিলাম না— স্বাস্থ্যের জ্বালায়। একটা না একটা লাগিয়াই আছে।...বন্ধু পড়িতেছ কি? কেমন লাগিতেছে ?

ইতি তোমাদের

শরদিন্দু

ভারতবর্ষের লেখাটা খুবই ছোট ছিল—পরে বিস্তারিত লিখি প্রবাসী ষাট বছর পূর্তি উপলক্ষে যে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়, তাতে। তারপর "আমি যাঁদের দেখেছি" বইতে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে এই রচনা থেকে সাহায্য নিয়েছি।

পাটনায় শরদিন্দু আসতে পারেনি। সে সব কথা অন্য অধ্যায়ে বিভূতি-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গে একটি রচনার উদ্ধৃতিতে পাওয়া যাবে। (১৩৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।) 'বন্ধু' শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত হচ্ছিল।

১৯৩৬ সনে রবীন্দ্র জন্মদিবস উপলক্ষে রেডিওতে বৈকুণ্ঠের খাতা অভিনীত হয়, একথা আগে বলা হয়েছে। শরদিন্দু তাতে কেদারের ভূমিকা নিয়েছিল, আমি তাকে এজন্য আসতে লিখেছিলাম। নিচের চিঠিখানিতে তার

'ডিটেক্‌টিব' অভিনয় রেডিওতে শুনে তার কি মনে হয়েছে সেকথা এবং বৈকুণ্ঠের খাতার সম্পর্কে কিছু সংবাদ চেয়ে, লিখেছে—

মুঙ্গের
২৫।৫।৩৬

ভাই পরিমল,

কাল রাত্রে 'ডিটেক্‌টিব' শুনলুম। শুধু কানে শুনলে দৃশ্যকাব্যের অনেকখানি রস বাদ পড়ে যায়। তবু ওঁরা যে ভাবে অভিনয় করেছেন তাতে আমার ত খুব ভালই লেগেছে। বিশেষতঃ অন্তত সমরেশ আর কেয়া অতি উৎকৃষ্ট হয়েছে। তোমাদের কি মনে হয়? বীরেন্দ্রবাবুকে আমার অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।…২৫ শে বৈশাখের আগে কলকাতায় যাব। বৈকুণ্ঠের খাতায় কে কি পার্ট নিয়েছে জানিও।

প্রবাসীর ব্রজেনবাবুর [ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়] সঙ্গে দেখা হয়েছে কি? ইতি—

তোমাদের
শরদিন্দু

চিঠির যেসব অংশ উদ্ধৃত করছি, তার তারিখগুলি কয়েক বছরের মধ্যে ব্যাপ্ত। তা হলেও লেখক মানুষটির কিন্তু বদল ঘটেছে খুব ধীরে ধীরে। কাজের চাপে পড়লে বদল ঘটবেই, বয়সের চাপও আছে। কয়েকখানি পত্রাংশ পর পর দিচ্ছি—

মালাড
১।৬।৫২

পরিমল,

নবেন্দুর [নবেন্দু ঘোষ] মুখে তোমার খবর পেলুম।…গতবার যখন কলকাতা গিয়েছিলুম তোমার ছেলেমেয়েরা ব্যোমকেশের গল্প লেখবার জন্য আমাকে ধরেছিল। তাদের অনুরোধ মনে বিঁধে ছিল। তারা শুনে হয়তো খুশী হবে সম্প্রতি দুটি ব্যোমকেশের গল্প লিখেছি, তার মধ্যে একটি মস্তবড়—১০ ফর্মার উপন্যাস। গল্প দুটিকে এখনও পত্রস্থ করিনি।…পেটের চিন্তায় ব্যস্ত, পেট ভাল যাচ্ছে না। ইতি

তোমাদের শরদিন্দু

শরদিন্দু বম্বে টকীজ বছর তিনেক পরেই ছেড়ে দিয়েছিল। তার ক্ষমতার খদ্দেরের অভাব ছিল না বম্বেতে। একখানি চিঠিতে সে জানাচ্ছে—

মালাড
৭।৫।৪২

পরিমল,

তোমার পত্র পাইলাম।···কালিদাস বই বাহির হইলে পড়িও। আমি বম্বে টকীজ ছাড়িয়া দিয়াছি। উপস্থিত আমার এক গুজরাটী বন্ধু ফিলম্ কোম্পানি খুলিয়াছেন, তাহাতেই চিত্রনাট্যকার রূপে বিরাজ করিতেছি, শীঘ্রই আমার প্রথম ছবি দেখিতে পাইবে।···

ইতি—শরদিন্দু

১৯৩৮ সনে সচিত্র ভারতে সম্পাদকরূপে যোগ দেওয়ার কথা শুনে শরদিন্দু লিখছে—

মুঙ্গের
২।৬।৩৮

পরিমল,

সচিত্র ভারতের ভারগ্রস্ত হইয়াছ জানিয়া খুব খুশী হইয়াছি। লেখা এবার হইতে নিয়মিত পাঠাইব।—অন্তত মাসে দুটি করিয়া পাইবে।··· আমার নবতম পুস্তক "বুমেরাং" পড়িয়াছ কি?···লাল পাঞ্জা রেডিওতে চালাইতে পার না? ভালবাসা লও।

—শরদিন্দু

১৬ই জুলাই ১৯৩৯, বম্বে থেকে লিখছে—

পরিমল, তোমার উপর আগে হইতেই চটিয়া ছিলাম, চিঠি পাইয়া আরও চটিয়াছি। তুমি নিজে পাষণ্ড ও নরাধম হওয়া সত্ত্বেও আমাকে উক্ত আখ্যায় অভিহিত করিয়াছ। উপরন্তু 'ভাবী' দেখিয়া আমাকে কিছু লেখ নাই।···আমার তৃতীয় ফিলম 'দুর্গা' ১লা জুলাই বাহির হইয়া গিয়াছে—ইহাতে দেবিকারাণী আছেন। কিন্তু কলিকাতায় প্রকাশ হইতে এখনও বহু বিলম্ব।

ইতি—শরদিন্দু

শরদিন্দুর একটি গল্পে ছোট্ট একটি ছেলের মুখে 'নরাধম' কথাটি পড়ে খুব কৌতুক অনুভব করেছিলাম, তারই অনুকরণে শরদিন্দুকেও সেই সম্বোধন করেছি ও তৎসহ পাষণ্ড, দুরাচার, ইত্যাদি, কিছুকাল। সেও করেছে। তেমন কয়েকখানি চিঠি—

মালাড

১২-৬-৪২

পরিমল,

তুমি মহা পাপিষ্ঠ—তোমার নাটক অভিনয় হইতেছে, অথচ তুমি আমাকে খবর পর্যন্ত দিলে না। কি নাটক লিখিয়াছ সমস্ত খবর দিও। অবিলম্বে চিঠি দাও। দীর্ঘ চিঠি দিবে, কোন খবর বাদ না পড়ে।

আমার কালিদাস লইয়া বড়ই বিপদে পড়িয়াছি। জিনিষটি কেমন হইতেছে কেহই কিছু বলিতেছে না। তুমি তোমার মতামত জানাইবে।........

শরদিন্দু

আমার একখানি নাটক, পৌরাণিক নাটক, মিনার্ভায় ঐ সময়ে অভিনয় হবে ঠিক হয়েছিল। রিহার্সাল আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু বন্ধ করতে হয়েছিল। তার প্রধান কারণ আমার লেখার মধ্যে অন্যে কলম চালিয়েছিলেন, এবং তা আমার পছন্দ হয়নি। তা ছাড়া মুখ্য কারণ অন্য কিছু ছিল না, যদিও তখন বোমা পড়ার কাল, পথ ঘাট নিষ্প্রদীপতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। নাটকখানি পৌরাণিক—রেকর্ড হয়েছিল ৭ খানিতে মোট ১৪ ভাগে। রেডিওতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের অনুরোধে বাড়িয়ে ২ ঘণ্টা করা হয়েছিল। তারই পরিবর্তিত সংস্করণ। বিষয়বস্তু বাজে, এখন ভাবতেও সংকুচিত হই। আর একখানি চিঠিতে আক্রমণের দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়—

মালাড

২০-৬-৫২

ভাই পরিমল,

তুমি একটি আস্ত নরাধম। আমি কলকাতা থেকে ফিরে এসেই তোমাকে চিঠি দিয়েছিলাম, তুমি উত্তর দাওনি।......

তোমার

শরদিন্দু

আরো আছে—

মালাড

১১-৭-৫২

ভাই পরিমল,

তোমার সম্বোধনগুলির জবাব দিতে গেলে পোস্ট কার্ডে কুলোবে না। তবু বলছি তুমি একটি উদীয়মান জলহস্তী।

অর্থ এবং পরমার্থ কিছুই সংগ্রহ করতে পারিনি। পরমার্থকে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত পকেটে পুরেছে আর অর্থ সব কালোবাজারে চলে গেছে। ইয়ার্কির উৎস শুকিয়ে যাবার কারণ—বয়স। বয়স বাড়ছে। নাতি ইয়ার্কি দিতে আরম্ভ করেছে। আমার ৫৪ চলছে, তোমার কত?

তোমার

শরদিন্দু

ভাই পরিমল,

তুমি একটি পরিপক্ক পাষণ্ড। কালের মন্দিরার যে সমালোচনা লিখেছ তা পড়ে কার সাধ্য বোঝে বইখানা ভাল কি মন্দ হয়েছে। তবে তোমার চিঠিতে যা লিখেছ তা থেকে মনে হল তোমার ভাল লেগেছে।.........

তোমার Buddhist India যত্ন করে রেখেছি, সুযোগ পেলেই পাঠিয়ে দেব। বইখানা মূল্যবান কিন্তু ওর অধিকাংশ সিদ্ধান্তই নবতম গবেষণার ফলে বদলে গেছে।......

তোমার শরদিন্দু

মালাড ৪-৭-৫২

Buddhist India বইখানা Rhys Davids এর লেখা। প্রথম প্রকাশ ১৯০৩, সুশীল গুপ্ত সংস্করণ ১৯৫০। এইখানাই শরদিন্দু আমার কাছ থেকে নিয়ে গিয়েছিল, এবং কিছুদিন পরেই ফেরৎ দিয়েছিল।

পরবর্তী চিঠি—দ্যাখো সম্পাদক, ইয়ার্কি ভাল লাগে না। সাত মাস হল আমি পুনায় এসে স্বাস্থ্য অন্বেষণ করছি, এখনও পাইনি। তারপর যদি গল্পের তাগাদা কর, রক্তারক্তি হবে।

ব্যোমকেশের উপর নজর কেন? দুর্গরহস্য পড়েছ? উপস্থিত ব্যোমকেশের একটা লম্বা উপন্যাস লিখেছি, এখনও শেষ হতে দেরী আছে।......আমার মাথায় রক্তের চাপ, পেটে বায়ুশূল, পায়ে বাত। আর বেশী দিন নয়।

ইতি

তোমার শরদিন্দু

বিজয়নগর, পুনা-২, ২৬-৬-৫৩

এর পরেও অবশ্য ১৬ বছর আয়ু অবশিষ্ট ছিল। এরপর এতেও আয়ু স্মরণ—

বিজয়নগর কলোনি, পুনা-২

৩০-৬-৫৩

ভাই পরিমল,

তোমার চিঠি পেয়ে আনন্দও হল, দুঃখও হল। দীর্ঘায়ু হবার আশা ছেড়েছি, এখন যদি দুতিন বছর টিকে যাই তাই যথেষ্ট।

তুমি দুর্গরহস্যের সমালোচনা করেছ, জানতাম না, দেখিনি। উপস্থিত ব্যোমকেশের একটা বড় উপন্যাস নিয়ে হিমসিম খাচ্ছি। ২০০ পাতার বই হবে। ওটা আনন্দবাজারে দেব বলে চুক্তিবদ্ধ হয়েছি। অগাস্ট মাসের প্রথম হপ্তার মধ্যে শেষ করে দিতে হবে, সুতরাং আমার অবস্থা বুঝতেই পারছ। এটা শেষ করে আবার ব্যোমকেশের গল্প লেখা আমার দেহমনের সাধ্যাতীত।......

আমার 'স্মৃতিচিত্রণ' পড়ে শরদিন্দু যে চিঠিখানা লেখে তাতে আমি অভিভূত। চিঠীখানা এই—

মিথিলা

বিজয়নগর, পুনা-২

৩০-৮-১৯৫৮

ভাই স্মৃতিদিগ্‌গজ,

হাতীর স্মরণশক্তি খুব প্রখর শুনেছি; তুমি হাতীর কান কেটে নিয়েছ। তুমি একটি আস্ত নিরেট স্মৃতিদিগ্‌গজ।

এক নিশ্বাসে রামায়ণ পড়া যায় কিনা বলা যায় না। কিন্তু আমি প্রায় এক নিঃশ্বাসে তোমার ৩৩২ পাতার বই শেষ করে ফেললাম। সত্যি সত্যি মহাকাব্য পড়ার স্বাদ পেলাম।

অথচ কত না ঘরোয়া কথা তুমি লিখেছ। তোমার বাল্যস্মৃতি একান্তভাবে নিজস্ব স্মৃতি হওয়া সত্ত্বেও যেন সকল যুগের সকল বালকের স্মৃতিচিত্র হয়ে উঠেছে। তোমাকে ধন্যবাদ, তুমি আমাকে আমার কৈশোরের কথা মনে করিয়ে দিয়েছ। বোধকরি আমাদের সমবয়স্ক যিনিই তোমার 'স্মৃতিচিত্রণ' পড়বেন তিনিই স্মৃতিময় হবেন। শৈশবকালটা আমার কাছে এখন প্রায় পূর্বজন্মের কাহিনী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নিজের স্মৃতিকথা লিখতে গিয়ে তুমি কোথাও নিজেকে প্রধান করে তোলনি। তুমি যেন ক্যামেরাম্যান, ক্যামেরার পিছনে কালো কাপড়ে মুখ

ঢেকে আড়ালে দাঁড়িয়ে আছ। সব দেখছ অথচ নিজে আড়ালে রয়েছ। নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখেই তুমি তোমার লেখার মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে আছ। বর্তমানে আত্মপ্রশস্তির ঢক্কা-নিনাদের মধ্যে তোমার attitude বড় মিষ্টি লাগল।

কত ঘটনা তোমার জীবনে ঘটেছে; কত ঘুরে বেড়িয়েছ, কত মানুষের সংস্পর্শে এসেছ। জগদ্‌বিখ্যাত মানুষ, অকিঞ্চিৎকর মানুষ; সকলের কথাই তুমি সমান চিত্তাকর্ষক করে বলেছ। 'যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই, তুমি তাহাদের কিছু ভোল নাই।' আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে আমাদের কথা যখন কেউ মনে রাখবে না, তখন তোমার এই বইয়ের মধ্যে আমরা অনেকে বেঁচে থাকব। তোমার বইখানা অমরত্বের উপাদানে তৈরি—

যা লিখলাম তা কেবল বন্ধুকৃত্য নয়, আমার অন্তরের অনুভব থেকে লিখলাম।..... যদি কেউ মনে করে শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল, আমি লজ্জিত হব না। তোমার মত শুঁড়ির জন্য আমি মাতাল হতে সর্বদাই প্রস্তুত।

আমার বার্ধক্য নিয়ে তোমার শেষ চিঠিতে ঠাট্টা করেছ, সেজন্যও আমি লজ্জিত নই। সত্যিই বুড়ো হয়েছি, মনের রস শুকিয়ে এসেছে। তবু বলব তুমি একটি উৎকৃষ্ট স্মৃতিদিগ্‌গজ।...আমার ভালবাসা নিও।

তোমার
শরদিন্দু

আমার 'স্মৃতিচিত্রণ' পুস্তকে শরদিন্দু সম্পর্কে অনেকখানি লেখা ছিল, তাই 'শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল' কথাটির আমদানি। শরদিন্দুর রচনার মধ্য থেকে পূর্বের স্বতঃস্ফূর্ত কৌতুক কমে আসছে সে কথা বার বার বলেছে, কিন্তু বলেছে কৌতুকের ভিতর দিয়েই। যেমন—একটি রচনা পাঠিয়ে তার সঙ্গে লিখেছে—

পুনা ১৪।৮।৫৯

ভাই পরিমল,

অনেক চেষ্টা করেও নতুন ইয়ার্কি উদ্‌ভাবন করতে পারলাম না। যা পাঠাচ্ছি তাকেই ইয়ার্কি মনে করতে পার। ভালবাসা নিও।

তোমার শরদিন্দু

মিথিলা, বিজয়নগর পুনা-২, থেকে ২৬।৭।৫৮ তারিখে শরদিন্দু আমাকে যে চিঠিখানা লিখেছিল (পূর্ব চিঠিখানার এক মাস আগে) তার অংশবিশেষ এই—

ভাই পরিমল,

কলকাতা থেকে চলে আসার আগে ইচ্ছে ছিল তোমার সঙ্গে আর একবার দেখা করব। কিন্তু মানুষ এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা সব সময় ফলবতী হয় না। মানুষ ভাবে এক, হয় আর। যা হোক এ জন্মে যদি দেখা নাও হয়, স্বর্গে নিশ্চিত দেখা হবে। কারণ আমরা দু'জনেই স্বর্গে যাব তাতে সন্দেহ নেই। এবং সেখানে যদি তুমি পত্রিকা বার কর আমি নিয়মিত তাতে লিখব।…

তোমার

শরদিন্দু

শরদিন্দুর এ কল্পনা সম্পূর্ণ সত্য নয়, কারণ সে স্বর্গে যাবে ঠিকই, কিন্তু আমার যাওয়া অসম্ভব। কারণ আমার গন্তব্য নরক। অতএব সেখান থেকে পত্রিকা বার করলে (ইহলোকেও যত পত্রিকা বার হয়, সেও নরক থেকেই ধরে নেওয়া যায়) আমি শরদিন্দুর লেখা পাব না। পার্থিব নরকে পেয়েছি, কারণ দু'জনেই এখানকার বাসিন্দা।

আমি যে স্বর্গের পাসপোর্ট পাব না, এ বিষয়ে মনে মনে অনেক কাল ধরেই একটা ধারণা পোষণ করে আসছি। এবং 'স্বর্গ-নরক-কথা' নামে একটি রচনাতে সব কথা খুলেই বলেছিলাম। রচনাটি বেরিয়েছিল লীলা রায় সম্পাদিত 'জয়শ্রী' পূজা সংখ্যায়, ১৯৬২ সনে। তার একস্থানে আছে—

"আমাদের পরিচিত আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সবাই মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গে যাচ্ছেন। অথচ আমার নিশ্চিত বিশ্বাস আমি নিজে মৃত্যুর পরে আমাদের শাস্ত্রের বিধি অনুযায়ী নরকে যাব। কিন্তু মৃত্যুর পর সবাই বলবে লোকটি স্বর্গে গিয়েছে। লেখা হবে স্বর্গগত পরিমল গোস্বামী। লেখা উচিত নরকগত। …যাঁদের সাহস আছে তাঁরা আমাকে অনুসরণ করতে পারেন।"

শরদিন্দুর ধারণা তার সঙ্গে আমিও স্বর্গে যাব। তার এ ধারণার সঙ্গে আমার ধারণার মিল নেই, সেই কথাই বলছিলাম। তবে স্বর্গে আমরা কেন যাব, তার একটা কারণ শরদিন্দু তার ঐ চিঠি লেখার ২২ বছর আগে একটি ব্যঙ্গ কবিতায় তার আভাস দিয়ে গেছে। কবিতাটির নাম 'পুণ্যফল'। দীর্ঘ কবিতা (আমার সম্পাদন কালে) শনিবারের চিঠির ফাল্গুন-১৩৪২ সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। কয়েকটি স্তবক এখানে উদ্ধৃত করি। মনে রাখতে হবে সেটি ইংরেজী ১৯৩৬ সন, ইংরেজ রাজত্ব চলছে তখন। স্বর্গে যাবার উপযুক্ত হতে আমরা কি জাতীয় পুণ্য অর্জন করেছি তা এতে বলা হয়েছে।

কৃচ্ছ্রব্রতে পুণ্য যদি বাড়ে
মোদের তবে কে বলে মহাপাপী ?
মোদের মত বলো ত কার ঘাড়ে
চেপেছে বোঝা বিন্ধ্যাচল ছাপি ?
কোথায় আছে এমনতর গাধা
বস্তা এত বয়েছে গাদা গাদা ?
এসেছে মগ মরাঠী নানা জাতি
ভেঙেছে দাঁত, মেরেছে ঘুষি নাকে,
পাঠান এসে মারিয়া পেটে লাথি
কর্ণ দুটি মলেছে পাকে পাকে।
মোগলদাদা হাসিয়া ফিকি ফিকি
কাটিয়া নিল সাবেক যত টিকি।
ইংরেজেরে বলিতে নারি কিছু
সাগরপারী সাহেব জাতি শাদা
(ফিরিছে সদা পুলিস পিছু পিছু
বলিয়া কিছু কাজ কি বল দাদা !)
তাহারা শুধু উঠিয়া বসি ঘাড়ে
মনের সুখে চরণ দুটি নাড়ে।
মোদ্দা কথা পুণ্য ছিল জমা
কুতুবশাহী মিনার সম উঁচা,
তাহার তলে মূর্তিমান ক্ষমা
সুখেই আছি নর্দমারি ছুঁচা।
পুণ্যভারে চ্যাপ্‌টা হয়ে তবু
ধৈর্য মোরা হারাইনি কো কভু।
কদলীপাতে খেয়েছি কচুপোড়া
অন্যে যবে মেরেছে ননী-ছানা
ন্যাকড়া দিয়ে ঢেকেছি তনু-খোড়া
পড়শী সবে পরেছে সোনাদানা।
নিতম্বেতে বুটের দাগা লাগে
হেসেছি তবু প্রভুর অনুরাগে।

ঘাপটি মেরে রয়েছি আপাততঃ
মুখটি বুজে স্বর্গপানে চেয়ে ;
লাগাও জুতা কোঁৎকা লাথি যত
একটা কথা বলিব না তা খেয়ে।
এখন শুধু করিয়া যাব ক্ষমা
পুণ্যফল করিব খালি জমা।

এমন পুণ্য জমা হতে থাকলে স্বর্গে যাওয়া কে আটকায়? ১৯৭০ সনের জুলাই কি অগস্ট মাসে রেডিওতে তার কণ্ঠস্বর শুনেছি,—সে স্বরে জীবন শেষ হয়ে আসার ধ্বনি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, বহু কষ্টে এক একটা কথা উচ্চারণ করছিল। ১৯৭০ সনের ২২ শে সেপটেম্বর সেই রেডিওতে শুনলাম শরদিন্দুর মৃত্যুসংবাদ।

সে এখন আমাদের কাছে স্মৃতিমাত্র, এবং এই পরিণতি, জন্ম এবং মৃত্যু—এও প্রাকৃতিক অমোঘ বিধানের পুনরাবৃত্তি মাত্র। সে তার কাজ ঘড়ি ধরে চালিয়ে যাবে, এ জিনিস আমাদের সমালোচনার বাইরে।



নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ফোটো : পরিমল গোস্বামী, ১৯৫০

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

শরদিন্দুর মৃত্যুর কথা লিখতে লিখতে আর এক মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটল নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের—গত ৮ই নভেম্বর ১৯৭০, রবিবার সন্ধ্যায়। এমন জীবন্ত মানুষটি হঠাৎ নেই শুনেই ধাক্কা লেগেছিল। শরদিন্দুর মৃত্যু সংবাদেও এমনি মন বিচলিত হয়ে উঠেছিল। অথচ একদিন ঠিক এর বিপরিতটাই সত্য ছিল। মৃত্যুকে সহজভাবে নেওয়ার জোর ছিল মনে, আশ্চর্য রকমের।

ছয় সাত বছর নারায়ণের সঙ্গে দেখা নেই। কিন্তু তবু সে যে আছে, এই বোধ মনের যে স্তরেই থাক তাতে খুব বিচ্ছেদ বোধ হয়নি।—এতদিন দেখা না হওয়ার বহু যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল। যাই হোক, তার সঙ্গে আমি শেষ কথা বলেছি টেলিফোনে—১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ সোমবার। এখন থেকে প্রায় দু বছর আগে। আমি এই সময়ে ব্যঙ্গ বিষয়ে একখানা বই (যা ১৯৬৯ সনে 'আধুনিক ব্যঙ্গ পরিচয়' নামে প্রকাশিত) লেখা আরম্ভ করছিলাম। নারায়ণের কাছে আমার জিজ্ঞাস্য ছিল রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে যে কবি-গানটি রচিত হয়েছিল, সেই গানের রচয়িতার নাম জানা গেছে কিনা। রচয়িতার নাম, সে বলল, সেও জানে না। কাজেই বিনা নামেই সেটি আমার বইতে উদ্ধৃত করতে হল। স্বয়ং নারায়ণ না জানলে আর কে জানাবে? বিশেষজ্ঞ বিশেষাজ্ঞকে সন্তুষ্ট করতে পারল না।

মৃত্যুর কয়েক দিন পরেই, সে কি করে লেখক হল সে বিষয়ে তার কথিকার রেকর্ডখানি রেডিওতে শুনছিলাম। সেই পরিচিত মধুর কণ্ঠ, সেই পরিচিত ললিত কথনভঙ্গি। (এই পর্যায়ে আমারও একটি কথিকা রেকর্ড করা আছে, মৃত্যুর পরে সেটি পুনঃপ্রচারের জন্য আকাশবাণীকে স্মরণ করিয়ে দেব কি ভূত হওয়ার পরে?)

নারায়ণ যে কি পরিমাণ সর্বজনপ্রিয় ছিল তা তার বইয়ের সংস্করণ দেখে নয়, তার মৃত্যুর পরে তার জন্য শতশত ক্রন্দনরতদের ভিড় দেখে। সত্যই মানুষ হিসাবে সে ছিল বেশি প্রিয়।

আমি যুগান্তরের ম্যাগাজিন সেকশনের সম্পাদন আরম্ভ করি ১৯৪৫ মার্চ থেকে। তার অনেক আগেই নারায়ণের সঙ্গে আমার পরিচয়। তারপর লেখক-সম্পাদক সম্পর্ক তো স্বভাবতই গড়ে উঠল। সে প্রায় আসত আমার

কাছে যুগান্তর দপ্তরে। ১৯৫২তে আমার খেয়াল হল একটা ধারাবাহিক ফীচার আরম্ভ করা যাক "বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না" এই নামে। যতদূর মনে হয় নারায়ণকে দিয়েই পর্যায়টি শুরু করি। সে একদিন আমার কাছে এলে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম অলৌকিক মনে হয় এমন কোনো ঘটনা ঘটেছে তোমার জীবনে? সে বলল, না। তবে অন্যের মুখে গল্প শুনেছি।

পরপর দুটো শোনা-গল্প সে বলল। আমি বললাম, এদুটি অবিলম্বে লিখে ফেল এবং আমাকে দাও। গল্প সে এমন মধুর ভঙ্গিতে বলেছিল যে টেপ প্রচলিত থাকলে তাতে তা রেকর্ড করে নিলেই সম্পূর্ণ দুটি গল্প হত। সরস গল্প মুখে বলত গল্পের ভঙ্গিতেই। একটি গল্পের নাম দিয়েছিল মীডিয়াম, অন্যটির নাম মনে নেই এখন। তার একখানি চিঠি উদ্ধৃত করছি এখানে।

লুই জুবিলি স্যানিটারিয়াম
দার্জিলিং, রুম নাম্বার ৯
৬। ৬। ৫১

পরিমলদা,

জলপাইগুড়ি থেকে দিনবারো আগে দার্জিলিং পৌঁছেছি। আর দিন তিনেক থাকব। এমন বিশৃঙ্খলভাবে এসেছি যে আপনাকে খবর দেওয়া যায়নি। তা ছাড়া এখন দার্জিলিংএ বিশ্রী বৃষ্টি নেমেছে, এলেও আপনার ভাল লাগত না।

আমরা এখান থেকে আবার জলপাইগুড়ি হয়ে কিছুদিন পরে কলকাতা যাব। আশা করি কুশলে আছেন। প্রণাম জানবেন।

ইতি স্নেহার্থী
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

কথায় কথায় বলেছিলাম দার্জিলিং যাও তো খবর দিও—আমিও যাব। দার্জিলিংএর নাম শুনলেই যেতে ইচ্ছা করে। কিন্তু জুনমাসে! অসম্ভব ব্যাপার। এ সময় সবাই সেখান থেকে পালায়। কিন্তু নারায়ণের সঙ্গে এই বছরেই একদিন প্রায় দার্জিলিং যাত্রা ঘটে গেল। একদিন ভয়ানক বৃষ্টি, বর্ষার প্রবল ঠাণ্ডা পূব হাওয়া, এমনি অবস্থায় বৃষ্টি কমলে নারায়ণ আর আমি যুগান্তর অফিস থেকে গিরিশ অ্যাভিনিউতে বাসে উঠতে রওনা হয়েছি। মাত্র তিন মিনিটের পথ। আমার গায়ে অতি পাতলা পাঞ্জাবি। সে

দিনের প্রবল ঠাণ্ডা হাওয়া আমার পক্ষে হল মারাত্মক। এই পোশাকে শীতের রাত্রে দার্জিলিংএর পথে হাঁটলে যেমন হত তেমনি হল। অন্যের এমন অবস্থায় প্রকৃতিদত্ত রক্ষা ব্যবস্থা থাকে। তাদের চামড়ার নিচেই কঙ্কাল। তাই সেদিন পথে বেরিয়ে বড়ই বিপন্ন হয়েছিলাম। আমার সকল দেহ কাঁপতে আরম্ভ করল। ভিজে ঠাণ্ডা হাওয়ার ক্ষমতা ছিল অব্যবহিত। মনে হচ্ছিল সেই মুহূর্তে হাড়সুদ্ধ জমে যাচ্ছে, হাঁটবার ক্ষমতা লোপ পেয়ে যাচ্ছে। তৃতীয় নেত্রের মতো কারো তৃতীয় কর্ণ থাকলে সে সময় আমার দেহাভ্যন্তরস্থ অস্থি-কম্পনজাত শব্দ সে শুনতে পেত। তাপজনন কেন্দ্র দেহযন্ত্র চালিয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল কিছু তাপ উৎপাদনেব. অতএব তার কোনো অপরাধ নেই।

এমন অবস্থা আমার আরো দু একবার হয়েছে ইতিপূর্বে। দেহকে তখন নিয়ন্ত্রণ করাব ক্ষমতা অক্ষম তাপজনন কেন্দ্রের হাতে চলে যায। তার নিজের কোনো ইচ্ছা অনিচ্ছা নেই, সবটাকেই বিফ্লেক্স অ্যাকশন। সঙ্গে নারায়ণ, সে আমার অবস্থা দেখে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। এমনি অবস্থায় নারায়ণ আমাকে তার দেহ দিয়ে হাওযাব বেগকে আড়াল কবে আমাকে বাসে পৌঁছে দিল। দুজনে ভিতবে বসে তাবপর নিশ্চিন্ত। কাবণ নারায়ণও আমাব অবস্থা দেখি বিস্মিত। বাসে বসবাব পরেই কিন্তু আমার দেহকম্প থেমে গিয়েছিল। ১৯১৪ সনেব কথা। আজও সে কথা ভাবতে ভয় হয়। আব নারায়ণের বুদ্ধি কৌশলে সেদিন যে আমি বক্ষা পেয়েছিলাম সে কথাটা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি।

গত ১৯৬৮ সনে (২৫শে বৈশাখ ১৩৭৫) সাপ্তাহিক বসুমতীর পক্ষ থেকে নাবায়ণ ও আমাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন কবা হবে; এই প্রস্তাব প্রথম টেলিফোন মারফৎ পেলাম সাপ্তাহিক বসুমতীব সম্পাদিকা শ্রীমতী জয়ন্তী সেনেব কাছ থেকে। এই সংবর্ধনা গ্রহণে আমি রাজি হইনি। বলেছিলাম এক নারায়ণ-কেই দেওয়া হোক। তাই হয়েছিল। সংবর্ধনায় আমার যাওয়াও ঘটল না; অনিবার্য কারণে। কিন্তু পবে আমি এ বিষয়ে কাগজে প্রকাশিত সামান্য খবরের উপর নির্ভর করে একটি কাল্পনিক সংবর্ধনা গল্প লিখেছিলাম, এবং সেটি কয়েক মাস পরে সাপ্তাহিক বসুমতীর পূজা সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল—নাম 'ভিন্ন চোখে'।

এই গল্পে অচিন্ত্য, প্রেমেন, মনোজ, লীলা মজুমদার প্রভৃতি যারা ঐ সভায় উপস্থিত ছিল, তাদের সবারই মুখে একটি করে কাল্পনিক বক্তৃতা বসিয়ে

দিয়েছিলাম। ঘটনাও প্রায় আজগুবি। ছাপা হলে মনোজ প্রথমে টেলিফোন করে জানায় তার খুব ভাল লেগেছে। একদিন, পূজোর ৮ দিন আগে ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৮, লীলা মজুমদার ও জয়ন্তী সেন আমাদের বাড়িতে এসেছিল। লীলাকে গল্পটি পড়ে শুনিয়ে দিলাম। সে সেই সভায় মোটেই কিছু বলেনি। কিন্তু আমার গল্পে তার বক্তৃতা শুনে গেল।

জয়ন্তী সেন নারায়ণের উদ্দেশে যে অভিভাষণ পড়েছিল সেখানা আমার কাছে ছিল, তার গোড়াতে ছিল এই কথাগুলি—

"যেমন জহুরী ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নুড়ি-সমুদ্রের ভিতর থেকে খুঁজে আনেন মণিমুক্তা, তেমনি সফলকাম সংবাদসাহিত্যিক রোজকার খবরের কাগজের ঠাসবুনুনি সংবাদসাগরের মধ্য থেকে অনায়াসদক্ষতায় বার করে নেন এমন এক সংবাদ, যাকে নিয়ে মুক্তার মত একটি রসরচনা সৃষ্টি করতে পারা যায়।"..... ...

এই অংশটি, আর অনুষ্ঠানের যে খবর বেরিয়েছিল, তা থেকে সামান্য দুচারটি কথা সম্বল করে আমার কাল্পনিক গল্পটি রচিত। আমার গল্পের গোড়াতেই আছে—

"সাপ্তাহিক বসুমতীর পক্ষ থেকে সর্বজনপ্রিয় লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হবে শুনে খুব আনন্দ হয়েছিল। বাংলা দেশের এই একমাত্র কথাশিল্পী যাঁর কোনো শত্রু নেই, সেজন্য কোনো লেখকের ঈর্ষা নেই...তাঁর প্রতি। এমন আর দ্বিতীয় দেখা যায় না।"

তারপর 'সংবাদ সাগর' থেকে এক টুকরো সংবাদ এনে তা কি করে মুক্তায় পরিণত করে নারায়ণ, তার দৃশ্যটি আমার গল্পে এইভাবে অবতারণা করা হয়েছিল—

"সম্পাদিকা বলছেন—তিনি [নারায়ণ] তা [মুক্তা] কি ভাবে গড়ে তোলেন তা সবাইকে দেখাবার জন্য আমরা একটি বিশেষ আয়োজন করেছি। একটি বিরাট জলাধার তৈরি করাতে হয়েছে এজন্য—একটি কাঁচের জলাধার।

"সম্পাদিকার কথা শেষ হতে না হতে তাঁর পিছন দিক থেকে বড় পর্দাটা সরে গেল, তিনিও সরে গেলেন, দেখা গেল একটি প্রকাণ্ড জলাধার ছাদ সমান উঁচু। সম্পাদিকা একপাশে দাঁড়িয়ে বললেন, "এটাই সেই সংবাদ সাগর।"...

অতঃপর নারায়ণ সেই জলে ডুবে একটুকরো পূর্বলিখিত সংবাদ তুলে এনে সবার সামনে কি করে তা থেকে মুক্তা গড়ল, তার প্রক্রিয়া দেখানো হল।

এরপর অনেক কাহিনী। আগাগোড়াই কৌতুক। নারায়ণের প্রতি যে অকৃত্রিম প্রীতি পোষণ করেছি তার পরিচয় এই গল্পটির মধ্যে নিশ্চয় কিছু পাওয়া যাবে।

মৃত্যুর কথা ভেবেছি অনেক দিন থেকেই এবং যতই ভেবেছি ততই মনে হয়েছে এটি অত্যন্ত স্বাভাবিক একটি ঘটনা। এর মধ্যে যদি কিছু বেদনা থাকে তবে তা যারা বেঁচে রইল তাদের। এই সেন্‌টিমেণ্টটা শুধু মানুষের মনেই দেওয়া হয়েছে, এবং জীবন জিজ্ঞাসা ও মৃত্যু জিজ্ঞাসা থেকে আরম্ভ করে যাবতীয় জিজ্ঞাসা শুধু মানুষেরই। এটা যে তাকে কেন দেওয়া হয়েছে বোঝা যায় না। বিচারবুদ্ধিহীন অন্য প্রাণীর জিজ্ঞাসাহীন জীবন খুব যে খারাপ তা মনে হয় না। কীটপতঙ্গ থেকে মানুষ পর্যন্ত সবারই জন্য অধিকাংশ প্রাকৃতিক নিয়ম এক। মানবেতরের মধ্যে দেখা যায় সন্তান পালনের দায়িত্ব আছে, কিন্তু নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে দেবার পর আর কোনো দায়িত্ব নেই। স্বজাতি চোখের সামনে মারা গেলেও ভ্রূক্ষেপ করে না, বুঝতেই পারে না, মৃত্যু কি। পূজোয় পাঁঠাবলিতে একটির মুণ্ডচ্ছেদ হল, পাশে দাঁড়িয়ে অন্য পাঁঠা তা দেখল, কিন্তু সম্পূর্ণ উদাসীন দৃষ্টিতে। বুঝতেই পারল না, কি হল। শুধু একটি কাক মারা গেলে পাড়ার কাকেরা মিলে কিছুক্ষণ হল্লা করে। মনে হয় একটি কাকের মৃত্যু দেখে অন্য কাকেরা ভয় পেয়ে ওরকম করে। সমাজ চেতনা নয় বলেই মনে হয়। মৃত্যু-জিজ্ঞাসা এদের নেই। মানুষের মনে মৃত্যু-জিজ্ঞাসা চিরদিনের।

অথচ মানুষের মৃত্যুর পর আত্মা শূন্যে বেরিয়ে গিয়ে ঘুরে বেড়ায় এমন ধারণা অনেকের আছে, আমার নেই। মৃত্যু কি, তা নিয়ে ১৯৫৩ সনে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম মাসিক বসুমতীতে। তাতে তৎকালীন আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় জীবন ও মৃত্যু নিয়ে যে সব গবেষণা হয়েছে সেই বিষয়ে আলোচনা ছিল। জে. বি. এস. হলডেন এ বিষয়ে যা বলেছেন, আমার নিজের ধারণার সঙ্গে তার মিল ছিল। আমার সেই মাসিক বসুমতীর প্রবন্ধ পড়ে ডাক্তার অশোককুমার বাগচী হ্যারিংগের স্ট্রাসে ২৬।৫ (অস্ট্রিয়া) থেকে আমাকে জানিয়েছিল আপনার "জাগিল কি ঘুমালো সে" লেখাটি অতি উপভোগ্য হয়েছে। তবে এটা সত্যি যে, এই স্ট্যাণ্ডার্ডের লেখার সমঝদার আমাদের পাঠক সমাজে অতি নগণ্য।...

কিন্তু তবু কলকাতার একজন সমজদার পাঠকের অন্তত একখানা চিঠি পাই এই রকম—

মিত্র অ্যাণ্ড ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২
৭।১২।৫৩

পরিমলদা,

এ সংখ্যার মাসিক বসুমতীতে আপনার লেখা পড়ে বিস্মিত হয়েছি। এ ধরনের লেখা আপনি লেখেন বলে জানতুম না ত! পড়বার পর তিন-চার ঘণ্টা আর কোনদিকে মন দিতে পারি না এমন অবস্থা। আমার স্ত্রীও অভিভূত। আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম ও অভিনন্দন নেবেন।

ইতি—
গজেন

গজেন্দ্রকুমার মিত্র, যাঁর গল্প উপন্যাসে অধিকাংশই জীবন্ত মানুষ নিয়ে কারবার, সেই মানুষ মারা গেলে কি তার পরিণতি, তা নিয়ে এই বোধহয় প্রথম তিনচার ঘণ্টা ভেবেছিলেন।

"জাগিল কি ঘুমাল সে" কথাটি রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত "মৃত্যুর পরে" নামক কবিতা থেকে নেওয়া। পুরো লাইনটি—"জাগিল কি ঘুমাল সে কে দেবে উত্তর।" মৃত্যু বিষয়ে এমন অপরূপ জিজ্ঞাসা আর কোনো কবির—মনে বোধহয় এমন ভাবে কখনো জাগেনি। মৃত্যুর পরে মানুষের কি পরিণাম, সে বিষয়ে এমন অনিশ্চয়তার দ্বন্দ্ব, মনের এমন দ্বিধাজড়িত বিপুল বেদনাভরা প্রশ্ন, এমন অশ্রুজড়িত ভাষায় দ্বিতীয় আর কোনো কবির মনে জাগতে পারে এমন কল্পনাই করা যায় না। এ কবিতাটি আমার মনকে আচ্ছন্ন করে আছে, তাই মৃত্যুবিষয়ে নীরস রচনা লিখতে বসেও এর নাম দিয়েছিলাম ঐ কবিতার লাইন থেকেই।

মাসিক বসুমতীতে আমার রচনাটি বেশ বড় ছিল। তার শেষ দিকের কিছু কিছু এখানে উদ্ধৃত করছি—

…"দেহের সমস্ত রক্ত ঢেলে ফেলে নতুন রক্তের সাহায্যে যে মানুষকে নবজীবন দান করা হচ্ছে, সে আর গর্ব করে বলতে পারবে না যে, তার ধমনীতে পূর্বপুরুষের রক্ত প্রবাহিত।

"এই সব পরীক্ষার সাহায্যে দেহাতীত আত্মার সন্ধানও করা হচ্ছে, কিন্তু তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বরঞ্চ বিপরীতটারই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এই পথে চলে ভবিষ্যতে কখনো যদি নিশ্চিত প্রমাণ হয় দেহবিচ্ছিন্ন আত্মা নেই, তা হলে মানবসমাজের খুব ক্ষতি হবে মনে হয় না।...

"উপাদান রহস্য সে জেনেছে, উপকরণ তার হাতের মুঠোয়, এখন গড়বার মন্ত্রটি জানতে পারলেই তার সাধনা সার্থক হবে। আরো একটি বড় সত্য সে তখন প্রমাণ করতে পারবে—প্রাণীকুলের ধারাবাহিকতা যতদিন অব্যাহত থাকবে ততদিন তার মৃত্যু নেই। সে নিশ্চিত প্রমাণ করবে এককোষ প্রাণী যেমন দুভাগে ভাগ হয়, মরে না; বহু-কোষ প্রাণী তেমনি আপন উত্তর-পুরুষের মধ্যে নিজেকে ভাগ করে বেঁচে থাকে, মরে না।" (১৯৫৩)

তা হলে ভূতের স্থান এর মধ্যে কোথায় বোঝা যাচ্ছে না। ব্যক্তি-মানুষের মৃত্যু হলেও মানবতা নামক যে সমষ্টি আছে তা তো ঠিকই আছে। ব্যক্তি-মানুষ উত্তর-পুরুষের মধ্যে নিজেকে ভাগ করে মানবতার স্রোত অব্যাহত রাখছে। গাছেরাও তাই করছে, কীটপতঙ্গও তাই করছে। সুন্দরবনের দক্ষিণ রায় মহাশয়রাও তাই করছেন। শুধু মানুষের 'আত্মা' বেরিয়ে গিয়ে শূন্যে ঘুরে বেড়াবে এটি প্রমাণ করা চলে না, শুধু বিশ্বাস করা চলে।

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আর এক পরিচিত, আমার প্রিয় এবং বিশ্বপ্রিয়, জাদুকরের মৃত্যুসংবাদ এলো এই অধ্যায় লেখার তিন দিন আগে (৬ই জানুয়ারি ১৯৭১)। প্রতুলচন্দ্র সরকারের সঙ্গে ১৯৩৮।৩৯ সনে প্রথম পরিচয়। আমি তখন আর্ট প্রেসে (ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট) সচিত্র ভারত নামক সাপ্তাহিকের সম্পাদক। প্রচুর ফোটোগ্রাফসহ আর্টপেপারে ছাপা হত সেই কাগজ।

একদিন অপরাহ্ণে প্রতুলচন্দ্র এসে হাজির। তরুণ যুবক বয়স বোধহয় তখন তার ২৪ বছর। তার প্রস্তাব : তার ম্যাজিক প্রদর্শনী হবে স্টেজে, তার ছবি সহ একটু পরিচয় লিখে দিলে তার উপকার হয়। সচিত্র ভারতের আকার ছিল তখন প্রায় ১২ ইঞ্চি × ৯ ইঞ্চি। দাম মাত্র চার পয়সা। সচিত্রতাই ছিল তার প্রধান আর্কষণ। অতএব পি. সি. সরকারের পরিচয় ফোটোগ্রাফসহ ছাপার কোনো অসুবিধা তো ছিলই না, উপরন্তু প্রার্থনীয় ছিল।

কিন্তু আমি বললাম, আমি তো তোমার ম্যাজিক দেখিনি, একটা কিছু দেখাও, তাহলে লিখতে সুবিধা হবে। নমুনা দেখে লেখায় জোর পাওয়া যায় বেশি।

কি দেখাব ? বলে টেবিল থেকে একটি পেপার ওয়েট (পিতলের) হাতে নিয়ে সেটা উড়িয়ে দিল। বললাম, যথেষ্ট। এবারে লিখব ভাল করে। প্রতুলচন্দ্র ছিল আমার চেয়ে মাত্র ১৪ বছরের ছোট।

আমি তার সম্পর্কে যেটুকু লিখেছিলাম তা তার ভীষণ পছন্দ হয়েছিল, এবং মুখস্থ করে রেখেছিল। অনেকদিন পরে দেখা, তখনও সে সেটি আমাকে শুনিয়ে দিল।

আমি যা লিখেছিলাম তা এখন মনে নেই, তবে মূল বক্তব্যটা মনে আছে। লিখেছিলাম, পৃথিবীর মধ্যে ম্যাজিশিয়ানই একমাত্র প্রতারক যাঁকে আমরা ভালবাসি। ম্যাজিশিয়ান একই সঙ্গে আমাদের মন এবং পকেট আর্কষণ করে থাকেন, এবং যত করেন, আমরা তত তাঁকে আদর করি। পি. সি. সরকার এই জাতীয় একজন প্রতারক।

ঠিক কথাগুলি মনে নেই। যাই হোক প্রতুলচন্দ্র তখন থেকে আমাকে মনে রেখেছে। বিলেতে গিয়ে তার রঙীন ফোটোগ্রাফ ছাপা খামে Greetings from London (12-2-56) পাঠিয়েছে। এর আট বছর পর অ্যামেরিকা গিয়ে আমাকে একটা লেখাও পাঠিয়েছিল, এবং সে লেখার সঙ্গে যে চিঠিখানা ছিল সেখানাও উল্লেখযোগ্য।

C/o American Express
649, Fifth Avenue
New York. 22
24. 5. 64.

প্রিয় পরিমলবাবু,

আশা করি ভাল আছেন। সচিত্র ভারতের পর আর তেমন যোগাযোগ হয়নি। আজ একটা লেখা পাঠালুম—যুগান্তরে আপনার বিভাগে এটাই আমার প্রথম লেখা, দেখবেন যেন শেষ লেখা না হয়। পছন্দ না হলে ফেলে দেবেন না—অন্যের পছন্দ হতেও পারে--লোক পাঠিয়ে ফেরৎ নিয়ে আসবো। দু'জনে মুখ দেখা-দেখি হবে না,—চক্ষুলজ্জাও থাকবে না। হয়তো আর পরে দেখাদেখিও হবে না। প্রণাম নেবেন ইতি

বিনীত প্রতুল

এর ঠিক দশ বছর আগে একটা যোগাযোগ হবার সম্ভাবনা ঘটেছিল, কিন্তু হয়নি। একদিন হঠাৎ এই চিঠিখানা পেলাম।

P. C. SORCAR, Magician.
12/3A. Jamir Lane, Calcutta-19.
Phone Park 1505 Telegram Sorcar, Calcutta
13. 8. 54.

পরিমলবাবু,

আপনি আমার ম্যাজিক কখনও দেখেন নাই। এদিকে ফ্রী পাস একদম বন্ধ। বাধ্য হইয়া একটা টিকিট আপনার নিকট পাঠাইলাম! রবিবার ১৫-৮-৫৪ সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় (punctual) আরম্ভ, অনুগ্রহপূর্বক আপনি নিজে আসিবেন।

ইতি

প্রণত সরকার

নিউ এমপায়ার থিয়েটারের প্ল্যান আঁকা আসন নম্বর সম্বলিত খাম। আমার সীট নম্বরে দাগ দেওয়া, এবং খামের ভিতরের টিকিটে যে সব কথা লেখা ছিল, বাইরের খামেও সে সব লেখা। যেমন Your seat, Royal Circle E 24 ইত্যাদি।

আমি এর আগে (১৯১৫ থেকে) গণপতি চক্রবর্তী অনেকবার, ও সাহেব পাড়ায় বিদেশী ম্যাজেশিয়ানদের (মেয়েকে দ্বিখণ্ডিত করার দৃশ্য সমেত) অনেকবার দেখেছি। গণপতিবাবুর ম্যাজিকই তখন খুব ভাল লেগেছিল। তাই স্টেজে ম্যাজিক দেখার আর ইচ্ছা ছিল না। আমি টিকিট পাওয়া মাত্র প্রতুলচন্দ্রকে সেখানা ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, এবং লিখে জানিয়েছিলাম, টেবিলে বসে দু-একটা ভাল ম্যাজিক দেখতেই আমার ভাল লাগে, স্টেজে আর দেখতে চাই না।

এর পর প্রতুলচন্দ্র (১৯৬১ সম্ভবত), যুগান্তরে বিকেলে এলো আমার কাছে। তখন বেলা ৪ টে। ঘরে আরো অনেকে ছিল। আমাকে জিজ্ঞাসা করল, তাসের ম্যাজিক ভাল দেখেছেন কিছু? বললাম গণপতি চক্রবর্তী ছাড়া ভাল আর দেখিনি। প্রতুল বলল ওসব পুরানো, নতুন একটা দেখুন।

পকেট থেকে একসেট নতুন তাস বার করে চোখের সামনে একবার উলটো পিঠ একবার সোজা পিঠ মেলে ধরল, এবং জাপানী পাখার ভঙ্গিতে বিস্তার করতে করতে দেখা গেল, তাসগুলির দুদিকেই সম্পূর্ণ শাদা। আবার ঐ ভাবে ছড়াতে ছড়াতেই সব গুলি রঙ ও পিঠের দিকের সমস্ত নক্সা আগে যেমন তেমনি হয়ে গেল।. এত কাছে থেকে এমন একটি ম্যাজিক দেখানো যায়, এ ধারণা করতে পারিনি। খুব ভাল লেগেছিল খেলাটি। ঐ একটি-তেই খুশি হয়েছিলাম, আর দেখতে চাইনি। কাছে থেকে প্রতুলভ্রাতা অতুল সরকারও অনেকবার অনেক রকম খেলা দেখিয়েছে। তাছাড়া ম্যাজিক-পাগল অজিতকৃষ্ণ বসুর পরিচিত 'রয় দি মিষ্টিক'কেও সে কাছে এনেছিল দুদিন, এবং তাঁর ম্যাজিকও ঘরে বসে দেখেছি। আশু দের-খেলা ঘরে বসে দেখেছি ভাগলপুরে। অতুল সরকার অর্থাৎ এ. সি. সরকারের মুখে গীটার বাদ্যের ধ্বনি আমার খুব ভাল লেগেছিল।

পি. সি. সরকারের মৃত্যু সম্পূর্ণ অকালে। শীতকালে প্রায় ৪৫ ল্যাটিচুডে রুক্ষ পাহাড়ী দ্বীপ হোক্কাইডো—জাপানের সর্বোত্তর দ্বীপে যাওয়া,

স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের অধিকারী হলে কিছুই ক্ষতির কারণ ছিল না। কিন্তু হাইপারটেনশন বেশি ছিল এবং রিপোর্টে দেখা গেল— ব্লাডশুগারও খুব বেশি ছিল। এ সব জেনেশুনে শীতকালে এদিকে আসা নিতান্তই দুর্ভাগ্যের বিষয়।

পি. সি. সরকারের সঙ্গে যারা ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছে, তারা তার মৃত্যুতে মর্মাহত। আমি এমন দুজনের চিঠির অংশ উদ্ধৃত করছি।

প্রথমেই "যাদুকাহিনী"র লেখক অজিতকৃষ্ণ বসুর চিঠি। অজিতকৃষ্ণ (অ-কৃ-ব ছদ্মনামে বিশেষ পরিচিত) আশুতোষ কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক, কবি গল্প লেখক এবং যাদুবিদ্যার একজন বিশেষ ভক্ত। তার ব্যঙ্গ রচনাও বিশেষ শক্তিশালী। আমার 'আধুনিক ব্যঙ্গ পরিচয়' বইতে তার বিষয়ে একটি অধ্যায় লিখেছি। এমন লোক ম্যাজিক ভক্ত! ভক্ত বললে কম বলা হয়— বলা চলে ম্যাজিক-আসক্ত। অজিতকৃষ্ণ আমাকে লিখছে—

২১ রসা রোড ঈস্ট ফার্স্ট লেন
কলিকাতা ৩৩, ১৮।১।৭১

শ্রীচরণেষু

আপনার কার্ড পেলাম। পি. সি. সরকারের তিরোধানে আপনারই মতো আমিও মর্মাহত। এমন একটি আশ্চর্য মানুষ পৃথিবীর যাদুচর্চার ইতিহাসে আর একটিও নেই বলে আমার বিশ্বাস। ওঁর কথা বলে শেষ করা যায় না। আমার সঙ্গে ২৫ বছরের বন্ধুত্বের অবসান হয়ে গেল। পোপ লিখেছিলেন Proper study of mankind is Man। আমার স্টাডি ছিল পি. সি. সরকার। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁকে দেখেছি— স্টাডি করেছি। তুলনা নেই।……

ইতি অ-কৃ-ব

আর একখানা চিঠি—

কলিকাতা ৩৩
২৯।১।৭১

শ্রীচরণেষু

আপনার কার্ড পেলাম।…… লোকে সরকারকে শুধু বড় ম্যাজিশিয়ানই ভাবে, সেটা ভুল। ওঁর আসল ম্যাজিক ওঁর ব্যক্তিত্বে, চরিত্রের অনন্য বিশেষত্বে, ওঁর সাধনায়। সরকারের মৃত্যু আমার কাছে একটি

মর্মান্তিক আঘাত।……ওঁর একটা জীবনদর্শন ছিল, শিল্পী আর দার্শনিকের মন ছিল। জীবনে সাফল্য লাভের আশ্চর্য ফরমুলা ওঁর ছিল। সেইটেই তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে কাজে লাগিয়ে গেছেন।……

ইতি অ-কৃ-ব

পরবর্তী চিঠিখানা শ্রীমতী আরতি ভৌমিকের লেখা। আরতি সিনেমা অভিনয় জগতে অঞ্জনা ভৌমিক নামে খ্যাত। সে ১৯৬২ সালে পি. সি. সরকারের সঙ্গে রাশিয়ায় গিয়েছিল দলের একজন হয়ে। মোট পাঁচজন মেয়ে ছিল। এদের মধ্যে পুষ্প দাঁ এখন নিজেই পৃথকভাবে যাদুবিদ্যা দেখিয়ে থাকে—আরতি বলেছে। পি. সি. সরকার সম্বন্ধে আরতি এই চিঠিখানা আমাকে দিয়েছে আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে।

Tivoli Court Calcutta

৪।২।৭১

শ্রীচরণেষু

যাঁর বিষয়ে আপনি জানতে চেয়েছেন অল্প সময়ে এবং স্বল্প পরিসরে তাঁর সম্বন্ধে হয়ত বিশেষ কিছুই বলা সম্ভব হবে না। তবু তাঁকে ঘিরে অনেক স্মৃতির মধ্যে যেটুকু আজও বিস্মৃতিতে লুপ্ত হয়নি তা থেকেই কিছু বলতে ইচ্ছে হচ্ছে।

আমরা সবাই তাঁকে বলতুম 'দাদা'।

আমাদের সম্পর্ক ছিল একটা পরিবারের মত। যে পরিবারের অভিভাবক ছিলেন যাদুসম্রাট। বিদেশে গিয়েই তাঁকে আমি ঘনিষ্ঠভাবে জানবার সুযোগ পাই, যখন সেবার আমরা রাশিয়া সফরে গেলাম—সালটা বোধ হয় ১৯৬২।

'ইন্দ্রজাল'কে নিয়ে বিমান মস্কো বিমান বন্দরে নামল। পি. সি. সরকার রাশিয়ায় এসেছেন, চতুর্দিকে প্রেস ক্যামেরা, মুভি ক্যামেরা, টেলিভিশন, ফুলের মালা, ব্যুকে—হাততালি—এ এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতি। এর আগে আমি বিদেশে যাইনি। ওখানকার মানুষ অচেনা, ভাষা বুঝিনা—আকারে প্রকারে ভারতীয় নারীদের সম্বন্ধে ওদেশের মেয়েদের ঔৎসুক্য দেখে অবাক হলাম। কেউ জিজ্ঞাসা করল কপালে টিপ কেন? কিভাবে শাড়ী পরেছি—শাড়ীর সঙ্গে গয়না কেন? রাশিয়ান ভাষা জানা নেই যেটুকু জানা আছে ইংরিজি। তাই মিডিয়াম করে কাজ চালিয়ে দিলাম।

হোটেলে এলাম। 'হোটেল ইউক্রেনা'। ২৯ তলা হোটেল, তার ভিতর-বাহির দেখে আমরা হতবাক।

বাড়ী-ঘরদোর ছেড়ে এতদূর এসে একটু কেন, আমরা বেশ খানিকটা যে নার্ভাস হইনি তা নয়, তবুও বিদেশকে সহজেই দাদা বাড়ী-ঘরদোর করে ফেললেন। আমাদের সুবিধে-অসুবিধে সবকিছু ঐ একটি লোকই তদারক করছেন তখন। বিরাট গ্রুপ, সুতরাং হাজারো ঝক্কি। 'কার সর্দি' 'মাফলার জড়াও'—'কোথায় যাইবা, বেশীদূর যাওনের কাজ নাই'—সেই মৈমনসিংহি ভাষায় কড়া নির্দেশ। দাদার কথা অমান্যি করে কার সাধ্যি। অবশ্য আমিও মৈমনসিংহের মেয়ে, দাদার একই গ্রামের, কাজেই এ ব্যাপারে দাদার সঙ্গে আমার একটা আত্মিক মধুর সম্পর্কও ছিল। ব্যক্তিগত সমবেদনা ও অনুপ্রেরণায় সহযোগী কর্মীদের কাছে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কাছের মানুষ।

যারা দাদাকে কাছ থেকে দেখেন নি, তাঁর কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা করা একেবারেই সম্ভব নয়। প্রতিটি ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তালিম দেওয়ার পর দাদা যখন স্টেজে উঠতেন তখন তিনি অন্য মানুষ। সম্পূর্ণ আলাদা ধাতুতে গড়া।

স্টেজে আমরা কাজ ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারতাম না। দাদাও তাই—সর্বক্ষণ চোখের মণি ঘুরছে এদিক-ওদিক, প্রতিটি ব্যাপারই ঘড়ির কাঁটায়—মিনিট, সেকেণ্ড মাপা।

বিরাট থিয়েটার। হাজার হাজার দর্শক একসঙ্গে বসে খেলা দেখছে। গম্‌গম্ করছে সমস্ত হল। যাদু সম্রাট স্টেজে এলেই হাততালির ঝড় বয়ে যায়। প্রতিটি খেলার শেষেই হাততালি পড়ত অসম্ভব ভাবে। কোন সুন্দর জিনিষকে এত সুন্দর করে স্বীকৃতি ও সম্মান দিতে আমি আর কোথাও দেখিনি। আর উনিও তেমনি' প্রতি মুহূর্তেই দর্শকদের আনন্দের প্লাবনে ভাসিয়ে দিতেন টুকরো রসিকতা, রঙ্গ আর ব্যঙ্গে। দর্শকরা বুঝতেই পারতেন না কোথা দিয়ে সময় গড়িয়ে যাচ্ছে।

রাশিয়াতে দাদার প্রায় সব খেলাগুলোই দর্শকদের ভাল লেগেছিল। তবুও তার মধ্যে কয়েকটি খেলা খুবই চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। যেমন একটি খেলা পুরো অন্ধকারের মধ্যে করা হ'ত। খেলা শুরু হবার আগে উনি দর্শকদের কোনরকম আলো না জ্বালাতে অনুরোধ করে দিতেন। খেলার

মধ্যে নানারকম কংকাল-ভূত-প্রেতের নাচ, শূন্যে প্রজাপতি, ফুল, গেলাস ঝোলান, কাটা হাতের ঘণ্টা বাজান এসব হ'ত। সমস্ত খেলাটাই পি. সি. সরকার নিয়ন্ত্রণ করতেন। এবং খেলার ঠিক শেষ মুহূর্তে দর্শকদের ঠিক পেছনের সারি থেকে শোনা যেত—Ladies and Gentlemen—here I am! আলো জ্বলে উঠত।—দেখা যেত মঞ্চের সবকিছু অদৃশ্য এবং যাদু-সম্রাট দর্শকদের মধ্য থেকে হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসছেন।

দ্বিতীয় খেলা যেটা এদেশেও দর্শকদের কাছে খুব প্রিয় হয়েছিল সেটা ছিল The X'ray Eyes. চোখে তিন-চার রকম প্যাডে রুমাল বেঁধে উনি ব্ল্যাকবোর্ডে খড়ি দিয়ে দর্শকদের নানারকম প্রশ্নের উত্তর লিখতেন। যে কোন ভাষায় লেখা প্রশ্ন, অঙ্ক, কৌতুক, ছবি, ব্যঙ্গ সব কিছুরই উত্তর দিয়ে উনি দর্শকদের খুসী করতে পারতেন। সবচেয়ে বড় কথা, চোখে যে মাখা ময়দা ও ব্যাণ্ডেজ থাকত সেটা দর্শকরাই দাদার চোখে নিজের হাতে লাগিয়ে দিতেন।

তৃতীয় খেলাটি ছিল পি. সি. সরকারের বিখ্যাত খেলা, যার জন্য উনি পৃথিবী বিখ্যাত হয়েছিলেন। এই খেলার সময় দাদার চেহারাই পাল্টে যেত। উনি উইংসের পাশ থেকে ঠাকুরকে নমস্কার করে স্টেজে ঢুকতেন। আবহ সঙ্গীতে তখন মৃদু এবং গম্ভীর লয়ের বাজনা বাজানো হ'ত।

খেলাটি ছিল বৈদ্যুতিক ঘূর্ণায়মান করাত দিয়ে তরুণী দ্বিখণ্ডিত করা।

সুইচ অন্ করা হ'লে উনি মেয়েটিকে হিপনোটাইজ করে শুইয়ে দিতেন। এবং করাত দিয়ে পেট কেটে ধড় আর মাথা আলাদা করে দেখিয়ে দিতেন। খেলা চলাকালীন হলে এতটুকু আওয়াজ হত না। সবাই রুদ্ধশ্বাসে খেলা দেখত। খেলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে এক মিনিটের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ মেয়েটি হাসিমুখে দর্শকদের কাছে এসে দাঁড়াত। প্রচুর করতালির সঙ্গে খেলা শেষ হ'ত। প্রচুর ফুল, অভিনন্দন আর প্রশংসা। নানা জায়গা থেকে আসত আমন্ত্রণ।

আজ মনে হয় সেই অতিকাছের প্রিয় মানুষটি শ্রদ্ধেয় দাদা বিদেশের সেই বিরাট ভোজসভায় নীচুস্বরে আর কখনোই বলবে না "দ্যাখ, জল মনে কইর‍্যা ভুলে আবার ভদকা খাইও না।"

ইতি আরতি

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আর একজনের চিঠি আবার আমাকে মনে করিয়ে দিল ১৯৩১-৩২ সনের অনেক কথা। যে চিঠিখানা উদ্ধৃত করছি, তার পূর্ব ইতিহাস আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল বলা চলে। সে কথা পরে বলছি। এই চিঠিখানা 'লেখা চাই'-আমন্ত্রণের উত্তরে আমি যে চিঠি দিই তার উত্তর—

10/1 Gurusaday Road
Calcutta 19.
3-3-60

শ্রদ্ধাস্পদেষু

চিঠি পেয়ে খুব খুশী হয়েছি। বর্ষবাণী বের হতে আর তিন চার মাস আছে কিন্তু আমি এপ্রিলের শেষে সব কাজ শেষ করতে চাই। হয় ত আমায় কিছুদিনের জন্য বাইরে যেতে হতে পারে। আপনার লেখা, ভাই, এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পেলেই চলবে। এবার please একটি ছোট খুব মজার গল্প দিতেই হবে। বর্ষবাণীর জন্ম সম্পূর্ণ আপনার সাহায্যে হয়েছে, তাই এবার আমার একান্ত অনুরোধ দাদা, আপনার লেখা চাই-ই।

রবিবার সন্ধ্যা ৭টায় যদি সময় হয় কবে একবার আসেন খুব খুশী হব। বনফুল আসছেন, আরও দু একজন আসবেন। অনেক কাল দেখা হয়নি।

উত্তরের প্রতীক্ষায় রইলাম। ইতি

বিনীতা—জাহান-আরা বেগম

আমার যাওয়া হয়নি কোনো কারণে। আজ প্রায় ৪০ বছর হয়ে গেল। ১৯৩১ সনের কথা। বর্ষবাণীর আরম্ভ বিষয়ে সে যা লিখেছে সে কথা সত্য। প্রথম সংখ্যা রূপ ও লেখা (তখন নাম ছিল 'রূপ ও লেখা') ও পরবর্তী বর্ষবাণী নামক দুএক সংখ্যা আমিই সম্পাদন করেছিলাম, সম্পাদিকা জাহান-আরা চৌধুরীর পক্ষ থেকে। যোগাযোগ ঘটিয়েছিলেন ফরিদপুরের তরুণ জমিদার লাল মিয়া (চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেন)।

এই উপলক্ষে প্রথম আলাপ হয় কবি জসীমউদ্দীনের সঙ্গে, কবি বেনজির

আহম্মদের সঙ্গে, এবং জাহান-আরার দাদা আলতাফ চৌধুরীর সঙ্গে। বেনজীরকে এখন কেউ মনে রাখে নি। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের কাছে প্রথম শুনেছিলাম তিনি স্বদেশী-ওয়ালাদের সঙ্গে মিশে ডাকাতিও করেছেন। ওদিকে খদ্দরধারী লাল মিয়াও কংগ্রেসের কাজে জেল খেটেছিলেন। বেনজীর আহম্মদের মতো সহৃদয় মানুষ সহজে চোখে পড়ে না। তিনি যে ডাকাত দলে ছিলেন, তা তিনিও একবার আমাকে বলেছিলেন। আলতাফ চৌধুরী সুমার্জিত ও সংস্কৃতিমান, এই স্মৃতি স্পষ্ট হয়ে আছে মনে। তিনি, প্রবাসী প্রেস থেকে প্রকাশিত 'ওয়েলফেয়ার' নামক সাময়িক পত্রের একজন সম্পাদক ছিলেন—বর্তমান প্রবাসী সম্পাদক অশোক চাটুজ্জের সহযোগী রূপে।

'রূপ ও লেখা' সম্পাদনের সময় আমি সজনীকান্তের সঙ্গে আরো একটু মিলতে সুযোগ পাই। এবং শনিবারের চিঠির সম্পাদনের ভার আমাকে দেওয়ার মূলে, রূপ ও লেখার সম্পাদনার পটভূমি ও পরে শুনেছি কিরণকুমার রায়ের সমর্থন। একদিনের আকস্মিক প্রস্তাবে আমি মাসিক সম্পাদকে রূপান্তরিত হয়েছিলাম। সেজন্য আমার টান ছিল এদের প্রতি তাই নিমন্ত্রিতদের বৈঠকে আমার না যাওয়াটা খুবই অন্যায় হবে জেনেও যেতে পারিনি।

ছোটখাটো ঘটনা, আসলে ছোটখাটো নয় সব সময়। জীবনে এক একটি মুহূর্ত আসে যখন যে কোনো তুচ্ছ ঘটনা অনেক বড় হয়ে ওঠে। তা যে শুধু খ্যাতজনের জীবনেই ঘটে তা নয়, অখ্যাত জনের জীবনেও ঘটে।

ছোটখাটো ঘটনায় জীবনের মোড় ঘোরে কিভাবে তার একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত শ্রীমতী মায়া বসু। বর্তমানে কবিতা গল্প উপন্যাস লেখিকারূপে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে, কিন্তু তার মূলে এক মেমসাহেবের মোটর চালনাজনিত দুর্ঘটনা। লেখিকা হবার তার কোনো সুযোগই ছিল না। কোনো কল্পনাও হয়তো ছিল না। ১৯৫৮ সনের মে মাসে হঠাৎ এক ফোন এলো—মহিলা তাঁর নাম বললেন না, কিন্তু জিজ্ঞাসা করলেন, "এক মেমসাহেবের মোটর চালনায় যে দুর্ঘটনা ঘটেছে, তার খবরে কারো নাম প্রকাশ না হওয়াতে তিনিই যে ঐ দুর্ঘটনায় পড়েছেন এমন সন্দেহে আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব ক্রমাগত ফোন করে পাগল করে তুলেছেন এমন অবস্থায় কি করে এর প্রতিবাদ করা যায় কাগজে?" আমি বললাম এটা তো

বার্তাবিভাগের ব্যাপার। বললাম তবে আমি আমার ভঙ্গিতে ইতশ্চেতঃ কলমে লিখতে পারি। বললাম আমাকে চিঠি লিখুন, দেখা যাক কি করা যায়। সব বিস্তারিত লিখবেন।

আমি তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করলাম।

চুপ করে গেলেন তিনি। তারপর কিছুক্ষণ থেমে বললেন অত্যন্ত সাধারণ নাম। আমি বললাম আপত্তি থাকলে চিঠি প্রকাশে ফল হবে কি করে? চিঠিতে তো নাম দিতেই হবে নইলে ছাপা হবে না।

শেষে অনেক সঙ্কোচের সঙ্গে বললেন, নাম মায়া বসু। তারপর বললেন, "আপনি" বলবেন না, আমি ছোট। "তুমি" বলবেন।

চিঠি এলো এবং আমি তা নিয়ে যে মন্তব্য করেছিলাম তা ২৫শে মে (১৯৫৮) তারিখের ইতশ্চেতঃতে ছাপা হয়েছিল। মায়া বসুর চিঠিখানা এই—

মান্যবরেষু, গত বুধবার (১৫-৫-৫৮) যুগান্তর ও আনন্দবাজারে একটি মোটর দুর্ঘটনার খবর বেরিয়েছে: একটি মহিলা চৌরঙ্গীতে এক দোকানের নিকট অ্যাকসিডেন্ট ঘটিয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত জনতার হাত থেকে পুলিসে তাঁকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় ইত্যাদি।

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে এবং আমি ঐ নির্দিষ্ট স্থানে বই কিনতে মাঝে মাঝে যাই। ···সুতরাং আমার কয়েকজন হিতৈষী বন্ধু বার বার টেলিফোন করে আমার খবর নেন। "কি রকম আছ?"-"হাসপাতালে না হাজতে?" "মারধোর বেশী করেনি তো?" "বারণ করি তবু শোন না" "এ যুগের মেয়ে" ইত্যাদিরূপ প্রচুর অনুসন্ধানে অতিষ্ঠ হয়ে কাগজে ফোন করে জানিয়েছিলাম তাঁরা যদি অন্তত গাড়ির নম্বরটাও ছাপতেন।···

ইতি

শ্রীমতী বসু

আমার এককলমীর মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা থেকে বিরত রইলাম। কারণ সেটি দীর্ঘ। লেখিকার নাম প্রকাশ নিষিদ্ধ ছিল তাই এ চিঠি ছাপার সময় নাম প্রকাশ করা হয়নি।

পরে জানা গেল মায়া চৌরঙ্গী অঞ্চলে ইংরেজী ম্যাগাজিন কিনতে যেত তার এক অ্যামেরিকান ইংরাজী শিক্ষকের নির্দেশে। আরো জানা গেল সাহিত্য পাঠের নেশা তার অপরিসীম। আমার লেখা বাদে আর সমস্ত

লেখকের লেখা তার প্রায় কণ্ঠস্থ। প্রথমনাথ বিশীর অচিন্ত্যকুমারের কবিতার সে ভক্ত। আধুনিক খ্যাত সাহিত্যিকদের সঙ্গে তার খুব পরিচয়।

এসব শুনে আমার ধারণা হল মায়া সম্ভবত মনে মনে ইচ্ছা করে সেও লিখবে। আমি নির্দেশ দিলাম ফুটপাথে যে ম্যাগাজিন কিনতে যাও, তার গল্পগুলির মধ্যে তোমাকে যে সব গল্প মুগ্ধ করেছে সেই সব নিয়ে একটা রচনা লিখে পাঠাও। তার এতে বিষম আপত্তি, তবু আমার কথা শেষ পর্যন্ত না শুনে পারেনি। আমার দিক থেকে ভেবে দেখলাম যদি বিষয়টি ভাল লিখতে পারে তা হলে আমার বিষয় বৈচিত্র বাড়বে। এভাবে অনেকেরই লেখার বিষয় ঠিক করে দিতাম আগে। যথা সময়ে লেখা এলো, এবং পড়ে খুবই ভাল লাগল। একেবারে পাকা লেখা। ছাপা হল এবং তার পরেও কয়েকটি ঐ একই বিষয়ের লেখা চেয়ে নিয়ে ছাপলাম। তার পর গল্প। নিটোল ছোট গল্প। তারপর গল্পের বই ছাপা হল "চেনা অচেনা" অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তা পড়ে তাকে জানালেন··· "কি সুন্দর তোমার লেখা, ক্ষীণ কলা থেকেই আরম্ভ জানতাম, তোমার একেবারে পূর্ণিমার আবির্ভাব। তোমার চিত্তের শিল্পশ্রীকে নমস্কার।"

এরপর প্রবাসীতে বেরুল মায়ার দীর্ঘ এক কবিতা। আমি অবাক হয়েছিলাম পড়ে। একেবারে পরিপক হাত, প্রকাশের টেকনীক, ভাষার বাঁধন সমস্তই যেন বহুদিন গোপনে অনুশীলন করে তবে হঠাৎ আত্মপ্রকাশ। আমার প্রথম অনুমান যে অভ্রান্ত তাতে আমি খুশিই হয়েছিলাম। প্রথমেই তার সাহিত্য-আসক্তিতে এবং খ্যাত সাহিত্যিকদের সঙ্গে মেলামেশা ও তাদের প্রতি আকর্ষণ থেকে অনুমান করেছিলাম মায়ার মধ্যে একজন ভবিষ্যৎ লেখিকা প্রচ্ছন্ন থেকে আত্মপ্রকাশে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। আর ঠিক এমনি সময়ে মিসেস নরম,ান লুইস গাড়ির মোড় ঘোরাতেগিয়ে এমন দুর্ঘটনা ঘটালেন যাতে মায়া বসুর জীবনের মোড় ঘুরে গেল! দশ বছরের লেখিকা-জীবনে তার অনেক উপন্যাস বেরিয়েছে, কবিতার বইও একখানা, নাম আলোকিত অন্ধকারে। এর প্রত্যেকটি কবিতায় সত্য কাব্যসুর ধ্বনিত। যখন পড়ি

চলে যাযাবর মন বিহঙ্গ চলে
মমতাবিহীন নীল আকাশের তলে,
হৃদয়ে আমার এক মহানদী জাগে

কী যে ঢেউ তার! উদ্দাম চঞ্চল
বাঁধ ভাঙে আর ভেঙে চলে দুই কূল
প্রাণ বন্যার তরঙ্গে টলমল।
মেঘের কলসে ভরি তৃষ্ণার ধারা
ঢেউ তুলে যায় আকাশের আঙিনায়
মরু সাহারার সন্ধ্যা বালুর চরে
হারাই শ্যামল সবুজের দুরাশায়!...

অথবা

গভীর নদী, এপার ওপার একটি ভাঙা সাঁকো
মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে আমি একা।...
পায়ের তলায় অগাধ অতল খোলা জলের ঢেউ—
জীর্ণ সেতু ভাঙল বুঝি· উঠছে দুলে দুলে,
সাবধানে পা ফেলতে গিয়েও চমকে উঠি ভয়ে—
নিরাপদে পৌঁছতে কি পারব অপর কূলে?
শব্দবিহীন আকাশ ভরা হাওয়ার হাহাকার,
চিকুর হানা কালো মেঘের তীব্র ঘনঘটা
নীচে নদীর বাঁধন ভাঙা অশান্ত কল্লোল
ঝিকমিকানো তারারা কই? চাঁদের আলোর ছটা?

খাঁটি কাব্যের সুর। বইখানা অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের নামে উৎসর্গ করা। এবং ভিতরে 'অমাবস্যার কবিকে' নামক কবিতাটি ভারি সুন্দর। মোট ৩২ লাইন থেকে ১২ উদ্ধৃত করছি—

গোলাপের মালা বক্ষে, ভুলেছ কেয়ার কাঁটার ক্ষত,
ক্ষণতরে তারে মনে রাখ নাই যে তারা অস্তগত।
যে তৃণ পায়নি প্রাণ—
তব নবান্ন উৎসবে তারে দাওনিকো সম্মান।
অথচ শুনেছ প্রখর দীপ্ত দুপুর রোদের পিছে
প্রতিবেশিনীর নিবানো দীপের বেদনা নিঃশ্বসিছে।
মনে পড়ে নাকি এত বড় এ নিখিলে
কত মমতায় একদিন মোর নাম ধরে ডেকেছিলে?...

অচিন্তনীয় তুমি অচিন্ত্য। চিরজ্যোৎস্নার কবি
চেয়ে দেখ মোর কবিতার মাঝে তোমারি প্রতিচ্ছবি
ছন্দে তোমারে বন্দী করেছি দিয়েছি অমর কায়া,
আখরে আখরে এঁকেছি তোমারি 'অমাবস্যা'র ছায়া।

ভক্তের বন্দনা, আন্তরিকতায় ভরা। এতখানি উদ্ধৃত করছি কারণ মায়া বসুর প্রকৃত সাহিত্য ক্ষমতা যথাকালে আত্মপ্রকাশের সুযোগ না পেলে লেখিকা কোনোদিনই নিজেকে নিজের দর্পণে এমন ভাবে দেখতে পেত না।

মূলে মিসেস নরম্যান লুইসের মোটর দুর্ঘটনা।

১৯৫৮ সনের ১লা জুন মায়া ফোনে জানিয়ে আমার সঙ্গে (এই প্রথম) দেখা করতে এলো। আমি মজার কথাটথা লিখি, অতএব আমার সঙ্গে কিছু মজা করা দরকার, তাই সে এসে বলল, মায়া বসু আসতে পারল না, আমি তার বন্ধু, আমাকেই সে কথা জানাবার জন্য পাঠিয়ে দিল।

এই ছদ্মবেশের ছলনা-জালটি বড়ই স্বচ্ছ ছিল, আমি প্রতারিত হইনি। তারপর আর এক কাণ্ড। আমার 'স্মৃতিচিত্রণ' প্রকাশিত হল ৩০শে জুলাই ১৯৫৮, এর ঠিক ৮ দিন পরে (৭ই অগস্ট) তার এক কপি বাজার থেকে কিনে এনে আমাকে উপহার দিয়ে গেল।

এটা অবশ্য মজা সৃষ্টির জন্য নয়। উপহারের এই অভিনবত্বে আমি অভিভূত হয়েছিলাম।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আজ এমন এক বন্ধুর মৃত্যু সংবাদ শোনা গেল যাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক না থাকলেও তিনি আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। মৃত্যু হল ৫ই ফেব্রুয়ারি (১৯৭১)। এ সংবাদ রেডিওতে ঘোষিত হয়নি—অথচ হলে অশোভন হত না। কারণ তিনি লেখকরূপেও পরিচিত ছিলেন, যদিও তিনি সেটি তাঁর বৃত্তিরূপে গ্রহণ করেননি। উপন্যাস না লিখলে সহজে সাহিত্যিক স্বীকৃতি পাওয়া যায় না। কিন্তু তিনি উপন্যাসও লিখেছিলেন। কাজেই স্বীকৃতিতে অন্যায় হত না কিছু। তবে তিনি মানুষ রূপেই মহৎ ছিলেন। সাহিত্যের বাজারে এ মহত্ত্বের মূল্য কম।

জীবনময় রায়ের কথা বলছি। মনে হচ্ছে ১৯৬২ সনে তাঁকে শেষ দেখেছি বসু বিজ্ঞান মন্দিরের কাছাকাছি—গেরুয়া বসন পরিহিত অবস্থায়। একদা তিনি চিকিৎসার সাহায্যে জনসেবার ব্রত বেছে নিয়েছিলেন, শুনেছিলাম তিনি গড়পারে জনসাধারণের চিকিৎসা করতেন মাত্র চার পয়সা ফী নিয়ে। ওষুধ বিনামূল্যে।

আমার সঙ্গে ১৯৫৪ সনের ১০ই অগস্ট দেখা, আমার স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছে না শুনে আমাকে দেখতে এলেন নিজে থেকে। এবং একটি কি দুটি হোমিওপ্যাথিক মাদার টিংচার ব্যবস্থা করলেন আমার জন্য। আমি তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতাম, সেজন্য মনের দিক থেকে অন্তত বিশেষ বল পেয়েছিলাম এবং ভাল ছিলাম তাঁর ব্যবস্থায়। তারপরেও তিনি দু তিনবার আমার কাছে এসে দেখে গেছেন আমি কেমন আছি। এ সময় আমি কৈলাস বসু স্ট্রীটে বাস করতাম।

১৯৬৩তে তাঁকে একখানা চিঠি লিখি। তাতে অনুরোধ জানাই ডাক্তার রবীন্দ্রনাথের চিকিৎসা পদ্ধতি বিষয়ে একটি প্রবন্ধ দিতে। আমি জানতাম রবীন্দ্রনাথ তাঁকে হোমিওপ্যাথিতে উৎসাহিত করেছিলেন, এবং তিনি তাঁর এই গুরুকেও একবার চিকিৎসা করেছিলেন। তাঁর মুখে শুনেছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমার অনুরোধ তিনি রাখতে পারেননি। কেন পারেননি তা আমাকে লেখা তাঁর এই চিঠিখানি থেকে জানা যাবে।

দুর্গাপুর-৪
৮-৪-৬৩

ভাই পরিমল,

অসুস্থ হ'য়ে বায়ু পরিবর্তনের জন্যে এখানে এসেছিলাম। এসে গণ্ডস্যোপরি পিণ্ডক: এক নতুন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছি। ডান হাতটি হঠাৎ অকর্মণ্য হয়ে পড়েছে।

১৪ই কলকাতায় ফিরে ফোনে তোমার সঙ্গে কথা বলব। আশা করি ভাল আছ।

—জীবন দা

জীবনদা ছিলেন অনেকের জীবনদাতা। অনেক কঠিন রোগীকে তিনি চিকিৎসায় ভাল করেছেন। এ খ্যাতি তাঁর ব্যাপক ছিল। ফাল্গুন (১৩৭৭) সংখ্যা প্রবাসীতে শ্রীযুক্তা শান্তা দেবী তাঁর সম্পর্কে লিখছেন :

"৮১ বৎসর ৬মাস বয়সে জীবনময় রায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পিতা ছিলেন ইন্দুভূষণ রায়, সুকবি ও সুগায়ক। কিন্তু ইহার উপরে তাঁহার আর একটা বড় গুণ ছিল আর্তজনের সেবক হিসাবে। ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন কর্মী মিলিয়া গত শতাব্দীতে যে 'দাসাশ্রম' স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই দাসাশ্রমে ইন্দুভূষণ ছিলেন একজন দাস। আমার পিতৃদেবও [রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়] একজন কর্মী ছিলেন, তবে তিনি দাস নাম গ্রহণ করেন নাই। তিনি দাসী পত্রিকার সম্পাদক রূপে ও অন্য বহুভাবে আশ্রমে কাজ করিতেন।

"জীবনময় পিতামাতার কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন।···বাল্যকাল হইতেই রন্ধনে তাঁহার হাত ছিল। তাঁর দিদির অল্প বয়সে মৃত্যু হওয়াতেই মাকে রন্ধনাদিতে তিনিই সাহায্য করিতেন। পরে যখন একলা সংসার করিতেন তখন বোধহয় বরাবরই নিজের খাদ্য নিজে প্রস্তুত করিতেন।

"উপন্যাস রচনাও তিনি করিয়াছিলেন [মানুষের মন]। মানুষ হিসাবে ছিলেন বন্ধুবৎসল ও হাস্যরসিক। বাল্যকালের বন্ধুদের শেষ বয়স পর্যন্ত ভোলেন নাই। জীবনে যাহা কিছু সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিলেন তাহা ব্রাহ্মসমাজের হাতে সেবার জন্য দান করিয়া গিয়াছেন। পিতামাতা ও দিদির নামে মাঝে মাঝে বড় দানও করিয়াছেন।"

মানুষটির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল। এর উপর আর এক পরিচয়—তিনি ছিলেন প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য বসন্ত রায়ের বংশধর।

প্রবাসী সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায় ঐ একই ফাল্গুন সংখ্যা প্রবাসীতে লিখছেন—"...কিছুকাল হইতে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং বিশেষ ঘোরাফেরা করিতে কষ্ট হইলেও কাহারও রোগের কথা শুনিলে তিনি যেমন করিয়া হউক দেখিতে যাইবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার পিতার সেবাধর্ম তিনিও অবলম্বন করিয়া চলিতেন। জীবনময় রায় চিরকুমার ছিলেন। কখন কখন তিনি বন্ধুদের গৃহে বাস করিলে কাহারও সেবা গ্রহণে তাঁহার অনিচ্ছা দেখা যাইত। তিনি নিজের রন্ধন নিজেই করিয়া লইতেন। এই কারণে দেখা যাইত যে তিনি ও তাঁহার পোষ্যগণ শুধু ডালভাত খাইয়া রহিয়াছেন। ..."

অসুখের কথা শুনলে যে নিজে থেকেই আসতেন, সেকথা আমার নিজের সম্পর্কে আগেই বলেছি। জীবনময়ের কবিতা লেখার হাত ছিল, রোমা-নটিকভাবের কবিতা ও কৌতুক কবিতা দুইই লিখতেন। আমি তাঁর দুরকম কবিতারই কিছু নমুনা দিচ্ছি—

তোমার গভীব চিত্তে যার ধ্যানে তুমি অবহিত,
সে ত আমি নহি ;
আনন্দেব পাত্র মোব ছিল বিক্ত, সুধায বঞ্চিত ;
আনিযাছ বহি
তোমার মঞ্জুল কণ্ঠে মধুবস বিহ্বল সঙ্গীত—
নির্ঝ'ব উচ্ছল ;
আমার সাগর তীর্থে তাবই মন্দাকিনী তরঙ্গিত
লীলায় চঞ্চল।
দীর্ঘদিন জীর্ণ তরী বাহিয়া এনেছি চলে আজ
দিনান্তের তীরে
ব্যর্থ বুবুক্ষিত চিত্তে, অন্তরে বহিয়া দৈন্যলাজ
ঘুরিয়াছি ফিরে।
বারম্বার যার পায়ে স'পিয়াছি চিত্ত দুরাশায়
অসীম নির্ভরে
দুরন্ত দুর্দিনে মোরে ত্যজিয়া গিয়াছে নিরুপায়—
অবহেলা ভরে।
আজি সেই ভগ্নতরী প্রতীক্ষিয়া স্নিগ্ধ অবসান

নিঃসঙ্গ অতলে
চলিছে মন্থর গতি বন্ধুর তরঙ্গ খরসান
মৃত্যু রসাতলে।
দিগন্তে ঘনায় মেঘ বিদ্যুতিছে প্রলয় ইঙ্গিত ;
মরণের কোল
আমারে দিয়েছে ডাক ; ধ্বনিতেছে ধ্বংসের সঙ্গীত
সিন্ধু উতরোল।...
ফিরিবার নাহি পথ, সম্মুখে অনন্ত মৃত্যুরাশি
হানে ঊর্মিদল,
ছিন্নপাল ভগ্নতরী ঝঞ্ঝা উঠে গগন বিলাসী
নিষ্ঠুর চঞ্চল।
পশ্চাতেব স্মৃতি আজ অস্ত গেছে অতীত পাথারে
বিদায়ের গানে,
মরণের যাত্রী, তারে মিছে ডাকা জীবনের পারে
সন্ধ্যা অবসানে।

(স্তিমিতায়মান—প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৪১)

জীবনময়ের চরিত্রের এবং বাক্যের সরসতা পরিচিতদের জানা ছিল। এবারে তাঁর কলমের সরসতার দিকের কিছু পবিচয় দিই—

কবিতাটির নাম 'বুদ্ধিমান'—

সবাই যেমন চলবে আমি চলব তারই উল্‌টা
সবার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেব ভুলটা।
সবাই চলে পন্থের মতে, কইব আমি পষ্ট
আমার মতে চললে পরে ঘুচবে সবার কষ্ট।
স্বাধীন ভাবেই চিন্তা করি স্বাধীন মতেই ব্যক্ত।
আহ্নিকেলে বুকনি বকে করছ আমায় ত্যক্ত
জগৎ জোড়া বোকার পালে বুদ্ধিমান যে একটি
বুঝতে এখন পারছ বোধহয় আমিই যে সে ব্যক্তি।

('বেতাল', ১৯২১)

জীবনময় রায় তাঁর লেখক সত্তাকে খুব বেশি প্রশ্রয় না দিয়ে সেবা ধর্মকেই জীবনের লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। আমার নিজের সম্পর্কে তাঁর আচরণ থেকেও আমি সে কথা হৃদয়ঙ্গম করেছি।

ষষ্ঠত্রিংশ পরিচ্ছেদ

প্রমথনাথ বিশীর প্রায় চল্লিশখানা চিঠির ভিতর থেকে আমি দুখানি মাত্র বেছে নিচ্ছি। একখানি ১৯৫৭ সনে লেখা আর একখানি ১৯৬৯ সনে।

আগে প্রথমখানির কথা বলি। আমি ঐ সময়ে মাসিক বসুমতীতে আমার স্মৃতিকথা লিখতে আরম্ভ করেছি প্রাণতোষের পরিকল্পনায় ও চাপে। সেই সময়ে, শান্তিনিকেতন পর্বে কিছু লিখতে গিয়ে আমার পরবর্তী কালের বিশিষ্ট শুভার্থী বন্ধু অথচ তৎকালীন (১৯২১) শান্তিনিকেতনবাসী আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত প্রমথনাথ শান্তিনিকেতনে কোথায় থাকত এবং কি পড়ত এসব কথা জানবার দরকার হয়ে পড়েছিল। আমি তাকে একখানা চিঠি দিয়েছিলাম আমার পুরানো ঠিকানা ৩৫/ডি কৈলাস বসু স্ট্রীট থেকে, ৫।৫।৫৭ তারিখে, প্রমথনাথের কলকাতার পুরানো ঠিকানায় (সম্ভবত অশ্বিনী দত্ত রোডের বাড়িতে)।

লিখেছিলাম—' এই খবরগুলি আমার জরুরি দরকার। ভীষণ দরকার। পাশে লিখে দিন। (তখনও পরস্পর 'আপনি' চলছে।)—

১। ১৯২১ সনে আপনি শান্তিনিকেতনে কোথায় রাত কাটাতেন? এবং কি পড়তেন?

এর পাশে প্রমথনাথের লিখিত উত্তর: বীথিকাঘরে ও অন্যান্য ঘরে, এখন মনে পড়ছে না। কি পড়তাম?—Sermons in trees and stones"

আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন ও তার উত্তর এখানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। আমি আমার চিঠির নিচে লিখে জানিয়েছিলাম—"সৈয়দ মুজতবা আলীকে চিঠি লিখেছিলাম, তখন তিনি কি পড়তেন জানাতে। তিনি সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তখন ওখানে [বিশ্বভারতীতে] যাঁরা ছিলেন তাঁদের নামের তালিকা পাঠিয়েছেন।"

দুজনেরই চরিত্র দুখানা চিঠিতে প্রকাশ। প্রমথনাথ সাময়িকভাবে, আরডেন অরণ্যে নির্বাসিত ডিউক, কবিদার্শনিক, আত্মউদাসীন। মুজতবা আলী পথভ্রষ্ট, আত্মবিস্মৃত।

শান্তিনিকেতনে একদিন বাস করলেও প্রমথনাথ বিশীকে না চিনে থাকা

যে সম্ভব, পরে তা আর কল্পনাই করা যায়নি। অথচ তার ছোট ভাই প্রফুল্লনাথ তখন আমাকে শান্তিনিকেতনের ভূগোলের সঙ্গে আগ্রহের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। প্রমথনাথের মতো স্বতন্ত্র মেধার মানুষ স্বতন্ত্র হয়েও দলের মধ্যে মিলিয়ে ছিল, অন্তত আমার চোখে, এটা আমার নিজেরই কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে পরে। (তবে আমি ঘরের লোকদের বাইরে কারো সঙ্গে বিশেষ মিশিনি তখন।)

পরে, মানে ১৯৩২ থেকে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক শ্রেণীতে বি.এ. পড়েও যেমন সে অপরিচিত ছিল তখন, পরে ১৯৩২-৩৩ সনে পুনঃ-পরিচয় ও বন্ধুত্ব ঘটল, এও প্রায় তেমনি। প্রায়, কিন্তু সবটা নয়। তার কারণ কলেজের একটি ছোট ঘরে ১৫০ ছাত্র, আর শান্তিনিকেতনের মতো বৃহৎ নিকেতনেও তখন মোট ছাত্র সংখ্যা হয়তো তাই। কলেজের সীমাবদ্ধ ক্লাসঘরে কেউ কাউকে ডিঙিয়ে গিয়ে অন্যের সঙ্গে আলাপ করতে পারে না, রোজ পাশে বসলে তবে আলাপ হয়, কিন্তু শান্তিনিকেতনে নানা উপলক্ষে পরস্পর মেলবার সুযোগ ছিল, ছোটবড় নির্বিশেষে। তাছাড়া সেখানে সবাই অভিনয়, খেলাধূলা, গান, পাঠ, ইত্যাদিতে যখন স্বর্গীয় আনন্দে প্রায় দিশাহারা, আমি সে স্বর্গীয় আনন্দ ঠিক উপভোগ করতে পারিনি, কারণ আমার লক্ষ্য ছিল পাতালের আনন্দ। অর্থাৎ হাসপাতালের। সেখানে ডাক্তার মুখোপাধ্যায় (নাম মনে পড়ছে না) ছিলেন আমার পরম উপকারী বন্ধু, তাঁর ওষুধ ও পথ্যেই তখন প্রধানত আমি অস্তিত্ব রক্ষা করেছিলাম। বলা সম্ভবত বাহুল্য যে, আমি তখন প্রায় স্থায়ী রোগী ছিলাম, বাইরে যদিও দেখাবার চেষ্টা করতাম আমি আর সবার মতোই সুস্থ। এই সব কারণে প্র-না-বি আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়ে থাকবে।

কিন্তু পরে জীবনসংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রমথ আমার যে উপকার করেছে তা আমি কখনো ভুলব না। প্রমথ যদিও আমার অপেক্ষা প্রায় ৪ বছরের ছোট, কিন্তু বন্ধুবাৎসল্যে তাকে সবসময়েই বড় মনে হয়েছে, আর মনে হয়েছে তার ভাষাশিল্পের কুশলতার জন্য—তার সর্বজাতীয় রচনার কুশলতার জন্য। একদিকে তার ন্যারেটিভ কাব্যে ক্ল্যাসিক্যাল ছন্দোবন্ধন আর ঝলমল করা প্রকাশদীপ্তি। অন্যদিকে, তার লিরিক কাব্যে ভাষার অলঙ্কার খুলে পড়েছে প্রকাশ ভঙ্গি থেকে। সরল সহজ কথায় পাঠকমনকে এক গভীর অনুভূতির রাজ্যে টেনে নিয়ে গেছে অনায়াসে। আবার যখন তার উপন্যাস পড়ি তখন

সে আর এক ব্যক্তি। বহুরূপী প্রমথনাথকে পৌরাণিক ভাষায় সব্যসাচী বলা চলে, যদিও 'নিমিত্তমাত্র' নয়। নাটকে গল্পে এবং কোনো কোনো উপন্যাসে প্রখর ব্যঙ্গ কৌতুক এবং বাগবৈদগ্ধ্য। উপমাপ্রয়োগ তো চমকপ্রদ। এমন সহজে দেখা যায় না। আবার সমালোচক প্রমথনাথের চেহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে তার সুসংযত কথায় সমালোচিতের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য প্রকাশের বিস্ময়কর ক্ষমতা। এর উপরে আছে তার সরস এবং মনোহর আলাপের ভঙ্গি। ব্যঙ্গের আক্রমণ তার শুধু লেখায় নয়, কথাতেও প্রখর। কোনো একটি ক্ষেত্রে হাতাহাতি পর্যন্ত হতে দেখেছি। আর ছাপা লেখায় মোহিতলাল মজুমদারের সঙ্গেও প্রায় গুঁতোগুঁতি হয়েছে। সাহিত্যিক কোঁদলের ইতিহাস লেখক সে সব খুঁজে বার করবেন একদিন।

পরিহাসপ্রবণতা যদি চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য হয়, তবে তার সঙ্গে কৌতুক, শ্লেষ, বাগবৈদগ্ধ্য ইত্যাদি জড়িয়ে থাকবেই। এবং চরম মুহূর্তে আক্রমণও অনিবার্য হয়ে ওঠে। প্রকৃত ব্যঙ্গে কৌতুক অংশ কিছু কম, ব্যঙ্গ্য বেশি, এবং যদি ব্যঙ্গের সফল প্রয়োগ বাঞ্ছনীয় হয় তবে আক্রমণটা নিষ্ঠুর হতে বাধ্য। কিন্তু এদেশে উচ্চাঙ্গের ব্যঙ্গ রচনাও খুব ব্যাপক নয়, এবং তা পড়ে বোঝে এমন পাঠক সংখ্যাও কম। ব্যঙ্গ কাকে বলে তা বোঝাতে গেলেও সাধারণত ব্যর্থ হতে হয়। এমন কি অনেক সমালোচকের বুদ্ধিও ধরাশায়ী হয়। এমন অবস্থায় প্রমথনাথ বিশী নিজে যে কয়েকটি ব্যঙ্গ নাটক রচনা করেছে, তার মধ্যে প্রায় ৫০ ভাগ কৌতুক মিশিয়ে দেওয়াতে রঙ্গমঞ্চে তার দুখানি নাটক খুব সফলভাবে অভিনীত হয়েছিল। তার বিশুদ্ধ কৌতুকও খুব কড়া এবং মারাত্মক এবং মঞ্চে দর্শকদের মধ্যে উচ্চ হাসির রোলে অভিনয়ের অনেক কথা চাপা পড়তে দেখেছি।

সাধারণ মঞ্চে প্রথম অভিনীত নাটক 'ঋণং কৃত্বা'র অভিনয় আমি দেখেছি কিন্তু তখন মন দিয়ে উপভোগ করতে পারিনি নিখিলচন্দ্র দাসের জন্য। থিয়েটারের প্রথম সারিতে নিখিলবাবুর দুদিকে 'পি-সি-এল' ও আমি বসে তাঁর দুখানা হাত খুব জোরের সঙ্গে বগলে চেপে রেখেছিলাম। কিন্তু পা-দুখানা নিয়ন্ত্রণ করা যায় নি।

'সানি ভিলা' (পূর্ব নাম ঘৃতং পিবেৎ) অভিনয়ে নিখিলবাবু ছিলেন না কিন্তু মনে হয় তাঁর শিষ্যস্থানীয় অগণিত দর্শকে প্রেক্ষাগৃহ ছিল বোঝাই।

অহীন্দ্র চৌধুরীর নির্দেশে এবং সন্তোষ সিংহের সহযোগিতায় ও প্রয়োগ-কৌশলে নাটকখানি উদ্দাম হাসির ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল।

এই সময়ে ১৯৪৩এর বড়দিনে রঙমহলে সানি ভিলা প্রথম অভিনীত হয়। তখন বিশ্বযুদ্ধ চলছে, এবং একবছর আগে কলকাতার নানাস্থানে আকাশ থেকে বোমা পড়েছে।

আমি এই সময় একটি সান্ধ্যকাজ সবে হাতে নিয়েছি। কাজটি বীরেন্দ্রকৃষ্ণের দৌত্যে, রঙমহল থেকে একখানা বিতরণের জন্য ছাপা পাক্ষিক পত্রের সম্পাদনা। প্রথম সংখ্যা ছাপা হল ২২শে জুলাই ১৯৪৩। এই উপলক্ষে অহীন্দ্রবাবুর মেক্‌আপ-ঘরে থিয়েটার সম্পর্কিত অনেকের সঙ্গেই পরিচয় ঘটল। স্মৃতিচিত্রণে বিস্তারিত লিখেছি। এবং এই উপলক্ষে সানি ভিলা ও প্রমথনাথের বিষয়ে কয়েক সংখ্যা ধরে অনেক লেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। ক্যামেরার ব্যবহারও করেছিলাম ব্যাপকভাবে, এবং প্রমথনাথের ইচ্ছায় তার একখানি কার্টুন ফোটোগ্রাফও আমার লেখার সঙ্গে ছাপা হয়েছিল।

শেষ সংখ্যা অষ্টাদশ। (মাসে দুখানা, শেষ সংখ্যার তারিখ ১।৫।৪৪ পর্যন্ত ছাপা হয়েছিল।) তারপর আমিই বন্ধ করে দিলাম। আমি নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলাম রবীন্দ্রনাথের ছবি ঐ সংখ্যায় দুকলম ছাপা হবে, ব্লক যেন দুকলম করা হয়। পরদিন এসে দেখি ব্লক করা হয় নি, এক কলম করতে বলেছেন থিয়েটারের মালিক। এখন আমার অনুমতি সাপেক্ষ। জানা গেল—খরচ একটু কম হবে তাতে। আমি তৎক্ষণাৎ বললাম, খরচ কমানোই যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে কাগজ বন্ধ, করে দিলে একেবারেই খরচ হবে না।—বলে চলে এসেছিলাম—আর কখনো যাইনি সেখানে। এদিকে কথা ছিল প্রমথকে প্রতি অভিনয়ে দশ টাকা করে দেওয়া হবে। প্রথম প্রথম দেওয়া হচ্ছিল, পরে অনিয়মিত। সেও বিরক্ত হয়ে বোধহয় আর যায় নি। আমার পাওনাও আর আনতে যাইনি।

কাগজখানা ভালই হয়েছিল। মন্মথ বসু, মনোজ বসু, অহীন্দ্র চৌধুরী, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, হেমেন্দ্র দাশগুপ্ত প্রভৃতি লিখেছেন তাতে। যাই হোক সানি ভিলার মতো সুন্দর ভাবে উপস্থাপিত কৌতুক নাট্য (আসলে মুখোশ-পরা ভণ্ড অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ) স্টেজে কমই অভিনীত হয়েছে। এর প্লট যেমন চিত্তাকর্ষক, তেমনি তা কৌতুকে মোড়া। এই কৌতুক নাট্যের প্লটের ট্র্যাজিডির লক্ষ্যে ক্রমবিকাশ, আশ্চর্য সুন্দর।

দুদিকের দুটি প্রতারণা সমান্তরাল ভাবে চলা কালে পরিণতির দিকে দর্শকের আগ্রহ উগ্র রকমে বাড়িয়ে তোলে। প্রধানত নায়িকার ও তার পিতার অসহায়তার ট্র্যাজিডির উপরে সমস্ত হিউমার প্রতিষ্ঠিত, আর সেজন্য এর মানবিক আবেদন অত্যন্ত গভীর। "বাহিরে যবে হাসির ছটা, ভিতরে থাকে আঁখির জল"—একথা এ নাটকের পক্ষে অত্যন্ত সত্য।

সানি ভিলার কথা বলতে গিয়ে অনেক কথাই মনে পড়ে গেল। শনিবারের চিঠির সম্পাদনা কালে প্রমথনাথ অনেক লেখা দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছে। আর একটি কথা অদ্যাবধি অপ্রকাশ রয়ে গেছে। আমি ১৯৪৫ সনে যুগান্তর ম্যাগাজিন সেকশনের সম্পাদন ভার পেয়েছিলাম প্রমথনাথের পরিচিতিতেই। প্রমথনাথ তখন যুগান্তরের সম্পাদকীয় বিভাগে নিযুক্ত।

আমি ১৯৬৯তে যখন 'আধুনিক ব্যঙ্গ পরিচয়' রচনায় নিযুক্ত তখন ঐ লেখার প্রয়োজনে প্রমথর ব্যঙ্গ গল্পের বই চেয়ে পাঠিয়েছিলাম। তার উত্তরে প্রমথ তার সমস্ত জীবনের ব্যঙ্গ রচনার অভিজ্ঞতা থেকে আমাকে বই পাঠানোর সময় জানাল (১৭।৯।৬৯)—

"দুখানা বই পাঠালাম। বেশ কিছু গালাগালি আছে। কিন্তু গালাগালিতে এদেশের চৈতন্য হবে না—ঢিল ছুঁড়ুন।"...

ব্যঙ্গ রচনায় 'ঝুনো' ব্যক্তির পক্ষে এটি চরম অভিজ্ঞতার কথা বলা বাহুল্য।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কবিতায় আমন্ত্রণ-লিপি মাঝে মাঝে পেয়েছি। কিন্তু এখন যে চিঠিখানার কথা বলছি সেটি কিছু অন্যরকম। জন্মদিনের নিমন্ত্রণ। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন। ইংরেজী ১৯৫১ সনে লেখা।

সুহৃদ্‌বরেষু,

বর্ষচক্রে একবার পৃথিবীর সূর্যপরিক্রমা
প্রাণের খরচ বাড়ে, শেষ হয় জীবনের জমা—
এসেছে নতুন খাতা—আটই শ্রাবণ—জন্মদিন,
প্রাপ্য নেই, তবু এসো, প্রীতির অমৃত দিও ঋণ,
সে ঋণের লজ্জা নেই, শোধ নেই, পঞ্চাশের পারে
সেই হোক সঞ্জীবনী। জীবনের হিসাবে-বিচারে—
শুধু এক দিবসের ছুটি নিয়ে শ্রাবণ-সন্ধ্যায়
আমার কুটীরে এসো বন্ধু রব তব প্রতীক্ষায়।

পি ১৭১ সি. সি. ও. এস — প্রীতিমুগ্ধ
টালা পার্ক, কলিকাতা — তারাশঙ্কর
শ্রাবণ ১৩৫৮

এ চিঠির একটি কথায় ধাঁধায় পড়েছিলাম। "প্রাপ্য নেই, তবু এসো"—মানে কি? খরচ করে যাব। অথচ জলযোগের ব্যবস্থাও বোধহয় নেই। তবু যেতে হবে। শেষ পর্যন্ত যা থাকে ভাগ্যে, চুলোয় যাক প্রাপ্য, যাওয়াই স্থির করলাম। ভেবে দেখা গেল, আরো তো অনেকে আসবে, একটা কিছু ব্যবস্থা অবশ্যই থাকবে। ও কথাটা নিশ্চয় তারাশঙ্করের বিনয়। অন্তত প্রীতির ঋণ দান করে তো আসা যাবে—আদায় হোক না হোক।

বিনয়ই ঠিক। মাংসও বাদ ছিল না। সভার মাঝখানে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় আচম্বিতে প্রশ্ন করে বসলেন, "আপনার বয়স কত?"—একটি বাধা উত্তীর্ণ হতে না হতে এই বাধার সম্মুখীন হয়েছিলাম। সত্য কথা বলতে কি, আমার বয়স কত তা ঠিক করেছি আমি অনুমানে, কিছু দ্বারেশ শর্মাচার্যের সাহায্যে। দলিল পত্র, বহুদিন হারিয়ে গিয়েছিল। হয়তো

ম্যাট্রিকুলেশনের বয়স কিছু কমানো ছিল, যাতে ১৯১৫তে ১৬ বছর হয়।

প্রশ্নের উত্তরে বললাম, (সেই সভাতেই)—"যদি কাউকে না বলেন তাহলে বলি।" কিন্তু সবটাই শেষে কৌতুকেই শেষ হল, বলার সুযোগ হল না। দরকার ছিলও না। প্রশ্নের হাত থেকে বাঁচা গেল, কিন্তু অতিভোজের হাত থেকে বাঁচা যায়নি।

ফিরে চলি ১৯৩২ সনে। উপাসনা, সাবিত্রীপ্রসন্ন, কিরণ রায়। সেই-খানেই যতদূর মনে পড়ে তারাশঙ্করের প্রথম প্রবেশ। তারপর নাটকীয় ভঙ্গিতে সব ওলটপালট হয়ে গেল। সাবিত্রীপ্রসন্ন বিদায় নিলেন, এলেন সজনীকান্ত দাস, 'উপাসনা' হল 'বঙ্গশ্রী', আর আমি ঐ একই সময়ে হয়ে গেলাম শনিবারের চিঠির সম্পাদক। কিরণ সেতুর কাজ করল। তারাশঙ্কর সজনীর মধ্যেও কিরণ ছিল সেতু। উপাসনায় প্রকাশিত প্রেমেনের 'সেতু' কার্যত কিরণকুমার রায়, কবিতার অন্য অর্থ যাই থাক। কিরণের কথা আগেই বলেছি।

সজনীকান্তের একটা অসাধারণ ক্ষমতা ছিল অন্যের ক্ষমতা উপলব্ধি করার। একে 'ইনট্যুইশন' বলা চলে। তারাশঙ্কর, মানিক,—যারা সাহিত্য ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত পরে এসেছে, এবং প্রথম আসছে তাদের ক্ষমতা আবিষ্কারক সজনীই প্রথম। সাহিত্য ক্ষেত্রে তারাশঙ্করের তখন দ্বিধাজড়িত প্রবেশ। 'বঙ্গশ্রী'র প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যাতেই (১৩৩৯ মাঘ, ইং ১৯৩৩) তারাশঙ্করের 'শ্মশান-ঘাট' ছোট গল্প ছাপা হল। প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রের প্রথম সংখ্যায় প্রথম গল্প ছাপার গৌরব অনেক। সজনীকান্তেরও গুণগ্রাহিতার দৃষ্টান্ত এটি।

বঙ্গশ্রী অফিস নামক রাইটার্স বিলডিঙে-আসা রাইটারদের চরিত্র প্রমথ-নাথ বিশীরকাব্য-চিত্রে সে সময়ের ছবিসহ অতি চমৎকার ফুটেছিল। আমি এই চিত্রগুলিকে বিশেষ মূল্যবান মনে করি। তারাশঙ্কর সম্পর্কে কয়েকটি ছত্র এই—

মফঃসল হতে কার চলে যাওয়া আসা,
কলমে অলম্ নাহি মুখে নাহি ভাষা,
কে লেখে অমর গ্রন্থ আয়ু চিরকাল
না পড়িয়া উপন্যাস কনতিনাতাল।
রাই কমলের সূর্য (কুয়াশা-মলিন)

ম্যালেরিয়া ক্লিষ্ট কার দেহখানি ক্ষীণ।
নাম নাই করিলাম (নাহি মেলে ছন্দে)
সকলেই জানে তারে খ্যাতির সুগন্ধে।
(শনিবারের চিঠি, মাঘ, ১৩৪১)

এই কয়েকটি মাত্র কথাতেই বোঝা যাচ্ছে সে সময় (১৯৩৫) তারাশঙ্কর মফঃসল (লাভপুর, বীরভূম) থেকে যাতায়াত করছে। রাইকমল প্রকাশিত (১৯৩৫) হয়েছে। এবং তার রচনা অমরত্ব প্রাপ্ত হবে, এ বিশ্বাস গুণীজনের মনে জেগেছে।

১৯৩৫ সনে, প্রবাসীতে (কার্তিক ১৩৪২) 'মতিলাল' নামক একটি ছোট-গল্প প্রকাশিত হয়। গল্পটি আমার খুব ভাল লেগেছিল। তাই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার আনন্দ সংবাদ তারাশঙ্করকে লাভপুরের ঠিকানায় জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলাম। এই অধ্যায় লেখার আগে গল্পটি আর একবার পড়লাম। আরো বেশি মুগ্ধ করল। মতিলাল দীন দরিদ্র, কুৎসিত-দর্শন, স্ত্রীও তাই। নানাজাতের সং সেজে মতিলালের সংসার চলে। সন্তানহীন, তাই ছোট ছেলে দেখলে মনের কোণের লুকানো বাৎসল্য জেগে ওঠে। উঁচু জাতের ছেলেরা তাকে ঘৃণা করে। তবু তার মনে কোনো গ্লানি নেই। কিন্তু মানুষের সমাজে সে যে অস্পৃশ্য, ঘৃণ্য, শুধু বাৎসল্যের দাবিতে যে সে তার হীনতার গণ্ডির বাইরে যেতে পারে না, এ বোধ তার অনেক দেরিতে এসেছিল। সে তার সরল নিষ্পাপ মনে আগে বুঝতে পারেনি যে, গণ্ডি পার হলে তার প্রাপ্য শুধু নিষ্ঠুর প্রহার। শেষ দৃশ্যটি অতি মর্মান্তিক। লেখক এখানে শিল্পীর নিস্পৃহতা নিয়ে শুধু দর্শক। শুধু ছবিটি ফুটিয়ে তোলাতেই শিল্পীর সার্থকতা। শেষ পর্যন্ত অভিভূত হতে হয়। নিটোল ছোট গল্প। মানুষ সমাজ-বিচারে যত নিচেই পড়ে থাক, তাকে মানুষ রূপে গভীরভাবে ভালবাসতে না পারলে এমন গল্প লেখা যায় না। প্রকৃত শিল্পী মাত্রেই এই গুণের অধিকারী।

তারাশঙ্করের এ গল্পের নায়ক মতিলাল কাল্পনিক মানুষ নয়। সে বাস্তবকে প্রত্যক্ষ করে লিখেছিল। তারাশঙ্করের সকল ছোট গল্পেরই সার্থকতা এইখানে। বাস্তব মতিলাল, গল্পের মতিলালের প্রোটোটাইপ। তাই গল্প ছাপার পরে কথাটা প্রচার হয়ে গিয়েছিল; এবং মতিলালের কানেও তা গিয়েছিল। তারাশঙ্কর চিঠিতে জানিয়েছিল, 'ফলে এখন মতিলালকে গাঁজার খরচ যোগাতে হচ্ছে।' বড় চিঠি লিখেছিল, দুঃখের বিষয় সেখানা হারিয়ে

গেছে; নইলে তাতে যা ছিল তা নিশ্চয় আর একটি ছোটগল্পের প্লট হতে পারত। আমার আরো বিস্ময় এইখানে যে, তারাশঙ্কর নিজে একটি অতি কোমল মনের অধিকারী, অথচ গল্প রচনায় সে প্রকৃত শিল্পীধর্ম থেকে একচুল বিচলিত হয়নি।

তারাশঙ্করের সঙ্গে আমার পরিচয় 'বঙ্গশ্রী'র জন্মের সময় থেকেই। তারপর কয়েক বছর কেটেছে পরস্পরের সান্নিধ্যে। অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। এখন তো মুখদেখাদেখি বন্ধ, দুজনেরই দেহ শিথিল হয়ে আসছে। বহুকাল পরে ১৯৭০, ১০ই মে (২৬শে বৈশাখ, ১৩৭৭) তারিখে তথ্যকেন্দ্রালয়ে শিশির-কুমার স্মৃতি পুরস্কারটি তারাশঙ্করের হাত থেকে নিয়েছিলাম—'একলক্ষার' হাতের স্পর্শে একহাজারী হওয়াতেও আনন্দ পেয়েছিলাম। তারপর আর দেখা হয়নি (৩১-১-৭১ পর্যন্ত) পরে কি হবে জানি না।

শনিবারের চিঠির আমলের কথা আমার স্মৃতিচিত্রণে বলা হয়েছে। যুগান্তরে প্রবেশ ১৯৪৫, মার্চ মাসে। ১৫।৩।৪৫ তারিখে আমি তারাশঙ্করকে একখানা চিঠি লিখি। তখন সে যুগান্তর সম্পাদকীয় বিভাগ যেখানে ছিল, তার থেকে আধ মিনিট দূরে বাস করত। যে চিঠি লিখেছিলাম, তার অপর পৃষ্ঠায় তার উত্তর পেলাম। কাজেই দুখানা চিঠিই আমার কাছে আছে। আমি লিখলাম—

"ভাই তারাশঙ্কর, আমি যুগান্তর অফিসে এসেই শুনলাম তুমি অসুস্থ হয়েছিলে, আশাকরি এখন ভাল আছ। একদিন বিকেলে, তিন সপ্তাহ আগে, তোমাকে বাড়িতে পাইনি। তোমার সাহিত্য বিষয়ে মতামত যা নানা কাগজে পড়ছি—আমার ভাল লাগছে।

"যুগান্তরের নববর্ষ সংখ্যা "উত্তীর্ণ" করার ভার আমার উপর। সময় সংক্ষিপ্ত, আমি প্রায় ক্ষিপ্ত। এ অবস্থায় তোমার দ্বারস্থ হচ্ছি—গল্প একটা চাইই, যত ছোট হয় লেখ। এক পাতার হলেও আপত্তি নেই।"...(১৫।৩।৪৫)

এর উত্তর পেলাম পরদিন বসন্তাক্রান্ত হয়েও চিঠির ভাষায় কিঞ্চিৎ কাব্য রসিকতা করা হয়েছে। বসন্তকালের প্রভাবেই হয়তো।

ভাই পরিমল, আমার বাড়িতে রোগের সমারোহ চলছে। আমি নিজেও শয্যাশায়ী। বাড়ীর দোরে নয়, আঙিনায় বসন্ত নাচছে। নিজেও সেই রোগে আক্রান্ত। সুতরাং আমার পক্ষে এ অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভবপর নয়। তোমার উদ্যমের সাফল্য কামনা করি।

তারাশঙ্কর
১৬।৩।৪৫

তারাশঙ্কর যে একটি স্নেহপ্রবণ কোমল মনের অধিকারী একথা আগে বলেছি। ১৯৫৬ সনের মে মাসে কোনো একদিন হঠাৎ আমার কাছে এসে হাজির। এসে বলল, তোমার স্বপ্ন দেখেছি কাল রাত্রে, তাই দেখতে এলাম। আমার বিশ্বাস সে আমার মৃত্যু স্বপ্ন দেখেছিল। আশু দের স্বপ্নের মতো। তবে আশু দের আশঙ্কা এবং স্বপ্ন ব্যাখ্যা স্বতন্ত্র। আমি সে ব্যাখ্যা মানি নি সে কথা টেলিফোনেই জানিয়ে দিয়েছিলাম তখন তখন। আশু দে সম্পর্কে সেকথা আলোচনা করেছি (১৬৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।) অন্যে আমার মৃত্যুর স্বপ্ন দেখলে ভয় পাই না, আমি নিজেও অনেকবার দেখেছি। গত ডিসেম্বর মাসেও (১৯৭০) দেখেছি একটা বেশ মজার স্বপ্ন। আমি মারা যাচ্ছি—দৃষ্টি কমে আসছে, একটা টাইমপীস ঘড়ি কানের সঙ্গে লাগিয়ে পরীক্ষা করছি—মৃত্যু সময়ে কি ভাবে কানে শোনার ক্ষমতা কমে আসে। মৃত্যুর জন্য কোনো দুশ্চিন্তাই হচ্ছে না স্বপ্নে। স্বপ্ন বলেই রক্ষা। জাগ্রত অবস্থায় হলে অবশ্যই ডাক্তার ডাকতে হত। আরো একবার নিজের মৃত্যুর স্বপ্ন দেখছিলাম এমনই নিস্পৃহ ভাবে। বছর ত্রিশ আগের কথা। পা ক্রমে ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। দুটো পা-ই ঠাণ্ডা হচ্ছে—বরফের মতো ঠাণ্ডা। আমি হাত দিয়ে দিয়ে দেখছি। অথচ কোনো দুশ্চিন্তা নেই মনে।

তারাশঙ্কর আমার বিষয়ে স্বপ্ন দেখে আমাকে দেখতে এসেছে, নিশ্চয় মূলে ঐরকম ভয়ঙ্কর কিছু আছে। এবং পাছে আমি ভয় পাই সেজন্য খুলে বলেনি কি স্বপ্ন সেটা। নানা বিষয়ে সেদিন অনেক আলাপ হয়েছিল, তর্কও হয়েছিল দুএকটি বিষয়ে। তারপর সে গেলে মনটা খারাপ হয়ে উঠল। বুঝলাম সেদিন তর্ক করাটা ঠিক হয়নি। তাই পরে একটা চিঠি দিলাম, ওসব মনে রেখো না, তুমি এসেছিলে সেটাই বড় কথা।

কোমল মন ভেজানোর পক্ষে ঐ চিঠি যে কতখানি অব্যর্থ হয়েছিল, তা বোঝা গেল তার উত্তর পেয়ে। উত্তরটি এই—

TALLA PARK
Calcutta-2

পরিমল,

ভালবাসার অরূপ রতন
গোপন মনের কোন্ সে কোঠায়
ধূলায় লুটায়।
শ্রান্ত রাতের অন্ধকারে

স্বপ্ন স্মরণ ক্ষণিক ছটায়
দীপ্তি ফোটায়।
সেই তো ভালো সেই তো ভাল,
তেল ফুরানো প্রদীপে সে
দহনহারা মায়ার আলো।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
২৫।৫।৫৬

তারাশঙ্কর চরিত্রে আর একটি বৈশিষ্ট্য আমি লক্ষ্য করেছি এবং তা আমার ভাল লেগেছে। তার আচরণে কূটবুদ্ধির কোনো খেলা নেই। তার কোনো বিষয়ে নিজস্ব মত প্রকাশেও চাতুরি নেই। যখন যা সত্য মনে হয়েছে বা ভুল করেছে মনে হয়েছে, তা আন্তরিকভাবে এবং সরল-ভাবে প্রকাশ করেছে, তাতে নিজের ভিতর থেকে কোনো বাধা অনুভব করেছে বলে মনে হয় না।

তারাশঙ্করের সাহিত্য কৃতি বা সাহিত্যের মূল্যায়ন আমি করব না, সে কাজ দেশবাসী করেছে। লক্ষটাকা পুরস্কার পেয়েছে তারাশঙ্কর (নোবেল প্রাইজ থেকে কয়েক হাজার মাত্র কম!) সেটা ফাঁকি নয়। ডকটরেট পেয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে (honoris causa) সেও সাহিত্য কৃতির পুরস্কার। মনের স্নেহ কোমলতা বা সরলতা বিষয়ে কোনো উপাধি নেই, তাই সেই দিকটিকেই আমি ভালবেসে এতটা বললাম।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ব্যঙ্গলেখক ডাঃ বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি জড়িত হয়ে আছে। কারণ বলাই নিজে একটি অদ্ভুত চরিত্র, আর সম্ভবত সেইজন্যই তার শিক্ষক বনবিহারীর প্রতি সে ভীষণ ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল। বনবিহারীর সঙ্গে তখন আমার পরিচয়ও বলাইয়ের জন্যই। সে ১৯২৫ সনের কথা।

বলাইয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় তার কয়েক বছর আগে। ১৯১৩ হবে। পরে ১৯১৭/১৮ থেকে কয়েক বছর আমি মাঝে মাঝে সাহেবগঞ্জে যেতাম আমার এক বন্ধুর কাছে। ১৯১৪ সনেও সেই বন্ধুর কাছে গিয়েই স্কুল বোরডিং হাউসে প্রথম সাক্ষাৎ। তারপর বলাই দুর্লভ। তার পরবর্তী ভাই ভোলানাথকে বেশি দেখেছি এবং আমার সাহেবগঞ্জের বন্ধু প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সেও কলকাতা আসত অতএব তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হল বেশি। তারপর ভোলা ডাক্তার হয়ে চলে গেল ভাগলপুর। বলাই রয়ে গেল কলকাতায়। ১৯২৩ সনে বলাইয়ের সঙ্গে পুনর্মিলন। তখন আমি ৬ নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলিতে থাকি (অল্প দিনের জন্য) তখন এম. এ. পরীক্ষার প্রস্তুতি চলছে সেখানে থেকেই ; এবং রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন এম্পায়ারে হবে, তারও প্রস্তুতি ঠিক সেই সময়ে।

পুনর্মিলন এবং ক্রমে গাঢ় মিলন। ঘোরাফেরার ব্যাপারে আমরা প্রায় সব সময় এক সঙ্গে। কোথায় নিমতলা ঘাট স্ট্রীটে তার ক্ল্যাসমেট সমরেশ ভট্টাচার্যের বাড়ি থেকে হেঁটে পার্ক স্ট্রীটের কাছে অবস্থিত বেনে-পুকুর রোড ক্রিমেটেরিয়াম স্ট্রীটে বলাইয়ের আর এক ক্ল্যাসমেট শিবদাস বসুমল্লিকের বাড়িতে যাওয়া। ক্লান্তিহীন পদযাত্রা—কত মাইল এখনো তা হিসাবের বাইরে আছে। শিবদাস বসুমল্লিকের ইতিহাস স্মৃতিচিত্রণে বিস্তারিত ভাবে লিখেছি—সে চরিত্র অদ্ভুত, অদ্বিতীয় এবং অতুলনীয়। তাছাড়া অবিশ্বাস্য।

১৯৩৩ সনে লেখা বলাইয়ের একখানি চিঠির অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি তা থেকে আমাদের সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যাবে।

ভাগলপুর

৭-১-৩৩

পরিমল,

··· আমাদের দুর্জনের বন্ধুত্ব এখন এমন একটা অবস্থায় আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে যে তাহাকে ভাষামুখর করিয়া তুলিলে তাহার অবমাননা করা হয়। কারণ আমি বিশ্বাস করি আমরা ভাষাদ্বারা মনোভাব প্রকাশ করিতে পারি না—অধিকাংশ ক্ষেত্রে গোপনই করি। তোমার এবং আমার মধ্যে যাহা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা ভাষাতীত।······

বলাই

ভাগলপুরের কড়া শীতে বসেও যখন এসব কথা সে লিখতে পেরেছে তখন তার আন্তরিকতায় সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই। এই ভাবেই চলছে গত ৪৭ বছর ধরে। ভাবের এই গভীরতা শেষ পর্যন্ত গাণিতিক চিহ্ন বা mathematical symbol দিয়ে এখনো আমরা মাঝে মাঝে প্রকাশ করে থাকি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রথমে একটি চিঠির নমুনা দেখাচ্ছি—

ভাগলপুর

১৯।৮।৬৪

পরি,···ছবি আঁকছি। রং নিয়ে খেলা। এখন ব্যস্ত পূজোর উপন্যাস নিয়ে। তোমাকে কারটুন পরে পাঠাব। সময় কম। আজ এখানেই থামলুম—$(CH)^n$

——ব

এই CH মানে চুম্বন এবং মাথায় n, অর্থাৎ চুম্বন সংখ্যাতীত। প্রীতির প্রতীপ স্বরূপ বিশুদ্ধ কৌতুক-চুম্বন পাঠানো বলাই প্রথম আরম্ভ করে ১৯৩৫ সনে। এর আগে থেকে তার রচনা লেখার অভ্যাস অনেক দিন বন্ধ ছিল। মাইক্রোসকোপের জগৎ নিয়ে ব্যস্ত। প্রায় আট বছর সে হাইবারনেট করছিল, এমন সময় আমি শনিবারের চিঠির সম্পাদন ভার পেয়ে (১৯৩২) বলাইয়ের লিখন-কেন্দ্রকে মাসাজ করতে আরম্ভ করলাম তার কাছে গিয়ে। আমি তখন খুব অসুস্থ। গলার ভিতর দানা গজিয়েছে, জ্বর লেগেই আছে প্রায় ত্রিশ দিন। অতএব বলাইএর কাছে গেলাম স্বাস্থ্য এবং লেখা আনতে।

অনেকদিন পরে তার নতুন করে লেখা। অনেক লেখায় দুজনের পরামর্শ ছিল, এমনকি যখন সে ছোট গল্প লিখতে আরম্ভ করল (বনফুলের ছোট গল্প

অনেক সময় কাগজের আধা পৃষ্ঠা) তখন কয়েকটিতে তার দুর্বলতা ধরা পড়ল। বললাম এ গল্পগুলি ছন্দে লিখলে সহজে জমে উঠবে। ছন্দে লেখা হওয়াতে সত্যাই সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটল, সুপাঠ্য হল এবং আশ্চর্য সুন্দর ছোট গল্পও হল। সংস্কারের কাজ আমাকেও করতে হয়েছিল কিছুদিন। বলাইয়ের যে অসাধারণ কল্পনা ও রচনাশক্তি চাপা ছিল, আমি খুলে দিলাম তার ছিপি। বলাইএর কৃতজ্ঞতা ছিল সেজন্য আমার প্রতি। আমাকে অজস্র লেখা দিয়ে শনিবারের চিঠি চালনা সহজ করে দিয়েছিল। এই চিঠিখানায়, তার কৃতজ্ঞতা এবং আত্মিক চুম্বনের সর্বপ্রথম প্রকাশ —

ভাগলপুর

২২।১১।৩৫

পরিমল,

…তুমি পাটনায় গেলে দেখিতে পাইতে যে তোমার হাতে-গড়া বনফুল কত লোকের মনোহরণ করিয়াছে। গড়িয়াছ বলিয়া গড় করিতেছি। চুম্বন লও …

বলাই

এরই নতুন নতুন রূপান্তর প্রায় প্রতি চিঠিতে অদ্যাবধি। আমি একবার লিখেছিলাম যথাবিহিত চুম্বন পুরঃসর নিবেদন—। কিন্তু বলাইয়ের অভিনবত্ব আরো বেশি এবং ব্যাপক। কয়েকটি নমুনা দিচ্ছি—

ভাগলপুর

৩০-১১-৫৭

পরিমল,…আমি লেখা নিয়ে খুব ব্যস্ত। আমার চুম্বন ব্যাংকের হিসাব (latest) নিম্নলিখিত রূপ। ফতুর হয়েছি।

Deposit—3,66,752

Withdrawal—3,66,785

তবু কিছু ওভারড্রাফট নিয়ে পঁচিশটি পাঠালাম। আপাতত এতেই সন্তুষ্ট থাক। পরবর্তী চিঠি—

ভাগলপুর

২৪-৫-৬০

পরি, তোমার কাছে চিঠি লেখার পর গত রবিবারের যুগান্তর দেখলাম। বুঝলাম গল্প সম্বন্ধে যা করবার নিজেই করেছ, আমার প্রয়োজন হয়নি।

চিরকালই তোমার সব ব্যাপারে "ডিটো" দিয়েছি। এবারেও দিলাম।... রবিবারের ইতস্ততঃ অতি চমৎকার! সহস্র চুম্বন পুরস্কার পাওয়া উচিত, কিন্তু স্টকে মাত্র একটি আছে, তাই পাঠালাম।

বলাই

যে ইতস্ততঃর কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার অংশবিশেষ এই—

......"চোখের সামনে সবাই দেখতে পাচ্ছে কলকাতার বড় বড় প্রায় সকল পথ এবং সঙ্কীর্ণ এবং সঙ্কীর্ণতর যাবতীয় গলি ক্রমেই অলঙ্কারের দোকানে ভরে উঠছে। এর একমাত্র কারণ সবাই জানেন, সোনার ক্রমবর্ধমান দর। সোনার দর যে পরিমাণ বেড়েছে, তাইতেই বাড়ি পাওয়া এতখানি দুর্ঘট হয়ে উঠেছে, এরপর সোনার দর যদি আরো বাড়তে দেওয়া হয়, তা হলে এখনো যারা কোনরকমে মাথা গোঁজার মতো স্থান সংগ্রহ করতে পেরেছে, তাদের ঠেলে বার করে দিয়ে সে সব স্থানে নতুন নতুন গহনার দোকান বসে যাবে।......ইতিমধ্যে সোনার দর আর যাতে বৃদ্ধি না হয়, তার জন্য মন্দিরে, মসজিদে, গির্জায় নিয়মিত প্রার্থনা চালিয়ে যাওয়া হোক। আমি জানি একমাত্র চোরেরা আমার প্রস্তাবের বিরোধিতা করবে, এবং মেয়েদের মধ্যেও অনেকে। তার অনেকগুলো কারণ আছে। হঠাৎ প্যারাডক্সের মতো শোনালেও এ কথা সত্য যে, মেয়েদের অলঙ্কার প্রীতির প্রধান কারণ সোনার দাম লোহার দামের চেয়ে বেশি। যদি লোহার দাম প্রতি তোলা ১৭০ টাকা হত, তাহলে মেয়েরা সর্বাঙ্গে লোহার অলংকার পরে বেড়াত এবং অপরাধীদের হাতে পায়ে বেড়ি পরানো হত সোনার।"...২২।৭।৬০

বলাইয়ের চুম্বন পরিকল্পনার অভিনবত্ব-সৃষ্টির এটুকুই যথেষ্ট প্রেরণা। আত্মপ্রেরণাজাত চুম্বন-সাহিত্যের নমুনা দিয়েছি, আরো কয়েকটি দিচ্ছি—পরে আরো দেব।

১। ...আর দিন সাতেক পরে গল্প পাইবে। একটু সময় দাও ভাই। চুমচুমচুম (২৭-৮-৫৬)

২। ...অনেকদিন চেষ্টা করেও আর আত্মসংবরণ করা গেল না। বৈজয়িক [বিজয়া থেকে বিশেষণ] চুম্বন নাও। (১২-১১-৫৬)

৩। ...চুম্বন ফাটকায় অসম্ভব লাভ হয়েছে, (চুম্বন)^n পাঠালাম। (১৪-১২-৫৭)

৪। ...গরম চুম্বন চাও না ঠাণ্ডা? দুরকমই স্টকে আছে আপাতত। দুইই পাঠালাম। (১৬-৯-৫৭)

৫। ...মুরগী-পুষ্ট দুটি। (২৪-১১-৬০)

৬। 'লু'-য়ে ভাজা খাস্তা কয়েকটা নাও। (২-৪-৬২)

৭। ...এখন 'ত্রিবর্ণ' নামক উপন্যাস নিয়ে ব্যস্ত আছি।...প্রচণ্ড গরম

পড়েছে। তার উপর পুরস্কারের বজ্রপাত। বড়ই বেকায়দায় আছি। বিপন্ন কয়েকটি পাঠালাম, ঝড় আর ধূলো থেকে অতিকষ্টে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম। (১৭-৪-৬২)

৮। ...কাল এখানে বৃষ্টি হয়েছে, সুতরাং স-জল ঠাণ্ডা কয়েকটা। (৮-৫-৬৬)

৯। ...চুম্বন শুকনো সব, আমসির মতো। তারই কিছু আচার সঙ্গে নিয়ে যাব। (৬-৬-৬৬)

১০। ...হাঁটু আমার বাতাতুর হয়েছে, আজ 'গাউট' - গম্ভীর কয়েকটি পাঠাচ্ছি। (১২-৭-৬৬)

১১। ...চুম্বন-শতক পাঠালাম। (১৫-২-৬৭)

১২। ...ঈষৎ বৃষ্টিসিক্ত খরাচুম্বন এক লক্ষ টন। (৮-৭-৬৭)

১৩। ...অনেক কিছু শিখলাম ['আমি যাঁদের দেখেছি' পাঠান্তে]। খুব ভাল লেগেছে। 'চেক বা হ্যাণ্ডনোট' দিয়ে এ আনন্দের দাম দেওয়া যাবে না। যায় না। Unchecked হয়ে কিছু করতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু আমার ড্রাইভার, রাম-কিস্তি দিয়ে ভাগলপুর চলে গেছে.. মাৎ হয়ে বসে আছি। সে ফিরলে যা হয় করব। In the meantime (চু + আ) । (১৪-৫-৬৯)

১৪। সংখ্যাতীত চুম্বনপূর্বক নিবেদন এই—আরও চাই। পা পিছলে পড়ে গিয়ে কিঞ্চিৎ বেকায়দায় আছি, তবু চাই। (১৭-১০-৬৯)

১৫। ৮ই মে নার্সিং হোম থেকে ফিরেছি। পেটে ২৫টি স্টোন ছিল।... শুনলাম তুমি একটা পুরস্কার পেয়েছ [মতিলাল ঘোষ পুরস্কার] সুখী হলাম। এ বাজারে সহস্র টাকা পাওয়া আনন্দজনক। আমিও কয়েক সহস্র পাঠাচ্ছি। (১৫-৫-৭০)

১৬। তোমার 'রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান' পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। অসংখ্য 'X' পাঠাচ্ছি।...আমি অনেক ভাল আছি। কবে দেখা হবে? আরও 'X' ...(২৯-৬-৭০)

উপরের ১৬ সংখ্যক পত্রাংশে 'X' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে তার একটা ইতিহাস আছে। আমি বলাইকে লিখেছিলাম kisses-এর জন্য K না লিখে ইংরেজী মতে X লেখাই তো ভাল, এবং ভালবাসার বদলে O। বলাই ইংরেজী কবিতায় এক চিঠি দিয়েছিল। আমি তার যে উত্তর দিয়েছিলাম তা এই—

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

এর পরেই যে চিঠিখানা হাতে উঠল সেখানা নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা। তার অনেক চিঠি আছে, কিন্তু সেগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য, একটিরও তারিখ নেই। এবং প্রায় প্রতি চিঠিতেই 'লেখা চাই' অনুরোধ। এ চিঠিখানার মাথায় আমি প্রাপ্তির তারিখ লিখে রেখেছিলাম। আমার এই সময়ে স্বাস্থ্যও একটু বেশি খারাপ হয়েছিল, চিঠিতে সেই কথা।

9 A Heysham Rd,

(প্রাপ্তির তারিখ ১৫।৭।৫৪)

পরিমলদা,

···তোমার চিঠি পেলাম। এমন অবস্থায় যে গিয়ে দেখা করবো, তার উপায় নেই। তোমার শরীরের কথা শুনে মনটা বড়ই উতলা হলো। এখন আমি বক-ধার্মিক হয়েছি, তাই ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন শিগগির তোমাকে স্বাভাবিক সুস্থ করে দেন। আমার ঠাকুর খুব ভাল কবিরাজ। কবিরাজ মানো ?

এত জিনিস লিখতে চাই, কিছু লিখতে পারছি না। জানি না কবিরাজ মহাশয়ের কি ইচ্ছা।

আমার ভালবাসা জেনো, বন্ধুদের জানিও।

ইতি

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ বড় সুন্দর ভাষায় লিখত। যে বিষয়েই লিখুক, তা তার হাতে প্রায় কাব্য হয়ে উঠত। পড়তে খুব ভাল লাগত। আবার এই ললিতভঙ্গি কোনো কোনো বিষয়ের লেখায় তার ক্ষতির কারণও ঘটিয়েছিল। বিজ্ঞান বিষয়ে ছোটদের জন্য লিখতে গিয়ে এর ত্রুটি ধরা পড়ে, কিন্তু সে পথ তার নিজস্ব ছিল না, হয়তো তার লেখা ছোটদের প্রিয়, অতএব তাকে দিয়ে বিজ্ঞান বিষয়েও লেখানো হয়েছিল।

ওর জন্য আমি একটি ধারাবাহিক লেখার কথা চিন্তা করছিলাম। শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল "অবিস্মরণীয় মুহূর্ত" শিরোনামে ২০টি রচনা, ১৯৫২-৫৩ সনে যুগান্তরে ছাপা গেল।

এই নামের একটি গৌণ ইতিহাস আছে। সেটিও বেশ চিত্তাকর্ষক। দ্বিতীয় যুদ্ধের কোনো এক সময়ে আমি ওয়েলিংটন স্কয়ার ধর্মতলার মোড়ের পুরানো বইএর স্টল থেকে চেসটারটনের Tremendous Trifles নামে একখানা বই কিনি। ছোটখাটো ঘটনাও যে, কোনো কোনো সময়ে কত বড় বা চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠতে পারে এ বিষয়ে কয়েকটি সরস রচনা আছে সে বইতে। ঐখান থেকে আমি প্রায় নিয়মিত পুরানো বই কিনতাম। এবং সব বইতেই হয় কোনো উঠে যাওয়া লাইব্রেরির রবার স্ট্যাম্প বা কোনো ইংরেজ ভদ্রলোক বা মহিলার নাম লেখা থাকত। নামগুলো আর পড়তাম না, নামে কোনো গুরুত্বও ছিল না। তথাপি এই নামেরও যে একটা ইতিহাস থাকতে পারে তা আবিষ্কার করি ঐ বইখানা কেনার প্রায় ২৫ বছর পরে। সে কথা পরে বলছি।

যুদ্ধের গোড়ার দিকের ব্যাপার। রেডিও থেকে মাঝে মাঝে আমার কাছে সরস কথিকার বিষয়বস্তু কি হলে ভাল হয় এ রকম প্রোগ্রাম করে দেবার জন্য অনুরোধ আসত। একবার ঐ 'ট্রেমেনডাস্ ট্রাইফ্‌লস' নিয়েই ৬টি কথিকার একটি প্রোগ্রাম করে দিয়েছিলাম। বাংলা কি নাম দেওয়া হয়েছিল এখন আর মনে পড়ে না। যাই হোক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণকেও একদিন ডেকে এই ধরনের একটা লেখা আরম্ভ করতে বললাম। শেষ পর্যন্ত আলোচনা গিয়ে দাঁড়াল, বিখ্যাত লোকের জীবনে কি ভাবে ছোটখাটো মুহূর্ত বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, এবং তা অনেক সময় তাঁদের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে, সেইসব কাহিনী লিখলে ভাল হবে। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ যা লিখল তা হল অদ্ভুত সুন্দর, রোমাঞ্চকর এবং শিক্ষাপ্রদ।

অবিস্মরণীয় মুহূর্ত পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৫৪ সনে। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ সব সময় একটা দুঃখের মুখোশ পরে থাকত। যেন কিছুই হল না, যেন পরমুহূর্তে তার সর্বনাশ হয়ে যাবে, এইরকম একটা ভাব। বঙ্গশ্রী মাসিক পত্রের সম্পাদক সজনীকান্ত দাসের খুব অনুগত ছিল নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ। ঐ মাসিকে চতুষ্পাঠী নাম দিয়ে ছোটদের একটি বিভাগ সে লিখত। তাছাড়া সে ও আমি দুজনেই মাঝে মাঝে বঙ্গশ্রীর সম্পাদকীয় প্যারাগুলো লিখে দিতাম। তার জন্য আমি টাকা পেতাম বঙ্গশ্রীর কাছ থেকে, এবং নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ পেত সজনীকান্তের কাছ থেকে। নৃপেন রেডিওতে ছোটদের শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান পরিচালনা করত। আমাকেও সে অনুষ্ঠানে ডাক পড়ত প্রায় নিয়মিত।

প্রমথনাথ বিশী একবার বঙ্গশ্রী দলের সবাইকে নিয়ে কবিতা লিখেছিল আগে বলেছি। আমি সেটি শনিবারের চিঠিতে ছেপেছিলাম, আমার অংশটি বাদ দিয়ে। নৃপেন সম্পর্কে প্রমথনাথ বিশীর লেখাটি ছিল এই—

ডু'ভল্যুম ডান হাতে ডু'ভল্যুম বামে,
ডু'ভল্যুম ফেলে রেখে পথে কিংবা ট্রামে,
আলুথালু কেশপাশ কে দাঁড়াল আসি
স্খলিত চাদর ঐ বেদনা বিলাসী?
দুঃখেরে কে আর্ট করে করেছে অভ্যাস?
সদাই নয়নে কার সন্ধ্যার আভাস?
বেদনার বৈতরণী-তরণী নাবিক—
বিরহের অনলের কে মহা সাগ্নিক?
আপনারা নাম বিনা এঁকে চিনিবেন,
সুনামা পুরুষ ধন্য ইনি শ্রীনৃপেন।

দশ লাইনের মধ্যে প্রায় পুরো নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ। প্রমথনাথকে অনুরোধ জানাই এইরকম মিনিয়েচার চরিত্রচিত্র সমসাময়িক সবার বিষয়ে লিখতে। লিখলে তা সবাই আগ্রহের সঙ্গে পড়বে। মিনি যুগের সম্মানও বাঁচবে তাতে।

'ট্রেমেনডাস্ ট্রাইফলস' আমার বহুদিনের সঙ্গী—প্রায় ত্রিশ বছরের। কিন্তু বছর তিনেক আগে হঠাৎ আবিষ্কার করি সে বইতে যে নাম লেখা আছে তা প্রেমেন্দ্র মিত্রের। ইংরেজীতে লেখা Premendra Mitra; Aug. 1926। এটি আবিষ্কার করামাত্র প্রেমেনকে টেলিফোন করে জানিয়ে দিলাম। প্রেমেন বলল, বইখানা কেউ চুরি করে সেকেণ্ড হ্যাণ্ড দোকানে বিক্রি করেছে। কথাটা বিশ্বাস হল, কারণ এ বইখানা অন্তত দুআনায় বিক্রির জন্য প্রেমেন কালিঘাট থেকে ওয়েলিংটন স্কয়ারে আসেনি। আমি এটি কিনেছিলাম চার আনায়।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

এবারে প্রেমেনের কথায় আসি। মনে পড়ে গেল অনেক কথা।

মনে পড়ার কথা থেকেই আগে মনে পড়ল একটি বিশেষ রচনার বিষয়। তুষারকান্তি ঘোষ সম্পাদিত অমৃত সাপ্তাহিকে একবার—"মনে পড়ল" এই নামে একটি ফীচার আরম্ভ হয়েছিল। আমার রচনাটি এই পর্যায়ে ২২-১১-৬২ তারিখের অমৃতে প্রকাশিত হয়। আমি প্রেমেন্দ্র মিত্রকে নিয়েই সেটি লিখেছিলাম। সেই রচনাটির অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি। তাতে তার চরিত্র বিশ্লেষণ যে ভাবে করেছি, পরে পাঠান্তে তার সঙ্গে তার পরিচিত সবারই মত মিলেছে। রচনাটি এই—

"একটি ব্ল্যাকমেলের কাহিনী। মনে পড়ল প্রেমেন্দ্র মিত্রের কথা। তাকে আমি গত বছর ব্ল্যাকমেল করেছিলাম।

"ব্ল্যাকমেল কথাটির একটি অর্থ হচ্ছে—কোনো অসুবিধাজনক বিষয় প্রকাশ করে জব্দ করব এই ভয় দেখিয়ে কারো কাছ থেকে টাকা আদায় করা।

"প্রেমেনকে ব্ল্যাকমেল করেছিলাম অনেকটা এই অর্থেই।

"কিন্তু কাহিনীটি বলবার আগে তার কিছু চরিত্র বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা দরকার।

"যাদের সঙ্গে প্রেমেনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন, সে যে-কোনো বিষয়ে বেশ মনোহর ক'রে বলতে পারে। এই বলা সে এমন একটি আর্টের পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে, তার মোহ থেকে তার নিজেরও এখন নিষ্কৃতি নেই। এজন্য স্বভাবতই তার বন্ধুর সংখ্যা বেশি আর তার লেখার সংখ্যা কম। সময় পাবে কি ক'রে?

"আলাপের বিষয় যাই হোক না কেন, প্রেমেনের কাছে সব বিষয়েরই সমান মর্যাদা। রোমান্টিক কবি-মানস। তার মানে যাকে বলে—exuberant intellectual curiosity—তা সব বিষয়ে, সব সময়। সে যদি তার কোনো সামান্য অসুখের বিষয় আলাপ শুরু করে, তবে সেই বিষয়টিকে সে একটি বৈজ্ঞানিক বিস্তারে টেনে নিয়ে যাবে এবং তাকে নতুন করে সাজিয়ে দর্শনীয়

করে তুলবে। তখন তা আর তার ব্যক্তিগত অসুখ থাকবে না, সে-অসুখ তখন একটি চিত্তাকর্ষক বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয় হয়ে উঠবে। এবং তার এই অসুখের জন্য তার প্রতি কারো সহানুভূতি দেখাবার দরকার হবে না। দেখাবার সুযোগও পাবে না কেউ। কারণ তার উদ্দেশ্য অন্য। সে শুধু অসুখটাকে মন থেকে টেনে এনে একখানা পেনটিঙের মতো বাইরে মেলে ধরবে।

"কথা না রাখা এবং কোনো বিষয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে লেগে না থাকার ব্যাপারটাতেও সে এমন একটি রম্য-মাধুর্য আরোপ করতে পারে যে তার কাছে অল্পক্ষণ বাস করলেও রুটীন-অনুসারীদের মনে তার প্রতি ঈর্ষা জাগবে। তার সমস্ত অভ্যাসের উপরেই সে একটা রোমাণ্টিক আবরণ পরিয়ে তাকে সবার বিস্ময়মিশ্রিত প্রশংসালাভের উপযুক্ত করে তোলে। ম্যাজিশিয়ানরা যেমন প্রতারণাকে আর্ট বানায়, প্রেমেনও ঠিক তাই করে। লেখা চেয়ে চেয়ে কাগজের লোকেরা যত তার কাছে ঘোরে, তত সে তাদের ফিরিয়ে দেয়, এবং তত তারা লেখা ফেলে লেখককে বেশি পছন্দ করতে থাকে। তার প্রতারণাই তার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ।

"প্রেমেনকে কোনো লেখা লিখতে বললেই সে ভারী সুন্দর করে বুঝিয়ে দেবে যে তার সময় বড়ই কম, এত কাজ তার। এবিষয়ে ঘণ্টাখানেক বক্তৃতা দিয়ে শ্রোতাকে সে মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে রাখবে।

"কাজের চাপে সে অস্থির।

এটি অবশ্য তার ধারণা মাত্র। সম্ভবত বিশ্বাসও।

"জেরা করে দেখিয়ে দিয়েছি, সে বস্তুত ব্যস্ত নয়, কাজের চাপ তার বিশেষ কিছুই নেই।

"বুঝতে পারে। এবং হাসে। কিন্তু ধারণা নষ্ট হয় না। পুনরায় বক্তৃতা দিতে উদ্যত হয়।

"এমন লোকের কাছ থেকে লেখা আদায় করা বড়ই কঠিন। ঘাড়ে চেপে না বসলে পাওয়া যায় না। একবার তার লেখা চেয়ে চিঠি দিয়েছিলাম, লিখেছিলাম, লেখা না দিলে গুণ্ডা লাগাব।

"কিন্তু তাতেও ফল হয়নি। গত বছর তাকে চিঠি পাঠানো হয়েছিল শারদীয় যুগান্তরের জন্য। যথারীতি "নো রিপ্লাই"। জানতাম লেখা এভাবে আসবে না। সময় প্রায় উত্তীর্ণ, এমন সময় প্রেমেন সশরীরে হাজির যুগান্তর সাময়িকী বিভাগে।

"উৎসাহপূর্ণ আবির্ভাব। এমন কি তার চরিত্র বৈশিষ্ট্যটাই ভুলিয়ে দিয়েছিল এসে। বললাম, লেখা দাও।

"ভুল ধারণা। লেখা নেই। অন্য কাজে এসেছে।

"তখন মনে পড়ল এই হল খাঁটি প্রেমেন। একে ভুললাম কি করে?

কিছু বললাম না। কিছু সময় লেগে গেল ভাবতে। পথ পেলাম একটা। বললাম, ভাই একজন তোমার অটোগ্রাফ চেয়েছে, যা হোক দু লাইন কবিতা লিখে দাও।

"কাগজ এগিয়ে দিলাম হাতে।

"প্রতিবাদ জানাল—এখন কি লিখব? কিছু ভাববার সময় নেই।

"বললাম, সেই তো ভাল। যা-তা এলোমেলো কিছু লিখে দাও। এলো-মেলো কথাটার উপর জোর দিলাম। ভাবলাম স্পষ্ট কোনো অর্থ হবে না, বেশ হবে।

"প্রেমেন তখন নিরুপায়। দুচার সেকেণ্ড চিন্তা ক'রে লিখে দিল অটোগ্রাফ। চার লাইন মোট, শিরোনাম ঐ "এলোমেলো"।

গুছিয়ে কি লিখব
দুনিয়াই এলোমেলো,
যাই লেখো তাই সই
কি বা কিসে এলো গেলো।

প্রেমেন্দ্র মিত্র
১৬-৯-৬১

"লেখাটি হাতে পাওয়া মাত্র পাশে যে ছিল তাকেই বললাম, অবিলম্বে প্রেসে পাঠাও পূজা সংখ্যার জন্য।

"প্রেমেন চেঁচিয়ে উঠল—না না, ওটা দিও না, দিও না। কি চাও, বল।

"গল্প চাই।

"তাই দেব।

"বেশ, তা হলে এটি প্রেসে পাঠাব না। কিন্তু যদি না দাও তা হলে পাঠাব।

"এর তিনদিনের মধ্যে তার গল্প পেয়ে গেলাম। ১৯৬১ (বাংলা ১৩৬৮

সালের) শারদীয় যুগান্তরে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'গল্পে নেই' নামক যে গল্পটি ছাপা হয় তা এইভাবে তাকে ব্ল্যাকমেল করে আদায় করা হয়েছিল।"

এ ঘটনার প্রায় তিন বছর আগে লেখা প্রেমেনের চিঠি পড়ছি, আর মনে করবার চেষ্টা করছি সে সময়ের কথা। চিঠিখানা এই—

বসুধারা

সচিত্র বাংলা মাসিক পত্রিকা

৪২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

৫-৮-৫৮

প্রিয়বরেষু,

পরিমল, আমার ওপর হয়তো চটেই আছ কিন্তু আমার অনুরোধ না রাখলে চলবে না। ''বসুধারা'র পূজাসংখ্যার জন্যে একটি রসরচনা চাই। তুমি ক্রনোমিটার ঘড়ির মত সর্বদাই নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য। লেখাটির জন্য নির্ভাবনায় রইলাম।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা

প্রীতিমুগ্ধ প্রেমেন্দ্র মিত্র

এচিঠির প্রথম লাইনের ইঙ্গিতার্থ এই যে, লেখা দেওয়া বিষয়ে প্রেমেন নিজে নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ তার কাছে অনেকবার লেখা চেয়ে পাইনি, আমার আগের রচনা থেকে তার চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যাবে। এবং না পাওয়ার জন্য আমি যে চটে আছি এটি তার কল্পনা মাত্র। কারণ আমি তার চরিত্র জানি। কিন্তু সে যে অপরাধী, এ চেতনা তার সব সময় মনে জাগ্রত আছে সেটি সুখের বিষয়। চিঠির মধ্যে বসুধারা নামটির সঙ্গে উলটো কমা (উদ্ধৃতি-চিহ্ন) ব্যবহার করা হয়েছে লক্ষণীয়। আমরাও করে থাকি। বাংলায় সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য বোঝাবার জন্য বিশেষ ক্ষেত্রে ঐ উলটো কমা ব্যবহার করতে হয়। ইংরেজীতে প্রপার নাউন লিখতে বড় হাতের অক্ষর ব্যবহার করা হয়, সেজন্য ইংরেজীতে অতিরিক্ত সুবিধা আছে, বাংলায় নেই। কিন্তু ঐ উলটো কমা যে, বিশেষ নামটিতে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত এ আইন আমার অল্প কয়েকজন পরিচিত বন্ধু ছাড়া অনেকেই জানেন না দেখতে পাই। প্রেমেন এটি ঠিকমতো ব্যবহার করেছে দেখে ভাষা ও চিহ্নাদির ব্যবহারের প্রতি তার যে মনোযোগ আছে তা অবশ্যই বোঝা যায়। ঐ চিহ্ন ব্যবহার না জানা থাকলে কেউ হয়তো লিখত "বসুধারার" জন্য রচনা চাই। এতে

মনে হওয়া উচিত মাসিক পত্রটির নামই বুঝি 'বসুধারার'। চিঠির শেষে দুটি বাক্যে অনুপ্রাস আপনা থেকেই এসেছে। এসব দেখে শুনে মন খুশি হয়ে উঠল, এবং লিখতে বসলাম।

লিখতে বসলাম, সুখে থাকতে মানুষকে ভূতে কিলোয় কেন? ভূতের এমন সদিচ্ছা হয় কেন? এতে তার কি উদ্দেশ্য সাধিত হয়? কিন্তু কি লিখেছিলাম তার নমুনা কিছু শোনাতে ইচ্ছা হচ্ছে। ভূতের কথায় কে না আকৃষ্ট হয়? ভূত-তত্ত্ব ভূ-তত্ত্বের মতোই জটিল। ভূর যেমন নানা স্তর-বিন্যাস আছে ভূতেরও তেমনি নানা স্তর-বিন্যাস আছে, যদিও আমার এই রচনায় তত্ত্বকথা বিশেষ কিছু নেই, আলোচনাটি সুখে থাকার সঙ্গে ভূতের কিলের সম্পর্ক বিষয়ে।

'সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়'

সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়—এই প্রবাদ বাক্যটির উৎপত্তি ইতিহাস আমি জানি না, কিন্তু এ কথা বিশ্বাস করি যে, এটি কোনো বিজ্ঞ লোকের কথা, নইলে আর এটি প্রবাদ বাক্যে পরিণত হবে কেন?

সুখে থাকতে অযথা যারা বিপদ ডেকে আনে, তাদের প্রতি বিদ্রূপ বর্ষণই এ প্রবাদবাক্যটির উদ্দেশ্য, যদিও বিদ্রূপ কতখানি সার্থক তা আমার কাছে স্পষ্ট নয়।

ভূত কি সত্যিই মানুষকে সুখে থাকতে দেয় না? কোনো মানুষ সুখে আছে এটা কি ভূতের পক্ষে অসহ্য? তাই কি সে সুখী লোককে কিলোতে থাকে? তাই কি সে তাকে সুখের গণ্ডি থেকে বার করে দুঃখের সীমানায় এনে ছেড়ে দেয়? অথবা এ কথার মানে কি এই যে, সুখে থাকতে ভাল লাগছিল না বলেই দুঃখকে ডেকে আনা হল?...

মানুষের সুখ দেখলেই যে-ভূতের ঈর্ষা হয়, কেউ সুখে আছে দেখলে যে-ভূত কিল মারতে আসে, সে-ভূত সমাজে আদৌ আছে কিনা সেই বিষয়েই আমার সন্দেহ আছে।

পৃথিবীর সব দেশেই ভূত সম্পর্কে অনেক গল্প প্রচলিত আছে, এবং এ সব গল্প থেকে সেসব দেশের ভূতদের চরিত্র বিষয়ে মোটামুটি একটা ধারণা হয়। দেখা যায় সভ্য দেশ মাত্রেই বহু সহৃদয় ভূত আছে এবং তারা মানুষকে সুখে থাকতে দেখলে কিল মারতে আসে না।

হ্যামলেট নাটকের ভূত হ্যামলেটকে বা অন্য কাউকে কিল মারেনি,

কারণ সে ছিল হ্যামলেটের পিতৃভূত, এবং কোনো পিতৃভূতই পুত্রের পিঠে কখনো কিল মারে না। এই নাটকে হ্যামলেটের পিতার ভূতই বরং রাজার লোকের হাতে মার খেয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।— ব্যাপারটা ঘটেছিল এই : হোরাশিয়োর বহু অনুরোধেও যখন রাজভূত কোনো কথা না বলে চলে যেতে চাইল তখন হোরাশিয়ো মারসেলাসকে বলল, ওকে থামাও। মারসেলাস বলল, ওকে (তা হলে) দণ্ডাঘাত করি? হোরাশিয়ো বলল, কর, যদি না দাঁড়ায়।

ভূত চলে যাওয়ার পর মারসেলাস দুঃখ করে এমন কথাও বলেছিল যে. এমন অভিজাত ভূতের উপর হিংস্র আক্রমণ চালিয়ে আমরা তার প্রতি বড়ই অন্যায় করেছি।

এই জাতীয় সব ঘটনা থেকে প্রমাণ হয় ভূত ও হিংসা এদুটি কথা সমার্থক নয়। মানুষের হাতে যে ভূত মার খেয়ে পালাতে পারে সে ভূত কতখানি নিরীহ ভেবে দেখা উচিত। অনেক ভূতের মধ্যে আবার বাঙালী-জনসুলভ হ্যাংলামিও আছে। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের লুল্লু গল্পে দেখা যায় এক ভূত খবরের কাগজের সম্পাদক হতে পারবে এই লোভে নিজের দেহ থেকে তেল নিষ্কাশিত হতে দিয়েছিল! এরকম মেরুদণ্ডহীন ভূত কখনো হিংস্র হতে পারে?

ভূত সম্বন্ধে আরো একটি দুষ্টবুদ্ধিজাত প্রবাদ প্রচলিত আছে। প্রবাদটি এই—

"ঠিক দুপ্‌পর বেলা ভূতে মারে ঢেলা
বলা কতই জানে ছলা।" (পাঠান্তরে "খেলা")

বলা নামক কোনো ভূত ঢিল মারে—যদি এর অর্থ এই হয়, তাহলেও একথা সত্য নয়, কেননা ঘড়ি ধরে ঠিক দুপুরবেলা কোনো ভূত অদ্যাবধি কাউকে ঢিল ছোঁড়েনি। আর, এর অর্থ যদি এই হয় যে, বলা নামক কোনো ব্যক্তি এ কাজ করে, তবে তো সব জলের মতো পরিষ্কার। বলা যে সেক্ষেত্রে কোনো ভূত নয়, বলা বাহুল্য। কিন্তু এ সব প্রসঙ্গত।

আসল প্রশ্ন—'সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়' প্রবাদটির প্রকৃত অর্থ কি? এর মূলে অবশ্যই কোনো সত্য আছে, যদিও তাতে ভূতের চরিত্রে কোনো কলঙ্ক স্পর্শ করে না। আমার বিশ্বাস সুখে থাকতে ভূতে কিলোয় এই কারণে যে, মানুষ নিজেই নিজের অনাবৃত পিঠটি ভূতের সামনে পেতে দিয়ে

বলে, "ভাই, এবারে কিলোতে থাক।" এ লোভ ভূতের পক্ষে সংবরণ করা কঠিন।...

হাজার হলেও ভূতও তো এককালে মানুষ ছিল? ভূত এই কারণেই সুখী মানুষের পিঠে কিল মারে। সুখী মানুষ নিজেই এটা চায়। সুখে থাকতে ভূতের কিল খেতে সে চায়। কেন চায় তার কারণ আছে।

মানুষ যখন 'সুখ চাই' প্রার্থনা করে, তখন অবশ্যই সুখের স্বরূপ তার কাছে স্পষ্ট নয়। যখন 'আলো চাই' প্রার্থনা করে, তখনো সে আলোর স্বরূপ না জেনে প্রার্থনা করে। এবং সুখ বা আলো পেলেও তা যে কি তা আগের অবস্থার সঙ্গে না মিলিয়ে বুঝতে পারে না। যে আলো সকল অন্ধকার দূর করে সে আলো আলোই নয়, তা তখন অন্ধকারের সমান। তেমনি সুখের মধ্যে একটানা বাস করলে বোঝাই যায় না সেটা সুখ কিনা। পাশে পাশে দুঃখ না থাকলে কেউ সুখের স্বাদ পেত না, পাশে পাশে অন্ধকার না থাকলে কেউ আলোর স্বাদ পেত না। হ্যালির ধুমকেতুর ল্যাজের মতো। শোনা গিয়েছিল এই ল্যাজ পৃথিবী স্পর্শ করলে পৃথিবী ধ্বংস হবে। অথচ যখন কথাটা শুনে লোকে আতঙ্কগ্রস্ত হচ্ছিল, ঠিক সময়েই সবাই আমরা সেই ল্যাজের মধ্যে বাস করছিলাম।

তাই সুখের বোধ জাগাতে হলে প্রত্যেক মানুষেরই মাঝে মাঝে একবার করে ভূতের কিল খাওয়ার দরকার হয়। বেঁচে থাকতে যেমন খাওয়াপরা চাই, সুখে থাকতে হলে তেমনি প্রত্যেকটি মানুষের একটি করে ব্যক্তিগত ভূত থাকা চাই। মানুষ যখন সুখের মধ্যে থেকে সুখের বোধ হারায় তখনই তাকে গা থেকে জামা খুলে ব্যক্তিগত ভূতের সামনে কিল খাবার জন্য গিয়ে দাঁড়াতে হয়।

মানুষের ইতিহাস এর প্রমাণ। মানুষ কোনো দিনই সুখে থেকে সুখকে বুঝতে পারেনি। কিন্তু ইতিহাসের কথা থাক। আমরা নিজেদের জীবনে প্রতি বৎসর দেখতে পাই, আমরা তার আগের বছর বেশি সুখে ছিলাম। ......আমি প্রমাণ স্বরূপ ১৮৫৪ সনের সম্বাদ ভাস্করের একটি খেদোক্তি উদ্ধৃত করছি—এক শতক আগের খবর।

'কলিকাতা নগরের সকল বস্তুই মহার্ঘ। তবে দরিদ্র লোকদিগের জীবন রক্ষার উপায় কি। শারদীয়া পূজা নিকট হইয়াছে দোকানি পসারিরাও দ্রব্যাদি অগ্নিমূল্য করিয়া তুলিয়াছে। মধ্যম প্রকারের মুগের মোন ২॥,

অড়হরের মোন ২।৶০ মাসকলাই মোন ১৷৷০ ···আতপ তণ্ডুল যাহা দুর্গা নৈবেদ্যে ব্যবহার হয়, তাহার মোন ২৷৷০ টাকা মধ্যম প্রকার ঘৃত সের একটাকা।'

আজ চালের মোন আড়াই টাকার স্থলে চল্লিশ টাকা! আজও সেই একই প্রশ্ন—

'মহাশয়,—দোকান থেকে ২টা টাকা দিয়ে দু'সের আতপ চাউল নিয়ে আসতে আসতে ভাবতে লাগলাম কোন যুগে বাস করছি। ৪০ টাকা চাউলের মন। ন্যায্য মূল্যের দোকানেও আতপ চাউল নেই কাজেই আমার মত মধ্যবিত্ত লোক ৪০ টাকা মন দরে কি করে কিনে বিধবা মা বোনেদের খাওয়াবে।'

এই সংবাদটি এই রচনা লেখার সময় আজকের (১-৯-৫৮) আনন্দ-বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত একখানি চিঠির অংশ।

(খুব বিস্ময়ের ব্যাপার যে, রচনাটি যেদিন লিখতে বসি সেই দিনই আনন্দবাজার পত্রিকায় ঐ সংবাদটি চোখে পড়ে, এতে দুটি বাস্তব চিত্র পাশাপাশি দেবার সুযোগ পাওয়া গেছে।)

আমি বলতে চাই যে, সুখে যখন থাকি তখন সে কথাটা আমরা তখন বুঝতে পারি না। সুখে থাকার জন্য কত সামাজিক বিধিবিধান গড়া হয়েছে, শাস্ত্রকারেরা হয়তো ভেবেছেন সমাজকে স্থায়ী সুখের গণ্ডিতে আটকানো গেল, কিন্তু এ সুখ মানুষের সহ্য হয়নি. কারণ তা সুখ কিনা বুঝতে পারেনি। সেই জন্যই তার মধ্যে বারবার ভূত ডেকে এনে তার সামনে পিঠ পেতে দিয়েছে।···

সমাজ জীবনের মতো ব্যক্তি চরিত্রও, নানা নীতিশাস্ত্র ও মোহমুদ্গর বারবার ভেঙে ভূতের কিল খেতে বেরিয়ে পড়েছে নিষিদ্ধ গণ্ডিতে, এবং চরিত্র ঠিক আছে কিনা যাচাই করেছে এই ভাবেই। চরিত্রের পিঠে এই কারণেই ভূতের কিল দরকার হয়, ভূতের কি দোষ?······

আমাদের দেশে বিবাহকে একটি স্বর্গ-নির্দিষ্ট বিধান বলে মানা হয়েছিল স্থায়ী সুখ ও শান্তির আশায়। মেয়েরা কি সুখেই না ছিল এতদিন, এমন কি বিধবা হয়েও কি তৃপ্তি! জীবিত অথবা স্বর্গীয় স্বামীরাও পরম নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু বিধবাদের স্থায়ী শান্তির পিঠে কিল মারতে এলো ভূতেরা—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মধ্যস্থতায়। (ভূতেরা এ কাজে সোজাসুজি সাহস পায়নি।)—

আর অবাঞ্ছিত দাম্পত্যের পিঠে কিল মারতে এসেছে বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনের ভূত। ······এমনি চলতে চলতে বিবাহ-বিচ্ছেদের সুখ যখন অপরিমেয় হবে তখন আবার মনে সন্দেহ জাগবে, 'সুখে আছি তো?'—ভূতেরা বলবে, আমরা প্রস্তুত আছি, আসব কি? বিচ্ছেদ-প্রাপ্তরা বলবে 'বোধহয় আসা উচিত।'—বলে পিঠ পেতে দেবে।...

রচনাটির অংশ উদ্ধৃত করা হল। প্রেমেন নিজেও বসুধারা সম্পাদনে যখন নিযুক্ত ছিল, হয়তো একটানা সুখ ছিল সে কাজে, তাই হয়তো অতিষ্ঠ হয়ে তার ব্যক্তিগত ভূতকে আহ্বান করেছিল। নইলে বুঝতেই পারত না সুখে ছিল কি না। তাই তার বসুধারা ত্যাগ। আকাশবাণীর কাজ ছাড়ার মূলেও হয়তো তার ব্যক্তিগত ভূতের হাত।

প্রেমেনের সঙ্গে প্রথম পরিচয় কি করে হল তা আর মনে পড়ে না। সম্ভবত সাবিত্রীপ্রসন্ন সম্পাদিত উপাসনা মাসিককে ঘিরেই! তবে ১৯৩১-এর শেষে অথবা ১৯৩২এর প্রথমে একটি ঘটনা মনে পড়ে যাতে ধরে নেওয়া যায়, এই সময়ের মধ্যেই বা কিছু পূর্বে পরিচয় ঘটেছিল। ঘটনাটি সম্ভবত সিনেমা ছবি দেখা উপলক্ষে, নইলে অতুলানন্দ চক্রবর্তী, প্রেমেন ও আমি সিনেমা পাড়ায় রিগ্যাল হোটেলে চিংড়ির কাটলেট খেয়েছিলাম কেন, তার অন্য কোনো অর্থ খুঁজে পাচ্ছি না। এটি একটি স্মরণীয় ঘটনা। আমি তখন থাকি পাল স্ট্রীটে, অতুলানন্দ সম্ভবত কলেজ রোতে, আর প্রেমেন তো তার পৈতৃক গৃহে—যার ঠিকানা এই ১৯৭১ পর্যন্ত বদলের কোনো কারণ ঘটেনি।

সেদিনের ঘটনা আরো একটু মনে পড়ে এই যে, অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের পরস্পরের মধ্যে দেখা হবে এই রকম একটা প্রস্তাব হয়েছিল। কিন্তু তার পরের ঘটনা ভোলা সহজ নয়।

এর বোধ হয় দুই সপ্তাহ পরে অতুলানন্দের সঙ্গে আমার দেখা। কেউ কাউকে চিনতে পারি না। প্রেমেনের সন্ধান পাওয়া গেল, সেও শীর্ণ এবং দুর্বল। এর অর্থ, আমরা তিনজনেই সেই হোটেলের খাদ্য খেয়ে ফুড-পয়জনিংএ আক্রান্ত হয়েছিলাম। এবং তার ফলে তিনজনেই বেশ শীর্ণ এবং দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম।

তারপর আমি ১৯৩২এর নভেম্বরে যোগ দিলাম শনিবারের চিঠিতে, সজনীকান্ত বঙ্গশ্রীতে। বঙ্গশ্রীর আড্ডায় সমসাময়িক প্রায় সকল লেখকের

ভিড় জমল। এবং সকল শিল্পীর। নামের তালিকা দীর্ঘ। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুশীল কুমার দে, মোহিতলাল মজুমদার, সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেম বাগচী, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, প্রমথনাথ বিশী, অতুলানন্দ চক্রবর্তী, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, অশোক চট্টোপাধ্যায়, বটকৃষ্ণ ঘোষ, সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী, মনোজ বসু, নলিনীকান্ত সরকার, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র প্রভৃতি। শিল্পীদেরও তালিকা আছে — যামিনী রায়, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, অতুল বসু, হরিপদ রায়, চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়, অরবিন্দ দত্ত ইত্যাদি। শিল্পীদেরও তো লেখক বলা যায়, কারণ 'চিত্র লেখা'ই হচ্ছে আসল শব্দ, পরবর্তী ব্যাবহারিক শব্দ অঙ্কন, তা থেকে আঁকা। সংস্কৃত যুগে শিল্পীরা চিত্র লিখতেন, অতএব তাঁরাও লেখক। এবং সেই জন্যই বঙ্গশ্রীর সেই ধর্মতলা স্ট্রীটের বাড়িটাই আমার মতে ছিল আসল Writers' Building।

প্রেমেন এখানে প্রায় নিয়মিত আসত। মাঝে মাঝে কবিতা ছাপা হয়েছে বঙ্গশ্রীতে। বঙ্গশ্রীর পূর্বরূপ উপাসনা মাসিকে তার 'সেতু' কবিতাটি আমাকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করেছিল। ঐ একটি কবিতার ভিতরে কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের এমন একটি শক্তি অনুভব করেছিলাম, যা আজও আমার মনে বিস্ময় জাগায়। এর অবশ্য কোনো ব্যাখ্যা নেই, ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টাও করব না।

বিরাট সেতু সে এ ধারের সাথে
ও ধার জুড়িতে চায়
সে সেতু হয়েছ পার ?···

'উপাসনা'তে এ কবিতা যখন প্রকাশিত হয় তখন প্রেমেনের বয়স বাইশ-তেইশ। এর উত্তরে এতদিন পরেও জানাই, সে-সেতু মনে মনে হাজার বার পার হয়েছি, এখনো হই।

প্রেমেনের চিঠি থেকে আর কিছু উদ্ধৃতি দেব না।

তবে তার লেখার যে দিকের প্রশংসা কেউ করেনি তা আমি করছি। — সে আমার চেয়ে হয়তো দশগুণ বেশি লিখেছে, কিন্তু এতে কাগজ খরচ এবং কালি খরচ হয়েছে দুজনেরই সমান, কারণ এখনো তার হাতের লেখা ম্যাগনিফায়িং গ্লাস ধরে পড়তে হয়।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

পুলিনবিহারী সেন যে আমার পত্র লেখকদের মধ্যে একজন প্রধানতম সে কথা পত্রস্মৃতির গোড়াতেই বলে নিয়েছি! এই শুভার্থী বন্ধুটি আমার জীবনের সকল আরাম ধ্বংসকারী এ কথা স্পষ্ট করেই বলা দরকার। ১৯৩৫ সনে তিনি প্রবাসী মাসিকের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন, তখন থেকে তিনি, আমার যে সব মুহূর্ত কুড়েমিতে কাটিয়ে দেব ভেবেছিলাম সেই সব মুহূর্তের উপর অবিরাম আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছেন। ১৯৭০এর শেষেও তার বিরাম হয়নি, এবং পরেও চলবে এমন আভাস পাওয়া যাচ্ছে। রবীন্দ্র-বিজ্ঞানীরূপে এঁর পরিচয় দিয়েছি আমার 'রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান' পুস্তকের ভূমিকায়। কবিদের কথার পরে তাই এই বিজ্ঞানীর কথা বলতে আরাম বোধ করছি। তবে তাঁর একটি জন্মগত স্বভাব-বৈশিষ্ট্য আছে। অর্থাৎ তিনি যে ব্রাহ্ম, এ চেতনা তাঁর মধ্যে প্রপঞ্চে প্রকট। আমি ব্রাহ্মণ হয়ে হ্মণত্ব ছেড়ে শুধু ব্রা-তে এসে ঠেকেছি, কিন্তু পুলিনবাবু ব্রাহ্মত্ব ছাড়তে রাজি নন। চেষ্টা করেছি, ছাড়াতে পারিনি। তাঁর সর্বপ্রথম দিকের যে চিঠিখানা আমার কাছে আছে তার ভাষায় তা অনেকটা প্রমাণিত হবে।—

THE PRABASI
120/2 Upper Circular Road
Calcutta
23/4/38

সবিনয় নিবেদন,

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা প্রবাসীর জন্য একটি গল্প পাইলে ভাল হয়। যদি দু-চার-দিনের মধ্যে দিতে পারেন বেশ ভালো হয়।

আপনি দিতে পারিবেন কিনা একটু জানিতে পারিলে সুখী হইব।

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

চিঠির শেষে 'সুখী হইব' না লিখে 'সুখী হওয়া যাইত' লিখলে নীতিধর্ম সম্পূর্ণ বজায় থাকত মনে হয়। তাঁর "সবিনয় নিবেদন" শেষ পর্যন্ত "প্রীতি নমস্কারান্তে নিবেদন"-এর ধাপে পৌঁছেছে, কিন্তু আজ ৩৫ বৎসরের মধ্যে

এই সম্বোধনের আর বিশেষ কোনো রূপান্তর ঘটেনি, যদিও ৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭০ তারিখের চিঠিতে পুনরায় "সবিনয় নিবেদন" দেখছি। এবং আরো পরে "সজ্জনবরেষু"। আমার পরিচিত সকল ব্রাহ্ম বন্ধু ব্রাহ্ম শব্দের অক্ষরটি বাদ দিয়ে "ত্য" বসিয়ে ব্রাত্য হয়েছেন, কেউ বা শুধু 'ব্রা' টুকু রেখেছেন vestige রূপে। কিন্তু পুলিনবাবুর 'হ্ম' হচ্ছে বিদ্যুতের পরিবাহিতা মাপের MHO নামক একটি একক, যার সঙ্গে অন্য একক OMH-এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। স্পর্শ করতে ভয় হয়। সব ওম্, তৎসৎ নয়।

আমার কাছে তাঁর যে কয়েক শত চিঠি আছে তা পুস্তকাকারে ছাপলে একজন আদর্শ কর্মী এবং দুর্লভ বাঙালী রূপেও তিনি খ্যাত হতে পারতেন, শুধু গবেষক রূপে নয়। আপন বিষয়ে এমন সকল দিকে সচেতন এবং যাঁর উপর কর্তব্য চাপাবেন তাঁর প্রতি এমন সদাজাগ্রত দৃষ্টি আর আমি দেখিনি। পদবী বদলের অধিকার আমার নেই, থাকলে পুলিনবিহারী সেনকে পুলিনবিহারী শ্যেন করে দিতাম। তাঁর সত্যই শ্যেন দৃষ্টি, তাই এই বাসনা।

যাই হোক, আমার প্রতি তাঁর তৎপরতা এতদূর গড়িয়েছিল যে, আমি শেষ পর্যন্ত বঙ্গীয় উন্মাদ আশ্রমের কাছাকাছি বাসা নিতে বাধ্য হয়েছি।

এখান থেকে আর এক ধাপ মাত্র। আপাত দৃষ্টিতে আমার প্রতি তাঁর ব্যবহারকে মমত্বপূর্ণ বলে বোধ হতে পারে, কিন্তু আসলে তা নয়। আসলে প্রতিহিংসা। আমাকে তিনি গবেষক বানাতে চেয়েছেন, পারেন নি। আমার এ দিকের ত্রুটি বিচ্যুতি অনেক, আমি মার্জনা চাইবার আগেই তিনি আমাকে মার্জিত করে ছেড়েছেন। একেবারে যাকে বলে সম্মার্জিত করা। তার দৃষ্টান্ত হাতেই আছে, যথাসময়ে উল্লেখ করা যাবে।

তিনি আমাকে কি ভাবে গোড়ার দিকে প্রলুব্ধ করেছেন তার দৃষ্টান্ত প্রথম উদ্ধৃত চিঠিখানিতে পাওয়া যাবে। মাঝখানে আরো আছে, গৌণ প্রমাণ দেওয়া যাবে, কিন্তু ১৯৪০এর শেষে তিনি প্রবাসী অফিস থেকে প্রথম আমার ঘাড়ে এক দায়িত্ব চাপালেন, জানালেন রবীন্দ্রনাথের সদ্য প্রকাশিত তিনসঙ্গী বইখানা আমাকে পাঠাচ্ছেন, একটা সমালোচনা লিখে দিতে। অবশ্য প্রবাসীতে এর পাঁচ ছ বছর আগে থেকে পুস্তক সমালোচকের দায়িত্ব ঘাড়ে চেপেছিল পুলিনবাবুর প্রবাসীতে যাবার আগে থেকেই। কিন্তু এ তো সে জাতীয় সমালোচনা নয়, রবীন্দ্রনাথের গল্পের বই, এবং তখন রবীন্দ্রনাথ

জীবিত। এবং তিনসঙ্গীর সমালোচনা লিখে দিলে তা প্রবাসীতে ছাপা হবে এমন কোন কথা নেই, তাঁর ইচ্ছা মতো কোথায় ছাপবেন কে জানে।

আমার লেখায় দেরি হয়েছিল এবং এ বিষয়ে পুলিনবাবুকে আমি ১৭।৭।৪১ তারিখে যে চিঠি দিই, এবং তিনি তারই পাশে তার যে উত্তর লিখে দিয়েছিলেন, তা থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

পুলিনবাবু, আপনার পাঠানো 'তিনসঙ্গী' যথাসময়ে পাওয়া গেছে। কয়েকদিন নিতান্ত সময় অভাবে কিছু করতে পারিনি, কিন্তু কাল থেকে লেখা আরম্ভ করে আজ শেষ করেছি। খুব হিসেব করে লিখতে হচ্ছে, দায়িত্ব বেশি। আপনি যদি সোমবার পর্যন্ত অপেক্ষা করেন, তা হলে আমার দিক থেকে ক্ষোভের কারণ কমে যায়।·· লেখাটা প্রবন্ধের আকারে হয়েছে।

এক পৃষ্ঠার চিঠির কোণে পুলিনবাবু লিখলেন—সোমবারেই দেবেন। বড় হলে আপত্তি নেই। আমাদের যেখানে সুবিধা হয় ছাপব, তাতে আপত্তি নেই আশা করি। সোমবার প্রবাসীতেই পাঠাবেন।—পুলিন।

লেখা পাবার পর পুলিনবাবু, আমার রচনার সঙ্গে যে চিঠি ছিল, তার উত্তরে লিখলেন---

১। টাকা পাঠানো হইল।

২। লেখাটি (তিনসঙ্গী) প্রবাসীতে (ফাল্গুন) ছাপা হইবে। আপনি অনুগ্রহপূর্বক আজ বিকেলে বা কাল ১০।১১টার সময় প্রুফ দেখিয়া দিয়া গেলে ভাল হয়।—পুলিন

"টাকা পাঠানো হইল", পূর্বে প্রকাশিত কোন গল্প বা প্রবন্ধের জন্য তা আমার হিসাবে নেই। কিন্তু প্রুফ দেখলে "ভাল হয়"—এই ভাষায় যে সুনীতি ও সৌজন্যের পরিচয় আছে তা থেকে পুলিনবাবুকে মুক্ত করা গেল না। ওকথা আধুনিক ভাষায় রূপান্তরিত করলে দাঁড়াত—"প্রুফ দেখে যাবেন, না দেখলে ভাল হবে না।"

তিনসঙ্গীর সমালোচনা যথানির্দিষ্ট সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল প্রবাসীর পুরো তিন পৃষ্ঠা, ১০ পয়েন্ট টাইপে। তিনসঙ্গীর তিনটি গল্প নিয়ে কিছু বিস্তারিত আলোচনা, একটি ভূমিকা সহ। এক পৃষ্ঠা ভূমিকার একটি সামান্য অংশ নমুনা দিচ্ছি—

"রসসৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি শুধু গল্পের পরিণতির জন্যই অপেক্ষা করেন

না। যে মুহূর্ত থেকে গল্প আরম্ভ হল, সেই মুহূর্ত থেকে তাঁর প্রকাশভঙ্গি একটা অপূর্ব দীপ্তি বিকিরণকারী ক্ষমতা লাভ করে। এতে গল্পের গতি কিছুমাত্র শিথিল না হয়েও গল্প দুদিক দিয়ে উপভোগ্য হয়ে ওঠে। কাজেই প্লটের দিক দিয়ে গল্প শেষ হলেও রসের দিক শেষ হয় না। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের গল্প একবার পড়ে পরিণতি কি হল জানলেই গল্প পড়া শেষ হয় না। বার বার পড়তে ইচ্ছা করে। তার একটা ছন্দ আছে, একটা সুর আছে, ...সেই ছন্দ সেই সুর মনের মধ্যে গুঞ্জন করে ফেরে।"

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে এলো। আমার এই রচনাটি থেকে রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্রজীবনী চতুর্থ খণ্ডে দুটি স্থানে আমার সমালোচিত 'শেষ কথা' ও 'ল্যাবরেটরি' থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এই উদ্ধৃতিতে একটা ভুল দেখা গেল। আমার রচনাটি "প্রবাসী ১৩৪৮ জৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত" লেখা হয়েছে। আসলে ১৩৪৭ ফাল্গুন সংখ্যায় বেরিয়েছিল। মুদ্রিত রচনা আমার কাছে আছে, এবং পূর্বে উদ্ধৃত পুলিনবাবুর চিঠিতেও বলা আছে ফাল্গুন সংখ্যায় ছাপা হবে।

বিশ্বভারতীতে পুলিনবাবু যোগ দেন ১৯৪১ সনের মার্চে। আর আমি যুগান্তরে যোগ দিই ১৯৪৫ সনের মার্চে। এই বছর থেকে আমি বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত নানা পুস্তক যুগান্তরে সমালোচনা করেছি। কিন্তু তার ভিতরে একখানি পুস্তক সমালোচনার জন্য পড়ে যেমন আনন্দ হয়েছিল, তেমনি কয়েকটি কারণে দুঃখও পেয়েছিলাম। পুস্তকখানির নাম পূর্ণকুম্ভ। কাগজে আমার 'প্রোফেশনাল' মত সমালোচনাকারে লেখার সময়, পুলিনবাবুকে ব্যক্তিগত চিঠিতে আমার নিজস্ব মত খুলেই লিখেছিলাম।

পূর্ণকুম্ভের লেখিকা প্রকৃত শিল্পী। চিত্রশিল্পের চেয়েও মনে হয়েছে ভাষা শিল্পী রূপে তাঁর উৎকর্ষ অনেক বেশি। তাঁর 'গুরুদেব' নামক বই থেকে আমি আমার অনেক লেখায় কিছু কিছু উদ্ধৃত করেছি নানা সময়ে। রীতিমতো রচনানুরাগের দৃষ্টান্ত। খুব মূল্যবান বই এটি। পূর্ণকুম্ভ সম্পর্কে আমার যা ক্ষোভের কারণ সে অন্য। পাঠান্তে আমি পুলিনবাবুকে এই চিঠিখানা দিয়েছিলাম...তা থেকে তা বোঝা যাবে।

২২।৭।৫২

প্রিয় পুলিনবাবু,

আপনার প্রেরিত পূর্ণকুম্ভ পেয়েছি, এবং আপনারই অনুরোধে যথাসম্ভব

শীঘ্র তার সমালোচনাও লিখে দিলাম। আগামী রবিবারে যুগান্তরে তা দেখতে পাবেন। শ্রীমতী রাণী চন্দের লেখা পড়ে বিস্মিত হয়েছি, অদ্ভুত ভাল লেগেছে তাঁর চিত্ররচন ভঙ্গি। বাংলাভাষায় তীর্থস্থান সম্পর্কে এমন বই যে হতে পারে তা কল্পনা করা দুঃসাধ্য ছিল। কিন্তু লেখিকাকে—বই পড়তে শুরু করে মনে করেছিলাম আগাগোড়া observer রূপে পাব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আশা পূর্ণ হল না। আমাদের দেশের জন সাধারণের মধ্যে ভক্তির যে আতিশয্য আছে—যে ভক্তির চাপে আমাদের মেরুদণ্ড কখনো সোজা হল না, জাতি হিসাবে আমরা যুক্তিবিচারের ক্ষেত্রে মাথা তুলতে পারলাম না, সেই অন্ধ ভক্তির advocate রূপে লেখিকা তাঁর সমস্ত লেখার মধ্যে শেষ পর্যন্ত প্রকট হয়ে উঠেছেন। এতে বেদনা বোধ করছি। রবীন্দ্রনাথ আমরণ যার বিরুদ্ধে লড়াই করলেন, ধর্মের নামে যে মাতামাতিতে তিনি পীড়া বোধ করেছেন, তারই অন্তত গৌণ সমর্থন আছে এই বইতে। লেখিকা পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে হয়তো সাময়িকভাবে carried away হয়ে পড়েছেন, কিন্তু এ বই ছাপবার আগে সে বিষয়ে তাঁকে সচেতন করে দেওয়া উচিত ছিল। তাই মনে হয় বিশ্বভারতী থেকেই এ বই প্রকাশিত হওয়া এক irony of fate ছাড়া আর কিছুই নয়।

রবীন্দ্রনাথ যেখানে শিল্পী সেখানে তিনি সবসময়েই আমাদের দেশের চরমতম অন্ধতাকেও শিল্পীজনোচিত সহানুভূতির সঙ্গে দেখেছেন, কিন্তু সে দেখায় artistic detachment ছিল, তার সঙ্গে নিজেকে কখনো জড়িত করেন নি। কিন্তু পূর্ণকুম্ভে শিল্পী-রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লেখিকা একপথে চলতে পারেননি! লেখিকা প্রকৃত শিল্পী হওয়া সত্ত্বেও যে এরকম কেন হল তা বোঝা কঠিন। গোল্ড্স্মিথের মতো তাঁর যে genial humour এবং satire, বাংলাভাষায় তার জুড়ি কম আছে। শিল্পীজনোচিত এই ক্ষমতা শেষ পর্যন্ত পাণ্ডার পায়ের ধূলোয় লুটিয়ে পড়ল এর চেয়ে দুঃখের আর কিছু নেই। নারীজনোচিত দুর্বলতা? হয়তো তাই। কিন্তু এ দুর্বলতা লেখার মধ্যেও আত্মপ্রকাশ করল এটা সত্যই দুঃখের। যদি সম্ভব হয় লেখিকাকে ভবিষ্যতের জন্য একটুখানি সচেতন করে দেবেন। অন্ধভক্তিতে তিনি দেশের কোটি কোটি লোকের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে পারবেন না, কিন্তু শিল্পীর ধর্মে যদি তিনি অবিচলিত থাকেন তা হলে লেখিকারূপে তাঁর মাথা সবার ঊর্ধ্বে উঠবে এ ভবিষ্যদ্বাণী করতে জ্যোতিষী হবার দরকার করে না। ইতি

পরিমল গোস্বামী

কবি ফ্রানসিস টমসন যেমন হাউণ্ড অভ হেভন-এর পশ্চাদ্ধাবন থেকে মুক্তি পাননি (রবীন্দ্রনাথকে অবশ্য তাঁর "সে" ঐ হাউণ্ডের মতো তাড়া না করলেও তার পায়ের ধ্বনি শুনতে পেয়ে লিখেছিলেন "সে যে আসে আসে আসে")—পুলিনবিহারী সেনের আচরণও আমার প্রতি প্রায় সেই রকম। হাউণ্ড অব হেভন-এর ভালবাসার তাড়া থেকে কেউ নিষ্কৃতি পায় না। পুলিনবাবুর সংস্পর্শে যাঁরাই এসেছেন, কম বা বেশি তাঁরা একথা মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন বলেই আমার বিশ্বাস। এমনকি তিনি একান্ত আমার স্বার্থের জন্যও, শুধু আমাকে নয়, অন্য অনেককে প্রায় উন্মাদ করেছেন। পুলিনবাবু বিবেক নামক একটি দুর্লভ বস্তুর অধিকারী। নিজে সন্ন্যাসী মানুষ, মাথায় একটি পাগড়ি বাঁধলেই তিনি সহজে স্বামীজি হতে পারতেন।

১৯৬১ সনে যখন তিনি দুই বৃহৎ খণ্ডে সমাপ্ত রবীন্দ্রায়ণ সম্পাদনা করেন তখন আমার লেখা "রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান" তার দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। সেই প্রবন্ধ ছাপার সময় আমাকে যেভাবে অস্থির করে তুলে-ছিলেন, যেভাবে আমাকে মার্জিত করতে চেয়েছিলেন, তাতে তাঁর বিরুদ্ধে আমার অভিযোগের কিছু প্রমাণ মিলবে। কিছু কিছু দৃষ্টান্ত আছে আমার হাতে। একটি এই—

July 31, 1961

সবিনয় নিবেদন,

আপনার প্রবন্ধ নিয়ে প্রথমে শৈথিল্য করেছিলাম।—উদ্ধৃত অংশগুলি মূল বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া আমার কর্তব্য ছিল, তা প্রথমে করিনি। কপিতে না, প্রুফেও না। যিনি প্রবন্ধকার তাঁর লেখায় বাদ পড়ে যাওয়া স্বাভাবিক।

আপনার প্রবন্ধ ১৭ ফর্মায় ১ পৃষ্ঠা গেছে (এতে বেশি উদ্ধৃতি নেই, এ পৃষ্ঠা অর্ডার দিয়েছি) তারপর ১৮-২২, ২৩-এও কিছু যাবে (২৩ এখনো পাইনি।)

১৮-১৯ প্রেসের তাগিদে অর্ডার দিয়েছিলাম, উদ্ধৃতি না মিলিয়েই, ২০-২২ মিলিয়ে আপনার কাছে সেই ফর্মাগুলি এই সঙ্গে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সব মেলানো হয়নি, যেগুলি মেলানো হয়েছে পাশে টিক চিহ্ন দেওয়া আছে।

কতকগুলি জিনিস করা উচিত ছিল মনে হয়, কিন্তু এখন আর করা চলে না ; এটি হয়ত বই করে ছাপবেন, তখন করে দিলে ভালো।

১—'আলোচনা' ও অন্যান্য বই থেকে যে প্রবন্ধ নিয়েছেন, সঙ্গে বইয়ের নামটি দিয়ে দেওয়া ভালো, তা নাহলে কেউ সবটা পড়তে চাইলে সহজে খুঁজে পাবে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দিয়েছেন, যেমন পঞ্চভূত।

২—ছিন্নপত্রের চিঠির সাল শুধু না দিয়ে তারিখও দেওয়া উচিত, যখন দেওয়াই আছে। তাহলে সংস্করণে কোনো ইতরবিশেষ হয়ে পত্রসংখ্যার তফাৎ হলেও ক্ষতি হবে না।

৩—প্রবন্ধের তারিখ যেখানে জানা নেই, বইয়ের তারিখ দেওয়া হয়েছে, সেখানে সেটি স্পষ্ট করে লেখা ভালো। যেমন আছে পঞ্চভূত, (১৮৯৭), পল্লীগ্রাম।—এই রকম করে দিলাম। (এ ক্ষেত্রে 'পল্লীগ্রাম'-এর তারিখও অবশ্য পাওয়া যেত, কিন্তু এখনই পাচ্ছি না। যদি বই আকারে প্রকাশের সময় দিতে চান তা হলে তখন সংগ্রহ করে দেওয়া যাবে। লেখা মনে পড়ছে—কয়েক বৎসর আগেকার।)

যে ক্ষেত্রে প্রবন্ধের তারিখ সহজপ্রাপ্য, দিলে একটু এগিয়ে যায়। তা প্রুফে করে দিলাম। আপনি বলতে চান প্রথম যৌবন থেকে রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞান গ্রন্থ পাঠ করছেন, কাজে যত এগয়।

'আত্মীয়তার বেড়া' প্রবন্ধটি খুঁজে পাইনি (প্রুফের ১৭১ পৃষ্ঠা)। এটি কোথায় আছে?

'আলোচনা' থেকে যে প্রবন্ধগুলি দেওয়া হয়েছে তার সাব-হেডিংগুলি প্রবন্ধের মত উল্লেখ করা হয়েছে। আমি সাব-হেডিংগুলি তুলে দিইনি, তার আগে প্রবন্ধের নাম দিয়েছি—ডুব দেওয়া:

...প্রুফে অনেকগুলি তারিখ আছে, যেমন বিজ্ঞানীদের জীবিত কালের। সেইগুলি আপনি একটু বিশেষ করে দেখে দেবেন, তা হলে খুব সাহায্য হয়। আমি উদাসীন থাকব।

—পুলিন

একটিমাত্র নমুনা দিলাম। "উদাসীন থাকব"—ওটা আমার উপর দায়িত্বটা বেশি দেওয়ার জন্য। কিন্তু উদাসীন তিনি মোটেই থাকেননি, তার অনেক প্রমাণ আছে, কিন্তু সেগুলি দেখানোর দরকার নেই। মোটকথা আমাকে তিনি স্থির থাকতে দেননি, যদিও আমি যতটা সম্ভব ফাঁকি দিয়েছি। তবে পুলিনবাবুর মাঝে মাঝে "বই করে ছাপলে ভাল হয়" অথবা "কবে ছাপবেন?" ইত্যাদি টেলিফোনের স্মরণকারী বাক্য শেষ পর্যন্ত



পুলিনবিহারী সেন

ফোটো : পরিমল গোস্বামী, ১৯৫৭

"রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান" পুস্তকাকারে ছেপেছি, (১৯৭০, নবগ্রন্থনা, ৮ কৈলাস বসু স্ট্রীট, কলিকাতা-৬)।

আমার জন্য অন্যকে কিভাবে অস্থির করেছেন, তারও কিছু নমুনা দিচ্ছি। এবারের আক্রান্ত ব্যক্তিটি শান্তিনিকেতনবাসী শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। ইনি ব্যঙ্গলেখক ও কারটুন-শিল্পী বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। আমি যখন ১৯৬৬তে "আমি যাঁদের দেখেছি" পর্য্যায় সাপ্তাহিক বসুমতী (সম্পাদনা: জয়ন্তী সেন) পত্রিকায় লিখছিলাম, তার মধ্যে বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন (এ বই পরে ১৯৬৯ সনে প্রকাশিত হয়: রূপা অ্যাণ্ড কোং)। কিন্তু বনবিহারীবাবুর মৃত্যুর পর (মৃত্যু ১৯৬৫) তাঁর সম্পর্কে আমার একটি রচনা দেশ, সাহিত্য সংখ্যায় (১৯৬৬) প্রকাশিত হয়। কিন্তু সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রকাশকালে ও তৎপূর্বে দেশে প্রকাশকালে আমি বনবিহারীর ভাইদের কাছ থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছি। এবং তারও মূলে পুলিনবিহারী সেন। বনফুল, জ্যোতির্ময়ী দেবী, ব্যোমকেশ মজুমদার, বনবিহারীর ছাত্র ডাক্তার ধীরেন্দ্র চৌধুরী, জবলপুরের জিতেন্দ্র-নাথ চৌধুরী (শেষের তিন জন আমার অপরিচিত) আমাকে কিছু কিছু সংবাদ পাঠিয়ে আমাকে সাহায্য করেন। (পরে ব্যোমকেশ মজুমদারের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে।)

বনবিহারী সম্পর্কে আমার প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় যুগান্তর সাময়িকী বিভাগে ১১-৭-৬৫ তারিখে, মৃত্যুর সপ্তম দিনে।

এ সব কথা আগে জানা থাকলে পুলিনবাবুর পরবর্তী চিঠিগুলি ও অন্যান্য চিঠির অর্থ পরিষ্কার হবে।

৫৪ বি হিন্দুস্থান পার্ক
কলিকাতা ২৯
জুলাই ৩০, ১৯৬৫

প্রীতি নমস্কারান্তে নিবেদন,

এই সঙ্গে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের দুখানি চিঠি পাঠাচ্ছি—সম্ভবতঃ আপনার কাজে লাগবে। কাজে লাগাবেন।

বনবিহারীবাবুর পুত্র কানাই তাঁর বাবার লেখার তালিকা করতে ইচ্ছুক। অনেক লেখা তো স্বাক্ষরহীন। কানাই সামন্তর মারফত উপদেশ দিয়েছি

আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে। বিনোদবাবুকে লিখেছি তাঁকে তাগিদ দিতে।

কানাই মুখোপাধ্যায় টেলিফোন করেছিলেন—জানিয়েছিলেন ফোটোগ্রাফ দেবেন।

—পুলিন

যে দুখানি চিঠির কথা পুলিনবাবু উল্লেখ করেছেন এবং আমাকে পাঠিয়েছেন, সে দুখানি বিনোদবিহারীর লেখা, পুলিনবাবুকে। তা এই—

শান্তিনিকেতন
১৪-৭-৬৫

নমস্কারান্তে, পুলিনবাবু,

আমার মেজদা সম্বন্ধে পরিমলবাবুর লেখা যথাসময়ে পেলাম। [এই লেখাটি যুগান্তরে ১১-৭-৬৫ তে বেরিয়েছিল আগে বলেছি, পুলিনবাবু নিজে উৎসাহ করে এটি বিনোদবিহারীকে পাঠিয়েছেন!] আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করবেন। আমার দাদা আপনার বাবাকে শেষ সময় চিকিৎসা করেছিলেন, সে খবর আমার জানা ছিল।···

ভারতবর্ষে বাঙালীর দশদশা নামে সর্ব প্রথম যে ব্যঙ্গ চিত্রাবলী প্রকাশিত হয়েছিল, সম্পাদক জলধর সেন মশায় সেই সঙ্গে যে ভূমিকা দিয়েছিলেন তা থেকে চিত্রকরের নাম জানা যায় না। সেটি দাদার সর্বপ্রথম ব্যঙ্গ চিত্র। দৈবক্রমে যদি পরিমলবাবু ব্যঙ্গচিত্র সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করেন তবে এই খবরটি তাঁর জানা দরকার। যদি পরিমলবাবু বা আর কেউ দাদার সম্বন্ধে কিছু তথ্য চান তবে আমার পক্ষে যতদূর সম্ভব আমি সাহায্য করতে প্রস্তুত।

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

পুলিনবাবুকে লেখা বিনোদবিহারীর দ্বিতীয় চিঠি—

শান্তিনিকেতন
২২-৭-৬৫

পুলিনবাবু,

···চারুবাবুর [চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য] পরিবারের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে নিশ্চয়। তাঁদের কাছে আমার দাদার ফোটো থাকবার কথা।

গ্রুপ ফোটো—চারুবাবু, তুলসীবাবু, দাদা, বেপরোয়া প্রকাশের সময়ের তোলা।…

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

এই গ্রুপ ফোটোখানাই আমার দুটি প্রবন্ধে ব্যবহার করেছিলাম, এতে বেপরোয়া সম্পাদক বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্যও ছিলেন। কিন্তু বনবিহারীর চেহারাটির, নেগেটিভ একটু বেশি রিটাচ করার ফলে, বদল ঘটেছিল, তা আমার খুব পছন্দ হয়নি। সেজন্য অন্য ফোটো যোগাড় করতে হয়েছিল কানাই মুখুজ্জের কাছ থেকে।

কিন্তু আসল কথা, আমার জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পুলিনবাবুর এতটা পরিশ্রম করা আমার পক্ষে আনন্দ যতটা, অস্বস্তিও ততটা। তবু এর পরেও আছে। এই চিঠিখানা আমার কথার সমর্থনে উদ্ধৃত করছি—

৫৪বি হিন্দুস্থান পার্ক
২৫-১০-৬৫

প্রীতিনমস্কার নিবেদন,

বনবিহারী মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে আপনি আরও লিখবেন এই রকম ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তাতে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের চিঠি কাজে লাগতে পারে বলে সেগুলি রেখেছিলাম— পাঠানো হয়নি, এখন পাঠাচ্ছি।

সম্ভবত বনবিহারীবাবু সম্বন্ধে লিখবার জন্য কোনো প্রধান কাগজ থেকে আপনি শীঘ্রই অনুরুদ্ধ হবেন।

পুলিন

কোন্ কাগজ থেকে তা আগেই উল্লেখ করেছি, অর্থাৎ 'দেশ' সাহিত্য সংখ্যা ১৯৬৬। এবারে পুলিনবাবুকে বিনোদবিহারী শান্তিনিকেতন থেকে আরো যে চারখানা চিঠি লিখেছিলেন তিনি তা এইসঙ্গে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তার একখানা থেকে দুটি লাইন উদ্ধৃত করি—

শান্তিনিকেতন
৩০-৭-৬৫

পুলিনবাবু,

দাদার ফোটো পাওয়া গেছে। প্রয়োজন হলে পরিমলবাবু পাবেন। পরিমলবাবু বেপরোয়া কাগজের তিনসংখ্যা সংগ্রহ করতে পারেন নি

লিখেছেন, আপনি নিজে থেকে ফোটোগ্রাফের কথা উল্লেখ করেছিলেন বলেই এ সম্বন্ধে আপনাকে জানালাম।...

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

বিনোদবিহারীর দৃষ্টি তখন এতই ক্ষীণ যে চিঠি সবই অন্যকে দিয়ে লেখাতে হয়েছে। কোনোরকমে নামটি সই করেছেন চিঠিগুলিতে। পুলিনবাবু বিনোদবাবুকে আনন্দ দেবার জন্য যা সব করেছেন তা অন্যান্য চিঠিগুলিতে আছে। সেগুলির উদ্ধৃতি এখানে নিষ্প্রয়োজন।

আমার জন্য অন্যের আরাম নষ্ট করা—এও পুলিনবাবুর বন্ধুত্ব বৈশিষ্ট্য। আজ ২৮-১২-৭০ তারিখে এই অংশটুকু লিখছি এবং আজ আমার মনে হচ্ছে আমারই একটি বিশেষ কাজের জন্য পুলিনবাবুর পাল্লায় পড়ে দুজন বিশিষ্ট দত্ত সম্ভবত আত্মগোপন করেছেন। এঁদের একজন অজিত দত্ত, অপরজন ভবতোষ দত্ত। আমার জন্য ঐ একই জাতীয় কাজে প্রতুল গুপ্ত পুলিনবাবুর পাল্লায় পড়েছিলেন। তিনি কর্তব্য সমাধা করে, শান্তিনিকেতনে (বিশ্বভারতীর উপাচার্যরূপে) পালিয়েছেন। কিন্তু এই নব 'হাউণ্ড অব হেভন' তদবধি নিজেই ঘনঘন শান্তিনিকেতনে যাতায়াত আরম্ভ করেছেন। প্রতুলবাবু স্থানত্যাগ করবেন কিনা চিন্তা করুন।

পুলিনবাবু একমাত্র কাজ ছাড়া আর সব জিনিসেই একটা প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে নিয়েছেন। 'লেডি উইন্ডারমিয়ার্স ফ্যান' নাটকে লর্ড ডারলিংটন বলেছিল "আমি প্রলোভন ছাড়া আর সবই দমন করতে পারি।" পুলিনবাবু নিজে ঐ রকম কোনো নাট্য চরিত্র হলে তিনিও হয়তো বলতেন, "আমি কাজের প্রলোভন ছাড়া আর সব দমন করতে পারি।"—নইলে দুবার বিশ্রামের জন্য কলকাতার বাইরে গিয়েও আমাকে বহুবিধ কাজের কথায় ভরা চিঠি লিখেছিলেন কি করে? একখানা চিঠি ১৯৪৯ সনে গালুডি থেকে, অপরখানি ১৯৫৬ সনে ঘাটশিলা থেকে।

ব্যাপারটা মোটেই হালকা নয় বলেই আমি হালকা সুরে লিখতে বাধ্য হচ্ছি। এবং সবই প্রায় ব্যক্তিগত কথা। তার বাইরে পুলিনবাবুর ঘাড় থেকে তাঁর নিজস্ব কর্তব্যের বোঝা নামিয়ে নিতে হলে ভারতীয় সংবিধান বদলের দরকার হতে পারে।

আমার আরামভঙ্গের শেষ যে চেষ্টা পুলিনবাবু করেছিলেন, তার কথা না বললে আমার কথা সম্পূর্ণ হবে না। আমি যখন 'আধুনিক ব্যঙ্গ

পরিচয়' নামক পুস্তক লিখতে আরম্ভ করেছি, তখন পুলিনবাবুর ইচ্ছা হল, তিনি আমার গ্রন্থপঞ্জীও করাতে ইচ্ছুক, এবং তা যেন ঐ বইয়ের সঙ্গে থাকে।

কিন্তু এ কাজ করতে আমাকে বেশ পরিশ্রম করতে হয়েছিল। বই সংগ্রহে প্রত্যেক বইয়ের প্রথম সংস্করণ চাই। খুব চেষ্টা করেও একখানা বইয়ের প্রথম সংস্করণ সংগ্রহ করা যায়নি। তাবপর তো সেই বইয়ের বোঝা পাঠানো হল পুলিনবাবুর কাছে। তিনি তা চাপালেন গ্রন্থপঞ্জী রচনায় সিদ্ধহস্ত সুবিমল লাহিড়ীর ঘাড়ে। সব শেষ হলে পুলিনবাবু দেখে শুনে মাঝে মাঝে কিছু মন্তব্য জুড়ে আমাকে পাঠালেন, তা ছাপা হয়েছিল। ছাপার অক্ষরে মোট নয় পৃষ্ঠাব্যাপী ১৯৩৬-১৯৬৯ পর্যন্ত প্রকাশিত, পুস্তকের পরিচয়। আধুনিক ব্যঙ্গ পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সে তালিকা। পুলিনবাবু পরে লিখলেন—

৫৪বি, হিন্দুস্থান পার্ক
কলিকাতা-২৯
৯-২-১৯৭০

সবিনয় নিবেদন,

...গ্রন্থপঞ্জী দেবার যে প্রস্তাব কবেছিলাম তাতে এখন আমি সুখী আছি —আপনার রচনার পরিমাণ পাঠকের কাছে প্রকাশিত হল।

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

পুনশ্চ—পুলিনবাবু প্রবাসীতে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাজ করেছেন, এবং নিজে সনতারিখ বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন. কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রথম দিকের লেখা চিঠির কয়েক খানিতে তারিখ লিখতে ভুলেছেন. এবং রবীন্দ্রজ্ঞানী ও রবীন্দ্রশিষ্য হওয়া সত্ত্বেও নামের পূর্বে শ্রীব্যবহার ছাড়েননি। সম্ভবত শান্তিনিকেতনে "পূর্বশ্রী"তে থাকেন বলে নামেরও পূর্বশ্রীটি বজায় রেখেছেন।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

ইতিপূর্বে আমি নীরদচন্দ্র চৌধুরীর কিছু কিছু পত্রাংশ অন্যত্র অন্য উপলক্ষে প্রকাশ করেছি। "আমি যাঁদের দেখেছি" বইতে নীরদবাবু সম্পর্কে পৃথক একটি অধ্যায় আছে, সেখানেও চিঠির অংশ আছে। এবারে অন্যান্য চিঠির অংশ উদ্ধৃত করব। অনেক দিনের স্মৃতি আছে সে সবের পিছনে। কিন্তু তার আগে নীরদবাবুর স্ত্রীর কয়েকখানি চিঠির অংশ পাঠককে উপহার দিচ্ছি। এবং এগুলিও নানা দিক থেকে চিত্তাকর্ষক বোধ হবে এবং এমন অনেক খবর জানা যাবে যা অন্যভাবে জানা সম্ভব ছিল না। এই চিঠিগুলি থেকে একটি আশ্চর্য চরিত্রের পরিচয়ও পাওয়া যায়। এমন সরলতা এবং নিজেকে অকপটে প্রকাশ, অনেকসময়ে যা ব্যক্তিগত ঘরোয়া কথা হয়েও সুন্দর সাহিত্যরসসমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। এমন প্রকাশ ক্ষমতা খুব সুলভ নয়। কিন্তু এ সব ছাড়াও শ্রীমতী অমিয়া চৌধুরাণীর চিঠি থেকে নীরদবাবুর চরিত্রও অনেকখানি জানা হয়ে যাবে। নীরদবাবুর চরিত্রের আর একদিকে যে কামলতা, স্নেহপ্রবণতা, এবং সরল বিদ্রূপপ্রিয়তা আছে, তা তাঁর কোনো রচনার ভিতরেই খুব সহজে প্রকাশ পায় না। অমিয়ার চিঠিগুলি থেকে তার কিছু কিছু আভাস এবং অনেক ঘরের খবর পাওয়া যাবে—

নিকলসন রোড
দিল্লী—৬
২৩-৩-৬৮

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার চিঠিখানা পেয়ে খুবই খুশী হয়েছি। উত্তর দিতে একটু দেরী হয়ে গেল। কারণ ভাবলাম ওঁর কাছ থেকে প্রাইজের খবরটা পেয়ে একেবারে লিখবো। কিন্তু খবরটা পাওয়ার পরও কলম নিয়ে বসতেও পারলাম না।

ভেবেছিলাম উনি বিলেত গেলে ভিজিটর আসা কমবে। কিন্তু উলটো হয়েছে ......। উনি যাবার আগে ছোট ছেলে সেই রাত্রেই কলকাতা থেকে এসেছিল। বাড়ী এসে এত লোক দেখে ভাবলে যে আমরা বুঝি পার্টি দিচ্ছি। পরে শুনে বলে, এ তো সাংঘাতিক কাণ্ড।

ওঁর ১৭ই মার্চের লেখা চিঠি আমি ২০শে পেয়েছি। লিখেছেন প্রাইজের সব বিবরণ এমন এলাহি যে লেখা সম্ভব নয়। মুখেই বলতে হবে। লিখেছেন, হাইড পার্ক গেটে পুরস্কার দেওয়া হোলো। তারপর লর্ড নরউইচ-এর বাড়ীতে ডিনার ছিল। অসম্ভব ভীড় হয়েছিল। লর্ড ও লেডি নরউইচ, লেডি ডায়ানা, ও আর দুজন সম্ভ্রান্ত লেডি, ফিল্ড-মারশাল অকিনলেক, উনি,—সকলে বসে। সামনে শ্যামপেন ইত্যাদি ও প্রাইজ ২০০ পাউণ্ড-এর একটি চেক ও ডাফ কুপারের বই অতি সুন্দর বাঁধানো। লর্ড নরউইচ প্রথম বক্তৃতা করেন, তারপর ফিলড-মারশাল, তারপর উনি দশমিনিটের জন্য বক্তৃতা করলেন। অ্যাসকুইথের মেয়ে ও আরও অনেক বিশিষ্ট ভদ্র মহিলা সব এসেছিলেন। এরপর ডিনার হোলো। সেও নাকি ভীষণ হৈ হৈ ব্যাপার। সকলে সমানে ফরাসী ভাষায় ও ইংরেজীতে বক্তৃতা চালিয়ে গিয়েছেন। লর্ড নরউইচ নিজে আমার পুত্রবধূকে নিয়ে টেবিলে বসেছিলেন।

উনি লিখেছেন. আপনার চিঠি পেয়েছেন, আপনাকে লিখতে যে পরে উত্তর দেবেন।...

আপনার ওঁকে লেখা চিঠি, বিভূতিবাবুর বিষয়ের ফাইল কপি. আমরা যথাসময়েই পেয়েছিলাম। [সাপ্তাহিক বসুমতীতে ছাপা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়ে লেখা, পরে "আমি যাঁদের দেখেছি" নামক গ্রন্থভুক্ত]... আমি ঐ ফাইল কপি আমার নিজের কাছে রেখেছি যত্ন করে। বিভূতিবাবুর সঙ্গে আমার খুবই আলাপ ছিল। কারণ উনি আমার বিয়ের পর এসে জোর করে আমার সঙ্গে পরিচয় করেন এবং কলকাতা থাকাকালীন প্রায়ই আসতেন ও দুতিন ঘণ্টা বসে আমার সঙ্গে গল্প করে যেতেন। তখন এমন মজার মজার কাণ্ড করেছেন যে আমারও ইচ্ছে আছে সেইগুলি একটু লিখি। লোকে পড়লে আমোদ পাবে।—এই দ্বিতীয় বিয়ে কেন করলেন এবং তারপরে তাঁর স্ত্রী কি করতেন সব।...লিখলে বোধ হয় অনুমতি নেওয়া উচিত হবে। আমি লিখে আপনাকে দেখতে পাঠাবো। ...আমি বিভূতিবাবু সম্বন্ধে যে লিখতে চাইছি এই প্ল্যানটা বলাতে উনিও বললেন তা মন্দ হয় না। তবে অমনি আবার পেছনে লাগলেন, একেবারে লেখিকা হয়ে যেতে চাইছ যে?

আপনি ছেলেদের খবর জানতে চেয়েছেন। বড়টি ধ্রুবনারায়ণ।

ওকে ত কয়েক বছর আগেও দেখেছেন। সে এখানে স্কুলে টাউন প্ল্যানিং ও আর্কিটেকচারে কাজ করছে। লেকচারার অ্যাণ্ড ফোটোগ্রাফার। চাকরিটা ভালই। ফার্স্ট ক্লাস গেজেটেড অফিসারের পোস্ট।...দ্বিতীয় ছেলের নাম কীর্তিনারায়ণ। সে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে সীনিয়র লেকচারার, বিষয় History of Economics in India and South East Asia... উনি ত ওদের কাছেই আছেন। কীর্তি লণ্ডনে বাড়ী করেছে ১৯৬৫সনে। ছোট ছেলের নাম পৃথ্বীনারায়ণ (আপনি যে বেবির ছবি তুলেছিলেন)—সে গত জুলাই মাসে বিলেত থেকে ফিরে এসে এইচ-এম-ভি তে দমদমে রেকর্ড প্রোডাকশনে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট মেকানিক্যাল ম্যানেজারের পোস্টে আছে। তাকে লণ্ডনের ই. এম. আই. থেকে এই কাজটা দিয়ে পাঠিয়েছে।... ইতি

বিনীতা অমিয়া

পুনশ্চ—লিখতে ভুলে গিয়েছি মেজ ছেলেকে এখান থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করার পরে বিলেতে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। সেখান থেকে সে বি-এ, ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট (Honours in History) পায় এবং ২৩ বছরের রেকর্ড ভঙ্গ করে। এরপর পিএইচ. ডি. করবার জন্য ব্রিটিশ গভরমেণ্ট স্কলারশিপ দেন। কিন্তু থীসিস সাবমিট করার আগেই সে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে লেক-চারার হয়ে ঢুকে যায় এবং তার দুমাস পরেই সে ডক্টরেট পায়।—অ

আর একখানা চিঠি, কিছু আগে লেখা, কিন্তু এ চিঠিতে প্রাইজ পাবার খবরে নীরদবাবুর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে কিছু খবর পাওয়া যাচ্ছে এবং ঐ সঙ্গে লণ্ডনের কিছু খবর।

নিকলসন রোড
দিল্লী ৬
১৩-৩-৬৭

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনি হয়ত আমার চিঠিখানা পেয়ে একটু আশ্চর্যান্বিত হয়ে যাবেন। তবে আপনি ওঁর সব খবর বিস্তারিত জানলে পর খুশি হবেন, সেই জন্য এই চিঠিখানা লিখছি।...

ওঁর এই প্রাইজ পাওয়ার খবর পাওয়া অবধি আমি কলকাতায় সকলকে জানাবার ইচ্ছায় ছিলাম, কিন্তু ওঁর হঠাৎ কোথা থেকে একটা লজ্জা এসে ধরলো যে কিছুতেই নিজে ত লিখলেনই না, আমাকেও লিখতে দিলেন না।

তারপর আমি এখানে যিনিই আসতেন তাঁকেই টেলিগ্রাম খানা দেখাতাম। এবং সরোজবাবুকে [সরোজ আচার্য] আমিই খবরটা দিই, ও টেলিগ্রাম খানা দেখাই।···

সম্ভবত উনি ৬ সপ্তাহ থাকবেন লণ্ডনে। আমি এখানে একাই আছি। আমার রক্ষক ওঁর অ্যালসেশিয়ান কুকুর ও ৩২ বছরের পুরোনো চাকর। একে আপনি দেখেছেন। ছেলেদের নিয়ে থাকতো কলকাতায়। ১৯৫৫ সনে বারো বছর বয়সে আমাদের বাড়িতে বহাল হয়।

ইতিমধ্যে ২৬শে ফেব্রুয়ারি হিন্দুস্থান স্ট্যানডার্ডের সান্‌ডে ম্যাগাজিনে আমার একটি লেখা বজ্‌রিগার পাখী সম্বন্ধে বেরিয়েছে, দেখেছেন কি ? আমি আজকাল অনেকরকম পাখী পুষেছি। আমাকে অবশ্য অনেকে এর জন্য পাগল বলে, কিন্তু আমার মনে হয় আমি যে ভাবে সংসারের কাজের ওপর, পাখী, বা গান, কুকুর, পড়াশোনা, শেলাই, লেখা এবং কিছু কিছু ওঁর প্রুফ ইত্যাদি দেখাশোনা সব করি এর চেয়ে আনন্দের আর কিছু নাই।

ইতি

বিনাতা অমিয়া চৌধুরাণী

পুনশ্চ: ওঁর যখন যেমন খবর পাই আপনাকে জানাবো। আপনার শরীর প্রায়ই ভাল থাকে না, সেজন্য বড় দুঃখ হয়। দিল্লী এসে আমরা দু-জনেই স্বাস্থ্য ব্যাপারে মুক্তি পেয়েছি। একবার এসে আমাদের কাছে কিছু দিন থেকে যান না ? আপনার মেয়েও ত এখানে আছেন।······অ. চৌ.

ডাফ কুপার পুরস্কারের ইতিহাস ও এ সম্পর্কে অন্যান্য খবর এইখানে বলে নেওয়া যাক। তথ্যগুলি আমি নীরদবাবুর কাছ থেকে পেয়েছিলাম। এই প্রাইজের নাম ডাফ কুপার মেমোরিয়াল প্রাইজ। ১৯৬৬ সনে নীরদচন্দ্র চৌধুরী এই পুরস্কার পান। পুরস্কারের মূল্য ২০০ পাউণ্ড।

ডাফ কুপার, ফার্স্ট ভাইকাউন্ট নরউইচ (১৮৭০—১৯৫৪) তাঁর অনুরাগী ও বন্ধুগণ মিলে একটি 'ট্রাস্ট ফাণ্ড' খোলেন। এর সুদ থেকে ইংরেজী বা ফরাসী ভাষায় পূর্ববর্তী ২৪ মাসের মধ্যে প্রকাশিত সাহিত্য পুস্তকের জন্য বার্ষিক পুরস্কার দেওয়া হবে এই উদ্দেশ্যে উক্ত ট্রাস্ট ফাণ্ড গঠিত হয়। এর জন্য দুজন স্থায়ী বিচারক নিযুক্ত আছেন (বর্তমান বিচারক লর্ড নরউইচ, ও নিউ কলেজ অভ অক্সফোর্ডের ওয়ার্ডেন সার উইলিয়াম হেটিস।) এ ছাড়া আরও তিনজন বিচারক আছেন—তাঁদের প্রত্যেকের স্থায়িত্বকাল তিন বৎসর।

এই তিনজন—(১) ভি. এস. নইপল, (২) সিরিল কনোলি, (৩) জন বেলি। এঁরা ১৯৬৬ সনের বিচারক।

বিধিবদ্ধ শর্ত--পুরস্কারের তারিখের ঠিক ২৪ মাসের মধ্যে প্রকাশিত জীবনী, ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি অথবা কাব্য। মূল রচনা ইংরেজী বা ফরাসী ভাষায় হওয়া চাই। রচনা পুরস্কারযোগ্য কিনা তা ডাফ কুপার প্রাইজ কমিটি স্থির করবেন।

১৯৫৬ থেকে ১৯৬৬ পর্যন্ত যাঁরা এই পুরস্কার পেয়েছেন তাঁদের ও তাঁদের পুরস্কার প্রাপ্ত পুস্তকগুলির নাম—

১৯৫৬ অ্যালান মুরহেড,	(পুস্তকের নাম)	গ্যালিপলি
১৯৫৭ লরেন্স ডারেল	,, ,,	বিটার লেমনস
১৯৫৮ জন বেটজেম্যান,	,, ,,	কালেকটেড পোয়েম্‌স
১৯৫৯ প্যাটরিক লইস ফেরমর,	,, ,,	মানি
১৯৬০ অ্যানড্রু ইয়ং,	,, ,,	কালেকটেড পোয়েম্‌স
১৯৬১ জোসেলিন বেইনস,	,, ,,	জোসেফ কনরাড
১৯৬২ মাইকেল হাওয়ার্ড,	,, ,,	দি ফ্রাংকো-প্রাশিয়ান ওয়র
১৯৬৩ এইলিন ওয়র্ড,	,, ,,	জন কীটস
১৯৬৪ আইভান মরিস	,, ,,	দি ওয়র্লড অভ দি শাইনিং প্রিনস
১৯৬৫ জর্জ পেনটার	,, ,,	মারসেল প্রুস্ট
১৯৬৬ নীরদচন্দ্র চৌধুরী,	,, ,,	দি কনটিনেন্ট অভ সারসি

প্রাইজের মূল্য যাই হোক, এর সম্মানমূল্য একজন বাঙালীর পক্ষে ইংরেজী ভাষায় লেখা বইএর জন্য পাওয়া কম নয় কোন দিক থেকেই।

নীরদবাবুকে তাঁর স্ত্রীর চিঠিগুলির মধ্য দিয়ে আরো নিবিড়ভাবে দেখতে পেয়ে আমি খুব খুশি হয়েছি বলেই শ্রীমতী অমিয়ার চিঠিগুলির প্রকাশ। তা ছাড়া চিঠিগুলির নিজস্ব মূল্যও যে কত বেশি তা আগেই বলেছি। এইবার পরবর্তী চিঠির অংশ—

নিকলসন রোড
দিল্লী-৬
৭।৪।৬৭

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

…আপনি আমার চিঠির অংশ… অনেককে শুনিয়েছেন জেনে ভীষণ লজ্জা পাচ্ছি। আমি কি কখনও লিখতে শিখেছি বা পারি?…আমার পণ্ডিত

স্বামী বরাবর আমাকে "খাসিয়া মেয়ে আবার বাংলা জানে নাকি" বলে হেসেই উড়িয়ে দিয়েছেন (কারণ আমি শিলং-এ জন্মেছিলাম এবং সেখানেই মানুষ হয়েছি)...বোর্ডিং হোস্টেলে থাকলে পড়াশুনা হয় না বিশেষ করে মেয়েদের। ক্লাস সেভেন থেকে আই-এ পর্যন্ত কলকাতা বোর্ডিং-এ থেকেই পড়েছি, শুধু মাঝে এক বছর ম্যাট্রিক দেবার সময় শিলং-এ পরীক্ষা দিই।... কলেজে যখন আই-এ পড়ি, সিটি কলেজে পড়তাম এবং বটানি ছিল। বটানিতে সব সময়ই ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছি। উনি আগে বটানি জানতেন না, আমি খুব উৎসাহ দিই, আমার পাল্লায় পড়ে এখন আমার চাইতে বেশী জানেন। বাগানও আমি ও ছোট ছেলে আরম্ভ করি। এখন উনি হাতে নিয়েছেন।...

জানেন একটা মজার কথা। যখন শ্যামবাজারের বাড়ীটায় থাকতাম, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আর একটা ফ্ল্যাটে থাকতেন? আমাকে রান্না করতে দেখলে ওঁকে প্রায়ই বলতেন, "লেখাপড়া শেখা মেয়ে বিয়ে করে কি লাভ হল? ঐ তো হাতা-বেড়ী-খুন্তি নিয়েই আছে।"—অবশ্য এঁরা এমন গ্রাম্য জীবন যাপন করতেন যে না দেখলে বোঝা যায় না। তবে ব্রজেনবাবুর কাছে একটা জিনিসের জন্য আমি আজন্ম কৃতজ্ঞ। তিনি তখনকার দিনে তিন ভলিউম Natural History অনেক দাম দিয়ে কিনেছিলেন। কেন যে কিনেছিলেন, কার জন্য ঐ বই, জানি না। আমার বিয়ের পর মাঝে মাঝে ওঁদের বাড়ীতে যেতাম এবং একটা একটা করে এনে প্রায়ই পড়তাম। আমার ঐ পড়ার উৎসাহ দেখে একদিন ব্রজেনবাবু বললেন, "দেখুন নীরদবাবু, ঐ বই তিনখণ্ড দিয়ে আমি আর কি করবো। আমি বৌমাকে ঐগুলি দিয়ে দিচ্ছি, তিনি এত যত্ন করে পড়েন, আমার খুব ভাল লাগে।" আমার যে কি আনন্দ তখন, বুঝতে পারছেন। নাচতে নাচতে দুপুরে গিয়ে বইগুলি ব্রজেনবাবুর স্ত্রীর কাছ থেকে নিয়ে এলাম। এবং এখনও বইগুলি আমরা দুজনেই পড়ি এবং ব্রজেনবাবুর কথা বলাবলি করি।...এককালে খুব ছবি আঁকতাম। বিয়ের পর সুনীতিবাবু [সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়] আমার অয়েল পেন্টিং দেখে বলেছিলেন, আপনি কখনও ছবি আঁকা ছাড়বেন না। রমেন্দ্র চক্রবর্তী এখানে...ভরতি করতে চেয়েছিলেন।... এখন মনে মনে বড় আফশোষ হয়।

যে আদর্শের পথে বরাবর চলতে চেয়েছি এখন জীবনের শেষ পর্যায়ে

তা অনেকটা ফলবান হয়ে ওঠায় মনে এইটুকু শান্তি পাই যে, হ্যাঁ অন্তত যা চেয়েছিলাম তা খানিকটা করতে পেরেছি।...আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবেন।

বিনীতা অমিয়া চৌধুরাণী।

নিকলসন রোড দিল্লী-৬
১৭।৪।৬৭

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

...ওঁকে ইজরায়েল সরকার ওখানে যাবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে নেমন্তন্ন করেছে। তারা ওখানকার পুরো খরচাপত্র দেবে। এতদিন ঠিক করে উঠতে পারেন নি, কি করবেন। আজ চিঠি পেয়েছি বিকালে। আসছে-কাল টেল আভিভে পৌঁছবেন, ওখানে কদিন থেকে ২৩ শে রওনা হয়ে ২৪ শে এখানে পৌঁছবেন।...এরপর ত ওঁর খবরাখবর ওঁর নিজের কাছ থেকেই পাবেন। এতদিন আমি আমার ডিউটি করে গেলাম।...

বিনীতা অমিয়া

নিকলসন রোড
দিল্লী-৬
২৮-৪-৬৭

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

কিছুদিন আগে আপনাকে যে চিঠি লিখেছিলাম পেয়েছেন নিশ্চয়ই।

উনি ২৪শে এপ্রিল সকালে ইজরায়েল থেকে এখানে এসে পৌঁছেছেন। এবারের সাপ্তাহিক বসুমতীতে ওঁর প্রবন্ধের উপর আপনার চিঠিখানা পড়ে ওঁর খুব ভাল লেগেছে এবং খুসী হয়েছেন। তাইতে আপনাকে লেখার জন্য বললেন। উনি আপনাকে পরে চিঠি লিখবেন। একটু শ্রান্ত ক্লান্ত আছেন আপনার চিঠিখানা আমারও খুব ভাল লেগেছে।

ইজরায়েল জায়গাটাও একটা দেখবার মত বলছেন। আর ওরা যা উন্নতি করেছে দিনে দিনে সে আর বলবার নয়। News from Israel পড়ে অবশ্য খানিকটা ধারণা হয়। একমাত্র আমাদের দেশই কি ছারখার হয়ে গেল। ...নিজের দেশের লোকই যেরকম ভাবে নিজের দেশের

ruin করছে বোধহয় আর কোনো জাত করেনি। উনি ত এক একসময় দেশের কথা উঠলে রীতিমত কাঁদতে থাকেন।…

ইতি

বিনীতা অমিয়া

আমার যে চিঠিখানার কথার উল্লেখ করা হয়েছে সেখানা ২০-৪-৬৭ সাপ্তাহিক বসুমতীতে ছাপা হয়েছিল। সে চিঠি এখানে উদ্ধৃত করছি—

শ্রীযুত নীরদচন্দ্র চৌধুরীর 'বাঙালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার—পঞ্চাশ বছর আগে ও পরে' (সাপ্তাহিক বসুমতী ৯-৩-৬৭) নামক রচনায় বাঙালী চরিত্রের একদিকের গতি ও প্রবণতা, এবং ভারতীয় অর্থনৈতিক মানে সে কোন স্থানে পড়ে আছে, তার একটি উৎকৃষ্ট বিশ্লেষণ। ত্রিশ বছর আগে নীরদবাবু যা বলেছিলেন, তা এখন পড়তে গেলে প্রায় 'প্রফেটিক' বলে বোধ হবে। দেখা যাবে প্রফুল্লচন্দ্রের অনুমিত মস্তিষ্কের অপব্যবহার পঞ্চাশ বছর পরেও চলছে, তবে উল্টো দিকে।

প্রফুল্লচন্দ্রের ঐ প্রবন্ধের তারিখ নীরদবাবু অনুমান করেছেন ১৯১০ বা ১৯১১। ঐ প্রবন্ধ পুস্তিকাকারে বেরিয়েছিল। দু-আনা দাম মনে পড়ে। আমিও কিনেছিলাম, হয়তো আরও কিছু পরে এবং পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। খুব সাড়া জাগিয়েছিল তা। প্রফুল্লচন্দ্রের ঐ রচনা প্রথমে বেরিয়েছিল সুপ্রভাত নামক মাসিক পত্রে, প্রকাশের বৎসর ১৯১০।

নীরদবাবুর আরও মনে পড়ে পুরাতন পন্থীরা প্রফুল্লচন্দ্রের এই লেখাটাকে "আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও তাঁহার মস্তিষ্কের অপব্যবহার" এই বলিয়া নিন্দা করিয়াছিলেন।"

এই পুরাতন পন্থীদের মধ্যে একজনের মনোভাবের প্রমাণ আমার কাছে আছে। তাঁর নাম ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বঙ্গবাসীতে পর পর পাঁচটি প্রবন্ধ লিখে প্রফুল্লচন্দ্রকে গাল দেন। মনে হয়, নীরদবাবুর এঁর কথাই অস্পষ্ট ভাবে মনে পড়েছে। পাঁচটি রচনার নাম ছিল "পি, সি, রায়ের মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার।" এর প্রথমটি প্রকাশিত হয় ১০ই পৌষ ১৩১৬ (ইং ১৯১০, অতএব নীরদবাবুর অনুমান ঠিক)। দ্বিতীয়টি ১৭ই পৌষ, তৃতীয়টি ২৪শে পৌষ, চতুর্থটি ২রা মাঘ এবং পঞ্চমটি ৯ই মাঘ। সাতদিন পর পর। ইন্দ্রনাথের ছদ্ম নাম ছিল পঞ্চানন্দ (এ নামে তাঁর কাগজও ছিল একখানা)—অতএব প্রফুল্লচন্দ্রের বিরুদ্ধেও পাঁচটি প্রবন্ধ লিখেই তিনি আনন্দ লাভ করেছিলেন।

ইন্দ্রনাথের প্রথম রচনাটি থেকে তারিখ ইত্যাদি জানা যাবে। তিনি এক স্থানে লিখছেন—'নির্বাসিত কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্যা শ্রীকুমুদিনী মিত্র বি-এ সম্পাদিত 'সুপ্রভাত' নামক কাগজে পি, সি, রায়ের এক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। প্রবন্ধের নাম বাঙালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার। সেই প্রবন্ধ পুস্তকাকারে পুনর্মুদ্রিত হইয়া বিক্রীত বা বিতরিত হইতেছে।'

প্রথম প্রবন্ধের প্রথম লাইনেই প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতি আক্রোশ প্রকট। যথা—'যিনি জাতিতে কায়স্থ, নামে প্রফুল্লচন্দ্র রায় ছিলেন, তিনি ম্লেচ্ছ দেশে গিয়া সায়েন্স শিখিয়া পুনরায় এদেশে আসিয়া ডক্টর পি, সি, রায় হইয়াছেন।'

ইন্দ্রনাথের সমস্ত যুক্তিই ভাবাবেগের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিচার, প্রাচীন শাস্ত্রাদি পটে। এবং তা 'সেল্‌ফ-ওপিনিওনেটেড। তা এই জাতীয়, যথা—

'শাস্ত্র প্রদর্শিত পন্থা পরিত্যাগ করাতেই···আমাদের বর্তমান দুর্দশা ঘটিয়াছে। সত্যের স্বরূপ কি, সত্যের আকার কেমন, পি, সি, রায় কি তাহা জানেন? সামান্য মনুষ্যের জাগ্রদ্দশায় যাহা সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়, পরমার্থতঃ তাহা যে সত্য নহে, একথা পি, সি, রায় কখনও শুনিয়াছেন কি? যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয়, দূরবীক্ষণ অণুবীক্ষণের সাহায্যেও যাহা দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাকে আমরা স্থূল পদার্থ বলি। আর যাহা···কোনও যন্ত্রের সাহায্যে মনুষ্যের জ্ঞানগম্য হয় না, তাহার নাম সূক্ষ্ম পদার্থ। পি, সি, রায় স্থূল-সূক্ষ্মের এই প্রভেদ অবগত আছেন কি? যোগসাধনার বলে—তপস্যার বলে, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানে, মৃত্যুর এধারে এবং ওধারে সমান দৃষ্টিসম্পন্ন হইতে পারা যায়, পি, সি, রায় সে বিষয়ে কোনও সংবাদ রাখেন কি?'

সংবাদ যে তিনি রাখতেন না, তার প্রমাণ তাঁর বেঙ্গল কেমিক্যাল নামক স্থূলবস্তুসর্বস্ব প্রতিষ্ঠানের জন্মদান।

পরবর্তী চিঠিতে সরস দাম্পত্য সংবাদ আরো পাওয়া যাবে। বাংলার ভবিষ্যৎ বিষয়ে লেখিকার নিজস্ব আশাবাদ অতি চমৎকার ফুটেছে এতে।

Nicholson Road
Delhi-6
26-5-67

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার চিঠিখানা পেয়ে খুবই খুসী হয়েছি। আপনি অনেকদিন উত্তর দেননি দেখে ভাবলাম হায় হায়! অত করে বিলিতি কাগজে লেখা চিঠিখানাই হারিয়ে গেল। অবশ্য আপনার বন্ধুরই বিশেষ ইচ্ছায় ঐ কাগজে লিখতে বাধ্য হয়েছিলাম। আমি আপনাকে একখানা ইনল্যাণ্ড লেটারে লিখবো বলে সবে ঠিকানাটা লিখেছি, উনি এসে এমন ধমক দিলেন যে বাধ্য হয়ে ঐ কাগজ নিয়ে চিঠিখানা লিখে ফেললাম। হাজার হলেও ১২ বছরের বড়, পণ্ডিত মানুষ, গুরুজনও বটে, তাই আর অবাধ্য হতে পারলাম না। ···বিলেত যাবার আগে কাউকে চিঠি লিখবো বলে ওঁর কাছে কাগজ চাইলেই নিজের ফ্রেঞ্চ 'মটো' লেখা কাগজ এনে ধরে দিতেন। তাইতে একদিন ঢুত্তোর বলে আমি আমার নিজের আলাদা স্টেশনারি কিনে নিয়ে আসি। আজ ওতেই লিখছি। এখন দেখি মাঝে মাঝে ওঁরও আমার ওগুলোতে হাত পড়ে। বিলেত থেকে আর-একটা নোট লেটার এনেছেন, নমুনা স্বরূপ অন্য সময় আপনাকে পাঠাবো।···

আজ ওঁর কাছে আপনার চিঠি এসেছে। ...আমার একটা বক্তব্য আপনাকে লিখছি, এবং আমি সর্বক্ষণ ঐ এক কথা ওঁকেও বলছি। আপনার ওঁকে লেখা চিঠিখানায় বাংলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অসম্ভব একটা নিরাশার ছায়া প্রতিবিম্বিত হয়েছে এবং এখানে উনিও কথায় কথায় ঐ রকমই বলে থাকেন। কিন্তু আপনারা এত নিরাশ হয়ে পড়ছেন কেন বুঝি না।...আপনারা এ রকমভাবে হাল ছেড়ে দিলে চলবে কেন? আমার পরিষ্কার ধারণা এখনও বাংলা দেশে ও বাংলার বাইরে প্রবাসী বাঙালী মিলে অন্তত তিন চতুর্থাংশ আপনার, ওঁর, লেখা পড়েন এবং পড়তে উৎসাহ বোধ করেন। আমার মনে হয়...আপনাদের সমস্ত অগ্রাহ্য করে চলতে হবে। এজন্য আমার বিশেষ অনুরোধ, অনুগ্রহ করে এত উৎসাহহীন হবেন না। আমি সমস্তক্ষণ ওঁকেও এই একই কথা বলছি। আপনাদের যা বক্তব্য তা আপনারা বলে যেতে থাকুন এবং তা ইতিহাসে অমর হয়ে থাকতে বাধ্য।...

আপনার কথাসাহিত্য মাসিকে রবীন্দ্রনাথের গানের ওপর লেখাটাও আমার খুব ভাল লেগেছে। গতকাল বিকেলে আমি ওঁকে বলছিলাম, উনি এখনও পড়েননি। আজ দুপুরে আমার বৌমার [ধ্রুবনারায়ণের স্ত্রী] খাবার টেবিলে বসে হঠাৎ বললেন যে "মা, ঐ লেখাটা পড়েছেন কি? খুবই চমৎকার লিখেছেন।"...

তারপর আপনার লেখা একটা কথার উত্তর দিই। আপনি লিখেছেন "আপনারা তো এখন আন্তর্জাতিক"—এটা ঠিক কথাই লিখেছেন। আমাদের যে পরিমাণ বিদেশী মহলে যাওয়া আসা করতে হয় এবং আপনি শুনে আশ্চর্য হবেন এখানে ওঁর এবং আমার বেশীর ভাগ বন্ধু-বান্ধবই বিদেশী—দুই চারজন ভদ্র বাঙালী পরিবার ছাড়া।...

মারগারেট [মিসেস মারগারেট চাটার্জি, এর কথা পরে আসবে] খুব আপনার গল্প করে। আমি ওকে বাংলা বই দিয়েছি পড়তে, কিন্তু বলে শক্ত বই।...

আপনি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানবেন।

ইতি

বিনীতা অমিয়া

পরবর্তী চিঠিতে দাম্পত্য কলহের একটি সরস ইঙ্গিত আছে, এবং এই

প্রসঙ্গে এই চিঠির পরেই নীরদবাবুর একখানা চিঠির অংশ উদ্ধৃত করব, তা থেকে বিষয়টা পরিষ্কার হবে। চিঠিব গোড়ার দিকে অন্য কথা অবশ্য।

দিল্লী-৬

শ্রদ্ধাস্পদেষু, ৬-১-৬৭

...আপনার চিঠি ওঁর কাছে অনেক দিন আসেনি। আপনি অসুস্থ নন ত? আমরা দুজনেই আশা করেছিলাম যে ওঁর লেখাটা "দুই রবীন্দ্রনাথ" দেশে পড়ে আপনি হয়তো ওঁকে চিঠি দেবেন। সম্প্রতি একটা বাংলা বই নিয়ে খুব ব্যস্ত আছেন। গজেনবাবুরা [মিত্র অ্যাণ্ড ঘোষ] ছাপছেন বইখানা। আপনি কি প্রতি সোমবারে উনি যে, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে কমেনটারি লেখেন, তা দেখেন? না দেখে থাকলে দেখবেন। ওঁর লেখাগুলি নিয়ে দেশী বিদেশী দুই মহলেই খুব বেশী আলোচনা হচ্ছে। বেশীরভাগ বিদেশী ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা admirer হয়ে দাঁড়াচ্ছেন। এখানে যিনি ডেনিশ অ্যামব্যাসাডর এতাদিন ওঁর লেখা পড়ে সমানে চিঠি লিখতেন। গরমে দেশে চলে গিয়েছিলেন। আসছে কাল তাঁর বাড়ী ডিনারে নেমন্তন্ন করেছেন আমাদের।...

এতক্ষণ ধরে একটা কথা লিখতে ভুলেই গিয়েছিলাম। উনি, আপনি "কল্যাণীয়াসু" লেখাতে যে সব ঠাট্টা মন্তব্য কয়েছেন [ওঁর চিঠিতে] সেটা পড়ে আমি যখন....ধমক দিলাম যে এসব আবার কে লিখেছে, তখন বললেন, আচ্ছা আচ্ছা, সব কেটে দিচ্ছি। তারপর রান্নাঘরের দোরে গিয়ে আমায় বললেন, সব কেটে দিয়েছি। আমি তখন রান্না নিয়ে খুব ব্যস্ত এবং আমি জানি ইচ্ছে করেই নষ্টামি করবেন, যাতে আপনি মনে করেন যে ওটা আমিই কেটেছি। বরাবরই এত পেছনে লাগবার চেষ্টা করেন, তবে আমি নির্বিকার। ···তখন চুপ করে না থেকে উপায় কি।

কিছুদিন আগে মারগারেট এসেছিল। জিজ্ঞাসা করেছিল আপনার চিঠি পেয়েছি কিনা। সেও আপনার চিঠি অনেক দিন পায়নি, বলল। —এবারে দিল্লীতে খুব বৃষ্টি হচ্ছে আর ছাদের বাগানে খুব ফুল ফুটেছে। আজ তিন চারটে ফুলদানিতে সাজাবার মত ফুল কেটে এনেছি। সারাদিন দুজনেই যে যার কাজে ব্যস্ত থাকি। সন্ধ্যাবেলা বসে মিউজিক শুনি এবং আমাদের সব পুরোনো বন্ধুদের কথা বলাবলি করি। ···প্রণাম জানবেন।

ইতি অমিয়া



দুটি পুত্র সহ নীরদচন্দ্র চৌধুরী ও অমিয়া চৌধুরাণী

ফোটো : পরিমল গোস্বামী, ১৯৩৬

চিঠিখানার স্ত্রীসম্পর্কে যে টিপ্পনি ছিল তা নীরদবাবু এমনভাবে কেটে ছিলেন যাতে সবই পড়া যায়। তার উত্তরে লিখেছিলাম, কাটা অংশ পড়া যাচ্ছে কিন্তু। সে চিঠির কাটা অংশ উদ্ধৃতিযোগ্য না হলেও তার পটভূমিটি কি তা নীরদবাবুর নিজের লেখা এই চিঠি খানাতে কিছু বোঝা যাবে। নীরদ-বাবু লাইনগুলি কেটে দিয়ে পাশে লিখে দিয়েছিলেন "পত্নীর শাসনে কাটিতে হইল। কড়া সেনসরশিপ।"

P & O Buildings
Nicholson Road
11. 5 1967

প্রিয়বরেষু

আজ দুপুরে আপনার ১০ তারিখের পোস্ট কার্ড পাইলাম। মনে হইতেছে আপনি আমার স্ত্রীর পত্র পান নাই। তিনি আমি আসার দুএক-দিন পরেই [পূর্বের ২৮-৪-৬৭ তারিখের পত্র দ্রষ্টব্য] আমার খবর দিয়া চিঠি দিয়াছিলেন। ইহাতে জানাইয়াছিলেন যে আমি বাঙালীর মস্তিষ্কের অপব্যবহারের উপর আপনার চিঠি পড়িয়া অত্যন্ত খুসী হইয়াছিলাম। আমি জয়ন্তী সেনকেও এ কথা লিখিয়াছি। চিঠিতে আরও কথা ছিল।

শুধু কথাগুলিই যে মারা গেল তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে ভাল বিলাতী খাম ও চিঠির কাগজও মারা গেল। [চিঠিটা পরে পেয়েছিলাম। পূর্বোক্ত ২৮।৪।৬৭ তারিখের চিঠি দ্রষ্টব্য] তিনি ইনল্যাণ্ড লেটারের চিঠি লিখিতে বসিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে বকিয়া বলিয়াছিলাম "এত দাম দিয়ে সখ করে তোমার জন্যে চিঠির কাগজ এনেছি, আর ঐ চোতা ফর্মে চিঠি লিখছ।" তিনি তারপর ভাল কাগজে লিখলেন বটে, কিন্তু অত্যন্ত অন্তরঙ্গ কাগজে তবুও নয়। না লিখিয়া ভালই করিয়াছিলেন, এ দেশে চোতা কাগজ ছাড়া চলিবে না। এরপর হইতে শুধু কার্ডে চিঠি লিখিব। এদিকে তিনি প্রতিদিন আপনার চিঠির অপেক্ষায় থাকেন।

শুনিয়া সুখী হইবেন যে, আপনাকে লইয়া আমাদের মধ্যে বিলাত থাকার সময়েই চিঠিতে দাম্পত্য কলহ সুরু হইয়াছিল, এখনও চলিতেছে। তিনি আপনার চিঠির কতকগুলি জায়গা চিঠিতে উদ্ধৃত করিয়া আমাকে লিখিয়া-ছিলেন, "তুমি বল আমি খাসিয়া মেয়ে, বাংলা জানি না, দেখ পরিমলবাবু কি লিখেছেন।" আমি উত্তর দিয়াছিলাম, "আর কি, নূতন প্রেমিক (lover)

পাইয়াছ।" বিবাহের পূর্বে একটি যুবক তাঁহার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইত ···। তিনি তাই ভক্ত ছাড়া ছিলেন, এখন আপনি new lover হিসাবে জুটিলেন।—

আশাকরি শারীরিক ভাল আছেন। আমার শরীরের খুবই উন্নতি হইয়াছিল। শেষের পাঁচদিন ইজরায়েলের গভর্নমেণ্টের নিমন্ত্রণে ইজরায়েলে অতিথি ছিলাম। যাহা ইংলণ্ডে ও ইজরায়েলে দেখিলাম তাহা চিঠিতে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। দেখা হইলে ভাল হইত। কিন্তু হইবে কি? কাহাকেও বিদেশের কথা লিখি নাই। দেশে ফিরিয়া অবসন্ন ও মুহ্যমান হইয়া আছি।

ইতি

আপনার নীরদ

আগেই বলেছি নীরদবাবুর চরিত্রের এ দিকটি তাঁর রচনার ভিতর দিয়ে খুব প্রকাশ হয় না, তাই এ জাতীয় মধুর দাম্পত্য কলহের সংবাদবাহী চিঠিই তাঁর চরিত্রের এ দিকের পরিচায়ক। ইতিপূর্বে আমি যখন সাপ্তাহিক বসুমতীতে "আমি যাঁদের দেখেছি" পর্যায়ের ১৯ সংখ্যক প্রবন্ধে (২০।১২।৬৬) নীরদবাবুর চরিত্র বিশ্লেষণ করি, তা পড়ে আমার অপরিচিত, এবং নীরদ-বাবুর পরিচিত, শ্রীমতী বেলা ভট্টাচার্য আমার সমর্থনে যে সুন্দর একখানি চিঠি নীরদবাবুর বন্ধু (শ্রীমতী বেলার মামা)-কে লেখেন, সেখানা নীরদবাবু আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন—আমি তা পড়ে খুশী হব বলে। সে চিঠি সাপ্তাহিক বসুমতীতে (২৩।২।৬৭) ছাপা হয়েছিল। সে চিঠি আমার বই ("আমি যাঁদের দেখেছি")-তে "প্রসঙ্গত" অধ্যায়ে পুনরমুদ্রিত করেছি। আরো অতিরিক্ত সংবাদ আছে তাতে। প্রবন্ধ লেখায় নীরদবাবু যতই চিৎপন্থী হোন না কেন, আচরণে হৃৎপন্থী তিনি এবং অতি উদারভাবে। এদিকের পরিচয় পেলে নীরদবাবুকে অন্তরঙ্গ বন্ধু ভাবতে অসুবিধা হয় না।

এইবার শ্রীমতী অমিয়ার চিঠিতে ফিরে যাই। রচনার ক্ষেত্রে artlessness এবং তার পিছনের অকৃত্রিমতাপূর্ণ মন—এ দুইই অনেক সময় সাধারণভাবে পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। আমি এই চিঠিগুলির সেই গুণটিই সবার সামনে ধরব বলে এতগুলি চিঠির একত্র সমাবেশ ঘটিয়েছি:

পি অ্যাণ্ড ও বিলডিংস
নিকলসন রোড
৭।৪।৬৭

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

[কলকাতা থেকে] দিল্লীতে ফিরে এসে অবধি আপনাকে চিঠি

লিখব ভাবছি, কিন্তু নাতনী পুত্রবধূ এদের নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম যে, চিঠি লেখা দূরে থাক, কলকাতার সবার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের মধুরতা, পুরী বেড়ানোর স্মৃতি, সব ভুলে যেতে হয়েছিল।…তারপর একটু সুস্থির হওয়া মাত্রই আবার এখন প্রবাস যাত্রার যোগাড় সুরু করতে হয়েছে। যা কিছু সব ফরম্যালিটি দরকার হয়, সর্বদা ওঁদের জন্য আমিই দৌড়াদৌড়ি করে, করে দিই। এখনও করতে হচ্ছে। উনি পারেনও না, করেনও না। এখন একমাত্র রিজার্ভ ব্যাংক থেকে 'পি' ফর্ম স্যাংশন হয়ে এলেই আর কিছু বাকী নেই। সব ঠিকমত হয়ে গেলে, আর কোনো বাধা-বিঘ্ন না ঘটলে, আমরা পয়লা মে বি-ও-এ-সি ভিসি ১০এ রওয়ানা হবো।

লণ্ডনে ছেলের কাছেই থাকবো। আমার ত এখানে থাকতেই বিশেষ কোথাও যাওয়া হয় না। এখন বিদেশ গিয়ে ৬ মাস ঘুরে বেড়িয়ে তার শোধ তুলে আসি। এখানে সবাই যা আরম্ভ করেছেন আমি এই প্রথম যাচ্ছি শুনে। —"দেশে ফিরে এলে হয়" ইত্যাদি ইত্যাদি। আপনিও ত লিখেছেন যে এবারে আমার হাতে জলচল হবে।…

আমাদের পাড়ায় এক খুব রসিক বৃদ্ধা ছিলেন। তিনি এখন কলকাতায়। বছর চারপাঁচ আগে একদিন তিনি বেলা ৯টা নাগাদ যমুনা স্নান করে ফিরছিলেন। আমি ও আমার বাড়ীওয়ালীর পুত্রবধূ দুজনে কোথায় যেন গিয়েছিলাম, একসঙ্গে ফিরছি। বৃদ্ধা পেছন থেকে আমায় উদ্দেশ করে চীৎকার করে ডাকছেন আর বলছেন, "ওগো বিলাতফেরৎ, কেমন আছো? —কই থাইক্কা আইলা?" আমি বললাম "আমি আবার বিলাত-ফেরৎ কবে হলাম?" তিনি উত্তর দিলেন, "হঃ তুমি বিলাত না গিয়াই বিলাত-ফেরৎ। স্বামী গ্যাছে, ছাইলারা গ্যাছে, তোমার আর বাকী কি?" এই বলে, বললেন, "লও, তোমারে শুদ্ধ কইরা দেই—একজন বিলাতফেরৎ আর এক-জন খ্রীষ্টান, কেউই যমুনায় ডুব দিতে যাইবা না।" তারপর বিড়বিড় করে কি মন্তর-টন্তর বলে আমাদের দুজনের গায়ে তুলসী পাতা দিয়ে ঘটি থেকে যমুনার জল ছিটিয়ে দিলেন।

আপনি ওঁকে যে ইনল্যাণ্ড লেটারখানা লিখেছেন সেখানা আজ তিনচার দিন হল আমরা পেয়েছি। আপনি যে কথাগুলি লিখেছেন সেও ঠিকই। ….হিন্দু মুসলমান বিষয়ে আপনারা সবাই মিলে লিখতে থাকুন। চারদিক থেকে শুনতে শুনতে যদি দেশের লোকের একটু চৈতন্য হয়। সব দিক

দিয়েই কি যে অবনতির স্রোত এসেছে! বীটল্‌গুলোকে নিয়ে কি নাচানাচি আরম্ভ করেছে...। আর আমাদের সরকারও সমানে এগুলোকে এনকারেজ করে যাচ্ছে। কলকাতায় ত দেখলুম না, কিন্তু এখানে রাস্তায় রাস্তায় বীটলে। কি জোচ্চর, নোংরা, পাজি, নেশাখোর। এগুলোকে এদেশে ঢুকতে দেওয়া উচিত নয়। দেখলে পর ঘেন্নায় গা জ্বলে যায়। আর আমাদের ছেলেছোকরাগুলি এদের চেলা হতে চলেছে। এবারে আপনাদের সকলের সঙ্গে দেখা হওয়াতে বেশ আনন্দ হয়েছিল।

ওঁর বাংলা বই কলকাতায় ২৯শে এপ্রিল বেরিয়ে গিয়েছে। জানিনা আপনাকে মিত্র অ্যাণ্ড ঘোষ পাঠিয়েছেন কিনা। উনি আপনাকে পাঠাবার জন্য বহুকাল আগেই জানিয়ে দিয়েছেন।...

ইতি

বিনীতা অমিয়া

পরবর্তী চিঠিখানা কসৌলি থেকে লেখা। আগে ক্ষেপা কুকুরে কামড়ালে সরকারী খরচে রোগীকে কসৌলি পাঠানো হত চিকিৎসার জন্য। এখন কুকুরে না কামড়ালেও যাওয়া চলে দেখছি। আমিও ১৯৪৯ সনে সিমলা যাবার পথে কসৌলি স্টেশনটি এবং পরিবেশটা মনোযোগের সঙ্গে দেখেছিলাম। কারণ নামটি ক্ষেপা কুকুরের সঙ্গে জড়িত ছিল মনের মধ্যে। এই চিকিৎসার জন্য কসৌলি যাওয়া বহুকাল বন্ধ হয়েছে। স্থানটি প্রায় দারজিলিং শহরের সমউচ্চতা বিশিষ্ট। চিঠিখানা এই—

ALASIA HOTEL
Kasauli (H. P)
24-10-69

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

... ওপরের ঠিকানা দেখেই বুঝতে পারছেন কোথা থেকে চিঠিখানা লিখছি। আমরা দিনকয়েক হল এখানে এসেছি এবং রবিবার রওয়ানা হয়ে সোমবার দিল্লী পৌঁছব। উনি কি আর দিল্লী থেকে বেরোতে চান? আমি জোর করে ধরে এনেছি। গত মে মাসে আমি বড় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। ...তাই ভাবলাম পাহাড়ে এসে যদি একটু সুস্থ বোধ করি। পাহাড়ের মেয়ে আমি, বরাবর লক্ষ্য করেছি পাহাড়ে গেলেই আমার সব ক্লান্তি কেটে যায়। ...হোটেল থেকে চারদিকের দৃশ্য উপভোগ করছি। উনি সকাল দুপুর

বিকেল খুব হুটোপুটি করে বেড়াচ্ছেন। একটু কম ঘুরতে বললেও কে কার কথা শোনে। দোতলায় আমাদের ঘর থেকেই সামনে হিমালয় দেখা যায়। এটা হল ধওলাধর শ্রেণী—সাত পাহাড়ের সারি, তার একদম পিছনে স্নো রেন্‌জ, অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য। রাতে ঐ পাহাড়ের মাঝখানে সিমলার আলো দেখা যায়। এ দৃশ্য দেখলেও মনের সব গ্লানি দূর হয়ে যায়। জানিনা, আপনি কখনও কসৌলি এসেছেন কিনা। আমারও জায়গাটা বেশ ভাল লাগছে। নির্জন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, চারিদিকে কত ফুল আর রকমারী পাখী ডাকছে। ঠাণ্ডাও আছে বেশ। প্রায় আমাদের দিল্লীর ডিসেম্বরের মতই। হোটেলটাও খুব ভাল।···

গ্রীষ্মের ছুটির পর মারগারেটের কাছে শুনেছিলাম আপনি অসুস্থ, কিন্তু আমি নিজেও এত কাহিল যে ইচ্ছা সত্ত্বেও চিঠি লিখতে পারিনি।··· আপনাকে বেশ অনেকদিন পর চিঠিখানা লিখছি। গতবছর বিলেত গিয়ে রোজই ভাবতাম আপানাকে ওখানকার সব বিস্তারিত জানিয়ে চিঠি দেবো, কিন্তু আপনি আপনার নিজের বাড়ীতে উঠে গেছেন শুনেছিলাম, এবং সেই বাড়ীর ঠিকানা না জানায় লিখতে পারিনি। এবারে মারগারেটের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়েছি।

সত্যি, লণ্ডনে গিয়ে আমার এত ভাল লেগেছিল যে মনে হয় আবার যাই। আমি প্রচুর পিকচার পোস্ট কার্ড কিনেছিলাম এবং দেশে এনে সবাইকে কত দেখাবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু···কারো কোনো উৎসাহ নেই। কলকাতায় সব বয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম।···একমাত্র বিজন বোস যিনি রেডিওতে আগে খবর বলতেন, তিনি অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করে দুঘণ্টা ধৈর্য ধরে সব দেখেছিলেন। এরকম দেখিয়েও আনন্দ, ব্যাখ্যা করেও আনন্দ।···আপনার কাছ থেকে এই চিঠির উত্তর পেলে আমি এই ছয় মাসে কোথায় গেছি, কি দেখেছি, খানিকটা খানিকটা লিখে জানোবো। আপনি খুসী হবেন জানতে পারলে। আমরা দু জনে ইংল্যাণ্ডে প্রচুর জায়গায় অতিথি হিসাবে গেছি এই ছয় মাসে। কি তাদের আতিথেয়তা। কি যত্ন, একেবারে মুগ্ধ হতে হয়। আমি এখান থেকে পয়লা মে (১৯৬৮) অ্যারোপ্লেন চড়ার সময় থেকে ৬ই নবেম্বর দিল্লী পৌঁছা পর্যন্ত এই ছয় মাসের প্রত্যেক দিনের ডায়ারি লিখে রেখেছি। এমনকি বাড়ীতে ছেলে বৌমা কি খাইয়েছেন, এবং এক মাস অক্সফোর্ডে নিজে রেঁধে খেতে হয়েছে

তাও। কি খেয়ার, কিরনাম সব লেখা আছে। অক্সফোর্ড আমার খুব ভাল লেগেছে। ওখানে বডলিয়ান লাইব্রেরিতে ওঁকে একমাস পড়াশুনা করতে হয়েছিল। আমরা একটা ২-রুমওয়ালা ছোট ফ্ল্যাট নিয়েছিলাম। ওখানে নিজে কাজকর্ম করতে হলেও কি সুবিধা। একটুও কষ্ট হয় না। আমিও কাজকর্মের অবসরে একাই সব ঘুরে ঘুরে কলেজগুলো, তার চ্যাপেল, মিউজীয়াম সব দেখেছি। মিউজীয়ামগুলোতে যা দেখেছি প্রচুর নোটকরে, ছবি এঁকে, এনেছি! গাইডরা হাসতো। বলতো এত পুঙ্খানুপুঙ্খ কেউ দেখে না। আমি বলতাম আর হয়তো এদেশে আসবার সুযোগ হবে না, সুতরাং যতখানি পারি শিখবার, জানবার, সঙ্গে করে নিয়ে যাই। আপনার উত্তরের আশায় থাকবো, দিল্লীতে লিখবেন। ইতি

প্রণতা অমিয়া

বই উপহার উপলক্ষে 'অপরাজিত' স্মরণ—

Nicholson Road, Delhi-6,
15. 1. 70

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার বইখানা ['শুভবিবাহ'] ও চিঠি পরশু দুপুরে পেয়েছি। বইখানা পেয়ে খুবই খুশী হয়েছি। কারণ কোনো লেখক যদি নিজের হাতে লিখে বই উপহার দেন তাহলে বেশ গর্ব মনে হয়। আমি বিয়ের সময় বিভূতিবাবুর কাছ থেকে 'অপরাজিত' দুখানা [দুই খণ্ডে সমাপ্ত] উপহার পেয়েছিলাম। ...

গজেনবাবু মাঝে মাঝে তাঁর লেখা বই পাঠান, কিন্তু সবই ওঁকে। এদিকে আবার লেখেন "বইখানা পড়ে কেমন লাগল বৌদিকে জানাতে বলবেন।"...কিন্তু এবারে ভেবেছি বলবো আমায় না দিলে আর পড়বোও না, কেমন লাগল জানাবোও না। ...

প্রণতা অমিয়া চৌধুরাণী

এর পরের চিঠিখানা ফুলসক্যাপ সাইজ কাগজে ছোট ছোট লেখা, মোট ৬ পৃষ্ঠার মধ্যে কোথাও ফাঁকা নেই। কিন্তু যে সব সংবাদ আছে তা ওর কমে লেখা যেত না। এর সঙ্গে আবার পৃথক এক পৃষ্ঠা ভূমিকা আছে। এই যে নিজেকে প্রকাশ করার ব্যাকুলতা এবং সুন্দর করে গুছিয়ে বলার ক্ষমতা এই দুটি জিনিসই বোধহয় বিরূপ পরিবেশে আর সফল হয়ে ওঠার

সুযোগ পায় নি। সবকিছু অগ্রাহ্য করে চলার মনোভাব থাকলে বোধ হয় লেখিকারূপে নাম করতে পারতেন। পূর্বের এক চিঠিতে অক্সফোর্ডে ঘুরে ঘুরে দেখা ও তথ্যসংগ্রহ করার কাহিনীটি পড়বার পর এ বিষয়ে সন্দেহ থাকা উচিত নয়। চিঠিগুলিতে যেসব বর্ণনা আছে তা সম্পূর্ণ চিত্রধর্মী। প্রমাণ আরো বেশি পাওয়া যাবে এই দীর্ঘ চিঠিখানায়। আমি অবশ্য অল্পই উদ্ধৃত করতে পারব।

দিল্লী-৬

১৪. ১. ৭০

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার ৭।১২।৬৯ তারিখের পত্রখানা যথাসময়েই পেয়েছিলাম, কিন্তু উত্তর দিতে দেরী করে ফেললাম। উনি প্রায় রোজই তাড়া দিচ্ছেন। কই তুমিত পরিমলবাবুর চিঠির উত্তর দিচ্ছ না? আর আমি বলেই যাচ্ছি -এই আজই লিখবো। কিন্তু সেই আজই এলো দেখুন কত দেরী করে।...

আজ দুদিন ধরে রবিবাবুর মত আমাকেও পেয়ে বসেছে, বেদেদের তাঁবুতে কি হচ্ছে না হচ্ছে দেখা। ছিন্নপত্রাবলীতে তাঁর একটা চিঠিতে তিনি জানালা থেকে লক্ষ্য করছিলেন লিখেছেন। আর আমি দেখছি আমার বারান্দা ও ছাদ থেকে। আজ বহু বছর ধরে একদল রাজস্থানী (আসলে একসময়ে এরা রাজপুতনায় রাজার কোর্টে পেশাদার গাইয়ে ছিল, এখন আর কোন আয় নেই সেখানে) দিল্লীতে এসে আস্তানা গেড়েছে আমাদের বাড়ীর সামনে। এখন অ্যালসেশিয়ান কুকুরের ব্যবসা করে। কুকুরের বাচ্চা নিয়ে কলকাতা আসাম সর্বত্র বিক্রি করে আসে। পুলিসের কাছে তাড়া খেয়ে এদিক ওদিক করে। এখন সারি দিয়ে আমাদের বাড়ীর সামনে তাঁবু গেড়েছে। কি ভয়ংকর তাদেব জীবনযাত্রা। এই শীতের দিনে সামান্য কাপড জড়িয়ে একটু আগুন জেলে ছেলে বুড়ো সবাই চারদিকে গোল হয়ে বসে আছে। ঐ তাঁবুর মধ্যে জন্মমৃত্যু বিয়ে সবই হচ্ছে। আজ দুদিন ধরে দেখছি আর ভাবছি···। এদের মধ্যে অনেকে আবার ক্রিমিন্যালও বটে! অসম্ভব কুড়ে, কেউ কাজ করে খেতে চায় না। সামান্য মুটেগিরিও না। আমি অনেক চেষ্টা করেছি আগে, যদি মেয়েরা বাড়া বাডী বাসন-মাজা, কাপড় ধোয়ার কাজ করে, কিন্তু তারা তা করবে না। দারিদ্র্যকেই তারা খুসী মনে বরণ করে নিয়েছে। তাদের এই কুকুরের ব্যবসাও খুব

সহজ। হাড় জিরজিরে কুকুরগুলোকে আধপেটা রেখে অগুনতি বাচ্চা জমিয়ে তাদের বেচে পয়সা করা। খাটুনি নেই।

আমাদের দেশের এই দুর্দশা কবে যাবে জানি না। বিলেতে নানা জায়গায় ঘুরে এলাম, কিন্তু এরকম শোচনীয় দারিদ্র্য ত কোথাও চোখে পড়েনি। দুচার জন যদি বা ভিক্ষে করে তাও কেউ বা বেহালা বাজিয়ে, কেউ বা পেভমেণ্টে ছবি এঁকে। এক মাত্র আমার যা চোখে পড়েছে এবং দুঃখ হয়েছে তা ওদেশের বুড়োবুড়ীদের জন্য। এরা বড় কষ্ট করে থাকে। কষ্ট মানে টাকা পয়সার জন্য ততটা নয়, কারণ সরকার থেকে এরা একটা 'ওল্ড এজ অ্যালাউয়েনস' পায়। প্রায়ই দেখতাম বুড়োবুড়ীরা সব 'কিউ' করে দাঁড়িয়ে ডাকঘর থেকে অ্যালাউয়েন্স নিচ্ছে। কিন্তু তারা প্রায়ই একা একা থাকে। নিজেদের কাজকর্ম নিজেদেরই করতে হয়। অনেক সময় দেখতাম কি কষ্টেই না, ৮০।৯০ বছরের বুড়ীরা সব বাজার বয়ে দিয়ে যাচ্ছে। কোন কোনদিন আমাদের পাড়ায় এরকম অবস্থায় কাউকে দেখে উনি তার বাজার নিয়ে বাড়ীর কাছাকাছি পৌঁছে দিয়েছেন। অনেক সময় আবার আমিও কাউকে হাত ধরে রাস্তা পার করে দিয়েছি, বা তার বোঝা খানিকটা বয়ে দিয়েছি। এই সামান্য একটু সাহায্য পেয়ে যে কি খুসী হতো তারা, আর কি সর্বান্তঃকরণে 'থ্যাংকস্' দিত—সে এক moving দৃশ্য।

জানেন, লণ্ডনে পৌঁছেই আমার সব চেয়ে ভাল লাগলো চারদিকের সবুজ দৃশ্য, ফুলে ফুলে রঙের মেলা, আর লোকের অদ্ভুত নীরবতা! রাস্তা দিয়ে হাজার হাজার লোক যাচ্ছে, কিন্তু একটু চেঁচামিচি, গণ্ডগোল, জোরে কথা কওয়া, কিছু নেই। চারিদিকে রাস্তার ধারে ধারে, লোকের বাড়ীতে বাইরে কত রকমারি ফুল ফুটে আছে, কিন্তু কেউ সেই ফুল ছিঁড়ছে না বা নষ্ট করছে না। ছোট ছোট শিশুরা ফুলের 'বেড'-এর চারদিকে খেলে বেড়াচ্ছে কিন্তু ছেঁড়ার নামও করছে না।···

আমরা ৬ মাস দিল্লীতে না থাকায় ফিরে এসে দেখি পাড়ার ছেলেরা ছাদের বাগান একেবারে নষ্ট করে দিয়েছে।···মনের অবস্থা বুঝতেই পারেন।···আগে আমি বুঝতাম না—এখানে সাহেব মেম যাঁরা থাকেন তাঁরা বসন্তকালে দেশে যেতে চান কেন। এখানে একজন লেডি ডাক্তার ছিলেন, তিনি আমায় প্রায়ই বলতেন আমি স্প্রিং-এ ফুল দেখার জন্য দেশে যেতে ভালবাসি। আমরা যখন পৌঁছেছি তখন ক্রোকাস প্রিমরোজ ড্যাফোডিল

ও নারসিসাস প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, অল্প-বিস্তর ছিল, কিন্তু চারদিকে টিউলিপ, অ্যাজালিয়া, রোডোডেনড্রনের কি বাহার ! আর ফুটপাথগুলোর ধারে ধারে একটা করে চেরির গাছ ও একটা করে মে-ফ্লাওয়ার-এর গাছ। একটা গাঢ় গোলাপী রঙের, আর একটি ফিকে গোলাপী। সারি দিয়ে কি অপরূপ দৃশ্য। টিউলিপ দেখে কিন্তু মনে হয় না ওগুলো আসল ফুল, মনে হয় কেউ যেন মোম দিয়ে গড়ে ওদের মাটিতে পুঁতে রেখেছে। বাকিংহাম প্রাসাদের সামনে, সেন্ট জেম্স্ পার্কে, কেনউডের বাগানে, আরও অন্যান্য পার্কে বেড্ ভরতি টিউলিপ দেখে আমি একেবারে মুগ্ধ। এ যেন এক স্বপ্ন-রাজ্য মনে হোতো। এই ফুলগুলি যেই শেষ হোলো অমনি আরম্ভ হোলো গোলাপ।...

অক্সফোর্ড জায়গাটা আমার খুব ভাল লেগেছে। একটা আলাদা অ্যাটমস্ফিয়ার। চারদিক থেকে চার্চগুলির ঘড়ির ঘণ্টা যখন বাজতো এত ভাল লাগত শুনতে। বিশেষ করে অনেক রাত্তিরে। কাছেই ছিল আইসিস নদী। অক্সফোর্ডের ভিতর দিয়ে গেছে টেম্স্ নদীর যে অংশ, তাকে আইসিস বলে। উনি ত রোজই নদীর ধারে বেড়াতে যেতেন, আমিও প্রায়ই সঙ্গে যেতাম। সেখানে নদীতে ২০টা রাজহাঁস ছিল। আমরা রুটির টুকরো নিয়ে যেতাম সঙ্গে করে, আর হাঁসদের খাওয়াতাম। তারা এত চিনে গিয়েছিল আমাদের যে, দূর থেকে আমাদের দেখতে পেলেই তরতর করে সাঁতরে সাঁতরে আসতো খাবার জন্য। যেদিন অক্সফোর্ড থেকে চলে আসি, ভোরে উঠে উনি বললেন, "দাও কিছু রুটি হাঁসগুলোকে শেষ দিনে খাইয়ে আসি।" ওদের ছেড়ে আসব বলে মন খারাপ হয়ে গেল।...

ইতি

প্রণতা অমিয়া

এই চিঠিগুলি থেকে নীরদচন্দ্র চৌধুরী মানুষটিকে আরো বেশ চেনা যায়। স্ত্রীর লেখায় স্বামীর চরিত্রচিত্রণ বাংলাভাষায় এমন আর বোধ হয় নেই। লেখিকার নিজস্ব লিখন ভঙ্গিতে সবই ছবির মতো ফুটে উঠেছে।

১৯৩২ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত মোহনবাগান রো-তে শনিবারের চিঠির সম্পর্কে থাকতে আমাদের বাসস্থানের ব্যবধান ছিল মাত্র তিন মিনিট। মাঝে মাঝে যেতাম, নীরদবাবুও আসতেন। তাঁর আলাপের আকর্ষণ আমার কাছে প্রবল ছিল। আলাপ সবই অন্যস্তরের। শিল্প, সঙ্গীত, সাহিত্য, ইতিহাস,

ভুগোল অথবা সামরিক বিষয়। তাছাড়া 'বঙ্গশ্রী' অফিসে ধর্মতলাতেও আমাদের নিয়মিত দেখা হত। নীরদবাবুর কর্নওয়ালিস স্ট্রীট মোহনলাল স্ট্রীটের মোড়ের বাড়ির ফ্ল্যাটে আমি নীরদবাবুর স্ত্রী ও দুটি পুত্রসহ ১৯৩৬ সনে একটি গ্রুপ ছবি তুলে দিয়েছিলাম। তাঁর তৃতীয় পুত্রের ছবি অনেক পরে, যখন সে 'নিউ অ্যারাইভ্যাল'। বেবিদের যত ছবি অদ্যাবধি তুলেছি তার মধ্যে সেখানা আজও আমার স্মরণীয় হয়ে আছে। Wide Awake নামে সেখানা অমৃত বাজার পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। এই বেবির সে ছবিটিরই উল্লেখ শ্রীমতী অমিয়ার চিঠিতে আছে।

ছেলেদের প্রথম শিক্ষা দিতে হবে, অতএব নীরদবাবু এডুকেশন বিষয়ে দামী দামী বই কিনে দিলেন স্ত্রীকে। স্ত্রীকেই শিক্ষিকা করে তুললেন সেই উপলক্ষে। শিক্ষিতা তো বটেই। তারপর ১৯৩৬ সনে জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহ থেকে নীরদচন্দ্র চৌধুরী সম্পাদিত (সজনীকান্ত দাস পরিচালিত) 'নূতন পত্রিকা' নামক সাপ্তাহিক প্রকাশিত হল রঞ্জন প্রকাশালয় থেকে, অর্থাৎ আমি যেখানে বাস করছিলাম সেখান থেকে। এ সাপ্তাহিক সম্পাদনে নীরদবাবুর কি উত্তেজনা। ফলে কাজ ওখানেও খানিকটা হত। নূতন পত্রিকায় আমার রচনা, ও 'বাংলার শ্রী' পর্যায়ের অনেকগুলি ফোটোগ্রাফ ছাপা হচ্ছিল। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, বনফুল, সার যদুনাথ সরকার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অমল হোম প্রভৃতির লেখাও নিয়মিত থাকত। সেই দিনগুলির কথা আজও স্মরণমাত্রে ভাল লাগে।

এবারে চব্বিশ বছর পার হয়ে আসি। ১৯৪২এর পর অনেকদিন আমাদের দেখা না হলেও চিঠি লেখা মাঝে মাঝে চলেছে। ১৯৬৮ সনের ১০ই জানুয়ারি নীরদবাবু ও শ্রীমতী অমিয়া আগে কিছু না জানিয়ে হঠাৎ আমাদের বাড়িতে এসে হাজির—বিস্ময়ের চমক লাগিয়ে। আমি অতঃপর যে চিঠিখানার অংশ প্রথমেই উদ্ধৃত করছি, সেখানা ১৯৬৫ সনে লেখা। ২৪ বছরের হিসাব এই দিক থেকেই। আমি একদিন ডাকে কিছু ছাপা কবিতা পাই। প্রেরক কে তা মনে নেই, অপরিচিত। সে কবিতা এমনই উদ্ভট এবং ইতর যে তা যে ছাপা হতে পারে এবং প্রচার হতে পারে তা কল্পনাই করা যায় না। নীরদবাবুর সঙ্গে এর আগে বাংলাদেশের হালচাল বিষয়ে চিঠিতে কিছু কিছু আলোচনা চলছিল। আমি বাঙালী তরুণদের

একটি অংশের অধঃপতন কতদূর হয়েছে তা দেখানোর জন্য ঐ কবিতাগুলি নীরদবাবুকে পাঠিয়েছিলাম। তা পেয়ে নীরদবাবু লিখছেন—

Delhi 6
4th June 1965

প্রিয়বরেষু,

...আর একটি জিনিস যাহা পাঠাইয়াছেন উহার তুলনা হয় না। আমরা (অর্থাৎ আমার পরিবারভুক্ত সকলে) বাঙালীকে (অবশ্য আজকালকার typical বাঙালীকে) Bandar Log বলিয়া থাকি। এবং বাংলাদেশে বাসকে বঙ্গীয় উন্মাদ আশ্রমে বাস বলি। উহার নূতন প্রমাণ পাইয়া খুবই আনন্দ হইল। কবিতাগুলিতে যে মনোবৃত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাকে আমি মনের literary syphilis বলিতেছি। তবে ইহাতে আমি কিছুমাত্র আশ্চর্য হই নাই। এ বিষয়ে আমার ভবিষ্যতে একটি বই লিখিবার ইচ্ছা আছে। এখানকার ব্যাধিরও খবর জানি।...

ইতি

আপনার
নীরদচন্দ্র চৌধুরী

এর পরের চিঠিখানা এর কিছু আগে লেখা—

Delhi 6
30th April 1965

প্রিয়বরেষু

আপনার চিঠি পাইয়া অত্যন্ত আনন্দ পাইলাম। আমি অনেক সময়েই বলিয়া থাকি, আমার কলকাতার বন্ধুবর্গ যেন আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন। তবে আমি ইহা কখনও মনে করি নাই যে, উহা ইচ্ছাকৃত। কলিকাতার বাঙালীজীবন যে স্তরে পৌঁছিয়াছে তাহাতে কাহারও সঙ্গেও সক্রিয় থাকা সম্ভব নয়। আমার স্ত্রী কয়েক বছর আগে কলিকাতা গিয়াছিলেন। তিনি বলেন 'তুমি সকালে কলিকাতা গেলে, বিকালের অ্যারোপ্লেনে ফিরিয়া আসিবে।' বয়সের সঙ্গে আমার ঝগড়া বা লড়াই করিবার উৎসাহ বাড়িয়া গিয়াছে। তাহা লেখা হইতেও বুঝিতে পারিবেন। তবে ঝগড়া মৌখিকই হউক বা লিখিতই হউক, আমি বাঙালী ভদ্রলোকের ছেলে তাহা আমি ভুলি না, ভুলিতে পারিও না। তা আমাকে যত গালিই খাইতে হউক না-

কেন। আমি আমার অনেক সমালোচকদের সম্বন্ধে ল্যানডরের একটি উক্তি উদ্ধৃত করি—Fleas know not whether they are upon the body of a giant or upon one of ordinary stature." অত্যন্ত অহংকারের কথা মনে হইবে, কিন্তু আমি আমাদের বর্তমান আদর্শ দেখিয়া উহাকে statement of fact মাত্র বলিব।

কলিকাতা যুবসম্প্রদায়ের যে মূর্তি আবির্ভূত হইয়াছে তাহা দূর হইতেও আমার কল্পনা করা সহজ।···গণতন্ত্রে বৃদ্ধেরা বালককে ভয় পায়—এই কথা প্লেটো লিখিয়াছেন। আমি গণতন্ত্রবাদী নই, বালককে ভয়ও পাই না।···

আপনি হেমন্তবালা দেবীর কথা লিখিয়াছেন, শুনিয়াছি তিনি ব্রজেন্দ্র-কিশোর রায়চৌধুরীর কন্যা। ঠিক কি? তাঁহার বিবাহ কোথায় হইয়াছিল একটু পরিচয় জানাইবেন।···

ইতি

আপনার নীরদ

শ্রীযুক্তা হেমন্তবালা দেবীর পিতৃকুলের পরিচয় (রবীন্দ্রনাথ যাঁর কাছে তাঁর অনেকগুলি চমৎকার চিঠি লিখেছেন, এবং যেসব চিঠি বিশ্বভারতী কর্তৃক 'চিঠিপত্র' পর্যায়ের ৯ সংখ্যক গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়েছে), তা তাঁর পুত্র আমার অনুজোপম বন্ধু বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী আমাকে একখানা চিঠিতে জানিয়েছিল। তার কিয়দংশ পরে যথাস্থানে উল্লেখ করা যাবে। একুল ওকুল—দুকুলের খবরই তাতে আছে।

সাপ্তাহিক বসুমতীতে 'আমি যাঁদের দেখেছি' পর্যায়ে যখন মোহিতলাল মজুমদার ও নীরদচন্দ্র সম্পর্কে আমার রচনা প্রকাশিত হয় তখন তা পড়ে নীরদবাবু ঐ সাপ্তাহিকে এক দীর্ঘ চিঠি লেখেন। তার অংশ আমার 'আমি যাঁদের দেখেছি' পুস্তকে প্রসঙ্গত অধ্যায়ে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। ঐ লেখা বিষয়ে নীরদবাবু আমাকে যে চিঠি লেখেন তা এই—

দিল্লী-৬

৩-১-৬৭

প্রিয়বরেষু,

···মোহিতবাবু ও আমার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পড়িলাম। ইহাতে আপনার প্রীতি ও উদারতা প্রকাশ পাইয়াছে। আপনি আমার

সম্বন্ধে এত কথা মনে করিয়া রাখিয়াছেন তাহাতে আমি অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি। আর আমি যে আপনাকে এত চিঠি লিখিয়াছি ও এত কথা লিখিয়াছি স্মরণই ছিল না। এই কার্ড প্রাপ্তি-স্বীকার মাত্র, পরে বিস্তারিত চিঠি দিব।…

ইতি
আপনার নীরদ

পরবর্তী চিঠি বিদেশ থেকে ফিরে আমার পরেই লেখা—

দিল্লী-৬
১৭-৫-৬৭

প্রিয়বরেষু

…আপনার চিঠি দুখানা কাল আসিয়াছে।…আমি ফিরিয়া আসিয়া কিরকম যেন অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি। উহা গরমের জন্য নয়—মানসিক নৈরাশ্যে। সকালে খবরের কাগজটা দেখা মানে একটা যন্ত্রণা—কর্তব্য হিসাবে পড়িতে হয়। নহিলে পড়িতাম না। কিছু সাময়িক প্রসঙ্গ লইয়া লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি—হিন্দুস্থান স্ট্যানডার্ডে দেখিয়া থাকিবেন। এই লেখাটি সাপ্তাহিক কিস্তিতে চলিবে। এবারে বিলাতে ও ইজরায়েলে যাহা দেখিয়া আসিয়াছি, তাহার কথা পত্রে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। কাহাকেও লিখি নাই। যদি কলিকাতা যাইতে পারি, তবে মুখেই শুনিবেন। যাইবার একটা ইচ্ছা আছে—কতদূর হইবে বলিতে পারি না। বাংলা দেশ ও বাঙালীর জীবন লইয়া বাংলায় লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি, সুতরাং বাঙালীর জীবন আবার চাক্ষুষ দেখা দরকার। তবে ফল উলটা হইতে পারে। যদি দেখিয়া নিরুৎসাহ হই অর্থাৎ বুঝি রোগ চিকিৎসার বাহির হইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে হয়ত বাংলা লেখা ছাড়িয়া দিব। একটা সন্দেহ যে আসে নাই তাহা বলিতে পারি না। প্রায়ই নিজেকে জিজ্ঞাসা করি—বই লেখার কোনও সার্থকতা আছে কি? আপনি কি বলেন?

আমার হাতে প্রবন্ধ ও বইএর কাজ বহু বাড়িয়াছে। কাজ আরম্ভ করা দরকার। কিন্তু বাহিরের দৈন্য ও আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের সুখ, দুই মিলিয়া আমাকে কর্মবিমুখ করিতেছে। এক এক বার মনে হয়—এই ব্যক্তিগত জীবনে ডুবিয়া থাকিয়া চারিদিকের অপরিসীম তামসিকতা ভুলিয়া থাকি। উহা কাপুরুষের কাজ হইবে বুঝি, তবু মানুষ ত মানুষ।…

আপনার নীরদ

নীরদবাবু ম্যাক্স মুয়েলারের বিষয়ে গবেষণা করতে বিলেত যাচ্ছিলেন ১৯৬৮ সনের এপ্রিলের শেষের দিকে। সস্ত্রীক যাত্রা। আমি এর আগে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের A Visit to Europe পড়ে এত মুগ্ধ হই যে আপন গরজে অবসর সময়ে বইখানার অনুবাদ শেষ করি। তারও আগে আমার ভাল লাগা অনেক অংশ আমি মূল বই থেকে টুকে রেখেছিলাম। ১৯৬৮ সনের ১০ই জানুয়ারি নীরদবাবু সস্ত্রীক এসে হাজির হলে, সেই ইংরেজী অংশ কিছু কিছু পড়ে শোনাই, এবং পরে আরো চমকপ্রদ সব উক্তি আমি তাঁকে পাঠিয়ে দিই। সেগুলি নীরদবাবুর এত ভাল লাগে যে, তিনি তাঁর হিন্দুস্থান স্ট্যানডার্ডের প্রবন্ধে তা থেকে তিনবার উদ্ধৃত করেছিলেন। ১৮৮৯ সনে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের A Visit to Europe প্রকাশিত হয়, রচনা তারও প্রায় দুবছর আগে। বিলেতে তিনি গিয়েছিলেন ১৮৮৬ সনে। সে যুগের লেখা, কিন্তু তা অনেক পরবর্তীকালের মনের কথা। অর্থাৎ আজ আমরা যা করছি যা দেখছি, যা চিন্তা করছি, তাই তিনি তখন বলে গেছেন। নীরদবাবু এ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছিলেন "If it is not prophetic I don't know what is."

আমার অনুবাদ একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশ হচ্ছিল, মূল ইংরেজী ৪০০ পৃষ্ঠার বই। তা থেকে মাত্র দুটি অধ্যায় প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানানো হল, মালিকদের নাম করে, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস মালিক পক্ষের অজ্ঞাতসারে যে, ত্রৈলোক্যনাথ ইংরেজদের প্রশংসা করেছেন, অতএব ঐ সাপ্তাহিকের আদর্শের সঙ্গে তা মিলছে না, এবং সঙ্গে সঙ্গে এক অর্বাচীনকে দিয়ে একখানা প্রতিবাদ পত্র লেখানো হল আমাকে না জানিয়ে। সমগ্র বইতে কি আছে তা না জেনেই সে বইয়ের অনুবাদ ছাপা অপ্রয়োজনীয় এমন কথা রটে গেল। এমন আশ্চর্য কাণ্ড বাংলা দেশেই সম্ভব। পাঠকেরা অন্তত এক আশ্চর্য সুন্দর স্বাস্থ্যকর দেশপ্রেমমূলক, এবং যুক্তিবাদী, বৈজ্ঞানিক-চিন্তাপূর্ণ লেখা থেকে বঞ্চিত হলেন।

নীরদবাবুকে জানিয়েছিলাম ঘটনাটি। তিনি লিখলেন "আমি ঠিক বিস্মিত হইয়াছি বলিতে পারি না। দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত বাঙালীর এখনও একটা ছ্যাঁচড়া nationalism আছে। আসলে আমরা এখনও স্বাধীন হই নাই। পরাধীনতার গ্লানি এমনই আমাদের উপভোগ্য বস্তু যে, ইংরেজ না পাইয়া স্বাধীনতা আন্দোলন এখন আমরা ভারত গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে

চালাইতেছি।" ...ইত্যাদি আরও ভয়ানক সব বিশ্লেষণ আছে, যার উদ্ধৃতি নিষ্প্রয়োজন।

অনেক পরে অবশ্য বাকিটা ছাপতে রাজি হয়েছিলেন তাঁরা, এবং ছাপতে আরম্ভও করেছিলেন, কিন্তু বাকি পাণ্ডুলিপি ফিরিয়ে এনেছিলাম, কারণ একখানা দুরভিসন্ধিমূলক চিঠি ছেপে তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার পর আমি আর বাকি অংশ ছাপতে দিতে পছন্দ করিনি। (১৩৭৮ বৈশাখ থেকে অনুবাদটি প্রবাসীতে ছাপা হচ্ছে।)

নীরদবাবু ম্যাক্সমুয়েলার সম্পর্কে গবেষণা করতে বিলেতে গিয়েছিলেন জেনে আমি ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়ের বই থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি পাঠিয়েছিলাম। তার মধ্যে একটি ছিল এই (এটি নীরদবাবুর মন্তব্যসহ কাগজে যেমন ছাপা হয়েছিল তা থেকে উদ্ধৃত। মন্তব্যগুলি বন্ধনীভুক্ত দেখা যাবে।):

"I saw this world-renowned Sanskrit Scholar, dear to every Indian heart, at Oxford, in the latter days of my stay in England. He had lately suffered deep sorrow from the sad bereavement of his beloved eldest daughter. (Actually it was his second daughter Mary). At that time he kept himself quite secluded to mourn his deep loss in private. but when he heard that a Hindu from that far country, which is more beloved to him than any worldly tie, came to pay his homage to him, his heart at once warmed up and he prepared to receive him with open arms. So one day in November, when a thick fog cast a gloomy mantle over the shades of the evening, I rang the visitor's bell at the door of his cottage in the suburbs of Oxford. (Actually, is was one of the largest houses north of the parks, which is now a school. It had a sloping red roof which made Mukherjee think of it as a cottage). Mrs. Max Mueller herself opened the door of whom I enguired, 'Is the professor at home ? She answered in the affirmative and bade me come in. An elderly gentleman of venerable appearance soon appeared in the passage, who received me with the utmost kindness. It needed not an introduction to tell me that I stood in the presence of the man who would vie with Sayana and Yaska in his profound love of Vedic learning, and with Panini in

his power of ritical investigation and intelligent collation of facts. Still I asked. 'Have I the honour to speak to professor Max Muller ?' He quietly said. 'I am that individual' Then we sat for a long time in his cosy drawing-room, where a cheerful fire was burning......The professor talked incessantly of India and the Hindus for whom it is needless to say that he has the deepest sympathy and love. He told me that though his body lived in England his mind and soul were in India."

এই উদ্ধৃতিটি নীরদবাবু গত ১৯৭০, ১৪ই সেপটেম্বর তারিখের হিন্দুস্থান স্ট্যানডার্ডে তাঁর বিলেত থেকে পাঠানো 'কমেন্‌টারি' পর্যায়ের একটি রচনায় উদ্ধৃত করেছেন—তাঁর একটি বিশেষ বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করতে। এই উদ্ধৃতির আরম্ভে তিনি লিখেছেন (তুলনামূলক একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ)—

I quote a contemporary appreciation of him, not from Vivekananda, but from a representative of young Bengal who has been forgotten today. He was remarkable by any standards, and his name was Trailokya Nath Mukherji. He describes his visit to Max Mueller at Oxford in these words:

নীরদবাবু তাঁর বক্তব্যের শেষে যে কথাগুলি বলেছেন সেগুলি আমার অনুবাদ ছাপার ব্যাপার নিয়ে। বাংলাদেশের একশ্রেণীর জাতীয়তা বোধের কিছু মূল্যায়নও আছে এর সঙ্গে। তিনি বলছেন, (অবশ্য তাঁর অন্য বক্তব্য প্রসঙ্গে)—

But the tragedy is that even Bengal has forgotten his sense of humour' and became infected with this retrograde nationalism. I owe the quotation from Trailokya Mukherji to my friend Parimal Goswami. He wanted to reprint the travel diary of this remarkable Bengali, but came up against the objection that no praise of England could be published in these days ! From this sort of opinion, to the foaming at the mouth after seeing the Louis Malle film is only one step.

প্রশংসা যেখানে প্রাপ্য, সে যে জাতির লোকই হোক, তাকে প্রশংসা করলে আমাদের ন্যাশান্যালিজমের অপমান হয়, এই মনোভাব এদেশের যে শ্রেণীর লোকের, তাদের হাতে দেশ কখনো উন্নত হতে পারে না।

যাই হোক এ বিষয়ে অতিরিক্ত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। নীরদবাবুর বহু চিঠি এবং বহু কথা আছে। কিন্তু এ অধ্যায়ে আমি তাঁর স্ত্রীর চিঠি ও তাঁর চিঠি মিলিয়ে মানুষ নীরদচন্দ্রকেই দেখতে চেষ্টা করলাম। কারণ তাঁর সম্পর্কে তাঁর সেই দিকটিই আমার কাছে বেশি স্মরণীয় হয়ে আছে। এবং আমি মনে করি পাণ্ডিত্যের দিক থেকে নয়, কিন্তু চিন্তার দিক থেকে তাঁর সঙ্গে আমার অনেকখানি সমতা আছে এবং তা আমি অনুভব করি। এবং তিনিও যে করেন তা তাঁর 'দি কনটিনেণ্ট অভ সার্সি' বইখানা উপহার দেবার সময় সেই বইতে যে কথাগুলি লিখেছেন. তাতে তা বোঝা যাবে। —তিনি উপহার পৃষ্ঠায় লিখেছেন—

To

My dear friend Parimal Goswami—

We belong to the same generation, have been brought up on the same ideas, have gone through the same type of life in which external suffering was compensated for by internal exultation—and perhaps we shall die in the same faith, with exultation unextinguished, for both of us believe that nothing but the spirit counts.

Nirad C. Chaudhuri

Delhi

May 20,

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

প্রবাসীর ৬০ বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে বিরাট আয়োজন ১৯৬০ থেকে, সম্পাদনার ভার রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জামাতা কবি সুধীরকুমার চৌধুরীর উপর ন্যস্ত। সুধীরবাবু আমাকে চিঠি দিলেন, 'একটি গল্প ও একটি স্মৃতিমূলক অথবা অন্য প্রবন্ধ চাই।'

আমি সুধীরবাবুকে লিখলাম, এক সংখ্যায় একজনের দুটি লেখা দেখতে খারাপ হবে না? ভেবে দেখুন। সুধীরবাবু তার উত্তরে জানালেন 'দুটো ছাড়া আরো একটা পেলে ভাল হয়।'

তখন থেকে সুধীরবাবুর উপর নজর রেখেছি। অতি অবুঝ লোক, সাবধান হতে হবে। লেখা অবশ্য তিনটিই দিতে হল, একটি ব্যঙ্গ গল্প. একটি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে স্মৃতিমূলক প্রবন্ধ, ও তৃতীয়টি বিজ্ঞান ভিত্তিক রসরচনা—নাম "চাঁদে উঠব কেন"।—জানিয়েছিলাম, পাঠক হয়তো মনে করবে বন্ধুত্বের খাতির।

আমার সঙ্কোচপূর্ণ চিঠি পেয়ে সুধীরবাবু আমাকে আশ্বস্ত করার জন্য যে চিঠি দিয়েছিলেন তাইতে আমি আরো বেশি সঙ্কোচ অনুভব করেছি তখন, এবং এখনো করি। কারণ তিনি কেন যে আমাকে এতটা মর্যাদা দিলেন, তা আজও আমার কাছে দুর্বোধ্য। খ্যাতিমানদের দলের আমি নই, এ বিশ্বাস আমার মিথ্যা নয়। আমার এদিকে কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা এখনো নেই। আগেও ছিল না। কারণ আমি যে ধরনের লিখি তার আকর্ষণ আমার কয়েকজন পরিচিতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। প্রবাসীর ষষ্টি-বার্ষিক স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের পর আজ প্রায় ১০ বছর ধরে প্রবাসীতে মাসে মাসে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়ে আসছে। তাতে বিভিন্ন বিভাগে আমার তিনটি লেখা ছাপা হওয়া সত্ত্বেও আমার নাম বিজ্ঞাপনে পরিহার করা হয়েছে। যিনি ঐ বিজ্ঞাপন লিখেছেন, তিনি অন্তত জানেন আমার নাম পাঠকদের কাছে আকর্ষক হবে না। সুধীরবাবুর অপেক্ষা তিনি বুদ্ধিমান বেশি।

আবার দেখা যায় এক মহিলা ছোটদের পাঠ্য যাবতীয় বাংলা বই নিয়ে 'গবেষণা' গ্রন্থ লিখে ডকটর হলেন, কিন্তু আমার ৬ খানা বই থাকা সত্ত্বেও তার কোথাও কোনো উল্লেখ নেই।

এই প্রসঙ্গে একটা মজার গল্প মনে এলো। ১৯৬০এর কথা বা কিছু আগের, (হাতের কাছে দলিল নেই) কোনো একটা নতুন প্রকাশিতব্য বৃহৎ মাসিকের সম্পাদক প্রথম সংখ্যার জন্য একটি গল্পের বায়না করতে এসে গল্পের জন্য টাকা অগ্রিম দিয়ে গেল। পরে গল্প নিয়ে গেল নির্দিষ্ট সময়ে। আরো কয়েক দিন পরে মুখ কাঁচুমাচু করে গল্পটি ফিরিয়ে দিতে এসে বলল এর মধ্যে একটু যৌন আবেদন যদি ঢুকিয়ে দেন, তবে বড় ভাল হয়। অর্থাৎ একমাত্র তাইতে আমার গল্প পপুলার হতে পারে। আমি কোনো কথা না বলে গল্পটি নিয়ে আগের দেওয়া টাকা ফিরিয়ে দিলাম। কিন্তু সম্পাদক কিছুতেই টাকা ফিরিয়ে নেবে না, বলল, টাকা নেব না, আপনি না হয় আর একটি গল্প লিখে দিন। আমি বললাম, ও কাগজে আমি আর লিখব না।

প্রিয় লেখক না হওয়ার একটা অদ্ভুত কারণ এই উপলক্ষে জানা গেল।

এর পরে আরো অনেক নাটকীয় ঘটনা। গল্পটির নাম ছিল পাথুরে ভূত। একদিন যুগান্তর অফিসে প্রবাসী সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁকে সব বললাম এবং গল্পটি পড়ে শোনালাম। তিনি সেটি পকেটস্থ করে বললেন, কত চাই এর জন্য? এবং প্রবাসীতে ছাপলেন। পরে সে গল্প বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'অন্য ভুবন' নামক অলৌকিক গল্প সংগ্রহ পুস্তকে ছাপা হয়, অদ্রীশ বর্ধনের 'আশ্চর্য' মাসিকে ও 'অমৃত' সাপ্তাহিকে সংকলিত হয়। আমার 'বারো ভূতের আসর' নামক গল্পের বইতে ছাপা হয়েছিল সেটি। এবং ১৯৬০ সনে যখন প্রবাসীতে গল্পটি প্রকাশিত হয় তখন প্রখ্যাত সমাজসেবী কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় লিখলেন—

ওঁ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ

P. O. Bara Andulia
Nadia
4. 5. 60

পরম প্রীতিভাজনেষু,

পাথুরে ভূতের গল্পে দুর্নীতির উপরে ভোলতেয়ারী (Voltaire) কষাঘাত হেনেছেন। আপনাকে অভিনন্দন জানাই।...আশা করি কুশল।

ভবদীয়

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

আমি এতক্ষণ এই কথাটি বলতে চেষ্টা করেছি যে. আমি যা লিখি তা পপুলার নয়, এবং পপুলার হবার কোনো গরজ আমার নেই। আমার যাঁরা পাঠক এবং আমার লেখা যাঁরা পছন্দ করেন তাঁরা সবাই আমার বন্ধুলোক, এবং তাঁদের সংখ্যা স্বভাবতই সীমাবদ্ধ। সুধীরকুমার চৌধুরী তাঁদের অন্যতম। তাই তিনি লিখলেন,—

PRABASI
Sixtieth Anniversary Volume
15, Lake Temple Road
Calcutta-29
12. 5. 1960

প্রিয়বরেষু,

আপনার ৬ তারিখের চিঠিটির জন্যে ধন্যবাদ জানবেন। বেশী লেখা চাওয়ার হেতু ব'লে যা আপনি অনুমান করেছেন তা যথার্থ নয়। সুলেখক বলেই আপনাকে আমি বেশী মর্যাদা দিয়েছি, প্রবাসীর লেখক বলে নয়।···

দু'-একদিনের মধ্যেই টেলিফোনে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।··· প্রীতিনমস্কার ও শুভকামনা জানবেন।

ইতি—

ভবদীয় শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

Q. E. D.

সুধীরবাবুর বিচিত্র জীবন, জীবনে বিচিত্র অভিজ্ঞতা। আসলে তিনি কবি। ১৪ বছর বয়স থেকে অর্থাৎ স্কুলজীবন থেকে তাঁর কবিতা ছাপা হয় ঢাকা-থেকে প্রকাশিত রজনীকান্ত গুহ সম্পাদিত 'সেবক' নামক মাসিক ও ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত কেদারনাথ মজুমদার সম্পাদিত 'সৌরভ' মাসিকে। তারপর কত কবিতাই লিখেছেন, কবিতার বইও বেরিয়েছে দুখানা। তার মধ্যে 'জলের লিখন' নামক কবিতার বইখানা সুধীরবাবু ১৯৩৯ সনে আমাকে উপহার দেন। আমি ১৯৭১ সনে সুধীরবাবুকে ঠাট্টাচ্ছলে বলেছি আপনি এতকাল পরে ঐ কবিতার বইতে রবীন্দ্র পুরস্কার পেলেন।

ব্যাপারটা এই: ঐ কবিতার বই থেকে কোনো কবিযশঃপ্রার্থী কয়েক লাইন

আত্মসাৎ করে নিজের নামে ছাপিয়ে দিয়েছিল। আর সেই অপহরণ সংবাদ পরে আমাকেই ইতশ্চেতঃ কলমে প্রথম উদঘাটিত করতে হয়। ফলে আদালত পর্যন্ত গড়াবার উপক্রম। কিন্তু মাঝপথে মিটে গেল মামলা। গুজব, উক্ত অপহরণকারী ৬০০০ টাকা সুধীরবাবুকে দিয়ে সব মিটিয়ে ফেলেছে। রবীন্দ্র পুরস্কার ৫০০০ টাকা। সুধীরবাবু অতিরিক্ত ১০০০ পেয়েছেন। আমার আর এক বন্ধু বলেছিলেন ঐ ১০০০ টাকা আমাদের দুজনের পাওনা। কারণ তিনিই প্রথম ঐ অপহরণ সংবাদটি যথাস্থানে চালান করেছিলেন। ১০০০ টাকার প্রস্তাবটি ভালই ছিল, কিন্তু সুধীরবাবুর এক অদ্ভুত ক্ষমতা আছে, তিনি ইচ্ছা-বধির হতে পারেন। শরৎচন্দ্র পণ্ডিত একবার পাশে ঘুমন্ত নলিনীকান্ত সরকারকে ঘুম থেকে তুলে বলেছিলেন, 'নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি তোর আর আমার, তুই নলিনী আমি পণ্ডিত।' এর সঙ্গে আমার বন্ধুর প্রস্তাব সামান্য কিছু মেলে। সবটা নয়, কারণ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের সম্পত্তি ছিল দুষ্প্রাপ্য, আর সেটা ছিল নিতান্তই কথার খেলা, সুধীরবাবুর উদ্বৃত্ত ১০০০ টাকা খেলা নয়, যদিও তিনি আমাদের যুগ্ম প্রস্তাবকে খেলা বলে উড়িয়ে দিলেন।

সুধীরকুমার চৌধুরী জানিয়েছেন, তিনি ১৯১৯ সনের সেপটেম্বর মাসে প্রবাসীর সম্পাদকীয় বিভাগে প্রবেশ করেছিলেন সহকারী রূপে। কিন্তু, আমার মতে, সহকার রূপে। কারণ সহকারকে আশ্রয় করে একত্র বৃদ্ধি পায় যে ব্রততী, তা তিনি সেখানে পেয়েছিলেন সীতা দেবী রূপে। সুধীরবাবুর বিবাহ হয় ১৯২৩ সনের সেপটেম্বর মাসে।

বিচিত্র জীবন। রেঙ্গুনে সাংবাদিকতার জীবন, কলকাতায় বীমা প্রতিষ্ঠানের অফিসার, স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনসটিট্যুটের অফিসার। শিক্ষিত বাঙালীর অনেকেরই এই রকম বৃত্তি ও প্রবৃত্তির সামঞ্জস্য হয় না। ইতিপূর্বে সুরেশ চক্রবর্তী অধ্যায়ে "এইটে কি কম?" নামক যে কৌতুক নাটিকার উল্লেখ করেছি, তার এক জায়গায় একজন ঘোর রোম্যানটিক মনোভাবাপন্ন সহকারী ডিটেকটিভ তার নিয়োগকারিণীকে বলছে—

এক দিকে প্রাণভরা গান,
অন্য দিকে চোর ধরা। এই দুই
বিষমের মাঝে অস্তিত্ব রাখিতে হয়
ডিটেকটিভদের।……

তেমনি কিছুদিনের ইংরেজী বা বাংলা পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের কাজশেষে কবিকে যখন জীবিকার জন্য সম্পূর্ণ গদ্য পরিবেশে কাজ করতে হল, তখন ঐ বৃত্তির চাপে স্বাভাবিক প্রবণতা পিষ্ট হতে লাগল। তাই সুধীর-বাবু যে কবি সে কথা যথেষ্ট প্রচার আর হতে পারল না। এবং তিনি যে দুখানা কবিতার বই লিখেছেন এবং দুখানা গল্পের ও দুখানা উপন্যাস লিখেছেন, তা সত্ত্বেও লেখকরূপে তিনি যথেষ্ট প্রচারিত নন। এবং শুনেছি একখানা আলোচনা গ্রন্থে তাঁর 'অনুক্ত' নামক কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা-কালে লেখক লিখেছিলেন কবির পরিচয় অজ্ঞাত। এবং একদিন নিজ কানে শুনেছি, রেডিওতে তাঁর একটি কথিকা প্রচারের সময় (আগে ও পরে) নাম ঘোষিত হল সুধীরকুমার 'রায়চৌধুরী'! এবং সম্ভবত এই ভরসাতেই তাঁর কবিতা অপহরণ করার প্রবৃত্তিও হয় নতুন কবিযশঃপ্রার্থীর।

সুধীরবাবুর পূর্ব নিবাস ময়মনসিংহ। কলকাতা শহরের উপর ময়মনসিংহের প্রভাব কম নয়। সম্ভবতঃ আনন্দমোহন বসু থেকে আরম্ভ। সমসাময়িককালে ডঃ রমা চৌধুরী, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, সুধীরকুমার চৌধুরী (চৌধুরীর দল সংখ্যায় বেশি?) এবং অমল হোম, পুলিনবিহারী সেন। আরো অনেক বসু আছেন, অনেক চৌধুরী আছেন, অনেক সেন আছেন। সে সব নব ময়মনসিংহ গীতিকার অন্তর্ভুক্ত অবশ্যই। কেউ লিখেছেন কি এমন গীতিকা? আমি ঘনিষ্ঠভাবে জেনেছি অমল হোম, নীরদচন্দ্র চৌধুরী ও পুলিনবিহারী সেনকে। এঁদের কাকে কি ভাবে জেনেছি সবই বলেছি এ পুস্তকে। সুধীরকুমার চৌধুরীকে প্রথম জেনেছি তাঁর কবিতার ভিতর দিয়ে, যে কবিতার একটুখানি মাত্র পরিচয় এখানে দেওয়া সম্ভব।

বরষা সে আসে আর কাঁদে।
কি কথা বলিতে চায়, বলিতে কেবলি তার বাধে,
তাই বুঝি কাঁদে আর কাঁদে, শুধু কাঁদে।
এত কান্না কোথা পায়? যুগ যুগান্তরে
যে অশ্রু আকুলি উঠি ঝরিতে ভুলেছে তার পরে,
যে কান্না গলার কাছে সহসা থমকি থেমে গেছে,
সে-সকলই বেছে বেছে
পুঁজি সে করেছে বুঝি
দূর হতে দূরান্তর লোক হতে লোকান্তর খুঁজি!

বাষ্পাকুল বায়ুবেগে তার বুকে বাজে সেই সুর
সে কি কান্না আমাদেরই ? বুক তার করে ভরপুর
মোদেরই বিস্মৃত ব্যথা কোটি দিবসের,
দূরে রাখা দুঃখ-শোক, ঝেড়ে ফেলা বেদনা বিষের
সুনিবিড় বাহুপাশ ? অনুতাপ-পরিতাপ-তাপে
যতবার ফেনোচ্ছল মেকি হর্ষ-উচ্ছ্বাসের চাপে
ডুবাইতে চাহিয়াছি, বর্ষার বুকের গভীরে
বিজুলির জ্বালা হয়ে সে সবই কি গেছে ফিরে ফিরে ?
(যে কান্না কাঁদিতে ভুলি)'

একটা অখণ্ড ফুলের একটিমাত্র পাপড়ি সামনে ধরা গেল। বর্ণ গন্ধ পাওয়া যাবে, সবটা মিলিয়ে যে রূপ তা এতে পাওয়া যাবে না। তবু কবিতার পরিচয় না পাওয়া গেলেও কবির পরিচয় এই খণ্ডাংশেও নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

তবু আমার এই ব্লাফে যদি কেউ না ভোলেন তবে সম্পূর্ণ একটি কবিতাই দিচ্ছি, কবি ও কবিতাকে মনে হয় এই একটি কবিতা থেকেই সবচেয়ে ভাল জানা যাবে।

আজি এ নিমেষখানি উতরিল এসে চুপে চুপে
কি নিবিড় পূর্ণতার রূপে
নিভৃত এ হৃদিতটে এসে।
বুকে নিয়ে এল ভালবেসে
অসীমের যত পণ্য। অনাদির যত আয়োজন
একটি নিমেষরন্তে ফুটি' উঠি' ফুলের মতন
রহিয়াছে স্থির,
অন্তহারা তপোনিষ্ঠা বারে বারে টুটিছে সৃষ্টির।
নিতল এ নভঃ-তলে শরতের মেঘ-আলিপন
নত করবীর শাখা, রৌদ্র-দীপ্ত গৃহের প্রাঙ্গণ
নিদ্রাতুর সারমেয়, উড়ে যাওয়া চিলের ছায়াটি
পাতা-খোলা বইখানা, কাপড় কোঁচানো পরিপাটি,
কিছু নহে মিছে,—
স্নেহভরা কার দুটি নয়নে জাগিছে

সবে এরা।
পথে পথিকের চলাফেরা,
ও বাড়িতে ছেলেদের সুর করে ধারাপাত শেখা
এরও লাগি অনাদির যুগে যুগে কত স্বপ্ন দেখা,
অধীর প্রতীক্ষা কত কল্প কল্প ধ'রে।
তরুতলে পাতার মর্মরে,
গাড়ির চাকার শব্দে, কামারের হাতুড়ির ঘায়,
নারীর কলহে আর শিশুর কান্নায়
ধ্বনিতেছে সেই মূরছনা,
তারে ছেড়ে কোনমতে চলিত না,
এ বিশ্বের সঙ্গীত-সাধন,
ব্যর্থ হয়ে যেত তার যুগান্তের যত আয়োজন।
পরিপূর্ণ একটি নিমেষে
নিজেরে হেরিনু পরিপূর্ণতার রাজ-রাজ বেশে।
আমি আছি—চূড়ান্ত এ অধিকার গণি,
আমি বিশ্ব-দেবতার নয়নের মণি।

(একটি নিমেষ)

এই পথই সুধীরবাবুর ছিল আসল পথ। অর্থাৎ কাব্যের পথ। পরকাল মানি না ('ভবিষ্যৎ কাল' অর্থ ছাড়া), নইলে বলতে পারতাম, এ পথে থাকলে পরকালের কাজ হত অবশ্যই। তবে সেই সঙ্গে এ কথাও বলতে হয়, তেমন হলে, ইহকালে অন্যের বাড়ির ফ্ল্যাট ভাড়া করে বাস করতে হত।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

মনীশ ঘটক এক অদ্ভুত চরিত্র। এবং তার পরিবর্তনও অদ্ভুত। প্রেমেন্দ্র মিত্র একদিন এসে বলল, জানো, সেদিন মনীশ বসুধারা অফিসে গিয়ে সোজা চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞাসা করেছে, ঐ রাস্‌ক্যালটা কোথায়? চারুবাবু বুঝতে না পেরে মনীশের দিকে চেয়ে রইলেন। মনীশ তারপর বলল, মানে প্রেমেন কোথায়—সেই রাসক্যালটা? এটি মনীশের প্রেমের ভাষা। কিন্তু চারুবাবুর কাছে তার প্রয়োগ অদ্ভুত নয় কি? মনীশ অদ্ভুত।

মনীশ একাধিকবার যুগান্তর অফিসে গিয়েই আমার কাছে প্রস্তাব করেছে চল, তোমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিই। তার অনুরোধ পালন করা সম্ভব হয় নি। কারণ মনীশ যখনই গেছে তখনই ঠিক আমার কাজের চাপ সবচেয়ে বেশি।

আমার স্মৃতিচিত্রণ প্রকাশের (১৯৫৮) কিছুদিন পরে যুগান্তর অফিসে এসে একদিন আমাকে জড়িয়ে ধরে অভিনন্দন জানাল ঐ বই-এর জন্য, বলল আমাদের লাইব্রেরিতে অনেকগুলো কেনা হয়েছে ও বই। কি অদ্ভুত বই লিখেছ, বলেই আমাকে বুকে চেপে ধরল। দুর্বল দেহে কাবু হওয়ার কথা সেই চাপে।

কাবু হবার পক্ষে দ্বিতীয় কারণ ঐ পুস্তকের প্রশংসা। কিন্তু আলিঙ্গনের চাপে অথবা প্রশংসার চাপে সে আমাকে কাবু করতে পারে নি, কাবু করেছে একটি কবিতায়। তার এই কবিতাটি পড়ে আমি সত্যই বিচলিত হয়েছিলাম—বেদনার কবিতা, এমন মর্মস্পর্শী যে আজও আমার মনে পড়লে বিস্ময় জাগে। কবিতাটি এই—

একটি মাত্র ঘর ছিল আমার
যখন তোমরা এসেছিলে,
একের পর এক, আমার আশা, আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ,
আমার ধ্যানের ধন,
আমার জ্যোতির ঊর্মিমালারা।
ভরে উঠেছিল আমার ঘর, অকুলান ঘর,

একটি মাত্র ঘর,
ভরে উঠেছিলাম আমি, স্বপ্নের অনেক আমিকে
তোমাদের মধ্যে পেয়ে।
আজ অনেক ঘরে বাড়ী আমার ভরা,
কিন্তু একের পর এক
ঘর খালি হচ্ছে, হচ্ছে, হচ্ছেই।
সেই সব খালি ঘরে
স্বপ্নচারী আমি
আজ খুঁজে বেড়াই
এ ঘরে তোমাকে,
ও ঘরে তাকে!
আনন্দ পাই
মনে মনে বসিয়ে
এ ঘরে তোমাকে, ও ঘরে তাকে।
এই সব ঘরগুলো তখন আবার
একটি মাত্র ঘর হয়ে যায়,
সেই অনেক আগের একটি ঘর
যে ঘরে তোমরা ছিলে
আমার দেহে-মনে, আশায়, আকাঙ্ক্ষায়, আনন্দে
এক হয়ে;

যেন কোনো ঢেউ-না-ওঠা মহাসমুদ্রের
গোপন অতল মণিকোঠায়—
আমার অনেক ঘরের
অনেক ছড়ানো নির্জনতায়
আবার আমি পূর্ণ হয়ে উঠি।

('যদিও সন্ধ্যা'—সন্ততি)

পড়তে পড়তে মনকে অতি গভীরে টেনে নিয়ে যায়, চিরকালের বেদনা-ভরা এক রাজ্যে, ট্র্যাজিডির আনন্দে মন অভিভূত হয়ে পড়ে। এই হল কবি মনীশ ঘটকের একদিকের পরিচয়। মনটা স্নেহকোমল, আমার প্রতিও তার ভালবাসা অকৃত্রিম, আমার সে অনেক উপকার করেছে, কিন্তু সেকথা

জনসাধারণকে জানাবার কথা নয়। আমি অভিভূত হতে ভয় পাই, সেজন্য সে যেসব সামাজিক ভণ্ডামির বিরুদ্ধে অস্ত্র নিক্ষেপ করেছে, সেদিকে আমার আকর্ষণ বেশি। আমার 'আধুনিক ব্যঙ্গ পরিচয়' গ্রন্থে তার আমি প্রায় পুরো পরিচয় দিয়েছি।

কবিতায় লেখা চিঠি আমি অনেকের কাছ থেকে পেয়েছি। মনীশের কাছ থেকেও। ইতিপূর্বে বনফুল, তারাশঙ্করের কবিতায় লেখা চিঠির নমুনা দিয়েছি। হেমেন্দ্রকুমার রায় আমাকে অনেক চিঠি লিখেছেন কবিতায়—"আমি যাঁদের দেখেছি" বইতে তার অনেকগুলি ছেপেছি।

মনীশের একটি কবিতার চিঠি এখানে উদ্ধৃত করি, আগের ঠিকানা থেকে লেখা—

লালদীঘি রোড

বহরমপুর, ১৯।৬।৬১

পরিমল গোস্বামী চরণারবিন্দেষু,—

হে অগ্রজ
তুষ্ণীম্ভাব—ভাব কিংবা গুপ্ত অসদ্ভাব
অজ্ঞাত আছিল, তব এবম্ স্বভাব।
নহ যে পাণিনি তুমি বিলক্ষণ জানি,
দাক্ষিণ্যেতে ভরা তবু ও দক্ষিণ পাণি।
মসী ও লেখনী যোগে মঙ্গল সন্দেশ
পরিবেশনায় পূর্বে না মানিতে ক্লেশ।
অধুনা হয়েছে তাহা পুষ্প ডুম্বুরের
কি কহিব সকলই দুর্ভাগ্যের ফের।
এতৎসহ কীর্তিহীন নগণ্য কবির
সূর্যস্তোত্র তব স্থানে করিনু হাজির।
ধ্যানস্থ হইয়া দেবে করিয়া স্মরণ
পাঠ করি অগ্নিকুণ্ডে করহ অর্পণ।
ধৃষ্টতা হইলে জ্ঞান করিবে মার্জনা
অনুগত অনুজের এবম্ প্রার্থনা॥

স্নেহাশ্রিত অনুজ

এর সঙ্গে লেজুড় আছে কিছু। যথা—"অপর, বলাইদার চিঠিতে জানলাম

চোখের অসুখে তুমি কষ্ট পাচ্ছ এবং যথাযথ চিকিৎসা করাচ্ছ না। ধ্যাননেত্র কি এতই প্রখর হয়ে উঠেছে যে চর্মচক্ষুর পরিচর্যা অনাবশ্যক বিবেচনা করছ? অনুরোধ করি সময় থাকতে অবহিত হও।"

লেখাটি ভাল লাগল, কিন্তু ১৯৬১ তে কণ্ঠের অসুখে ভুগেছি, বোধ হয় বলাইয়ের হাতের লেখা 'কণ্ঠের' মনীশ 'চক্ষের' পড়ে থাকবে।

কবিতায় লেখা চিঠিতে যে 'সূর্যস্তোত্র' কথাটির উল্লেখ আছে সেটি রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে, ১৯৬১তে শতবর্ষ পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে। কবিতাটি এই—

ধরোনি রেসের বাজী, ওড়াওনি 'রাম্'
প্রড্যুস করোনি ফ্লপ সিনেমার ছবি,
খিড়কির দোর দিয়ে আনোনি ইনাম
উৎপাত বাড়াওনি 'উৎপলশ্রী' লভি'।
গুগলি বাম্পার নিয়ে ঘামাওনি মাথা
থ্রী হানড্রেড ক্লাবে কভু হওনি মেম্বার
জোড়া বলীবর্দ জুড়ে ঘোরাওনি যাঁতা।
ফুচকা খাওনি বসে সদর রাস্তায়,
একটানে কলকের ফাটাওনি নল,
নেতা হয়ে দেখাওনি খইনির বল,
বিলিতি থ্রিলার টুকে ঝাড়োনি শস্তায়।
করোনি অনেক কিছু ফর্দে কাজ নাই,
মানে মানে সরে গেছ বেঁচে গেছ তাই।

২১।৩।৬১

সনেটটি আমি ইতশ্চেতঃতে (২।৭।৬১) মন্তব্যসহ ছেপেছিলাম। রবীন্দ্রনাথকে উপলক্ষ করে সমকালের এক শ্রেণীর সাহিত্য ও সাহিত্যিকের প্রতি কিছু কটাক্ষ আছে। এই কবিতার শেষ লাইনটি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল যে আমিও এককালে এই জাতীয় এক দুঃসাধ্য কাজ করেছিলাম। অর্থাৎ কবিস্মরণে এক কবিতা লিখেছিলাম এবং তা যুগান্তরে 'প' স্বাক্ষরে ছাপা হয়েছিল। সেটি এখানে উদ্ধৃত করার প্রলোভন (স্নায়বিক দুর্বলতা বশতঃ) দমন করা গেল না। সে কবিতা আমার সতত সুহৃৎ বিশু মুখোপাধ্যায় তাঁর সম্পাদিত 'কবি প্রণাম' পুস্তকে সংকলিত করেছিলেন। আমি পরে কিছু মার্জিত করে রেখেছিলাম। অংশ এই—

তুমি যদি রইতে বেঁচে আমাদের এই কালে
বলতে পারি কি যে এখন ঘটত তোমার ভালে।
দেখতে তুমি অবশেষে তোমার বঙ্গজননী সে
লাঞ্ছিত হয় পদে পদে অবাঞ্ছিতের হাতে।
মানুষ মরে হাজার হাজার খাদ্য হরে কালোবাজার
জীবন-তরী আর বহে না মন্দাক্রান্তা ছাঁদে।
দেখতে মহা মন্বন্তর সকল বাংলা জুড়ে
অন্তরীক্ষ আঁধার ক'রে শকুন বেড়ায় উড়ে।

তুমি যদি থাকতে বেঁচে আমাদের এই কালে
বিষণ্ণমন রইতে চেয়ে হস্ত রাখি গালে।
বিরোধ-বাণীর ধ্বনি চড়া সকল মিলন স্বপ্ন হরা,
মর্মে পশি ধর্মে কবির হানত আঘাত রূঢ়।
দেখতে তোমার বিদায় বেলায় দেশ ডুবিছে পাঁকের তলায়
রুদ্ধকণ্ঠে রইতে বসে স্তব্ধ চিন্তামূঢ়।
হায়রে মিলন! মরীচিকা! খণ্ডিত দেশ কবি,
তুমি যেমন এঁকেছিলে ফুটল না সে ছবি।

তোমায় যদি বাঁচতে হত আমাদের এই কালে
দেখতে হত গান্ধী হত্যা আটচল্লিশ সালে
দেখতে জুড়ে সকল বিশ্ব, মানব ধর্ম দ্রুত নিঃস্ব,
ইউ-এন-ওর নূতন বাণী শুনতে শ্রবণ পাতি।
মানব-নীতির কবর 'পরে কূটনীতির ধ্বজা ওড়ে,
রাতকে যাহা দিবস করে দিবস করে রাতি।
হিংস্রবাণী ব্যঙ্গ করে শান্তিবাণীটিরে,
ষণ্ডধর্ম আসর জমায় বদ্ধমুষ্টি ঘিরে।

শেষ দুটি ছত্র এই—

উঠছে গরল বর্তমানের সকল সাগর সেচে,
আমরা তাতে তলিয়ে যাব, তুমি রইবে বেঁচে।

(বাইশে শ্রাবণ)

এ কবিতাটা দেওয়া হল দুটি কারণে। প্রথম কারণ আগেই বলেছি-

দ্বিতীয় কারণ, মনীশের ব্যঙ্গ কবিতাটির শেষের কথাটিতে আমার সঙ্গে তার একটুখানি সুরের মিল আছে, সেজন্য আমরা দুজনেই গ্রেট এটা প্রমাণ করা যাচ্ছে।

মনীশের ব্যঙ্গ কবিতা আমাকে বিশেষ ভাবে মুগ্ধ করেছিল, আর সেজন্য আমার আধুনিক ব্যঙ্গ পরিচয়ে তার সম্পর্কে একটি অধ্যায় লিখেছি--একথা আগে বলেছি।

তারপর বহুকাল পরে ১৯৬৮ সনে মনীশ একদিন হঠাৎ এসে হাজির। মুখে অকালপক্ক লম্বা দাড়ি ঝুলিয়ে। শুধু গোঁফ ছিল ব্যঙ্গ কবিতা লেখার কালে। তারপর দাড়ি রেখে সম্ভবত নিজের প্রতি ব্যঙ্গ প্রকাশ করতে লাগল। বুঝলাম যুবনাশ্বের কবি-জীবনের এটা একটা বড় transition period শুরু হয়েছে। একটা ক্রান্তি কাল। আমার অনুমান যে ঠিক তা অনেক দিন পরে সম্প্রতি ১৯৭১ সনে প্রমাণিত হয়েছে তার আত্মসাধনাজাত নতুন কবিতার বইখানা দেখে। বইয়ের নাম বিদুষী বাক্।

তার যে সব ব্যঙ্গ কবিতা আমার খুব ভাল লেগেছিল তার একটু একটু নমুনা দিচ্ছি। ভাল লাগবে পড়তে।

জাত পেশা প্রবঞ্চনা, অবসর ধর্মেকর্মে কাটে
মহাজনো যেন গতঃ—চলো বাবা চলো সেই বাটে।
মাতাল লম্পট যারা রাত্তিরে নর্দমা হাতড়ায়
ভব্য বেশে পরদিন গার্ল স্কুলে প্রাইজ বিলায়।
ভুয়ো কম্পানি খুলে, ন্যায্য আয়কর দিয়ে ফাঁকি
কৌঁসুলি এটর্নি পুষে, সততা জাহির করে হাঁকি।
হৈহল্লার অবসরে চোখবুজে আওড়ায় গুন গুন
জাতের বাপের দেওয়া অব্যর্থ দাওয়াই রামধুন।

অথবা—

উনিশ বছর ধরে দেশটাকে শুষলাম, পিষলাম লেভি করভারে,
বগড় লুঠছে যারা, ছিটে ফোঁটা ঝাড়লেই ছুটে গিয়ে ভোট দিই তারে।

অথবা—

যত আশা ভালবাসা মায়ের মুখের ভাষা কেড়ে নিয়ে শিখিয়েছি গালি।
'জন-গণ-মন' মেরে ভজি 'অধিনায়ক', গাহি তার জয়গান খালি।

মনীশ ঘটক একটি ব্যক্তি নয়—বহু ব্যক্তি, অর্থাৎ বহুবচন,—যদিও তার

নিজের ছাপা বচন বহু নয়। এ বয়সে তার অন্তত ৫০ খানি বই লেখা উচিত ছিল, কিন্তু বোধ হয়, উপন্যাস, কবিতা মিলিয়ে, মাত্র পাঁচখানা। ইনকাম ট্যাকসের উকিল, কাজেই অন্যের 'ফিকশন' নিয়ে কারবার। সেই সব ফিকশনের সে স্ক্রুটিনাইজার। সাহিত্য ক্ষেত্রে সে সংযতবাক। আর সেই জন্যই সম্ভবত তার সাম্প্রতিক বইয়ের নাম বিদুষী বাক। পুস্তকের সংখ্যার হিসাবে এমন বাক্‌ সংযম লেখকদের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না।

বলেছি, এক ব্যক্তির মধ্যে সে বহু ব্যক্তি। সংসারের প্রত্যেকটি মানুষই তাই, কিন্তু সবার মধ্যে সব গুলি ব্যক্তি সবসময় সমান ভাবে প্রকট থাকতে দেখা যায় না। তবে বহু ব্যক্তির কাছে একই ব্যক্তির নানা পরিচয়। মনীশের মক্কেলদের অনেকেই হয় তো জানে না যে মনীশ সাহিত্যকর্ম করে, কবিতা লেখে। জানলে প্র্যাকটিস করা শক্ত হত। মক্কেলরা তার কর্মক্ষমতায় সন্দেহ করত। অথবা কোনো গণ্ডেবারাম মক্কেল যদি তার কাছে এসেই মুখস্থ বলে যেত—

সার, কি সুন্দর লিখেছেন আপনি—জানতাম না আগে—তাই তো ভয়ে ভয়ে ছিলাম।—আপনার জ . . . াক, সার। এই যে লিখেছেন—সব মুখস্থ করেছি, সার,—

জাত পেশা প্রবঞ্চনা, অবসর ধর্মে কর্মে কাটে
মহাজনো যেন গতঃ—চলো বাবা চলো সেই বাটে।

বহুত আচ্ছা!—তাই তো মহাজনের পথে চলেছি, সার। সবাই চলছে যে পথে সেই তো পথ। গত বছর পঞ্চাশ হাজার টাকা কর ফাঁকি দিয়েছি, এবারেও ঐ রকম দিতে চাই, সার। আরো যে লিখেছেন—

এই তো যুগের হাওয়া, যে মাছটা বাড়ছে পুকুরে
নির্বিচারে ছোট গুলো ধরে ধরে মুখে দেয় পুরে।
হোক না সে প্রতিবেশী, হোক না সে আত্মীয় স্বজন
পারে না নিজেরে খেতে এই ক্ষোভে মরে সর্বক্ষণ।

একেবারে মনের কথাটি, সার, খুলে লিখেছেন। একাজে খুব জোর পাচ্ছি এখন—প্রতিবেশী ভক্ষণে।

এ রকম যদি কোনো মক্কেল মনীশের কবিতা মুখস্থ করে তার সামনে আবৃত্তি, করে তখন কি মনীশ আর বলতে পারবে ফাটা দাও ?—তাই তে মনীশের পক্ষে, বৃত্তিকে কাব্যের সঙ্গে জড়িয়ে না ফেলে, এবং মক্কেল মহলে

নিজেকে যুবনাশ্বরূপে বেশি প্রচার না করে, বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু একটা রফা কি হয় না? চেষ্টা করা যেতে পারে। তাই তাকে আমি ইনকাম ট্যাক্স নিয়ে এবারে একখানা বড় কবিতার বই লিখতে অনুরোধ জানাই, কারণ তা হলে কাব্যখ্যাতি এবং বৃত্তিখ্যাতি দুইই সে যুগপৎ এক খরচে লাভ করতে পারবে। বইটাও ভাল বিক্রি হবে। একই সঙ্গে ইনকামট্যাক্স ও কাব্য—বিষমধর্মী নয়।

মনীশের শেষ কবিতার বই বিদুষী বাক। আত্মিক যে গভীরতায় মনীশ এ বইয়ের কবিতা গুলির ভিতর গিয়ে পৌঁছেছে, সেখানে পৌঁছই এমন সাধ্য আমার নেই। সেখানে ব্যঙ্গ পৌঁছয় না, ইনকামট্যাক্স পৌঁছয় না। এ শুধু বিশ্বের সঙ্গে আত্ম উপলব্ধির ব্যাপার—এবং তা যেমন ভাবগাম্ভীর্যে মনকে গম্ভীর করে তোলে, তেমনি তা প্রকৃত কাব্যের ধ্বনি ও সুরে একান্ত মুগ্ধ করে।

কিন্তু তবু সব চেয়ে বেশি মুগ্ধ করে আমার প্রতি তার উদার ব্যবহার। গত ৯ই মে (১৯৭১) তারিখে সে তার 'বিদুষী বাক' পূর্বে প্রকাশককর্তৃক আমার কাছে প্রেরিত কবিতার বইখানিতে সস্বাক্ষর আমার নাম লিখে উপহার পাকা করে দিয়ে গেল, সেদিন সে আমাকে একটি ভাল ফাউনটেন পেনও উপহার দিয়ে গেছে। আমি ২৫।৫।৭১ তারিখে সেই কলমে অধ্যায়টি লিখে শেষ করলাম।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

সৈয়দ মুজতবা আলীর সঙ্গে প্রথম পরিচয় কবে হল সে কথা বলতে গেলে প্রায় কালিদাসের কালে ফিরে যেতে হবে। অর্থাৎ কবিশেখর কালিদাস রায়ের কালে। প্রথম জনের সঙ্গে পরিচয় ১৯২০ সনে আর মুজতবা আলীর সঙ্গে পরিচয় ১৯২১ সনে। এটি শান্তিনিকেতনের ঘটনা, স্মৃতিচিত্রণে সে সব কথার উল্লেখ আছে।

তার চিঠিও অনেক, কিন্তু এখানে আমি তার কয়েকখানি মাত্র উদ্ধৃত করব।

মাসিক বসুমতীতে আমার দ্বিতীয় স্মৃতি ধারাবাহিক প্রকাশিত হতে থাকে, এবং ১৯৬০তে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। স্মৃতিচিত্রণে ডাঃ বনবিহারী মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে কিছু লিখেছিলাম। আর ১৯৬২ সনে দ্বিতীয় স্মৃতিতে পৃথক একটি অধ্যায় লিখেছিলাম তাঁর সম্পর্কে। (তাবপর "আমি যাঁদের দেখেছি"তে আরো বিস্তারিত হয়েছে সে লেখা—কিন্তু সে প্রসঙ্গ অবান্তর)। ১৯৬২র লেখায় ডাক্তার মুজতবা আলীর ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কথা মনে পড়ে, এবং আমাকে চিঠি লেখে। সেটি এই—

শান্তিনিকেতন
২৮-১১-৬২

প্রিয়বরেষু,

১৯২১ ইংরিজি থেকে বনবিহারীবাবুর সঙ্গে পরিচয়। আমি তাঁর সর্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিনোদবিহারীর বন্ধু বলে আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। ১৯৪৮ সালে আমার মারাত্মক আরথ্রাইটিস হয়। তিনি তখন দেরাদুন থেকে কলকাতায় এসেছিলেন। থাকতেন তে-কোনা পার্কের কাছে। আমার রোগের কথা জানতে পেরে আমাকে ডেকে পাঠান (rare on his part) কারণ তিনি গায়ে পড়ে কারোরউপকার অপকার কিছুই করতে চাইতেন না। এক ভালো ডাক্তারের কাছে পরিচয় পত্র লিখে আমাকে সেখানে পাঠান। রোগ সাতদিনে সেরে যায়। তারপর আবার দেখা করতে যাই। আর দেখা হয়নি।

আমার এক বন্ধু আন্দামানে তাঁর সঙ্গে দেখা করে এসেছেন; একে আন্দামান, তার উপর এমন একটা লক্ষ্মীছাড়া হতভাগা জায়গা বাছাই করে নিয়েছেন যেখানে আলুটা দেশলাইটা পাওয়া যায় না।......কিন্তু এ বেয়াড়া ভদ্রলোককে কে বাগে আনবে? [সেখানে] তুলসী ডাক্তার নেই। [তুলসীচরণ ভট্টাচার্য 'বেপরোয়া' দলের অন্যতম।]

আমি বহু দেশ ঘুরেছি, বাঘা বাঘা লোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, এরকম একটা personality চোখে পড়েনি। তাঁর লেখা, তাঁর ছবি সব বাদ দাও—শুদ্ধ মানুষটার কথা ভাবো, Royal Bengal Tiger, হাতে আবার তলোয়ার, তাতে কুইনিন মাখানো এবং ফোঁটা ফোঁটা কমলা মধু।

—সৈয়দ মু. আলী

মুজতবা আলী আন্দামানের কথা লিখেছে, সেই আন্দামান থেকে আমি ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের দুখানা চিঠি পেয়েছিলাম। একখানার অংশ এই—

Holiday's Inn
Carbyn's Cove
Marine Drive, Port Blair
13.4.61

পরিমল,

ঠিকানা বদলেছি। এবার ফেরার। তুমি ইদানিং আমার জন্য যা করেছ তার জন্য অত্যন্ত ঋণী আছি। ঋণী লোকের ফেরার হওয়া বা গায়েব হওয়া দেখতে খারাপ। তাই ঠিকানা জানালুম।

ঠিকানা জমকালো। জমকালো ছিল হয় ত পঞ্চাশ বছর আগে। এখন যা অবশিষ্ট আছে তা হচ্ছে একটি টিলার ওপর একটা পোড়ো কাঠের বাড়ী। ঘর ও বারান্দায় দরাজ space, তবে সকালে চোখ খুললেই সমুদ্রের ওপর সূর্যোদয় দেখি। ডাইনে বাঁয়ে পাহাড়। আর চারপাশে নারকেল গাছের দল "stand at ease"-এ দাঁড়িয়ে আছে।

আমি কুনো মানুষ। মনের মত কোণ পেয়েছি।

উত্তর দেবার চেষ্টা কোর না। কারণ উত্তর হাতে পৌঁছবে কিনা সন্দেহ।...

বনবিহারী

মুজতবা আলীর বন্ধুটি বনবিহারীবাবুর বাসস্থানের যে বর্ণনা দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে বনবিহারীবাবুর নিজের বর্ণনার কিছু মিল আছে, তবে চোখের সঙ্গে মনের সঙ্গে সমুদ্রের যোগ ছিল! তাইতেই সব তুচ্ছ বড় হয়ে ওঠে, সুন্দর হয়ে ওঠে। আমি এ চিঠির উত্তর কবে দিয়েছিলাম ঠিক মনে নেই, নিষেধ অমান্য করেও দিয়েছিলাম। তা অনেককাল পরে তাঁর হস্তগত হয়েছিল অন্য ঠিকানায়। সে চিঠির অংশ ও ঠিকানা এই—

C/o N. P. Gupta
Agent State Bank of India
Port Blair
A & N Island
18. 1. 63

কল্যাণীয়েষু,

পরিমল তোমার একমাত্র চিঠি অনেক বাধা সত্ত্বেও আজ পেয়েছি। পত্রপাঠ উত্তর দিচ্ছি।

স্মৃতিকথার দ্বিতীয় খণ্ড বেরিয়েছে শুনে সুখী হলুম। তাতে আমি অনেক স্থান জুড়ে আছি শুনে আরও সুখী হলুম।···

শুভাকাঙ্ক্ষী
বনবিহারী মুখোপাধ্যায়

সৈয়দ মুজতবা আলীর একবার এক গুরু অপরাধের জন্য আমাকে তার পক্ষ সমর্থনে দাঁড়াতে হয়েছিল। ঘটনা ঘটেছিল আকাশবাণীতে। ১৯৬৪ সনের ঘটনা। এই বছরের শারদীয় বেতার জগতে মুজতবা আলীর একটি বেতার ভাষণ পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। এক পাঠক সেই কথিকার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পেয়ে এক চিঠি লেখেন যুগান্তরের বেতার সমালোচনা বিভাগে। লেখক বলেছিলেন ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও··· ইত্যাদি।

বাদ-প্রতিবাদ চলেছিল। আমার শেষ প্রতিবাদটি প্রায় দেড় কলম হয়েছিল। দীর্ঘ ভূমিকা অংশ বাদ দিয়ে আমার যুক্তিগুলির অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করছি। প্যারাগ্রাফগুলি সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত ছিল, আমি দু নম্বর থেকে আরম্ভ করছি।—

২। সৈয়দ মুজতবা আলীর যে কথিকাটি নিয়ে আলোচনা, তা রেডিওর

একটি বিশেষ পর্যায়ভুক্ত কথিকা। ঐ পর্যায়ে আমারও একটি কথিকা ছিল। তার বিষয় ছিল "পঞ্জিকার নির্দেশ"। সেটিও ছাপা হয়েছিল বেতার জগতে। কিন্তু সে সম্পর্কে 'হিনডুইজম' আক্রান্ত হয়েছে এমন কথা ওঠে নি।

৩। 'হিনডুইজম' বড় ব্যাপক কথা। আলী নিজে যদি হিন্দু বিদ্বেষী হতেন এবং তা প্রচার করতেন তা হলেও তাঁর ঐ দুটি সর্বনামের দ্বারা [এঁয়ারা ও ওঁয়ারা] হিনডুইজমকে আঘাত করা হয়েছে এমন কথা ওঠা উচিত হত না। তিনি কথা দুটি ব্যবহার করেছেন ইতু ও ঘেঁটু এই দুটি উপদেবতা সম্পর্কে। এরা পৌরাণিক দেবতা নয়।

৪। হিনডুইজম বলতে ইতু ঘেঁটু বোঝায় না। শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি সাধকগণ…কৃষ্ণ কালী প্রভৃতি সাধনা করে আত্মিক জগতে এত উঁচুতে উঠেছিলেন। কিন্তু আমি তো এমন কোনো হিন্দু সাধককে জানি না যিনি ঘেঁটুর ভিতর দিয়ে সিদ্ধিলাভ করেছেন। শীতলা ইতুকেও আত্মিক সাধনার লক্ষ্য কেউ করেছেন বলে আমার জানা নেই।

৫। ইতুর সর্বনামরূপে যদি "উনি" ব্যবহার করা ঐ দেবতার পক্ষে অথবা হিনডুইজমের পক্ষে অপমানজনক হয়, তা হলে সূর্য সম্পর্কেও ঐ সর্বনাম চলবে না, কারণ তিনিও দেবতা, তাঁরও পূজা হয়। এবং 'ইতু' মানেও সূর্য। কোনো কাহিনীতে যদি চরিত্রগুলির নাম ক খ এবং গ হয়, তা হলে অন্তত ক ও গ সম্পর্কে "ওঁয়ারা" সর্বনাম চলবে না, কারণ ক অর্থে সূর্য এবং গ অর্থে গণেশ বোঝায়।…

৬। ঘেঁটু যদি হিনডুইজম হয় তা হলে তার অপমান ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ করেছেন। ইন্দ্রদেবের সভায় ঘেঁটু মনসা প্রভৃতির প্রবেশ। ইন্দ্র সাধুভাষায় তাদের কুশল প্রার্থনা করলেন, কিন্তু তার একটি কথাও কেউ বুঝল না। মূল কিছু উদ্ধৃত করি—

মনসা। (ঘেঁটুর প্রতি) মিনসে কী বকছে ভাই?

ঘেঁটু। পুরুতঠাকুরের মত মন্ত্র পড়ে যাচ্ছে। (ইন্দ্রের প্রতি) ওহে, তুমি বুঝি কর্তা। তোমার মন্তর পড়া হয়ে গিয়ে থাকে তো গোটাকতক কথা বলি।

ইন্দ্র। হে ঘেঁটো। আপনকার—

ঘেঁটু। ঘেঁটো কী? আমি কি তোমার বাগানের মালী, বাপের জন্মে

এমন অভদ্দর মানুষ দেখিনি গা। ঘেঁটো! আমি যদি তোমাকে ইন্দির না বলে ইন্দিরে বলি?

উদ্ধৃতি শেষ। দেখলেন তো, ঘেঁটু দেবতার সমাজে চিরদিনই অপাংক্তেয়, বিদ্রূপের পাত্র। বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ও···ঘেঁটোকে নিয়ে বিদ্রূপ করেছিলেন। ঘেঁটো খুজলি চুলকানি দাদ প্রভৃতির দেবতা।···

৭। হিনডুইজম-এর উপর এ রকম সরাসরি আঘাত করার বিবিধ দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। যেমন আচারসর্বস্বতা যদি হিনডুইজম হয় তা হলে তাতে প্রথম আঘাত হেনেছেন শ্রীচৈতন্যদেব। সতীদাহ যদি হিনডুইজম হয় তা হলে রামমোহন রায় তার অপমান করেছেন। চিরবৈধব্য রক্ষা যদি হিনডুইজম হয় তা হলে তার উপর আঘাত হেনেছেন বিদ্যাসাগর। পুরোহিত-প্রথা যদি হিনডুইজম হয় তবে স্বামী বিবেকানন্দ "আগে পুরুতগুলোকে দূর কর" বলে তাকে অপমান করেছেন।

৮। মুজতবা আলী গণৎকারের ভবিষ্যদ্‌বাণী সত্য বা মিথ্যা প্রমাণ করতে যান নি, গল্পের দাবিতেই যা কিছু ঘটেছে। ঐ কথিকার নামই দেওয়া হয়েছে গল্প।

৯।···আলোচামান গল্পের লেখকের নাম আলী না হয়ে কোনো দেবশর্মা হলে কোনো প্রশ্নই উঠত না।

উদ্ধৃতি শেষ। প্রথমে অকটোবরের শেষে (১৯৬৪) মুজতবা আলীর লেখার প্রতিবাদ বেরোয়, তার জবাবে আমার একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। আমি তাকে জানিয়েছিলাম বেরোচ্ছে। সে সংবাদ আলীর কাছে পৌঁছনোর পর আমাকে এই চিঠিখানা লেখে—

শান্তিনিকেতন

২০।১১।৬৪

বেরাদর,

Congratulations!···আমি অনিদ্রায় কাতর এই গরমি কাল থেকে। তৎসত্ত্বেও তোমাকে বিলম্বিত···দীর্ঘ, অতি দীর্ঘ—প্রথমটায় ভেবেছিলুম সংক্ষেপেই সারবো—চিঠি লিখতে থাকি। এখন দেখছি সেটা শেষ হতে আরো অন্তত ২৪ ঘণ্টা লাগবে। তাই "যতক্ষণ বেত না আসে কানমলাই চলুক"-নীতিতে এই পোস্ট কার্ড দিয়েই চালাও! ইতিমধ্যে নিবেদন, আমি শুধু এইটুকুই জানতুম, কে যেন আমাকে যুগান্তরে এক হাত নিয়েছে।

আমি সেটা দেখতে চাইনে। কিন্তু তোমার লেখা আমি সর্বদাই সাগ্রহে সানন্দে পড়ি। বর্‌হক বলছি। অতএব ভদ্র, তোমার উত্তরের cutting গুলো পাঠালে অত্যন্ত চরিতার্থ হব। মফঃসলে বিশেষ কাগজের বিশেষ সংখ্যা পাওয়া প্রায় অসম্ভব। তবু এই শনিবারের প্রতি শ্যেনদৃষ্টি রাখবো (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলতেন শেয়ানা শ্যেন থেকে) তবু ব্রাদার তুমিই পাঠাও।···ইতিমধ্যে ঢাকায় একটি কাগজে editorial রূপে সিরিয়াল বেরচ্ছে আমার বিরুদ্ধে—আমি হেঁদু হয়ে গিয়েছি। সে সব আর এখানে তুলছি না। দীর্ঘতর পত্রে সোমবার দিন তাবৎ বাৎ পেশ করবো।···পুনরায় নিবেদন এসব লড়াইয়ে তুমি কি জিতবে! আর আমিই বা যাই কোথায়? ওরা বলে আমি কাফের, এরা বলে আমি লেড়ে! ভালোই, রাইকুল শ্যামকুল দুই-ই গেল। নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।···তোমাকে দীর্ঘ চিঠিটা লিখছি আর সুখ পাচ্ছি।

আমার দ্বিতীয় চিঠি বৈতারিকের কলমে (যেটি পূর্বে আংশিক উদ্ধৃত করেছি) পড়বার পর সৈয়দ মুজতবা লিখল—

শান্তিনিকেতন

৭।১২।৬৪

গোঁসাই,

তোমাকে মারবে। এদেশে গোডসের অভাব নেই। তবে প্রশ্ন. তোমাকে কি আর মারটার হওয়ার luxuryটা enjoy করতে দেবে?

গুরুদেবকে বিচক্ষণরা যখন সাবধান করলেন—তাঁর সভ্যতার সঙ্কট বেরোনর পর—ইংরেজ জেলে পুরে দেবে, তখন তিনি বললেন, প্রিন্স দ্বারকানাথের জাতি, বিশ্বকবি, সবই হয়েছি, এখন শুধু বাকী শহীদ হয়ে মরার সম্মান। ইংরেজ কি সে luxury-টা আমায় জেলে মরে ভোগ করতে দেবে রে!

তোমার কার্ড পেয়েছি। পরে সবিস্তারে লিখব। খাসা লিখেছ। আর শেষ কথাটাই আসল। ইতি

তোমার 'দেবশর্মা'

আমার চেষ্টা কিছু বিচারের পথে চলা। কিন্তু সংস্কার সহজে মরতে চায় না। আমার ঐ লিখনটি কাগজে পড়ে আর এক লেখক ও শিক্ষাব্রতী, আমার পরিচিত, আমাকে লিখল—

মঙ্গী, বাটানগর
২৪ পরগণা
অক্টোবর, ৩১. ১৯৬৪

পরম শ্রদ্ধেয়,

বসুমতীতে অন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয়ের চিঠি পড়ে মনে হয়েছিল প্রথমবার। আর যুগান্তরে বৈতালিকের নিকট লেখা আপনার চিঠি পড়ে এই দ্বিতীয়বার মনে হ'লো।

মনে হ'লো বাংলাদেশ থেকে মানুষ এখনো মরেনি। সাম্প্রদায়িক ডামাডোলে আমরা সকলেই এমন বিষাক্ত হয়েছি যে হলাহল আর দাঁতের কোটরে রাখতে পারছি না, মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে টপ্ টপ্। সেই বিষ মাটিতে পড়তে না দিয়ে আজও আপনি নীলকণ্ঠ হতে চান। আশ্চর্য।

খোদা আপনার মঙ্গল করুন।

নিঃসীম অন্ধকার চারপাশে
আলো চাই—আরো আলো।—আলো আলো আলো

ইতি
আপনার উদার-মন-মুগ্ধ
আবদুল আজীজ আল-আমান

এরকম আরো অনেকবার আমাকে লিখতে হয়েছে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। ইচ্ছাকৃত কোনো নতুন আচরণ নয়, মনে যে সাম্প্রদায়িকতা চেতনার নিচের স্তরে বাসা বেঁধে আছে, জ্ঞানত যা আমরা বুঝতে পারি না, বিচারের পথে এসে তা আর অস্পষ্ট থাকে না। আমি এ বিষয়ে অনেকবার লিখেছি এবং কোনো ফল হবে না জেনেও লিখেছি। কিন্তু সে সব স্বতন্ত্র বিষয়।

চিঠিপত্র লেখায় মুজতবা আলী খুব তৎপর নয়, এ কথা সে এক চিঠিতে কবুল করেছে তার অননুকরণীয় ভাষায়। চিঠিখানা এই—

শান্তিনিকেতন
৩১-৭-৫৭

প্রিয় গোঁসাইজী

আপনার ২।৬ তারিখের পত্র কাল হাতে এল। আমি দিন দুই পূর্বে

আপনাকে একখানা পত্র লিখি। বিবেচনা করি 'পথিমধ্যে' কাটাকাটি হয়েছে। পাছে সেটা না পেয়ে থাকেন, তাই এটা ছাড়ছি।

লেখালেখি বাবদে আমি কোন্‌কালে ভাল ছেলে ছিলুম বলুনতো? আমার দাদারা, বোনেরা, বাপঠাকুদ্দা কেউই লিখতে চাইতেন না, এই আমার পাকা খবর। আমি যখনই ভালো হই তখনই জানবেন সেটা পারিবারিক ঐতিহ্যকে পীড়িত করে। আপনিও তো লেখেন অনিচ্ছায়, হাতের লেখা দেখেই তো বোঝা যায়। আমাদের এই সদ্দৃষ্টান্ত যদি বাঙালী লেখক অনুকরণ করত।

গুণমুগ্ধ মুজতবা আলী

"আপনি" ছিল প্রথমদিকে, তারপর কখন "তুমি"তে নেমে এসেছি দুজনেই। মুজতবা আলী আমার চেয়ে বয়সে কিছু ছোট। যাই হোক উদ্ধৃত ঐ চিঠিখানি আমি বেশ উপভোগ করেছি।

আমি একটি প্রবন্ধে লিখেছিলাম, সৈয়দ মুজতবা আলীর হাতে প্রকৃত স্যাটায়ার ঠিক আসে না। সবই মধুরতা মণ্ডিত। হিংসা এবং জ্বালা মনে জাগলে তবে তো জন্মে প্রকৃত স্যাটায়ার। মুজতবা আলী হিংস্র নয়। এই জাতীয় কি সব লিখেছিলাম। তার উত্তরে সে লিখেছে—

শান্তিনিকেতন

২৮-৭-৫৭

বন্ধুবরেষু,

...আপনি ঠিকই বলেছেন, আমাতে স্যাটায়ার নেই। কিন্তু এইবারে তার চাষ করবো। কতকগুলো বাঙলার অধ্যাপক নিজেদের যেভাবে বাঙলার রাখাল ভেবে সমালোচনার নামে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করছে—তাও অতিশয় রদ্দী বাঙলায়—তার বিরুদ্ধে হয়তো একদিন ঐ হাতিয়ার 'এস্তেমাল করতে হবে। 'পোলেমিক'-এ স্যাটায়ার বড়ই বাজে লাগে। এ যাবত আমি মাত্র একটি পোলেমিক লিখেছি—'পূর্বপাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'। পড়েছেন কি চতুরঙ্গ-১৯৪৮এ বেরিয়েছিল। তাতে কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গ মস্করা ছিল।

আপনার রবিবারের লেখাও পড়ি।....কেরামতিকে শিরোপা দিতে হয়।

মুজতবা আলী

আর একখানা চিঠির এক তৃতীয়াংশ উদ্ধৃত করছি—

শান্তিনিকেতন

২০-৩-৬০

প্রিয়বরেষু,

…Pot-boiler না লিখতে হলে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একখানা প্রামাণিক বই লেখার বাসনা ছিল। বছর তিনেক লাগত। ততদিন খাব কি? তাই অবসর সময়ে 'পূরবী'র একটি টীকা লিখছি। বিপদ হয়েছে, সাধারণ পাঠক কতখানি রবীন্দ্রনাথ বোঝে তার স্টানডার্ডটা ধরতে পারছি না। বাংলায় এম-এ পাস ছোকরার কবিতা-বোধশক্তি দেখে তো নিরাশ হতে হয়। …অতএব একটুখানি বাখানিয়াই টীকাটি "প্রস্তুত" (বেতারের ভাষায়) করছি। মনে পড়ল, কয়েক মাস পূর্বে বেতারে আপনার সেতার কণ্ঠ—শুনতে পেয়েছিলুম। ক্ষিতিমোহনবাবুর শেষ রসিকতা শুনেছেন? ডাক্তার তাঁর স্ত্রীকে বললে, "দুধ উনি হজম করতে পারবেন না। আধা জলের সঙ্গে মিশিয়ে দেবেন।"—ক্ষিতিবাবু বললেন, "সিডা গয়লাই কইরা থুইছে।" পয়লা নম্বরী রসিকতা না হতে পারে—কিন্তু মৃত্যুশয্যায়!…

আপনাকে আবার কবে দেখব কে জানে?

সৈয়দ মুজতবা আলী

এর (১৯৬০) কিছুদিন আগে কলকাতার অল ইণ্ডিয়া রেডিওর স্টেশন ডাইরেকটর সৈয়দ মুজতবা আলীর সঙ্গে রেডিও স্টেশনেই দেখা হয়েছিল। তারপর আর দেখা হয়নি। এবং যদিও সে আজ (জানুয়ারি ১৯৭১) কলকাতায় আছে এবং আমিও তাই, তবু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, দুজনের আর কখনো দেখা হবে না।

আমার ১৯৬৯ সনে প্রকাশিত "আধুনিক বাঙ্গ পরিচয়" নামক পুস্তকের ভূমিকায় বুদ্ধিপ্রধান রচনা যে আমাদের দেশে অনেক সময় দুর্বোধ্য হয় তার কয়েকটি দৃষ্টান্তের সঙ্গে তারও একটি লেখার শিরোনাম সম্পর্কে কিছু বলতে হয়েছিল। কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি—

"১৯৫৪ সনের ঘটনা। যুগান্তর শারদীয় সংখ্যায় সৈয়দ মুজতবা আলীর ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে একটি ছোট রচনা ছাপি। রচনার নাম "হরিনাথ দে স্মরণে"।—মজুতবা আলী ভাষাতত্ত্ব বিষয়ের রচনায় তাঁকেই স্মরণ করেছিলেন এবং তাঁর নামেই রচনার নামকরণ করেছিলেন।…

"বহু অভিযোগ এসেছিল : মশায়, প্রবন্ধে হরিনাথ দের কথা তো কোথাও দেখলাম না। কেউ লিখলেন, স্রেফ ফাঁকি। হরিনাথ দের একটি কথাও নেই। কেউ লিখলেন, এমন ধাপ্পা দেবার মানে কি?

"একজনকে মাত্র লিখেছিলাম : গণেশ স্মরণ করে যারা ব্যবসা আরম্ভ করে, তাদের ব্যবসার মধ্যে গণেশ নেই কেন? তাদের চালের মধ্যে, ডালের মধ্যে, দুধের মধ্যে···গণেশ নেই কেন?"

মুজতবা আলীর শেষ চিঠি এই রচনা লেখার সময় পেয়েছি ৭।১।৭১ তারিখে। ইংরেজী চিঠি।

আমাদের দেশের তান্ত্রিক মতের সাধক সম্প্রদায়ের কথা জানা আছে· কিন্তু সেটি একতান্ত্রিক। মুজতবা আলী বহু দিন যাবৎ পঞ্চতান্ত্রিক হয়েছে, অর্থাৎ প্রায় বিষ্ণুশর্মা। এ তন্ত্র প্রজাতন্ত্র সমাজতন্ত্র স্বৈরতন্ত্র প্রভৃতি তন্ত্রের সঙ্গে মিলবে না।

ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

কবে কোন্ সনে কিছুই মনে পড়ে না, চেষ্টা করে তারিখ সংগ্রহ করতেও বাসনা হচ্ছে না—কিন্তু ঘটনাটা আমার কাছে স্মরণীয়। প্রবাসীতেই যতদূর মনে পড়ে অপরিচিত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের একটি গল্প পড়েছিলাম, নাম 'একরাত্রি'—তার মধ্যে আজ পর্যন্ত যেটুকু মনে আছে সে হচ্ছে একটি পুরুষ স্ত্রীলোক সেজে একমাত্র পুরুষযাত্রীর কামরায় উঠে সুন্দরভাবে তাকে ঠকিয়ে নেমে গেল।

সাধারণ গল্প থেকে এর লিখনভঙ্গি ও প্লটটি বেশ স্বতন্ত্র মনে হওয়াতে তখন খুবই ভাল লেগেছিল এবং লেখকের নামটিও মনে রেখেছিলাম। তা ছাড়া কৌতুকের দিক থেকে মৌলিকতার আভাস পেলে আমার কাছে তা বড়ই প্রিয় বোধ হয়।

তারপর বিভূতিবাবুর শিবপুরের দলের দেখা পেলাম যেদিন, সে কোন্ দিন মনে নেই, সে দিন এক আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে অভিভূত হয়েছিলাম। কে গুপ্ত, গোরাচাঁদ, ত্রিলোচন, গনশা, ঘোঁৎনা, প্রভৃতির অংশ জুড়ে জুড়ে যেন একটি অখণ্ড চরিত্র, অথচ প্রত্যেকে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে পৃথক। কয়েকজন মিলে ওরা যে সব কাজ করে, যে জাতের কথা বলে, তার ভিতর দিয়ে ওরা শিক্ষা সংস্কৃতি প্রভৃতির এমন একটা বিশেষ স্তরের পরিচয় প্রকাশ করে, যার জন্য আর পৃথক বর্ণনার দরকারই হয় না। কেউ ফুটবল খেলে, কেউ বিবাহ-ব্যাকুল, কেউ গান গায়, কেউ বা কিছু কবিতাও লেখে, কিন্তু সবাই মিলে পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। কেউ কাউকে বাদ দিয়ে দাঁড়াতে পারে না। ওদের একজন আবার তোতলা। ওরা একসঙ্গে ভাসে, একসঙ্গে ডোবে। আনন্দভোগ একসঙ্গে, দুঃখভোগও একসঙ্গে। একবয়সের, একজাতের এতগুলো চরিত্রের নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে এমন টীমওয়ার্ক বাংলা গল্পে দুর্লভ।

পরশুরামের শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেডের চরিত্রগুলি যেমন হঠাৎ একটা আবিষ্কারের মতো বোধ হয়েছিল, শিবপুরের এই তরুণদের দলও তেমনি আমার কাছে একটি নতুন আবিষ্কার মনে হয়েছিল। 'বরযাত্রী' গল্পেই এদের

সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় বলে মনে হয়। সিনেমায় আগে দেখেছি কোহেন-কেলি পর্যায়, অথবা লরেল-হার্ডি পর্যায়, বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম। এরা অ্যাডভেনচারপ্রিয়, অথচ সহজ সাফল্যলাভ এদের ভাগ্যে নেই।

বরযাত্রী গল্পের একটি দৃশ্য আমি কখনো ভুলব না। সে দৃশ্যের সঙ্গে এদের দলের অবশ্য মুখ্য সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক ওদের অভিভাবকদের সঙ্গে। শিবপুর দলের ত্রিলোচনের বিবাহ উপলক্ষে বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষের মধ্যে কলহ। বরপক্ষের লোকেরা বলছে কন্যা পক্ষীয়েরা বেশি ভদ্রলোক, আর কন্যাপক্ষের লোকেরা প্রমাণ করার চেষ্টা করছে বর-পক্ষের লোকেরা বেশি ভদ্রলোক। এই নিয়ে বিষম তর্ক। তর্ক শেষে গুরুতর ঝগড়ায় পরিণত হতে যাচ্ছিল। চিত্রটির অভিনবত্ব আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে আজও।

বিভূতিবাবুকে চেনবার আগেই তাঁকে তাঁর লেখার ভিতর দিয়ে চিনে ভালবেসেছিলাম। তারপর একদিন পরিচয়ও হল ২৫।২ মোহনবাগান রো-তে। আর একদিন চোখের সামনে দেখলাম বিভূতিবাবু তাঁর দুখানা গল্পের বইএর কপিরাইট সজনীকান্তকে নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করছেন। সে সময় গল্পের বই বিক্রি হত কম, (এখনও তাই উপন্যাসের তুলনায়) কিন্তু তখন বিভূতি মুখুজ্জের গল্পের সৌন্দর্য সাধারণ পাঠক কি ঠিক ধরতে পেরেছিল? অবশ্য এমন দিন দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। বিভূতিবাবুর কৌতুক চরিত্রগুলি এমনই জীবন্ত যে, যে-কেউ পড়বে সেই তার চোখের সামনে যেন তাদের ঘুরে বেড়াতে দেখবে। এ এক অসাধারণ রচনা ক্ষমতা। এমন চরিত্রগুচ্ছ সহজেই পাঠকের মনে এসে আশ্রয় নেয়। তখন শিবপুরের ঐ দলকে যেমন আদর করতে ইচ্ছা হয় তেমনি আদর করতে ইচ্ছা হয় বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে।

অথচ বিভূতিবাবুকে দেখলে কেউ ভাবতেই পারবে না যে এঁরই পকেট থেকে শিবপুরের ঘোঁৎনা গনশার দল বেরিয়ে এসেছে।

বিভূতিবাবুর সঙ্গে গত যুদ্ধের সময় কাছাকাছি আসবার কিছু সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল। ১৯৪৪-৪৫ সনে জেনারেল প্রিন্টার্সে একবেলা করে বসতাম। প্রকাশযোগ্য বই মনোনয়ন করা, 'বাংলার শিক্ষক' নামক মাসিক (কার্যত) সম্পাদনা করা ও প্রচার পুস্তিকা লেখা। বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের স্বর্গাদপি গরীয়সী ২ খণ্ড এখানেই প্রকাশিত হয়। সে সময় তিনি দ্বারভাঙ্গা থেকে মাঝে মাঝে আসতেন, এইখানেই দেখা হত। মস্ত আড্ডা জমে উঠল এখানে।

মোহিতলাল মজুমদার, সুশীল দে, বিনয়কৃষ্ণ দত্ত, সরোজ রায়চৌধুরী রতিশঙ্কর রায়, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং আরও অনেকে প্রায় নিয়মিত আসতেন। এই সময়েই বিভূতিবাবুর ফোটোগ্রাফ তুলি, যা এ বইতে ছাপা হয়েছে। বেশ কিছুকাল এখানে বসে বিভূতিবাবুর বইগুলির গুণগান লিখেছি, যেমন লিখেছি সরোজ রায়চৌধুরীর, গোপাল ভট্টাচার্যের এবং আরো অনেকের। আমার নিজের বই এখানে ছাপা হয়েছিল চারখানা। তারও গুণগান লিখেছিলাম।

১৯৭৫ সনে যখন যুগান্তরে যোগ দিই, তখন থেকে বিভূতিবাবুর সঙ্গে পুনরায় আর এক পরিবেশের সম্পর্ক। ম্যাগাজিন সেকশনে তখন তাঁর একটি গার্হস্থ উপন্যাস জাতীয় ধারাবাহিক গল্প ছাপা হচ্ছিল। পূজা সংখ্যা-গুলি আমিই সম্পাদন করতাম (১৯ বছর করেছি। ১৯৬৪ থেকে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—ভূষণচন্দ্র দাসের সহায়তায়। ভূষণচন্দ্র দাস যুগান্তরের সৃষ্টির দিন থেকে আছেন। এঁর বিষয়ে এত কৃতজ্ঞতাপূর্ণ স্মৃতি আছে যে তা নিয়ে পরে একটা পৃথক অধ্যায় লেখার ইচ্ছা আছে।)

১৯ বছর ধরে বিভূতিবাবুর লেখা যুগান্তর পূজা সংখ্যায় ছেপেছি। দ্বার-ভাঙ্গা কলকাতার যোগাযোগ। বরং বলা যায় বিহার বাংলার। বিহারের ভূমিতে বাংলা সাহিত্য ভাল ফসল দেয়। প্রমাণ কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়. রাজশেখর বসু, (এবং তস্য অগ্রজ শশিশেখর), শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, সতীনাথ ভাদুড়ী। এর মধ্যে পাঁচপুরুষ ধরে বিহারবাসী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে কোথাও বসিয়ে নিন। আমার মনে হয় বিহারে বাংলা সাহিত্য ভাল ফলে বলে অনেক বাঙালী সাহিত্যিক বিহারে বাড়ি করেছিলেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, গজেন্দ্রকুমার মিত্র প্রভৃতির নাম করা যায়। তবে বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় বিহারে বাড়ি করার আগে বিহারে বসেই তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্যও বিহার সীমানায় বাড়ি করেই প্রচুর লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। নীরদ দাশগুপ্তও সম্ভবত তাই। রবীন্দ্রনাথও বিহারীকে ভালবেসে গেয়েছেন : তুমি আমারি যে তুমি আমারি/মম জীবনমরণবিহারী !

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে আমি স্মৃতিচিত্রণে বর্ণচোরা বলে উল্লেখ করেছি। বর্ণচোরা আম—ভিতরে পরিপক্ক রস কিন্তু বাইরে সবুজ। বিভূতিবাবু কথা কম বলেন, যে টুকু বলেন মৃদু হাসির সঙ্গে মিলিয়ে থাকে

অনেক সময়। চিঠি লেখের সংক্ষেপে। তাতেও কালি খরচ এত কম যে তা শুধু প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখার সঙ্গে তুলনা করা চলে।

বিভূতিবাবু ব্যাচেলর মানুষ। ব্যক্তিগত ঝঞ্ঝাট নেই জীবনে, অর্থাৎ মুখ্য ঝঞ্ঝাট। সেই জন্য হয়তো সমাজ সংসারকে নিবিড়ভাবে দেখার সুযোগ পেয়েছেন। বিবাহ করেননি, সেজন্য বিবাহ বাসর ইত্যাদি ও বরযাত্রী বিষয়ে তাঁর মতো ভাল আর কে লিখেছে? বাইরের দৃষ্টি হয়তো সেজন্য স্বচ্ছ। কিন্তু বাইরের দৃষ্টিতে বাইরে বসে কয়লার খনি নিয়ে লেখা দুঃসাধ্য। সেজন্য তিনি কয়লার খনিতেও নেমেছিলেন একবার। ফলে 'নবসন্ন্যাস'-এর জন্ম।

বিভূতিবাবু আমার নামে তাঁর বিশেষ রজনী নামক বইখানা উৎসর্গ করেছিলেন. কিন্তু আমি আমার 'মারকে লেঙ্গে' বইখানা পাঁচজনের নামে উৎসর্গ করি। তার মধ্যে বিভূতিবাবুর নামও ছিল। তাঁকে বই পাঠাবার পরে লিখছেন—

দ্বারভাঙ্গা
২৯।৮।৫০

প্রীতিভাজনেষু,

কাল আপনাকে চিঠি দিয়েছি। তবে একটা কথা ছেড়ে গিয়েছিল, "মারকে লেঙ্গে"র প্রাপ্তিসংবাদ। যথাসময়েই পাই, ভেবেছিলাম একেবারে শেষ করেই প্রাপ্তিসংবাদ দোব, কিন্তু আরম্ভ করার পরই 'শাবদীয়া' চাপে বেশিদূর এগুতে পারিনি। মতামত এর পরে আপনাকে জানাব। আপাততঃ বইটি পাঠাবার জন্য এবং বিশেষ করে উৎসর্গের জন্য (যদিও মাত্র ঠোঁটের কাছে ঝুলিয়ে রেখেছেন) ধন্যবাধ জানাচ্ছি।

ভবদীয় শ্রীবিভূতিভূষণ

এর পরের চিঠি—

দ্বারভাঙ্গা
২২।৯।৫০

প্রীতিভাজনেষু,

…'মারকে লেঙ্গে' চমৎকার লাগছে, প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। দেখছি এর অনেক গল্পই এমন নূতন নূতন পত্রিকায় বেরিয়েছে যে, আমার পড়াই হয়নি। একসঙ্গে পেয়ে আরও ভাল লাগল। স্যাটায়ারে আপনার হাত চমৎকার, ব্যঙ্গের সঙ্গে প্রয়োজন মতো হাসি বা কারুণ্য বা একসঙ্গে দুইই

আপনি অতিশয় সূক্ষ্মতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন ; "দশ হাত" গল্পটা একটা উৎকৃষ্ট নমুনা। আপনি কথারও অদ্ভুত সংযম দেখিয়েছেন, তারও নমুনা অন্যান্য কয়েকটা গল্পের সঙ্গে এই গল্পটি। মোটের উপর বইটি চমৎকার হয়েছে, বেশ distinct। আর একটা লক্ষণীয় জিনিস, variety of topics, আপনি সহস্র-লোচন হয়ে বসে আছেন, কিছুই বাদ যায়নি। দৃষ্টিতে অগ্নিও আছে, কিন্তু সব যে fireproof।

বেশ ভালো একখানি বই, নামটা যুক্ত করার জন্য আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ভবদীয় শ্রীবিভূতিভূষণ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ও আমার অগ্রজ লেখক। দু'জনেরই প্রীতিলাভ আমার জীবনে স্মরণীয় ঘটনা। বিভূতি মুখোপাধ্যায় আমার লেখাকে যে ভাবে নিয়েছেন তাতে আমি ধন্য বোধ করেছি। তা আমার আত্মবিশ্বাসে যে অনেকখানি প্রতিষ্ঠা দিয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁর কাছে বসেও তাঁর হৃদয়ের উষ্ণতা অনুভব করেছি উষ্মা প্রকাশ কখনো দেখিনি।

কিছু আগে বিহারের বাঙালী সাহিত্যিক সম্পর্কে বলতে গিয়ে সতীনাথ ভাদুড়ীর কথা উল্লেখ করেছি। আমি যখন তাকে "সবিনয় নিবেদন" সম্বোধনে লেখা চেয়ে ব্যক্তিগত চিঠি দিই, তার উত্তরে সতীনাথ আমাকে এই চিঠিখানা লেখে—

পূর্ণিয়া
৯।৮।৫৪

শ্রীচরণকমলেষু

পরিমলদা, বছর পঁচিশেক আগে আপনি যখন এখানে খোকাদাদের [ডাঃ অমরেন্দ্র ভট্টাচার্য, পূর্বে উল্লিখিত শিক্ষাবিদ ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্যের অগ্রজপুত্র] বাড়ীতে এসেছিলেন, তখন আপনাকে প্রথম দেখি। সে সময় পাঁচ-সাত বছর বয়সের ব্যবধান অনেক বড় মনে হত। খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে আপনাদের আড্ডার প্রান্তদেশে বসতে হত শুধু শ্রোতা হিসাবে। তারপর বহুবার আপনাকে দেখেছি কলকাতার নানা স্থানে ; কিন্তু আপনার সঙ্গে কথা বলতে সাহস পাইনি খুব ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও। অকারণ গায়ে পড়ে আলাপ করা আপনি পছন্দ করবেন কিনা সেই কথা ভেবে। এখনও সে

দ্বিধা আছে। তবু আপনার নিজহাতে লেখা দু' লাইন চিঠির সূত্র ধরে সেই সঙ্কোচ কাটাবার প্রথম চেষ্টা করছি আজ। তাই এই চিঠি। প্রণাম নেবেন।

সতীনাথ

এই চিঠি লিখে সতীনাথ আমাকেই লজ্জিত করার যে চেষ্টা করেছে, তাতে তার সাফল্য লাভ হয়েছে। তার অকাল মৃত্যু না ঘটলে তাকে সমবয়সী বন্ধুরূপেই কাছে টেনে নিতাম।



লীলা মজুমদার

ফোটো : পরিমল গোস্বামী ১৯৪০

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

লীলা মজুমদারের মনের গভীরে যে জনৈক বিদ্যালঙ্কার-মহাশয় বাস করেন, তা তার বাইরের ব্যবহারে কিছু বোঝবার উপায় নেই। যদি কোনো অহঙ্কারও থেকে থাকে তাও সম্পূর্ণ অদৃশ্য থেকে যায়। কথায় আচরণে একটা মধুরতা ক্ষরিত হয়। তার মনের তলায় দুঃখ বেদনা যাই থাক, সবই সে হাসির আবরণে ঢেকে রাখতে পারে। এমনকি তার চিঠিতেও একটা প্রীতিপূর্ণ সুজনতা যেন উপচে পড়তে থাকে।

লীলার সঙ্গে একটি আত্মীয়তা বোধ আমার অতি সহজেই হয়েছে। কারণ তার যে সব লেখা আমি ছেপেছি তার ভিতরে একটা অদ্ভুত আড়ম্বরহীন সহজ সরলতার ছোঁয়া পেয়েছি, এবং তা intensely feminine এবং যাতে তাকে খুব কাছের লোক বলে মনে হয়েছে সব সময়। তার গল্পের কোনো চরিত্রও তার স্নেহ থেকে বঞ্চিত নয়—আইনের চোখে তারা যাই হোক। আগে বিদ্যালঙ্কারের কথা বলেছি। কিন্তু তার মানসিক নিবাসে একজন কিশোরীও বিনা ভাড়ায় বাস করে আসছে বরাবর। এটি মনে হয় তার বংশগত পরিবেশের প্রভাবে। বংশের প্রায় সবাই ছোটদের জন্য সাহিত্য রচনা করে বিখ্যাত হয়েছেন। এমন কি সত্যজিৎ রায়ও প্রথমে চিরশিশু অপুর মধ্যে তাঁর ফিল্মে আত্মপ্রকাশের সহজ পথটি খুঁজে পেয়েছেন। তারপর জিজিবিবি। অন্যদিকে তান বিস্তার করলেও বার বার ঐ সমে ফিরে এসেই তিনি আরাম বোধ করেন সন্দেহ থাকে না। এবং কিশোর মাসিক সন্দেশের দুজনেই সম্পাদক। লীলা অবিরাম ছোটদের বই লিখে চলেছে বর্তমানে। লীলা অন্য সবাইকে, এবং তার পাঠকদেরও, বয়সে ছোট ভাবতে অভ্যস্ত হয়েছে হয় তো এই পারিবারিক প্রভাবেই। আমার সম্পর্কে তার প্রকৃতই কি ধারণা তা তার ব্যবহারে ঠিক আমি বুঝতে পারিনি এত দিন। আমাকে কাগজে কলমে (প্রকাশিত অভিমতে এবং ব্যক্তিগত চিঠিতে) বিজ্ঞের স্থান দিয়েছে অনেক সময়, কিন্তু আসল মনোভাব বোঝা গেল যখন সে তার কিশোর পাঠ্য "কিশোর গ্রন্থাবলী" পুস্তকখানা আমার নামে উৎসর্গ করল (১৯৭০) তখন। আমি যে তার দৃষ্টিতে কিশোর তা ভেবে আমি অবশ্য খুব পুলকিত হইনি, কিন্তু আমি যে second childhoodএ পৌঁছেছি

এ ধারণা থেকে যদি সে এ কাজ করে থাকে, তবে দুঃখের কারণ নেই আমি অন্তত benefit of the doubt তাকেই দিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করেছি কিংবা হয় তো ব্যাপারটা সন্দেহাতীত। কারণ আগে সে 'আপনি' লিখত, কিন্তু ছোট মনে করার পর থেকে 'তুমি' সম্বোধন করছে।

লীলা ইংরেজী সাহিত্যে এম-এ. প্রথম শ্রেণীর প্রথম (১৯৩০)। শিক্ষা বিভাগে জীবনটা কাটাতে পারত, কিন্তু লেখাকে ও সংসারধর্ম পালনকে সে বেশি আরামজনক বৃত্তিরূপে গ্রহণ করেছে। আমি অবশ্য তুলনামূলক ভাবে বলছি। কাজেই এ বৃত্তির সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদক পাওয়ার সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ নয়। সে আসলে নিজেও যে, মনের দিক থেকে কৈশোর পার হয়নি, তার আর একটা প্রমাণ হচ্ছে, সে বড়দের জন্য যা লেখে তা কিশোর-প্রিয় হয়, এবং কিশোরদের জন্য যা লেখে তা বড়রা পছন্দ করে।

লীলার মনটা যে কতখানি উদার তার একটি প্রমাণ আমার হাতেই আছে। আমি তার একখানা চিঠি থেকে কিছু অংশ আগে উদ্ধৃত করছি—

৮ নম্বর ফ্ল্যাট, ৩০ চৌরঙ্গী রোড
কলিকাতা ১৬, ২৯।৪।৬৯

ভাই পরিমলদা,

কিছুদিনের জন্য শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলাম, মাত্র শনিবার ফিরে তোমার চিঠি পেলাম ....চিঠির উত্তর দেব-দেব করছিলামই হেনকালে কাল বইখানি [আমি যাঁদের দেখেছি] পেলাম। পরিমলদা, তুমি নিশ্চয় জান যে এ বইটা একটা সোনার খনি। এর মূল্য দিন দিন বাড়বে বই কমবে না। এ সব কথা কে-ই বা জানে আজকাল, আর তোমার ঐ stark bare beautiful wayতে বলতেই বা পারে ক'জন? সবটা পড়ার সময় পাইনি, কিন্তু পেটুকের মতো অনেকটা, নিশ্বাস বন্ধ করে, পড়ে ফেলেছি। বাকিটা আজকালের মধ্যে শেষ করব। তবে এর ব্যবহার শেষ হবে না, আমার কর্মজীবন যত দিন চলবে। এ বইও পদে পদে আমার কাজে লাগবে। এই রকম একটা বইয়েরই আমার এবং আমার মতো বহু লেখকের বড়ই প্রয়োজন ছিল। মুখের উপর চাটুবাদ ভালোবাসি না, কিন্তু এ ক'টি কথা না লিখে পারলাম না।

কেন যাব না তোমায় দেখতে। তোমার মতো খুব বেশি মানুষ কি

দেখা যায়? অন্তত আমি তো দেখিনি। জয়ন্তীর [জয়ন্তী সেন] সঙ্গেই দুবার গেছি। এবারও তাকে বলব। সে যদি না যেতে পারে, আমি নিজেই যাব। তোমাকে জানিয়ে যাব। তুমি শুধু একটা route plan এঁকে দিও, সেই প্রথম বারের মতো। বড রাস্তার নাম, গলির নাম, যেখানে গলি ধরব, তার একটা land-mark সেবার বলে দিয়েছিলে, সব দিও। মানুষ যতটা চিনি, পথ ততটা চিনি না, ভাই। তার উপর নতুন ড্রাইভার।

ছোটদের বই কিছু কিছু লিখছি। Children's Book Trust আমার প্রথম ছোটদের ইংরিজি বই Tiger Tales বের করছে। তার বাংলাও ছাপা হচ্ছে। তাছাডা National Book Trust-এর Nehru Library of Children's Books-এর ফরমায়েসে Rivers of India বলে একটা বই লিখে শেষ করলাম। ছোট বই, উত্তর ভারতের নদীর তথ্য। দক্ষিণ ভারতের নদীর বিষয় একজন তামিল ভদ্রলোক লিখছেন। Children's Book Trust আর একটা বই চাইছে। ভাবছি My Friends' Stories বলে বন্ধুদের কাছে শোনা জন্তু জানোয়ারের সত্যি গল্প অবলম্বনে লিখব। তুমি আমাকে একটা বাঘ বা বেড়ালের, ঈগল বা চড়াইয়ের, বা যে কোনো পোকা বা পাখীর বিষয়ে সত্য গল্প সে দিন বলবে তো? তাছাড়া যদি সম্ভব হয় পেঁয়াজি আর কাঁচা আমের সরবৎ খাইও। ...ওদুটি আমার বড প্রিয়। তুমি সাবধানে থেকো। আমার শ্রদ্ধা ও স্নেহ গ্রহণ কর।

ইতি

তোমার গুণমুগ্ধ ভগ্নী—

লীলা মজুমদার

এই চিঠিখানার দুটি পৃথক অংশ আছে। আমার উদ্দেশ্য লীলার উদার মনের প্রমাণ দেখানো। এবং তা দেখা যাবে আমার বইয়ের প্রশংসায়। বই সম্পূর্ণ পড়লে সবাই চুপ করে যান, লীলাও সবটা পড়ার পরে চুপ, বই সম্বন্ধে। আদৌ না পড়লে প্রাণখুলে প্রশংসা করা যায়। কিন্তু তবু অংশত পড়ার পরেও যে এতটা বলা যায় তার একটিমাত্র দৃষ্টান্ত বিভূতি মুখোপাধ্যায় পূর্বে দেখিয়েছেন। এ বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা বলি। আমার 'ক্যামেরার ছবি' নামক ফোটোগ্রাফি বিষয়ক প্রথম বই যখন প্রকাশিত হয় (১৯৪২),

তখন দুজন স্কলার বন্ধুর কাছে দুদিন গিয়েছিলাম ঐ বই উপহার দিতে। দুজনেই ক্যামেরা অথবা শিল্প প্রেমিক।

প্রথম বন্ধুকে বই দিয়ে বললাম, অবসর সময়ে পড়ে আপনার মতামত জানাবেন। তিনি বইখানা হাতে নিয়েই বললেন, আপনি লিখেছেন, এ আর পড়ব কি, একটু বসুন। আমাকে বসতে বলে পাতা উল্টে দেখলেন এবং তৎক্ষণাৎ ঐ বই বিষয়ে তাঁর মত আমাকে লিখে দিলেন দু পাতা।

এবার দ্বিতীয় বন্ধুর কাছে একদিন গেলাম। তারিখটি ১৯-১-৪৩। তিনি বই পেয়েই প্রশংসা লিখলেন একপাতা।

এই দুটি ক্ষেত্রে শুধু আমাকে দেখে, এবং বই না পড়ে, আমার চোখের সামনে প্রশংসা পত্র লিখলেন। আরো অনেকে লিখেছিলেন, কিন্তু সেও সম্ভবত বই পড়ার আগেই। এবং সেই থেকে আমার একটা ধারণা হয়েছে এই যে, কোনো বইয়ের প্রাণখুলে প্রশংসা করতে হলে সে বই পড়ার আগেই সমালোচনাটা লিখে ফেলা ভাল। কিন্তু লীলার বেলায় আমার বই আংশিক ভাবে পড়ে সে যে সব কথা লিখেছে, তা যে সত্যই আংশিকভাবে পড়ার পর তাতে সন্দেহ করিনি। তাই ভাবছিলাম, এমন উদার মন তার, এবং আমার পক্ষে তা যে বড়ই আনন্দের, তা বলা বাহুল্য মাত্র। "সব বইখানা পড়ার পর লিখছি" বললে হয় তো কিছু সন্দেহ হত। এতে আর সন্দেহ রইল না।

"বই পড়ার পর" কথাটির উপর জোর দিচ্ছি এ কারণে যে আমি গত ১৯৫৮ সনের জানুয়ারিতে একখানা ১৪শ সংস্করণের সাধারণ জ্ঞানের বই পড়তে গিয়ে দেখি আগাগোড়াই ভুলে ভরা। সে অতি সাংঘাতিক সব ভুল অথচ তারই ভূমিকায় এক এনজিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক (হার্বার্ড ও বারলিনের উপাধিধারী) ঐ বইয়ের ভূমিকায় বলেছেন "বইটি পড়ার পর এ কথা আমি বলতে পারি যে······বইটিতে জ্ঞাতব্য বিষয় যথেষ্ট আছে এবং চিন্তাশক্তিকে তীক্ষ্ণ করার উপযোগী সরঞ্জামও বিদ্যমান।"...

এই তো "বই পড়ার পর" লেখার নমুনা। অর্থাৎ বইটি একেবারে না পড়ে। যেহেতু আমি ঐ বইটি পড়ে ঐ বইয়ের আর প্রশংসা করতে পারিনি। আমি কয়েক সপ্তাহ ধরে ইতস্ততঃতে বইয়ের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছিলাম।

প্রসঙ্গত অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথাই হয়তো বলা হয়ে গেল। স্মৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না সবসময়।

লীলার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, আগেই বলেছি মধুরতা এবং সরলতা—এবং

নারীসুলভ স্নেহার্দ্রতা, যা তার লেখার মধ্যে এবং তার চিঠির মধ্যে সে গোপন করতে পারে না। Murder will out!—প্রায় সেই রকম। লেখার চরিত্র ও লেখিকার চরিত্র প্রায় সমধর্মী বলেই লীলার চরিত্র বিশ্লেষণে মন দিয়েছি। আমাকে সে একবার বলেছিল তার মন খারাপ হলে সে পিকউইক পেপার্স খুলে বসে। এ কথাতেও তার আরো কিছু পরিচয় পেয়েছিলাম। আশ্চর্য মানুষ! পিকউইক ক্লাবের সভ্যদের বালকোচিত সরলতার মধ্যে লীলা স্বধর্ম খুঁজে পায়। (আর স্যাম ওয়েলার? সেও আশ্চর্য মানুষ! সে কি ভৃত্য? না, তার চেয়ে অনেক—বেশি।—তার মতো একটি অতিবিশ্বস্ত মহৎ হৃদয় বন্ধু কোথায় পাওয়া যাবে?) ও বইয়ের কথা মনে হলে তাতে বর্ণিত সকল মানুষ, সকল দৃশ্য, একসঙ্গে মনে ভেসে ওঠে ছবির মতো। এমন কৌতুকরস ও মৃদু ব্যঙ্গও দুর্লভ।

সুধীরকুমার মজুমদার ও লীলা মজুমদার, স্বামী ও স্ত্রী, দুই প্রায় বিপরীত চরিত্রের। স্বামীকে এক হিসাবে প্রতারক বলা চলে। কারণ তিনি বিপন্ন মানুষের আসল জিনিষ হস্তগত করে নকল জিনিষ দিয়ে থাকেন। এটি তাঁর বৃত্তিগত প্রবৃত্তি। তাঁর পরিচয় আছে টেলিফোনের ডাইরেকটরিতে। তা এই রকম—

Dr. S K. Majumdar, D. M. D. (Harvard)। এ থেকে বোঝা উচিত তিনি উৎপাটনসিদ্ধ। তিনিও এসেছিলেন একদিন আমার কাছে, এবং আমার অবিন্যস্ত ঘরে কিছুক্ষণ কাটিয়েও নাকি তাঁর ভাল লেগেছিল, এই রকম একটা গুজব শোনা গেছে পরে। একজনের পরিচয় চিঠির ভিতর দিয়ে লেখার ভিতর দিয়ে। অন্যজনের পরিচয় ঐ একটি মাত্র গুজবে। অন্য পরিচয়ের সুযোগ সম্ভবত আর হবে না। যে ২৫টি পৈতৃক দাঁত এখনো বাঁচিয়ে রেখেছি, তিনি প্রার্থনা করুন, তারা যেন আমার আয়ুঃসীমা পর্যন্ত টিকে থাকে।

লীলার পরবর্তী চিঠিখানি তাকে আরো বেশি করে চিনিয়ে দেবে।

Suite 8, 30 Chowringhee Rd.
Calcutta-16, 13.1.70

ভাই পরিমলদা,

চিঠি পড়ে লজ্জায় কান লাল, মাথা হেঁট। ছি ছি ছি ছি। তবে বিশ্বাস কর একদিন একাই গিয়েছিলাম। বলতে মাথা কাটা যাচ্ছে গলিটা ঠিক

চিনতে পারলাম না। বলেছি না, আমার নিখুঁৎ চরিত্রে ঐ একমাত্র খুঁৎ, পথ চিনতে পারি না। তারপর সমস্ত নভেম্বর মাস……অতঃপর কি কর্তব্য তুমিই বল। এক হতে পারে তুমি যদি জানাও বি. টি. রোডের উপরে গলির মুখের দুপাশে এমন কি আছে সাইনবোর্ড বা দোকান বা হলদে গরু যা দিয়ে ঠিক চেনা যাবে। বলা বাহুল্য আমার ড্রাইভারের পর্যন্ত শ্রদ্ধা হারিয়েছি।

খবরের মধ্যে ৪ঠা নবেম্বর বৌমার আর একটি ছেলে হয়েছে। আগেরটার নাম রেখেছি গুপি। এটার নাম রাখলাম স্বনামধন্য বিশে ডাকাতের স্মৃতিতে বিশু। বলাবাহুল্য নাম রাখার এখনই যথেষ্ট কারণ দেখা যাচ্ছে।……

আমার 'বক ধার্মিক' থেকে ফিলম হল, 'হীরের প্রজাপতি', সে ফিলম প্রথম পুরস্কার পেল, যদিও কোথাও আমার নাম উল্লেখ নেই। এখন অরুন্ধতী 'পদিপিসির বর্মী বাক্স' ফিলম করবে। National Book Trust আমার River Story ছাপছে। সব ভাষায় বেরুবে সেই জানোয়ারের বইটা, একটু একটু করে এগুচ্ছে। তার জন্যেও তো তোমার সহযোগিতা দরকার। আর তুমি কিনা—যাকগে। একটা বই বেরিয়েছে ক্যালকাটা পাবলিশার্স থেকে সেটা তোমাকে উৎসর্গ করেছি। নিয়ে যাব।...শ্রদ্ধা ও প্রীতি নিও।

—তোমার লজ্জাবনতা বোন লীলা মজুমদার

"লজ্জাবনতা" কথাটি যে কৌতুকপূর্ণ একটি ছলনা, তাতে আমার পূর্ব উক্তি প্রমাণিত হবে। আমি বলেছি তার চরিত্র intensely feminine, এবং সে কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। 'লজ্জাবনতা' লেখার আগের চিঠিগুলিতেই তা প্রমাণিত হয়েছে। আমার 'স্মৃতিচিত্রণ'কে সে যে ভাষায় প্রশংসা করে চিঠি দিয়েছিল, তাতে লজ্জায় আমারও 'কান লাল মাথা হেঁট'।

অষ্টাচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

লীলা মজুমদারের সঙ্গেই নাম করতে হয় জয়ন্তী সেনের। কারণ দুজনের মধ্যে একটা বন্ধুত্বের গাঢ় ভাব লক্ষ্য করেছি। (এবং দুজনেই ইংরেজী সাহিত্যের এম-এ)। বয়সে হয়তো পার্থক্য আছে ('হয়তো' বলায় বয়ঃ-কনিষ্ঠার কোনো মানসিক চাঞ্চল্য ঘটবে না আশা করি)। পার্থক্য আছে অনুমানের বিষয় এজন্য যে, লীলা তার আত্মজীবনী লিখে তার বয়স সম্পর্কে কিছু আভাস দিয়েছে, জয়ন্তীর আত্মজীবনী এখনো লেখা হয়নি। তবে বিজ্ঞজনেরা বলেন মেয়েরা ২০ বছর পার হলেই পরস্পর এক বয়সী হয়ে পড়ে। পঁচাত্তরের সঙ্গে পঁচিশের প্রাণের কথা বলতে আটকায় না, এবং এককুড়ির সঙ্গে আটকুড়ির!

ইতিহাসে ফিরে যাই। ১৯৫৬ কি ৫৭ হবে। প্রেমেন্দ্র মিত্র তখন অল ইণ্ডিয়া রেডিওর প্রোডুসার অভ স্পোকন ওয়ার্ডস—সোজা বাংলায়, নাটক আর গান ছাড়া আর সব কিছুর ভার প্রাপ্ত প্রযোজক এবং লীলা মজুমদার ঐ বিভাগের অ্যাসিসট্যান্ট প্রোডুসার! (আরো পরে লীলা প্রোডুসার, প্রেমেন্দ্র শলাকার—বা অ্যাডভাইসার, পরামর্শদাতা। আরো পরে পুলিন-বিহারী সেন শলাকার, লীলা ও প্রেমেন্দ্র উধাও।)।

আমি গার্স্টিন প্লেসে প্রেমেনের কাছে গিয়েছিলাম আমার কোনো কথিকা বিষয়ে আলোচনা করতে, অথবা কিছুই না করতে। লীলা মজুমদার ঐ একই ঘরে বসে ছিল। প্রেমেন ও লীলা দুজনেই ওখানকার অফিসার। এমন সময় এক নীলবসনা মহিলা এসে বসলেন প্রেমেনের টেবিলে। আমি বসেছিলাম লীলার টেবিলে, পাশে। প্রেমেন নবাগতার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলল, এঁর নাম জয়ন্তী সেন, ভাল লেখেন। কিন্তু আমি এধরনের কথা এত শুনেছি যে সেদিকে আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হল না, নামও কানে এসেছিল কিনা, কিংবা এলেও, মনে রাখিনি। সেই দিনই ঐ একই স্থানে একটি ঘটনা মনে পড়ে। লীলা কাউকে তার বাড়ির ঠিকানা বলে দিচ্ছিল—৩০ চৌরঙ্গী রোড, সুইট এইট (Suite 8)। আমি শুধু গম্ভীর ভাবে বলেছিলাম সুইট এইট হয় না।

সূক্ষ্মবুদ্ধি লীলা ইঙ্গিতটা তৎক্ষণাৎ বুঝল, সে জন্য আর ঠিকানা ঘুরিয়ে বলল না।

এই দুটি ঘটনা সত্য, কিন্তু একই দিনে ঘটেছিল কিনা এবিষয়ে যদি লীলা বা জয়ন্তীর কোনো সন্দেহ থাকে, তবে আমি মাত্র এই অনুরোধ জানাতে পারি—তোমরা কেউ প্রতিবাদ করে কাহিনীটির রসভঙ্গ কারো না। কারণ, আর যাই হোক, এ ঘটনা ইতিহাস-প্রসিদ্ধি পাবে না। ঘটনা দুটিই সত্য, শুধু সন্দেহ--অ্যানাক্রনিজম ঘটে না থাকে।

জয়ন্তীর রচনা ক্ষমতার সঙ্গে অনেক পরে যখন পরিচয় ঘটল, এবং আমি তার লেখা চাইতে আরম্ভ করলাম, তখন সে সেদিনের আমার সেই উদাসীনতার কথাটা মনে করিয়ে দিতে ছাড়েনি।

কিন্তু এর আগেও আর একটি ছোট ঘটনা আছে। জয়ন্তীর নাম আমার মনে ছিল না। প্রাণতোষ ঘটক একদিন তার নিজের লেখা নিয়ে এলো যুগান্তর পূজা সংখ্যার জন্য—১৯৫৮ সনের ঘটনা। আর তার লেখার সঙ্গে একটি কবিতা রেখে গেল, বলল, এটি দেখবেন।

দেখেছিলাম অনিচ্ছায়। কিন্তু পড়তে আরম্ভ করেই বুঝলাম কবি-যশঃপ্রার্থী কোনো নতুন কবির লেখা নয়, বেশ পাকা হাত।—"হৃদয় ঘুমাতে চায়" কবিতার নাম। নামটা নিয়ে ভেবেছিলাম। এই তো আরম্ভ মাত্র, এখনই ঘুমের কথা কেন? তাছাড়া কোনো কবির হৃদয় কখনো ঘুমোয় না।

কবিতাটির আরম্ভেই কবিমানসের যে পরিপক্ক একটি বয়সের পরিচয় পাওয়া গেল, তাতে সত্য কবিকে চিনতে ভুল হয়নি। (বয়সের কথায় ভয় পাবার কিছু নেই, জন্মগত দৈহিক বয়সের কথা বলছি না! সেটা না হয় গোপনই থাক। আর তা আমার জানবার কোনো দরকারও নেই।) কবিতাটির আরম্ভ এই রকম...

হৃদয় ঘুমতে চায়—দুপুরের স্তব্ধ দীঘিপরে
শিরীষের ছল ছল ছায়া খানি স্বপ্ন হয়ে ঝরে,
হাওয়ায় রোদের ছোঁয়া।—আকাশের ধূ ধূ সাহারায়
নীল বালুকার কণা ক্লান্ত চিল মেখেছে ডানায়...

পড়ার পর ঘুমনোর বিরুদ্ধে মনের বিরূপতা কেটে গেল, ফলে আমারই ঘুম ভেঙে গেল। সমস্ত ভাবনার সঙ্গে প্রকৃতি জড়িয়ে আছে। সবটা উদ্ধৃত

করলে তা আরো স্পষ্ট হত। পরে প্রাণতোষের কাছে পরিচয় নিয়েছিলাম। সুকুমার সেন আই-সি-এস'এর কন্যা। তারপরে জয়ন্তীর সঙ্গে যোগাযোগ টেলিফোনে। সে গল্পও লেখে, শুনলাম। গল্প পাঠাল। সাধারণ ঘরোয়া ব্যাপারকে শিল্পের স্তরে তুলে আনার ক্ষমতায় অবাক লাগল। বিভূতি বাঁড়ুজ্জে আর আশাপূর্ণার এমন ক্ষমতা আছে। লীলা মজুমদারও এই দলের। আধুনিক তরুণতরুণী আর রোমান্স বর্জিত নিতান্তই সেকেলে ধরনের বাংলা ঘরের সরল নরনারীকে নিয়ে গল্প।

পরিচয় জানলাম আরো কিছু বিস্তৃত। ইলেকশন কমিশনার হয়েছিলেন সুকুমার সেন। তারপর গিয়েছিলেন (১৯৫৩) ঐ একই কাজে সুডানে। তাঁর নামে খারটুমে পথ হল একটা। শুনে গর্ববোধ হল। তার পর দণ্ডকারণ্যে গেলেন সেখানকার ডি-ডি-এ'র প্রধান কর্তা হয়ে। এ সব জেনে, জয়ন্তীকে যে রকম কল্পনা করেছিলাম, তা নয়। এমন নিরহঙ্কার এবং নিজের ক্ষমতা বিষয়ে বিনয় এবং কিছু অবিশ্বাস—তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

টেলিফোনেই প্রথমে আলাপ। পরে একদিন (২৭।১।৬৩) আকাশবাণীর নতুন বাড়িতে। ঠিক পাঁচ সেকেণ্ডের জন্য দেখা, শুধু অন্যের সঙ্গে উত্তেজিত ভাবে কথা বলার সময় (টেলিফোনে পরিচিত) কণ্ঠস্বরে অনুমান মাত্র করেছিলাম, এরই নাম জয়ন্তী সেন। পরে জেনেছি কয়েকটি ছোট মেয়েকে স্টুডিও দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল কিন্তু আগে অনুমতি নেওয়া হয়নি, তাই অসুবিধা ঘটেছে, তাই উত্তেজিত।

তারপর আমাকে না জানিয়ে একদিন (১৭।১১।৬৪) আমাদের কালীচরণ ঘোষ রোডের বাড়িতে এসেই প্রণাম করে দাঁড়াল। আমার খুব অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল চিনতে না পেরে। তার চেহারা আগে মনে রাখার মতো স্পষ্ট লক্ষ্য করিনি। বললাম, চিনতে পারছি না। নাম বলামাত্র খুব বিব্রত বোধ করেছিলাম এই ভেবে যে, জয়ন্তীর বিশ্বাস ছিল আমি নিশ্চয়ই চিনতে পারব, নইলে এভাবে নিজেকে না জানিয়ে কাছে এসে পড়ত না। যাই হোক খুশি হয়েছিলাম খুব। তারপর আর একদিন (১২।২।৬৫) আসতে বলেছিলাম সম্ভাবিত এক লেখকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে। সে রাশিয়া থেকে সদ্য-প্রত্যাগত আমার ভাগনে অভিজিত (সরোজ আচার্যের পুত্র)। সে এসে গেল জয়ন্তী আসবার একটু পরেই তার ক্যামেরা নিয়ে।

তার সঙ্গে জয়ন্তীর পরিচয় করিয়ে দিলাম। এবং শেষ পর্যন্ত সে তার ক্যামেরায় ফ্লাশ জেলে জয়ন্তীর একখানা ফোটোগ্রাফ তুলল। সাপ্তাহিক বসুমতীতে লিখবে কথা দিল, কিন্তু এটা তার প্রতারণা। ওকে দিয়ে লেখানো শক্ত। কিন্তু লেখা খুব নির্ভরযোগ্য, আমি লিখিয়েছি কয়েকবার।

জয়ন্তী নিজের ক্ষমতা বিষয়ে কেমন দৃঢ়বিশ্বাসহীন তার পরিচয় পাওয়া যাবে এই চিঠিখানিতে—

১৩।৩।৫৯

শ্রীচরণেষু

···২০ তারিখে দুপুরে রেডিওতে আমার গল্পপাঠ শুনলে সুখী হব। যদিও গল্পের বদলে ওটি sketch হয়েছে বলাই উচিত। আমার প্রণাম ও শুভেচ্ছা নেবেন।

জয়ন্তী

আর একটি আলোচনা সম্পর্কে (রেডিওতে)—

কলিকাতা,
৭।৫।৫৯

শ্রীচরণেষু, নিশ্চয়ই কোন miracle ঘটেনি। ৪ঠা মে আপনি রেডিও শুনেছেন, এবং আমার সম্পর্কে আপনার যদি কোন ভাল ধারণা এর আগে জন্মে থাকে, তা কিছুই অবশিষ্ট থাকল না। অর্থাৎ আমাকে সম্পূর্ণ রূপে অপদার্থ ভাবতে আর কোন দ্বিধা করছেন না। আমি নিজেও করছি না। যে-যে বিষয়ে কলেজ জীবনে পাতার পর পাতা essay লিখেছি, তা নিয়ে একটুও বলতে পারলাম না। একমাত্র সান্ত্বনা, বাইরের দুচারজন সেদিন শুনেছেন এবং আমার গলা আলাদা করে চিনতে পারেননি। ···

সেদিন বেতার আলোচনার আসরে সুপ্রভা চৌধুরীর সঙ্গে পরিচয় হল। খুব ভাল লাগল ভদ্রমহিলাকে। ....

জয়ন্তী

নিজের সম্পর্কে এতটা অবিশ্বাসের হেতু ছিল না। কারণ আমি সে আলোচনা শুনেছিলাম। সাহিত্য বিষয়ে সুপ্রভা-কনক-জয়ন্তী তিন জনের আলোচনাই একটা উঁচু আদর্শ বজায় রেখেছিল। সুপ্রভা ও কনকের বৃত্তিই তো বক্তৃতা দেওয়া। জয়ন্তীও এ বিষয়ে কম পটু নয়, ইংরেজী বাংলা দুটোই তার আয়ত্ত। সুপ্রভা চৌধুরীর কথা জয়ন্তী আমার মুখে শুনে থাকবে। তাঁর লেখা আমি যুগান্তরে ছেপেছি, তাঁর লেখা চিঠিও

আমার কাছে আছে। তিনি ভিকটোরিয়া কলেজের প্রিনসিপ্যাল। বর্তমান অবস্থা বা অবস্থানের কথা আমার জানা নেই। তাঁকে আমি দেখিনি, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে তাঁর কথা আগে শোনা ছিল।

জয়ন্তীর চিঠির মধ্যে তার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণ এই তিনের চমৎকার পরিচয় আমি পেয়েছি। তার চেয়েও বড় কথা sincerity যার তুলনা কদাচিৎ মেলে। আমি কয়েকখানা নানা জাতীয় চিঠির অংশ উদ্ধৃত করছি—

কলিকাতা, ১৩.৫।৫৯

শ্রীচরণেষু,

…আসলে মুড এলেই চিঠি লেখা উচিত। টেলিফোনে যা বলতে চাই বলতে পারলাম না। স্বপক্ষে এইটুকু বলবার আছে।

আপনার লেখার থেকে লেখককে যতটুকু চেনা যায় তার বেশী চিনি না। আমার মত অতি সাধারণ মানুষের সে লেখা পড়ে কি প্রতিক্রিয়া হয় তাতে আপনার কৌতূহল হলেও seriously নেওয়ার ইচ্ছে হয় না নিশ্চয়। বহু গুণী ও মনস্বী জনের সঙ্গে পরিচিত আপনি। কিন্তু তবুও অকপটে আমার শ্রদ্ধা মিশ্রিত admiration (ঠিক বাংলা প্রতিশব্দ মনে পড়ল না) না জানিয়ে পারছি না। আপনার মত আশ্চর্য ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আসতে পারাও অতি সৌভাগ্যজনক। সে দিক থেকে খুবই গর্ব বোধ করছি। আপনার সঙ্গে হয়তো অর্থহীন কথা বলে কিছু পরিমাণ সময়ের অপব্যবহার করতে বাধ্য করি, কিন্তু আমার পক্ষে নানা দিক থেকে সেটা এতই লাভজনক এবং মানুষ মাত্রেই নিজের লাভের কথা চিন্তা করে থাকে—যে না করে উপায় দেখি না। অতিতুচ্ছ সাধারণ জিনিসকে অসাধারণ চোখে দেখে আনন্দ পাওয়া যায়, সেকথা এর আগে কখনো এত ভালো করে বুঝিনি। সাহিত্যিক আরো অনেকে আছেন, অনেককে আপনার চেয়েও হয় তো ভালো করেই চিনি, কিন্তু সবটুকু শ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলে এমন মানুষ আগে চোখে পড়েনি।

অথচ আপাত দৃষ্টিতে light and subtle humourকে আশ্রয় করে ঠিকই, কিন্তু সেই অতি চঞ্চল ঢেউএর উচ্ছ্বাসের তলে যে অচিন্তনীয় গভীর আর একটা দিক আছে যেখানে 'বড় বেদনার মত' বেজে ওঠা অনেক উপলব্ধি লুকিয়ে আছে, মনে হয় তার একটুখানি আভাস যেন কোথাও

পেয়েছি। সে দিকটা প্রচ্ছন্ন থাকে, এবং থাকে বলেই আপনার humour সত্যিকারের humour, আপনার বন্ধুত্ব সত্যিকারের বন্ধুত্ব।

এতখানি লিখে একটু থামছি। কি লিখেছি দ্বিতীয়বার পড়ে দেখার সাহস নেই, এমনকি বানান সংশোধন করবার জন্যেও নয়। কেননা তাহলে লজ্জায় আর চিঠিটা পাঠাতে পারব না।

উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে দুজাতের লোক। যাদের অল্প বয়স, এবং মেয়েরা। আমি যা লিখলাম তা উচ্ছ্বাস হলেও একেবারে খাঁটি কথা। ..

নিজেকে এত insignificant মনে হয় সময়ে সময়ে। আপনার উৎসাহ অবশ্য একেবারে টনিকের মতো কাজ করে, তবু সত্যি কথা বলতে কি এত কার্পণ্য করেছেন বিধাতা নানা দিকে যে দুঃখ হয় মাঝে মাঝে।···

প্রার্থনা করি···আমার প্রতি আপনার স্নেহ ও করুণা যেন চিরদিন অটুট থাকে।...

—জয়ন্তী

আমাকে যতটা মর্যাদা জয়ন্তী দিয়েছে তা আমার প্রতি তার কৃতজ্ঞতা সত্য বলেই। আমি তার গল্প পড়ে যে ভাবে তার সূক্ষ্ম গল্পবয়ন নৈপুণ্যের বিশ্লেষণ করেছিলাম, তা হয় তো তার নিজের কাছেও অনাবিষ্কৃত ছিল। নিজের সম্পর্কে তার অবিশ্বাস ও কিছু পরিমাণ অজ্ঞতা আমি দূর করেছিলাম। এবং সে আমার সম্পর্কে যা বলেছে তাও মিথ্যা নয়। আমার দুঃখ বেদনার আবেগকে হাল্‌কা সুরের মধ্যে অনেক সময় ভেঙে ছড়িয়ে দিই। হয় তো শুধু এই জন্যই আমি কিছু লিখতে পারি।

জয়ন্তীর পত্র যথার্থ সাহিত্য পত্র হয়ে ওঠে, তার কারণ তার অনুভূতির গভীরতা। প্রকৃতির প্রতি তার ভালবাসা আন্তরিক। পরবর্তী পত্রাংশে তার কিছু দৃষ্টান্ত আছে—

১ নং শরৎ বোস রোড। কলিঃ ২০

১৫।৭।৫৯

শ্রীচরণেষু,

আপনাকে চিঠি লিখতে বসে মনে হল অনেক দিন আপনার কোন খবর পাইনি। আশা করি ভালো আছেন······

এদিকে বর্ষাহীন প্রখর সূর্যালোকে আকাশ ছেয়ে আছে, মেঘের নামগন্ধও নেই, এ ধারে প্রাত্যহিক জীবন যাত্রার গোলমেলে ধরনে বেশ হাঁপিয়ে

উঠেছি। এবারে বৃষ্টির কি হল কে জানে? অন্তত: বেশ ঘন হয়ে মেঘ নামলেও কিছুক্ষণ আর পাঁচটা ভাবনা ভুলে থাকা যায়। এবারে বর্ষা সত্যিই কবিদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। বিশেষত: বিরহী কবিদের সঙ্গে। বেচারীরা হয়তো অনেক আশা করে চাতকের মতো তৃষিত প্রাণে খোলা জানালার কাছে বৃথা প্রত্যাশায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটালো, কিন্তু সবই ব্যর্থ হল। মানুষ এমনিতেই sentiment, feeling, সব হারিয়ে ফেলছে বিজ্ঞানের যুগে, আবার প্রকৃতিও যদি সে সঙ্গে হাত মিলিয়ে বেরসিক হয়ে ওঠে, তা হলে কবিদের পুঁথিপত্র ফেলে এবারে মাটি কোপাতে শুরু করতে হবে।…

জয়ন্তী

—কবির আশা কিছু মেটার পরের চিঠি—

১ নং শরৎ বোস রোড
২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৯

শ্রীচরণেষু,

‥কালকে চললাম বেনারসে।‥আজ আকাশে আবার মেঘ। হয় তো বৃষ্টি নামবে। লঙ্কাগাছের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে গত দুর্যোগে, কাজেই জল নিশ্চিন্তে উঠুক, আমার আর ভয় নেই।

পূজোর সময়কার শুভেচ্ছা, প্রণাম ও শ্রদ্ধা জানাই।

জয়ন্তী

জয়ন্তী আসলে বর্ষামুগ্ধ কবি। আসন্ন বর্ষার কল্পনায় উচ্ছ্বসিত। কিন্তু ওদিকে তার লঙ্কাগাছের চিহ্নও যে রাখেনি একটি বর্ষণ, তাতে খুব দুঃখ হয়েছে বলে মনে হয় না। অর্থাৎ মনের মতো বর্ষণ হলে লঙ্কাগাছ চুলোয় যাক। পরবর্তী চিঠিখানায় দেখা যাচ্ছে বর্ষণ কল্পনায় মনে শিহর জেগেছে।

কলিকাতা
২০।১০।৫৯

শ্রীচরণেষু,

আপনাকে চিঠি লিখতে বসেছি ভর দুপুরে। আকাশ ঘিরে মেঘ, আর মেঘের ছায়া টলমল করছে মাটিতে, চারদিকে। মেঘের ছায়া আশ্চর্য, যেখানে ঝরে, সেখানটিতেই আরও ঘনতর করে তোলে। গাছের পাতা আরও

অন্ধকার, মানুষের মন আরও নিবিড়। হয়ত সেই মুহূর্ত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাবে বলেই সে এত নিবিড়, তাই লিখতে লিখতে আমি আশ্চর্য হয়ে চেয়ে দেখছি বাইরে। মনে হচ্ছে কেউ যেন মাথা নুইয়ে হাত উজাড় করে দেবে বলে এসে দাঁড়িয়েছে, এখুনি বন্যার মত ঝরবে তার দাক্ষিণ্য—মাটির শিরায় উপশিরায়। এই বৃষ্টি-আসন্ন দিনে আপনাকে ব্যক্তিগত কৈফিয়ৎ দিতে মন নারাজ।......কেন কথা দিয়ে কথা রাখিনি তার উত্তরে এত কথা বলবার আছে এবং সাপ কুকুর থেকে শুরু করে আরও নানা জাতীয় নখদন্ত-শৃঙ্গধারীদের আমদানি করে দেখাতে পারি যে শেষে জেরা করতে করতে হয় তো নিজেই ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। থাক ওসব কথা।

প্রথম কদম ফুলকে প্রায় অপাঙক্তেয় করে দেখলেও তার রোমান্স ফুরোল না। এত দুর্যোগ দুর্দৈব সহ্য করেও আমার ছোট কদমচারা আরও সতেজ, প্রাণবন্যায় উচ্ছল, হয়ে পায়ের তলার মাটিকে আঁকড়ে ধরে বলছে আমি আছি। হয় তো থাকব আরও বহুকাল, যখন এখনকার মানুষেরা থাকবে না। তার এখন নতুন রংধরা ঝলমলে সবুজ পাতার আড়ালে কুঁড়ি ধরেনি। প্রথম কদমফুলের সময় আসেনি। তবু অনেকখানি আশ্বাস দিচ্ছে সেও। ভবিষ্যতের দিকে চোখ মেলবার ইঙ্গিত জানাচ্ছে।

ভাদ্রমাসও চলে গেল, আশ্বিনও যাই যাই, আর কদম ফুল নিয়ে এত আতিশয্য আপনাকে বোধ হয় অধীর করে তুলছে। ...আসলে বর্ষার মাঝখানে কেমন যেন প্রতিশ্রুতির আভাস পাওয়া যায়। রোজকার ঝকমকে গিলটি করা তকমা আঁটা দিনগুলো মনকে শাসায়, এধারে-ওধারে নয়, সোজা চল ভাগ্যের লোহায় পেটা রেললাইন ধরে। এদিকে-ওদিক চেয়ো না, তবেই অ্যাকসিডেন্ট। অথচ মেঘের ছায়া ঝরা পৃথিবী যেন অন্য জগৎ। সে হাতছানি দেয় এমন সব রাজ্যের দিকে যেখানের সন্ধান পাওয়া-মাত্র মন হয়ে ওঠে রঙীন প্রজাপতি। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে বিরহের কল্পনাতীত অনুভূতিও জাগিয়ে তোলে মেঘমেদুর বেলা, স্বীকার করছি। হয় তো জীবনে 'অনেক কিছু' অথবা 'একটা কিছু' পাইনি এই গোছের ভাবখানা। তাতে দুঃখ নেই, না পেলেও সেই দুর্লভ একটা কিছুর অস্তিত্ব এ জীবনে অনেক-খানি।—তাই বর্ষাকে কখনো স্বাগত বলতে দ্বিধা বোধ করিনি।

লিখতে লিখতে মনে হচ্ছে আপনি অসুস্থ। বিছানায় শুয়ে থাকার বিলাসিতা অবশ্যই একটা আছে, কিন্তু যখনই বাধ্যবাধকতার প্রশ্ন ওঠে,

অর্থাৎ শুয়ে না থেকে অন্য কোনো উপায় নেই, তখনই শয্যা কণ্টকশয্যা বলে মনে হয়। আর দুর্বলতার 'অত্যাচার'ও কম নয়...তবু যদি চিঠিটা পড়ে একটু সময় কাটে। কল্পনা করছি আপনার ঘরের সামনে ছোট্ট জানালায় ভীড় করা মেঘ। দিগন্ত ছড়ানো নয়, কিন্তু দিগন্তের আভাস বয়ে আনা ঘননীল আকাশ। আপনি আগের চেয়ে নিশ্চয় অনেক ভালো আছেন, ভালো থাকবেন এখন থেকে। আর মনে মনে ভাববেন ঠিক ঐ একই মেঘ নিয়ে আমি এতক্ষণ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছি। আপনার অবশ্য পিছনের কত সুখ-দুঃখের ধারায় সিক্ত হাসিকান্না মেশানো অপূর্ব স্মৃতির ইতিহাস রয়েছে। কত মানুষকে চিনেছেন, দেখেছেন, আর তাদের নিয়ে লিখছেন। কেবল ভাবছি আপনার সঙ্গে আর কদিন আগে পরিচয় হলে স্মৃতিচিত্রণে আপনি আমার কথা একটু লিখতেন ; যা হোক কিছু।...

আমার জানালা দিয়ে দেখছি পাশের বাড়ী একটা ছোট গাছ গোলাপী ফুলে ভরে আছে।...ফুলটার নাম জেনে পরে আপনাকে জানাব। আমার প্রণাম নেবেন।

—জয়ন্তী

একদিকে প্রকৃতির আর্কষণ—অন্য দিকে কাব্য রচনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা এবং সবার উপরে একটি স্নেহার্দ্র অন্তঃকরণ, এ সব মিলিয়ে কবি জয়ন্তী সেনের একটি পরিচয় বেশ পাওয়া যায়। আমার অসুস্থতার জন্য তার কতখানি সান্ত্বনা দেবার আয়োজন, ভাবলে অসুস্থতা আপনা থেকেই দূর হয়। সব ছাপিয়ে এমন একটা সুজনতা পরিচ্ছন্ন কল্পনা এবং সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায় যা মনের গভীরে ব্যাপ্ত, যে বিষয়ে সে সচেতন নয়, যা স্বতঃস্ফুরিত, এবং যার শুধু কাব্যের ভিতর দিয়েই সার্থক প্রকাশ হতে পারে, তারই জন্য এই প্রকাশব্যাকুলতা এবং তা আমার জন্য সামান্য বেদনাবোধের ভিতর দিয়েও কি চমৎকার প্রকাশ পেয়েছে ভাবলে অবাক হতে হয়।

আরও কয়েকখানা চিঠির অংশ উদ্ধৃত করছি—

Koraput
29. 9. 60

শ্রীচরণেষু, আপনি আমার বিজয়ার প্রণাম ও অনেক শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন।......

গাড়ী করে অনেক ঘুরেছি আর দেখেছি। দেখতে দেখতে সময় চলে যাচ্ছে কোথা দিয়ে।

কি যে ভালো লাগছে বলতে পারি না। এ জায়গাটা শিলঙ আর শান্তি-নিকেতন মিলিয়ে। সবুজ উপত্যকা, নীলচে পাহাড আর লাল মাটির পথ। মাথায় কলসী নিয়ে সারি বেঁধে নিস্তব্ধ নির্জন পটভূমির উপর দিয়ে আদিবাসী মেয়েরা হাটের দিকে অথবা গাঁয়ের পথ ধরে চলে যায়। মাথায় তাদের ফুলের বন। মাঝে মাঝে দুপুর বেলা শীতের মরশুমী ফুলে ভরা ছোট মাঠে বসে যতদূর চোখ যায় চেয়ে থাকি—হাওয়া বয়ে যায় শ্বেতকরবী ফুলের গাছের ডালের ফাঁকে ফাঁকে।

সে দিন দুপুরে শালবনের মাঝখানে চলে গিয়েছিলাম। পথে পড়ল মহুয়া চন্দন কাঠের গাছ, ধানের ক্ষেত। গাডীতে মালকান গিরির কাছে একটি রেফিউজি সেণ্টার দেখে ফেরার পথে ওখানে গাডী থামিয়ে কিছুক্ষণ কাটালাম। এ রকম নির্জন জায়গা আর দুটি দেখিনি। আপনার জন্যে মন কেমন করছিল। এত ছবি তোলার অফুরন্ত বিষয় এখানে। মিস্টার জনসন এখানকার চাফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার। ভদ্রলোক গঙ্গোত্রীর ওধারে ১৮০০০ ফুট উঠেছেন ঐ ছবি তোলা আর শিকারের নেশায়। আশ্চর্য ছবি তোলেন। আমি বলেছি আমাকে কিছু তুলে দিতে।

কেবল বেড়াইনি, কাজও কিছু কিছু করেছি। ডায়রি লেখা বাদ দিলেও আদিবাসীদের সম্পর্কে পডাশুনা করছি, অনেক নোট নিয়েছি। বস্তার জেলার অমরকোটে কাল যাব। এর মধ্যে মালকানগিরির বণ্ডো জাতির সম্পর্কে অনেক কিছু জোগাড় করেছি—একটা উপন্যাস অনায়াসে হয়ে যায়।......

রেফিউজিদের সকলে এখনো জমি পায়নি, কিন্তু তবু বলব তারা বেশ ভালো আছে। শাকসবজীর ক্ষেত পড়েছে ক্যাম্পের চারপাশে। খোলামেলা জায়গায় ওদের স্বাস্থ্য খুব উন্নতি লাভ করেছে। জলের কিছু সুরাহা হলেই বেশ মনের আনন্দে গুছিয়ে বসতে পারে। জলের অভাব আছে। মাটির নীচে পাথর। সেই পাথর কেটে কুয়ো অথবা টিউবওয়েল করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। ফিরে গিয়ে সব বলব।...সময় পেলেই আদিবাসীদের নিয়ে পড়েছি লেখার মালমশলা যোগাড় করে নিতে চেষ্টা করছি।

সন্ধ্যার অন্ধকারে শুনেছি পাশের পাহাড় থেকে বুনো জন্তুর দল—লেপার্ড, হায়েনা, ভালুক নেমে আসে। আজ সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল ফিরতে, গা ছমছম

করছিল। বেশ নতুন অভিজ্ঞতা। মানুষ বোধ হয় ভয়ের রোমাঞ্চও উপভোগ করে।...

—জয়ন্তী

চিঠির ভিতর দিয়ে জয়ন্তীর যে পরিচয় দেখাতে চেষ্টা করছি তা আরো দেখা যাবে এই চিঠিগুলিতে—

কলিকাতা
১৬ই মে, ১৯৬১

শ্রীচরণেষু······যা হাতের কাছে থাকে তাকে সত্যিই দেখি না। প্রথম যে দিন আমার জানালার সামনে কৃষ্ণচূড়ার ডাল ফুলে ভরে গেল, খুব চমকে উঠেছিলাম। আর একদিন হঠাৎ দেখি শীতকালের পাতা ঝরা গুলনচাঁপা গাছে সবুজ সতেজ পাতা, আর থোকা থোকা মিষ্টি গন্ধ ছড়ানো শাদা ফুল। এত ভাল লাগছিল দেখতে। তারপর সেই প্রথম দেখার দিনটি সমস্ত দিনের যাঁতার পেষণে কখন যে তলিয়ে গেছে টের পাইনি। কিন্তু ভাল লাগার অনুভূতি বুঝি কোন দিনও শেষ হয় না। অনেকদিন বাদে আজকে সন্ধ্যায় বসেছিলাম ছোট পিছনের মাঠটিতে। ইমারতের শেষ নেই, কিন্তু তারই ফাঁকে ফাঁকে সন্ধ্যার আকাশ অপরূপ হয়ে উঠেছিল। অস্পষ্ট নীলাভ আকাশের গায়ে টকটকে লাল ফুলের ডাল যেন তুলি দিয়ে আঁকা। যতক্ষণ না রাত্রি হল বসে ছিলাম বাইরে।······

ইতি—জয়ন্তী

কলিকাত-২০
সোমবার, ১৭।৭।৬১

শ্রীচরণেষু······ব্যাঙের ডাক সত্যিই ভাললাগে, রাত্রিবেলা, বিছানায় শুয়ে, আর কেউ না থাকলে। সেই সঙ্গে মধ্যে মধ্যে যদি বৃষ্টি নামে। এবারে বৃষ্টির কার্পণ্য, কিন্তু তা হলেও আমার কদম গাছ মাথায় বাড়ছে। এ বছরে ইচ্ছা ছিল একটা তমাল গাছ লাগাব।....আপনার বাড়ীতে যে আকাশ ছড়ানো, সেখানে তাকিয়ে আগেকার ঠিকানার সেই সঙ্কীর্ণ আকাশটার কথা মনে পড়ছে। আপনি একবার লিখেছিলেন ঐ আকাশটুকুতেই যেরকম রঙের খেলা ও বৈচিত্র্য আপনি তা নিয়ে আমার সঙ্গে 'কমপিটিশন' করতে পারেন।

আমার কিন্তু কল্পনায় আপনার আগেকার বাড়ীর দৃশ্যই ভেসে ওঠে যেখানে দেওয়ালভরা বই—শুধু বই, একটুখানি জানালা, আর একটা ফুলদানী—।

জয়ন্তী

C/O Dr. A. K. Sen
Purba Palli, Plot-32
Santiniketan 7. 12. 62.

শ্রীচরণেষু, কাল শুক্লপক্ষের বোধহয় সপ্তমী তিথি ছিলো, সমস্ত আকাশ আলোয় আলোময়। লাল বাঁধের কাছে দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম জলের নিরুদ্বেগ বুকে চাঁদ ও তারার রুপালী ছায়া কাঁপছে, আর কাঁপছে ছোট ঢেউয়ের মাথায় আলোর রেখাগুলো। শরবনের ফাঁকে ফাঁকে হাওয়া কেঁপে কেঁপে উঠছিলো। প্রায় একঘণ্টা চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখানে—কিছু ভাবিনি, শুধু চোখ দিয়ে মন দিয়ে দেখেছি। তারপর মনে হোল আপনাকে সেই আশ্চর্য experienceএর কথাটা লিখে জানাই। আমি নানা দেশে ঘুরেছি, অনেক সুন্দর জিনিষ দেখেছি, কিন্তু এমনভাবে অভিভূত কবে হয়েছি মনে পড়ে না। আর আশ্চর্য এই যে, তখন সেখানেই মনে হোল, আপনিও হয় তো এখানে কোন দিন দাঁড়িয়ে এই অপার্থিব সৌন্দর্য দেখেছেন। জানি সে যুগে [১৯২১] লাল বাঁধ ছিলো কি না, কিন্তু এই খোলা উন্মুক্ত আকাশের নীচে নির্জন পৃথিবী নিশ্চয়ই ছিলো, আর সমস্ত গ্রহনক্ষত্রের এত সমাবোহেও কোন শিথিলতা ছিলো না নিশ্চয়। আমি সত্যিকারের লেখক বা কবি নই, —ঠিক সেই নিঃসঙ্গ নির্জন মুহূর্তে মনে হোল নিজেকে প্রকাশ করতে না পারার প্রচণ্ড দুঃখ। তার পরদিন বাড়ী ফিরতে কষ্ট হচ্ছিলো। সবকিছু ভালো সবকিছু সুন্দর এত কম পাই কেন জীবনে? রোজকার রোদের আলোয় সেই হঠাৎ ফুটে ওঠা ফুলগুলো কত তাড়াতাড়ি শুখিয়ে ঝরে যায় ধূলোয়। আর উজ্জল হয়ে থাকে চিরস্থায়ী গদ্যময় রহস্যহীন দিনগুলো।

৮।১২।৬২ কাল আপনাকে এইটুকু লিখেই থেমে গিয়েছিলাম। আজ হঠাৎ ঠিক হোল কলকাতা ফিরে যাব ১৪ তারিখে—আগামী শুক্রবার।…পৌষের মেলার আগেই এখানকার পর্ব চুকে গেল। এখানে এখন রোজ রোজ দিনগুলো শীতের পথ গুনছে। দিন শুরু হওয়ার আগে পূব দিকের আকাশে

লাল রেখায় চিত্র বিচিত্র এঁকে সূর্য ওঠে আর সকাল বেলার নরম রোদ ছড়িয়ে পড়ে গাছের পাতার শিশিরে। কত রকম পাখির গান যে শোনা যায় চার দিকে। মনে হয় এখনকার প্রত্যেকটি মুহূর্তই এক একটি রবীন্দ্র সঙ্গীত হয়ে মনের মধ্যে বেজে ওঠে। গীতবিতান নেই—তবু এলোমেলো লাইনগুলো মনের মধ্যে ঘোরা ফেরা করে—

ফুলের উদাস সুবাস বেড়ায় ঘুরে
পাখির গানে আকাশ গেল পুরে—

বিকেলে পশ্চিমের আকাশে তাকানো যায় না—এত তার রঙ। আর রাত্রি যখন নামে তখন আমার মত বেসুরো কণ্ঠও গানের তাগিদে বেজে ওঠে।…

এবার আপনাদের কথা। আপনার "মনে পড়ল" পড়লাম 'অমৃত'য়। প্রেমেনবাবুকে ব্লাক মেল করার ঘটনা। বেশ কিছুক্ষণ হাসলাম।

কলকাতায় ফিরে যাওয়ার কথায় চিঠি লেখার সুরটা কেটে গেছে।…

—জয়ন্তী

কনডার্গাঁও
জেঃ বস্তার, এম. পি., ১৯।১০।৬৩

শ্রীচরণেষু,

……এখানে এসে ভেবেছিলাম অনেক সময় পাব ও শিশুসাথার জন্য একটি ধারাবাহিক উপন্যাস লিখব। কিন্তু যত বেশী সময় পাওয়া যায়, তত সময় নষ্ট করারও অনুপ্রেরণা জাগে। জায়গাটা, শহরের চিহ্ন পড়েনি বলে বিভূতিভূষণের আরণ্যকের মত। ধূ ধূ করছে আকাশের সীমানা, সেখানে সন্ধ্যার রঙ অনেকক্ষণ ছড়িয়ে থাকে। উঁচুনীচু লাল মাটির রাস্তা দিয়ে আদিবাসী মেয়েদের ছায়া-মিছিল চলে। …হঠাৎ তারিখ হিসেব করতে গিয়ে দেখি কলকাতায় ফেরার সময় হয়ে গেছে। আর কাউকে চিঠি লেখাও হয়নি। এখন বিবেক দংশনের পালা।…

—জয়ন্তী

কলিকাতা, সোমবার
১৫।১০।৬৫

শ্রীচরণেষু,

…আপনি দোপাটী ফুলের কথা লিখেছিলেন, আমাদের কাছাকাছি একটা বাড়ীতে একটি স্থলপদ্মের গাছের দিকে সারা পূজোর ছুটি যখনই চোখ

পড়েছে, মনে হয়েছে চোখ জুড়িয়ে গেল। জীবনে যেটুকু সুন্দর, pleasing, চাওয়ার মত, তাকে বাদ দিয়ে আজকালকার আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী কেন যে seamy sideটার দিকে বারবার চোখ ফেরায় কে জানে। এ নিয়ে অনেকে তর্ক তুলে আমাকে out of date বার বার প্রতিপন্ন করে ছাড়ে। অথচ আমার ভাবতেও ভালোলাগে সেই ফুলে ফুলে ভরা গাছটার কথা। আর এখন দেয়ালের গায়ে লতার প্রত্যেকটি পাতায় রোদ চিকচিক করছে। ছোট একটা চড়াই পাখী বেশ উদ্ধত গর্বের সঙ্গে মাথা উঁচু করে নিজের ভালো লাগা মনের কথা জানাচ্ছে। রোদের রঙ হলুদ ফুলের পাপড়ির মত।

অনেক বিষণ্ণতার কথা ভাবা যায়, তবু জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাতে যে কি আশ্চর্য thrill, তা বলে বোঝানো যাচ্ছে না। এই অনুভূতির উপস্থিতিই বোধ হয় মানুষকে পশুত্বের গণ্ডীর অনেকখানি উঁচুতে তুলে ফেলেছে—জোর করে বুকের মাঝখানে জ্বলে ওঠা সেই প্রদীপখানি নিভিয়ে ফেলার মধ্যেই কি সব গৌরব…? তাহলে এ জন্মে আমার আর আধুনিক হওয়ার সৌভাগ্য ঘটল না।

…শুনলাম আপনার 'বঙ্গ আমার জননী আমার' [পর্যায়ের] প্রোগ্রাম খুব ভালো হয়েছিল—আমার শোনা হোল না। জীবনে কত কি ভালো miss করে যাই—।

—জয়ন্তী

কবি জয়ন্তী সেনের মানসব্যাখ্যা আগেই কিছু দিতে চেষ্টা করেছি—পরবর্তী চিঠিগুলি সে ব্যাখ্যার সহায়ক হবে অবশ্যই। রবীন্দ্রনাথের

আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল
শুধাইল না কেহ।

মায়ার খেলার এই গানের আরম্ভটির সাহায্যে জয়ন্তীর কবিমানসের ব্যর্থ ব্যাকুলতার (৭/১২/৬২র চিঠি দ্রঃ) কিছু ব্যাখ্যা হয় তো দেওয়া যায়। পরিপূর্ণ উৎসাহ এবং সুযোগ পেলে যে কথা সে এমন সুন্দর ভাবে চিঠিতে প্রকাশ করেছে, তা সুন্দরতর ভাবে সবার মাঝখানে বলতে পারত।

তার অনেকগুলি চিঠিতেই আমার এককালের প্রিয় প্রকৃতির পরিবেশ অতি উগ্রভাবে মনে পড়ে গেছে। যে প্রকৃতির মধ্যে আমি ডুবে ছিলাম, সর্বাঙ্গ দিয়ে যাকে প্রতিদিন স্পর্শ করেছি, তা বাইরের জীবন থেকে ছিন্ন হয়ে

গেছে চিরদিনের মতো। তাই যে-কোনো উপলক্ষে সে স্মৃতি যখন মনে জেগে ওঠে তখন মন বিচলিত হয়ে ওঠে, কিন্তু একটা মধুর স্পর্শও যেন নতুন করে পাই তার সঙ্গে, এবং এখন সেইটুকুই যা সান্ত্বনা।

এতদিন আমি ছিলাম সম্পাদক, জয়ন্তী লেখিকা। এরপর সে হল সম্পাদক, আর আমি লেখক। একটি গল্প মনে পড়ল। একটি লোক নিশ্চিন্ত মনে পথে চলতে হঠাৎ দেখে এক হিংস্র প্রকৃতির লোক তার দিকে এগিয়ে আসছে। লোকটি প্রাণভয়ে দৌড়তে লাগল, হিংস্র লোকটিও পিছনে ছুটতে আরম্ভ করল। শেষ পর্যন্ত অনুসরণকারী যখন ঐ লোকটিকে ধরে ফেলল, তখন লোকটি তার হাতে মৃত্যু অনিবার্য জেনে ভয়ে কাঁপতে আরম্ভ করল। অনুসরণকারী কিছুই করল না, হাঁফাতে হাঁফাতে শুধু বলল, তোমাকে ছুঁয়েছি, এবারে আমি দৌড়ই তুমি আমাকে ছোঁও দেখি?

আমি ভাবছি—আমার কি আর ছোটার সামর্থ্য অবশিষ্ট আছে?

ঊনপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

সংসারে নানা প্রতারক আছে, এবং চিরকালই থাকবে। কিন্তু প্রকাশ্যে খোলাখুলি বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রতারণা আমাদের এই পুণ্যভূমিতে যেমন আছে এমন বোধ হয় পৃথিবীতে অন্য কোথাও নেই। অন্তত এত বেশি নেই। এই রচনা লেখার সময়েও (১৯৭১) কাগজে নানা প্রতারণার বিজ্ঞাপন দেখতে পাচ্ছি। ৫টাকা মাসিক কিস্তিতে "অলওয়ার্ল্ড" রেডিও! লোভনীয় পার্সেল খুলে দেখা যাবে এই রেডিও সেটটির মোট দাম পাঁচ সিকাও নয়। আবার আট টাকায় সিলকের শাড়ী, অথবা 'চেন' সিস্টেমে পাঁচ টাকায় ঘড়ি ইত্যাদি রূপ প্রতারণা আমাদের দেশে আইন সঙ্গত বলেই মনে হয়। তারপর হোমিওপ্যাথি ডিপলোমা ১৫ টাকায়—একেবারে ছাপা এম-ডি উপাধি, বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রাখা চলবে। তা ছাড়া ফুলের নাম বললে বারো মাসের ভাগ্য গণনা পাঁচ টাকায়, এবং ঐ সঙ্গে বিশেষ মাসে কোনো নক্ষত্র প্রতারিতের প্রতি এমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে যাকে প্রশমিত করার জন্য একটি মাদুলী প্রতারক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ভি-পি ডাকে পাঠিয়ে দেবে। এছাড়া বশীকরণের নানা সহজ কৌশল, খুব শস্তা।

অনেকেই প্রতারিত হতে ভালবাসেন, নইলে এ ব্যবসা চলছে কি করে? না যদি চলে তবে প্রতারক এত টাকার বিজ্ঞাপনই বা দেবে কেন? বিজ্ঞাপনে কে কি ভাবে প্রতারিত হয়েছেন সে বিষয়ে তথ্য অন্বেষণ করে একবার পর পর অনেকগুলি কাহিনী ছেপেছিলাম যুগান্তর সাময়িকীতে। উদ্দেশ্য ছিল সবাইকে প্রতারকদের কৌশলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া, যদিও সব জানা সত্ত্বেও যাঁরা ঠকতে ভালবাসেন তাঁদের এ সব তথ্য পড়ে কিছু লাভ হয়নি, এটি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলা।

বিজ্ঞাপন আগে জলন্ধর থেকেই বেশি দেওয়া হত। এবং অনেক পাঠকই এই জলন্ধরের জালে পড়ে ঠকেছেন, সেজন্য আমাদের এক লেখিকা শ্রীমতী সবিতা সেনগুপ্তকে আমি জলন্ধরের প্রতারণা কৌশল বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতে অনুরোধ জানাই।

তিনি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত, কিন্তু তাঁর বাইরে-থেকে আসা লেখা

মাঝে মাঝে ছেপেছি, বেশ ভাল লিখতেন। এই সবিতা সেনগুপ্তের ঠিকানা যখন হল ৩২৩ মডেল টাউন জলন্ধর (পূর্ব পঞ্জাব) তখনই আমার মনে হয়েছিল জলন্ধরের প্রতারণার স্বরূপ উদঘাটনে এঁর সাহায্য নেওয়া যাক। তাঁকে অনুরোধ জানাতে তিনি খুব যত্ন করে বহু তথ্য সংগ্রহ করে আমাকে যে রচনাটি পাঠান তা আমি ১০ই জুলাই ১৯৬০ তারিখের যুগান্তর সাময়িকীতে প্রকাশ করি।

তার আগের ইতিহাস—আমি সম্ভবত লিখেছিলাম লেখা ছাপার বা লেখিকা হওয়ার ambition যদি থাকে তবে পরিশ্রম করতে হবে। কি লিখেছিলাম কিছুই মনে নেই। তবে লেখিকার চিঠিতে তার উত্তর আছে। তার অংশ বিশেষ এই—

৩২৩ মডেল টাউন, Jullundar, Punjab
(পত্রপ্রাপ্তির তারিখ ডাকঘরের মার্ক
অনুযায়ী—১৮।২।৬০)

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

...আপনি যে বিষয়ে লেখার জন্য বলেছিলেন, তাব মালমশলা সংগ্রহ করতে পারছি না বলে লেখা আর হয়নি। তবু চেষ্টা করবো। লেখা ছাপাব ইচ্ছা বা অগ্রহকে ambition কেন বলছেন, ambition যদি ম্যাকবেথের মত মারাত্মক না হয় তা হলে আর ক্ষতিটা কি? তা ছাড়া এই যুগে আর এই জীবনে সাহিত্যের মধ্যে আশ্রয় না নিলে বা না পেলে বাঁচারই বা উপায় কোথায়? অবশ্য যোগ্যতা অযোগ্যতার প্রশ্ন আছে পণ্ডিতেরা যে রসের আস্বাদন ব্রহ্মের আস্বাদনের সমতুল্য বলেছেন তার মধ্যে নিশ্চয়ই অধিকারী ভেদ রয়েছে?...

সবিতা সেনগুপ্ত

অতঃপর সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে শ্রীমতী সবিতা যে রচনাটি পাঠালেন তার জন্য তথ্য সংকলন, ও তার লিখন ভঙ্গি ভারী সুন্দর লেগেছিল। বিষয় বস্তুর উপযুক্তই তার মৃদু ব্যঙ্গপূর্ণ ভাষা। ফলে এটি শুধুই রিপোরটিং মাত্র হল না, তার চেয়ে বেশি কিছু হল। এটি সাহিত্যও হল। আর সেই জন্যই রচনাটি অনেকেই তখন খুব পছন্দ করেছিলেন।

আমি "জলন্ধর!" নামক ঐ রচনাটি থেকে কিছু অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি।

"দীর্ঘ দুবছর পর পিসিমার চিঠি পেয়ে হকচকিয়ে গেলাম। তাঁর একটি সনির্বন্ধ অনুরোধ আছে। …তিনি শুনেছেন জলন্ধরের জ্যোতিষাশ্রমের কবচ বা অঙ্গুরী ধারণ করলে সব সমস্যার সমাধান হবে, এমন কি স্বর্গত পিশেমশাইএর সঙ্গে সাক্ষাৎ হতে পারে। ওরা যখন বিজ্ঞাপনে লিখেছে, মিথ্যা প্রমাণিত হলে একহাজার টাকা দেবে তখন …। পিসিমা অনুরোধ করেছেন আমি যেন অবিলম্বে একটি কবচ বা অঙ্গুরী তাঁকে পাঠিয়ে …" ইত্যাদি।

এরপর সুন্দর সরস মৃদু ব্যঙ্গপূর্ণ ভাষায় ওদের যাবতীয় বিজ্ঞাপন ও প্রতারণার বিবরণ। প্রায় ৪ কলম ব্যাপী এই রচনাটি আগাগোড়া পুনর্মুদ্রিত করতে পারলে প্রতারিত হওয়ার সহজ উপায় যাঁরা খুঁজে পাচ্ছেন না, তাঁদের বড়ই উপকার হত। বিশেষ করে যাঁরা গোপনে প্রতারিত হতে ভালবাসেন, তাঁদের। পাঁচজনে জেনে গেলে এর রোমাঞ্চটা চলে যায়। ম্যাজিক রুমাল ঘরের লোকের নাকের কাছে ঘুরিয়েই প্রথমে পরীক্ষা করা চলে। ম্যাজিক আয়নায় পূর্বপুরুষের চেহারাও গোপনেই দেখা চলে।

এই দীর্ঘ রচনার ভিতর থেকে আমি একটি মূল্যবান জ্ঞাতব্য তথ্য সম্বলিত অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি। রচনাটি কয়েকটি উপশিরোনামে বিভক্ত। একটির শিরোনাম 'মেঘের আড়ালে।' এই অধ্যায়ে লেখিকা বলছেন—

"অবাক কাণ্ড এই যে, এই সব বিজ্ঞাপন-দাতাদের পুরা নাম-ধাম-ঠিকানা কখনো বিজ্ঞাপনে থাকে না। কোথায় যে এই সব প্রতিষ্ঠান, এবং তাদের কর্তাদের অধিষ্ঠান, তা এই জনমুখর শহরের অন্ধকার গলিঘুঁজি তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও পাওয়া যাবে না।…

"এই বিজ্ঞাপনগুলি দেওয়া হয় বহু দূরের সংবাদপত্রে। বিজ্ঞাপনে শুধু পোস্ট বক্স নম্বর দেওয়া থাকে—এ সব ঠিকানার নিশানা শুধু পোস্ট অফিসের পিয়ন আর পোস্টবাবুর কাছেই থাকে, তাদের সঙ্গে বিজ্ঞাপনদাতাদের কি সম্পর্ক জানা যায় না।

"এ সব বিজ্ঞাপন বাংলাদেশেই যে শুধু দেয় তা নয়, অন্যান্য প্রদেশের আঞ্চলিক ভাষায়ও দেয়। এবং নানা জায়গা থেকে কখনো কখনো লোক সরেজমিনে খবর নেবার জন্য এখানে এসে হানা দিয়েছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই বিজ্ঞাপনদাতাদের ঠিকানা সংগ্রহ করতে না পেরে হতাশ হয়ে ফিরে

গেছে।...দিনের পর দিন নিজেরা অন্ধকার গুহায় লুকিয়ে থেকে বিভিন্ন দেশের জনসমাজে মানসিক ব্যাধি ও অসুস্থতার মারাত্মক বিষ ছড়াচ্ছে। ...কোন সম্ভ্রান্ত পত্রিকায় কদাপি এই সব বিজ্ঞাপন বেরোয় না, সাধারণত পঞ্জিকা ও দ্বিতীয় শ্রেণীর দৈনিক [ও সাপ্তাহিক] কাগজে দেখা যায় এই সব বিজ্ঞাপনের বাহার। সহজে বিশ্বাসপ্রবণ নরনারী এদের শিকার।

"বিজ্ঞাপনগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায় ঠিকানা অধিকাংশেরই এক। লুধিয়ানা, হোসিয়ারপুর, জলন্ধর, অমৃতসর, যেখানকার ঠিকানাই দেওয়া থাকুক না কেন বিজ্ঞাপনে, চিঠিপত্র সব একই ঠিকানায় গিয়ে পৌঁছয়।.... একই জোচ্চোর সবগুলোর পিছনে কাজ করছে।...

"এক কবিরাজ আছেন এই শহরে, যাঁর কোন রোগী বা খদ্দের এই শহরে নেই, অথচ লক্ষ লক্ষ টাকা তাঁর আয়। কেবল খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনের বাবদেই তাঁর সম্বৎসরে সওয়া লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এত টাকা আসে কোথা থেকে?"...

এরপর এই দীর্ঘ প্রবন্ধের "লুণ্ঠনের হাত বহুবিস্তৃত" নামক উপশিরোনামে—পাসপোর্ট ইত্যাদির রোমাঞ্চকর জালিয়াতি ও প্রতারণার কথা বিবৃত হয়েছে। এক স্থানে বলা হয়েছে—

"জাল পাসপোর্ট তৈরি করা হয় দুটি উপায়ে। এক—পুরনো পাসপোর্ট অর্থমূল্যে সংগ্রহ ক'রে। তারপর পাসপোর্টে-আঁটা ফোটো তুলে নিয়ে সেখানে অন্য ফোটো এঁটে দিয়ে সরকারী সীলের জাল-করা স্ট্যাম্প, যা এদের হেফাজতে রয়েছে, তাই দিয়ে আগের মতনই করে দেয়। দু নম্বর—একদম নূতন পাসপোর্ট তৈরী ক'রে। তা করার জন্য দিল্লীর অফিসে অল্প বেতনের কর্মচারীদের ঘুস দিয়ে সরকারী পাসপোর্টের কাগজ বার করে নেয়। তারপর নিজেদের ইচ্ছেমত কাজে লাগায়। এক পোর্ট পুলিস ধরতে পারে এটা জাল না খাঁটি, কিন্তু সেই পুলিসই এদের আপনার লোক, কাজেই এদের ব্যবসা বেড়েই চলে।"...

এরপর "চর্বিমাখা গা, ধরা যায় না" উপশিরোনামে বলা হয়েছে—

"ধরা যদি বা পড়ে তা হলে এদের ছাড়িয়ে নেবার জন্য প্রভাবশালী লোকের অভাব হয় না। ...দৈনিক এদের কাছে এক হাজার থেকে দেড় হাজার টাকার মানি অর্ডার আসে, কিছু অগ্রিম হিসেবে কিছু ভি-পির টাকা হিসেবে। বিনা দ্বিধায় এরা ভি-পিতে মাল পাঠায়। কেননা যঃ পাঠায়

তার আসল দাম হয়ত কয়েক আনা মাত্র। তা ছাড়া শতকরা ৯৫টি ভি-পি গ্রাহকেরা রেখে দেয়। প্যাকেট খোলার পর জ্ঞানচক্ষুর উদয় হয়।"...

এই সমাজকল্যাণকর দীর্ঘ প্রবন্ধটি এমন তথ্যপূর্ণ যে মনে হয় যেন এটি কোনো ডকটরেটের থীসিস রূপে রচিত। যদি জনসাধারণ প্রবন্ধ পড়ে কিছু শিখত, তা হলে এই একটি প্রবন্ধেই প্রতারণা দেশ থেকে উঠে যেত। কিন্তু তা হয় না, কারণ এমন বহু লোক আছে যারা প্রতারিত হতে ভালবাসে, এবং সুযোগ পেলে আর স্থির থাকতে পারে না। তাই প্রতারকদের ব্যবসা চলে ভাল। এর আরো একটা সম্প্রতি-পাওয়া দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—ইতিহাসের অধ্যাপিকার লেখা চিঠি থেকে।

Prof. Gitasri Bandana Sengupta M.A. শিলিগুড়ি
Siliguri College ১।৫।৭১

শ্রীচরণেষু

লোভনীয় বিজ্ঞাপন দিয়ে মানুষকে যে কতরকমে প্রতারিত করা যায় তার একটি উদাহরণ আপনাকে দিচ্ছি। আমার এক বন্ধু পূজোর আগে বিজ্ঞাপন দেখে দিল্লী-৬ ঠিকানায় ৪০ টাকার বিনিময়ে ৪টি কাশ্মীরী সিল্কের শাড়ীর অর্ডার দিয়েছিল। টাকা আগে পাঠাতে হবে না, শাড়ী ভি. পি. পার্সেলে আসবে, তখন টাকা দিয়ে ছাড়াতে হবে। তারপর যথাসময়ে ভি. পি. পার্সেল এলো, বন্ধু অধীর আগ্রহে খুলে দেখল ভিতরে চার টুকরো শস্তা পাট সিল্ক। মাঝে মাঝে ফেঁসে যাওয়া সূতো দিয়ে ঐ ৪ টুকরো কাপড় তৈরি, কোনো রকমে বাক্সর ঢাকনা বা জানালার পর্দা হয়।

৪০ টাকায় যে চারখানা কাশ্মীরী সিল্কের শাড়ী হয় না, তা আমার বন্ধুর বোঝা উচিত ছিল। আর সেই দিল্লী-৬এর প্রতারকেরা চার টাকার জিনিস দিয়ে ৩৬ টাকা লাভ করল। এ রকম আরো আছে। আমরা যখন এম-এ পড়তাম, তখন এক বন্ধু "ফুল আপনার ভাগ্য বলিয়া দিবে" বিজ্ঞাপন দেখে প্রলুব্ধ হয়েছিল। সেখান থেকেও ভি. পি. এসেছিল। সঙ্গে একটি পোস্ট কার্ড, তাতে নানা ভীতি প্রদর্শন ছিল। তবু আমরা তাকে ভি. পি. ছাড়াতে দিইনি বলে সে রক্ষা পেয়েছিল। ইতি

গীতশ্রী

সম্প্রতি ঐ কলেজেরই দর্শনের অধ্যাপিকা শ্রীমতী নিবেদিতা বিশ্বাস আমার কাছে এসেছিল। এ কথা শুনে সে বলল, যে প্রতারিত হয়েছে সে তাদেরই পরিচিত একজন অধ্যাপিকা। সে নাকি বলেছে, আমি আগে ঠকে আর সবাইকে বাঁচিয়ে দিলাম। আমি না ঠকলে আরো অনেকে তো ঠকতে পারত ?

কিন্তু আমার বিশ্বাস, ঐ কথার পরে অনুসন্ধান নিলে দেখা যেত, উক্ত অধ্যাপিকার দৃষ্টান্ত গোপনে গোপনে অনেকেই অনুসরণ করেছে। এবং তাদের প্রত্যেকের জানালার পর্দা হয়েছে ঐ "কাশ্মীরী সিল্কের শাড়ী"তে। প্রতারণার মর্ম বুঝতে পারলে কারো পক্ষে এমন লোভ সামলানো কি সহজ কথা ?

পঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

রবীন্দ্রনাথকে অনেক দিক থেকেই দেখেছি। তাঁর গল্পের ভিতর দিয়ে, কাব্যের ভিতর দিয়ে, গানের ভিতর দিয়ে এবং অন্যান্য নানা রচনা ও চিত্রশিল্পের ভিতর দিয়ে। উপরন্তু তাঁর পদতলে বসে পাঠ গ্রহণ করে, বক্তৃতা শুনে, কণ্ঠ সঙ্গীত শুনে, কাব্য পাঠ শুনে, অভিনয় দেখে, নানা উপলক্ষে তাঁর সান্নিধ্যে এসে, তাঁর ছবি এঁকে, তাঁর ফোটোগ্রাফ তুলে। মনে হয়েছিল যথেষ্ট জানা হল। কিন্তু হঠাৎ গত যুদ্ধের সময় কোনো একটা দিন মৈত্রেয়ী দেবীর লেখা 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' পড়ে বুঝলাম কবিকে জানায় আমার সামান্য কিছু অসম্পূর্ণতা ছিল। যদিও তাঁকে চোখে দেখেছি, অন্তরের পথে দেখেছি, কিন্তু অন্দরের পথে দেখাও যে কবির আর একটি দিকের দেখা, তা এই বই পড়ার পরে তবে উপলব্ধি করেছি। খুবই ভাল লেগেছিল আরো এজন্য যে মৈত্রেয়ী দেবীর মনের ও স্মৃতির দর্পণে রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত ঘরোয়া, ব্যক্তিগত, এই জনতার দৃষ্টি-বহির্ভূত নিভৃত অর্গলমুক্ত কথাগুলো সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। স্মৃতির দর্পণ বলেছি দূরকালের স্মৃতির অর্থে নয়, নিকট কালের প্রায় অব্যবহিত স্মৃতির অর্থে। এক বেলার শোনা কথা আর এক বেলায় রিপোর্ট করতে গেলেও সাধারণ ভাবে কত যে বদল হয়ে যায়, কত বাদ যায়, কত যোগ হয়, এ অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। মৈত্রেয়ী দেবীর লেখাগুলো পড়লে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ ঠিক যেমনটি বলেছিলেন, যে ভাষায় যে ভঙ্গিতে, সব যেন লেখিকার স্মৃতি হুবহু ফিরিয়ে দিয়েছে আমাদের। রবীন্দ্রনাথের কাছে বসে আমরা তাঁর আলাপ যাঁরা শুনেছি, সেই আমরা বুঝতে পারি, যেন কবিকণ্ঠই কানে আসছে এই লেখাগুলোর ভিতর দিয়ে। প্রতিফলনের কথায় দর্পণের কথা মনে আসে, এবং দর্পণ কাঁচ দিয়ে তৈরি। কবির এসব বাক্যধারাকে যদি হীরকের সঙ্গে তুলনা করা যায় তা হলে তো এ উপমা ঠিক হয় যে, লেখিকার মনোদর্পণের কাঁচে কবিকণ্ঠ দাগ কেটে কেটে গেছে —যা মুছে যাবার নয়, ভুলে যাবার নয়। অনেক স্মৃতিকথা আমি নিজেও লিখেছি, নিখুঁত তথ্য পরিবেশন করেছি অনেক, কিন্তু তার প্রায় সবই বর্ণনা,

তার সঙ্গে আমার মনের রং যোগ করেছি মাত্র। কিন্তু এ যে একেবারে স্বতন্ত্র। এ বর্ণনায় অতিরঞ্জন নেই, ভিতরে ভিতরে শুধু শ্রদ্ধাপ্রীতিভালবাসার ফল্গুধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এমন মন দিয়ে না দেখলে কাউকেই যথার্থরূপে দেখা যায় না। সম্পূর্ণ ইনটেলেকচুয়াল দেখা অসম্পূর্ণ দেখা।

এর পর নারীর দৃষ্টিতে দেখা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত বই কয়েকখানা পড়লাম, কবির নানা দিকের অজানা পরিচয় সেগুলিতেও নানা ভাবে আছে, কিন্তু এ বইখানা প্রথমেই আমাকে যে স্বাদ দিয়েছিল, তা অবিস্মরণীয়। এ জন্য মৈত্রেয়ী দেবীর প্রতি আমার গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা। এবং সর্বোপরি বিস্ময়। আজও তা অম্লান।

আগেই বলেছি বুদ্ধি দিয়ে দেখা অসম্পূর্ণ, এ কথা ব্যক্তিগত মানুষ সম্পর্কে যেমন সত্য, কাব্য-বিচারেও তেমনি অনেকখানি সত্য। শ্রদ্ধার সঙ্গে না দেখলে অনেক সত্য অদেখা থেকে যায়। এই শ্রদ্ধাপ্রীতির চোখে দেখাতেই, যাঁরা গল্প লেখেন তাঁরা সাধারণ মানুষকেও শ্রদ্ধেয় এবং ভাল-বাসার যোগ্য করে ফুটিয়ে তুলতে পারেন। কিন্তু সম্ভবত এই কারণেই আমার দেখা রবীন্দ্রনাথকে মৈত্রেয়ী দেবীর দেখার ভিতর দিয়ে নিবিড় রূপে ফুটে উঠতে দেখে আমি লেখিকার প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়ে উঠলাম।

আমার ঐ বইখানা প্রথম পাঠের পরে দূর হিমালয়ের সৌভাগ্যবতীকে যতখানি দূর মনে হয়েছিল, আজও সেই দূরত্ব অক্ষুণ্ণ আছে। মাঝখানে তিনি আমার কাছে একাধিকবার এলেও আমি আর তাঁর কাছে যেতে পারিনি, এবং তিনি একবার গাড়ি পাঠিয়ে দেবেন বলা সত্ত্বেও। তাঁর লেখা অনেকগুলি ছাপলাম, যদিও যতটা যেত নানা কারণে ততটা পত্রস্থ করা সম্ভব হয়নি, এবং যুগান্তরই একমাত্র কাগজ যেখানে তাঁর সেই লেখাগুলি ছাপা সম্ভব হয়েছিল, এবং তিনিও তাই চেয়েছিলেন।

মৈত্রেয়ীর কাছে যাব বলে একবার দিনক্ষণ ঠিক হয়েছিল, কিন্তু এমন একটা কৌতুককর কাণ্ড ঘটল যাতে যাওয়া সম্ভব হল না। অবশ্য যখন ঘটেছিল, তখন তা মোটেই কৌতুককর ছিল না, পরে স্মরণমাত্রে কৌতুকটা উপভোগ করেছি।

আমার তখনকার প্রায় নিত্যসঙ্গী ছোট একখানা গাড়ির মালিক ও চালক বাসব ঠাকুর ও আমি পূর্ব ব্যবস্থামতো মৈত্রেয়ী দেবীর উদ্দেশে রওনা হয়েছি অপরাহ্ণ ৬ টার সময়। তারিখ ২২শে মার্চ ১৯৫৮, শনিবার। শনির

শেষে যাত্রা শুভ নয় অনেককাল ধরে এমন একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে আমাদের দেশে। কিন্তু জীবনে ঐ একটি শনিবারই (সুভো ঠাকুরের ভাইয়ের সঙ্গে, শুভচারীর দিদির উদ্দেশে রওনা হয়ে) সে কথা সত্য মনে করেছিলাম। আমরা লোয়ার সার্কুলার রোড ধরে ১৩।১ পাম অ্যাভিনিউয়ের দিকে চলেছি নিশ্চিন্ত মনে। হঠাৎ মৌলালি ছাড়িয়ে একটু দূরে যেতেই গাড়িটি কাঁপতে কাঁপতে থেমে গেল। রয়্যাল অ্যাকাডেমিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পী গাড়ি থেকে নেমে যন্ত্রবিজ্ঞানী হবার চেষ্টা করল, এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই আবার গাড়ি চলতে আরম্ভও করল। কিন্তু মাত্র দুমিনিট যাবার পর আবার স্তব্ধ। প্রথমে গাড়ি থামার পর সচল হলে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলাম, কিন্তু তখন বুঝলাম হাঁফ ছাড়া ঠিক হয়নি। কারণ এবারে পথের দুচারজন মাণবক-শক্তির সাহায্যে গাড়ি কিছুক্ষণ ঠেলার পর গাড়ি সচল হল। এবারে আর আগের মতো ভুল করে নিশ্চিন্ত হইনি, এবং ঠিকই করেছিলাম, কারণ আরো কিছুদূর গিয়ে গাড়িটি আরো কয়েকটি ছোকরাকে কিছু পাইয়ে দিল ঠেলার জন্য।

অনিচ্ছুক গাড়িকে ঠেলে ঠেলে সচল করায় আমাদেরও সকল ইচ্ছা প্রায় দমিত হয়ে এসেছে তখন। তাই ঠিক হল গাড়ির লক্ষ্য আপাতত পাম অ্যাভিনিউ থেকে সরিয়ে সার্কাস অ্যাভিনিউএর কাছাকাছি কোনো গ্যারাজে নিবদ্ধ করা হোক।

বাসব গাড়ির সঙ্গে থেকে গেল, আমি একা বাড়ি ফিরে এলাম।

১৯৫৮ সনের পর থেকে সেই দূরত্ব আর পার হতে পারিনি। এই প্রসঙ্গে বাসবের গাড়ির কথা নতুন করে মনে পড়ে। ১৯৩৪ সনে তাকে ৮সিলিন্ডার যুক্ত প্রকাণ্ড বুইক-কারের মালিক ও চালকরূপে দেখেছি। দেখেছি, কিন্তু সে গাড়িতে চড়বার সুযোগ হয়নি। সে গাড়িতে অন্তত ৮জন যাত্রীকে সে নরক পর্যন্ত পৌছে দিতে পারত। সে গাড়ি ছিল তার পৈতৃক টাকার। অতএব সে যে ১৯৫৮তে একজন যাত্রীকেও পার্ক স্ট্রীটের কবরখানা পার করে দিতে পারল না, সেটি তার অধঃপতন নয়, বরং সম্পূর্ণ নিজের উপার্জনে কেনা-গাড়ি তার উন্নতিরই পরিচয় বলে মনে হয়েছিল, গাড়ির এনজিন সাময়িকভাবে অচল হওয়া সত্ত্বেও। যাই হোক, 'বৈদ্যবাটি' যাওয়া আর ঘটল না।

কিন্তু বাসবের গাড়ি সেদিন অচল হয়েছিল, এবং আমি বর্তমানে অচল,

কিন্তু তবু সেই সঙ্গে মৈত্রেয়ী দেবীর প্রতি যে বিস্ময় মিশ্রিত শ্রদ্ধা জেগেছিল তাও অচল অবস্থায় আছে। প্রথম ইমপ্রেশন বোধহয় মনের উপর দাগ কাটে বেশি।

কিন্তু আমাদের পরস্পরের সঙ্গে দেখা হওয়ার ব্যাপারের আরো একটা কৌতুককর বিবর্তন আছে। এ দেখা হওয়া মানে আমি তাঁর বাড়িতে অথবা তিনি আমাদের বাড়িতে আসবেন এ ইচ্ছা সাত বছরের চেষ্টাতেও সফল হয়নি। আমি এ বিষয়ে কিছু আভাস দিচ্ছি। একখানি চিঠির অংশ এই—

১৩।১ পাম অ্যাভিনিউ
কলিকাতা-১৯
২৮শে ফেবরুয়ারি ১৯৫৯

শ্রদ্ধাস্পদেষু

......আপনার সঙ্গে একবার দেখা হবার ব্যবস্থা কিছুতেই হল না। এখন কেমন আছেন? সুস্থ থাকলে একবার আসবেন।......

ইতি
মৈত্রেয়ী

আমার পাম অ্যাভিনিউতে যাবার প্রথম চেষ্টার ঠিক একবছর পরে লেখা উপরের চিঠিখানি। এই সময়ের কয়েক বছর পরের একটি ঘটনা: কোনো একটা কারণে দুজনের মধ্যে একটি লেখা সম্পর্কে সামান্য ভুল বোঝার অবকাশ ঘটেছিল। সত্যই অতি সামান্য ব্যাপার। তা এখানে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তাই পরের চিঠিখানার আরম্ভ ও শেষ উদ্ধৃত করছি—কারণ শেষ অংশে আবার দেখা হওয়ার প্রসঙ্গ আছে।

কলিকাতা-১৯
২৫।১।৬৩

পরিমলবাবু,

অনেক ভেবেচিন্তে এই চিঠি লিখছি। কিছুদিন থেকে মনে হচ্ছে যেন আপনি আমার উপর বিরক্ত হয়েছেন।......আগে আমরা টেলিফোনে কত গল্প করতাম। আপনাকে প্রথম দিন থেকে বন্ধুভাবেই নিয়েছি, আমার সমস্ত সমস্যা আলোচনা করেছি......

আশাকরি শরীর ভালো আছে। একদিন আসুন না, যদি বলেন গাড়ি

পাঠিয়ে দিই। আমার বন্ধুসংখ্যা নিতান্তই কম, তার মধ্যে অকারণ কাউকে বিরূপ করতে চাই না। প্রীতি নমস্কার জানবেন।

ইতি

মৈত্রেয়ী দেবী

বলা বাহুল্য এবারেও যাওয়া ঘটে ওঠেনি।

কিন্তু তবু একদিন দেখা ভিড়ের মধ্যে। সুকমল ঘোষ তার বারাসতের বাগানবাড়িতে কয়েক বছর লেখক চিত্রকর সাংবাদিক বন্ধুদের ডেকে নিয়ে খুব খরচ করত। ১৯৬২ ফেব্রুয়ারিতে এই রকম একটি সম্মেলনে মৈত্রেয়ী দেবীর সঙ্গে দেখা হল। আমার হাতে ছিল ৮ মিলিমিটার মুভি ক্যামেরা —রঙীন ফিলম পোরা। ঐখানে অনেকের ছবি তোলা গেল। তারমধ্যে মৈত্রেয়ী দেবীও ছিলেন। পরবর্তী চিঠিখানায় এই ছবির কথার উল্লেখ।—

কলিকাতা-১৯

১১।২।৬৩

সবিনয় নিবেদন,

আপনার চিঠি পেয়ে খুশী হলাম। এ সপ্তাহটি খুব ব্যস্ত আছি, সামনের সপ্তাহে টেলিফোন করে যাব। ছবিটা দেখবার আগ্রহ রয়েছে।···আশাকরি ভালো আছেন।

প্রীতিপূর্ণ নমস্কার জানবেন।

ইতি মৈত্রেয়ী দেবী

এবারে মৈত্রেয়ী দেবীর আসবার ইচ্ছা। কিন্তু তিনি আসতে পারেননি। কৌতুক জমে উঠেছে এইভাবেই। এর সঙ্গে কি অজাযুদ্ধ অথবা ঋষিশ্রাদ্ধের অথবা প্রভাতের মেঘ ডম্বরের তুলনা একেবারেই অচল? আড়ম্বর হয়, কাজে কিছুই হয় না।

মৈত্রেয়ী দেবীর ধারণা হয়েছিল আমি তাঁর উপর কোনো কারণে বিরূপ হয়েছি। তাঁর বোঝা উচিত ছিল 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ'-এর মতো বই যিনি লিখতে পারেন, তাঁর প্রতি বিরূপ হওয়া যায় না। এবং এই আত্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করে, তাঁর যখন মনে হয়েছিল আমি বিরূপ হয়েছি, তখন তাঁর শুধু বলা উচিত ছিল "মংপুতে রবীন্দ্রনাথ বইখানা আর একবার পড়ুন।"

আবার দীর্ঘ সাত বছর পরে এপার ওপারের যোগাযোগ ঘটল পত্রযোগে। বাসব ঠাকুরের গাড়ি ব্যর্থ হলেও নানা আধুনিক বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যেও

পোস্টম্যান সেতু-রচনায় ব্যর্থ হয় না। প্রয়োজনটা আমার দিক থেকে ছিল। পত্রস্মৃতি রচনার সময় বহু জনের সঙ্গে মৈত্রেয়ী দেবীর চিঠিও যে আমার স্মৃতি অধিকার করে আছে একথা জানিয়েছিলাম চিঠিতে। তার উত্তরে তিনি আমাকে যে বড় চিঠিখানা লেখেন, তার অংশ বিশেষ আমি উদ্ধৃত করছি। এবারে ঠিকানা এক—কিন্তু পত্রলেখিকার নতুন এক কর্ম জীবনের পরিচয় বহন করছে তাঁর চিঠির কাগজের শির ঃ

Council for Promotion of Communal Harmony
President—Annada Sankar Ray
General Secretary—Maitreyee Devi
Secretary—Gouri Ayyub
Treasurer—Justice S. A. Masud

13/1 Palm Avenue
Calcutta—19
Phone. 44-3261
বড়দিন [১৯৭০]

শ্রদ্ধেয় পরিমলবাবু,

হঠাৎ আপনার চিঠিখানি পেয়ে যার পর নাই বিস্মিত ও প্রীত হয়েছি। বস্তুত আপনি যে আমাকে মনে রেখেছেন তাই তো আমি জানতাম না।

লেখা আমার তো হয়ই না, যাও বা হয় তা লিট্‌ল ম্যাগাজিনে কারু চোখে পড়ে না।······যাহোক আপনি কি জানেন, আমি একটি দ্বিমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করি? এ পত্রিকার বিষয় প্রধানত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও উভয় বঙ্গের সাংস্কৃতিক ঐক্য নানা ভাবে প্রকাশ করা। পত্রিকাটির নাম 'নবজাতক'—আমি আপনাকে দুএকটি পাঠাচ্ছি। পাকিস্তানে আজ প্রায় সাত বছর বিনামূল্যে এই পত্রিকা পাঠিয়ে আসছি। এখন পশ্চিমবঙ্গে অনেকেরই এ বিষয়ে আগ্রহ জন্মেছে। আপনি যদি মাঝে মাঝে এই ক্ষুদ্র পত্রিকায় কিছু লেখেন সুখী হবো।···

বর্তমানে দেশের সঙ্কট আমাকে বিষম উদ্বিগ্ন করেছে. অথচ পথ তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আপনারা কি ভাবছেন?....

আপনি আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রীতি জানবেন। পত্রিকা পড়ে কি রকম লাগল জানাবেন।

ইতি
মৈত্রেয়ী দেবী

মৈত্রেয়ী দেবীর চরিত্রে একটি দৃঢ়তা ও অনমনীয়তা আছে, যার ফলে তিনি কোনো কাজে নিষ্ঠার সঙ্গে লেগে থাকতে পারেন। এটি চরিত্রের একটি দুর্লভ গুণ। বর্তমানে তাঁর এই মিশনারি কাজের পরিচয় পেয়ে আমার পূর্ব ধারণা আরো দৃঢ় হয়েছে। তিনি যে উদ্দেশ্যে এ কাজে নেমেছেন তার অব্যবহিত

ফল কি হবে জানি না, কিন্তু ধর্মকে বাদ দিয়ে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে মিলনের বড় একটি ক্ষেত্র আছে, তা আবিষ্কারের কাজ একদিনে শেষ হবে না। এবিষয়ে বারট্রাণ্ড রাসেল খাঁটি কথা বলেছেন। তাঁর মতে প্রকৃত সভ্যতায় ধর্মের দরকার হয় না। অর্থাৎ থিওলজিক্যাল ধর্ম। তিনি আশা করেন…"every kind of religious belief will die out. এবং তাঁর এ কথাটাও যুক্তিপূর্ণ: I do not believe that, on the balance, religious belief has been a force for good." এবং তিনি 'একথা জোরের সঙ্গে বলেছেন যে, কোনো সময়ে বা স্থানে ধর্ম কিছু ভাল করেছে, কিন্তু ধর্ম, মানবজাতির যুক্তির পথে এগিয়ে চলার শৈশব-অবস্থার একটি ধাপ। এ অবস্থা এখন আমরা উত্তীর্ণ হয়েছি।"

কিন্তু এতখানি যুক্তি এবং সত্য এদেশের অন্তরে পৌঁছতে হয়তো আরো এক শতক কাটবে। যে যুগে মহামনীষীর মনে এমন কথা জাগে, সেযুগে বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিক ধর্মের নামে প্রতিবৎসর পূজার সংখ্যা বাড়ছে এবং চলার পথ বন্ধ করে ছেলেরা খেলায় মাতছে। এবং চাঁদা আদায়ের নামে গৃহস্থের উপর, বাস যাত্রীর উপর, অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। খুনও হচ্ছে অনেক। ধর্ম নিরপেক্ষতা তবে ঐ নামেই! মুসলমান অথবা খ্রীষ্টানরা যদি ধর্মের নামে প্রতি পথে যত ইচ্ছা প্যাণ্ডাল বাঁধতে থাকে, তখন বলব ওরা বড়ই সাম্প্রদায়িক। এবং তারা যদি ধর্মের নামে জবরদস্তি করে চাঁদা আদায় করতে থাকে, তবে চেঁচিয়ে বলব এদেশে ধর্মের নামে এসব হচ্ছে কি?—এদেশ যে আমাদের সেকিউলার নীতির দেশ! যখন এদেশের প্রত্যেক পূজা প্যাণ্ডালের বক্তা বলেন 'এই পূজা উৎসব বাঙালীর জাতীয় উৎসব', তখন অবশ্যই তাঁর অবচেতন মনে এই ধারণাই থাকে যে, এদেশে মুসলমান খ্রীষ্টান কেউ নেই, শুধু হিন্দু বাঙালী আছে। কিন্তু মুসলমান বক্তা ইদ উপলক্ষে যদি বলেন এ বাঙালীর জাতীয় উৎসব, বাংলাদেশের ঘরে ঘরে এ উৎসব পালিত হয়, তখন ভাবব, ওরা কি অসম্ভব কথা বলে! আবার রেডিওতেও ঠিক ঐরকম হিন্দুদের পূজাকে বাঙালীর জাতীয় উৎসব বলা হয়। মেয়েদের ব্রতকথা প্রচার উপলক্ষে বলা হয় বাঙালীর ঘরে ঘরে এই ব্রত উৎযাপিত হয়, তখন কি একবারও ভাবা হয় যে, তা সত্যই হয় না?

সবাই জানেন এর কোনোটাই ধর্ম নয়, কতগুলি অভ্যাস মাত্র। এবং সে অভ্যাসের চেহারাটা কি তা দেখতে হলে রবীন্দ্রনাথের 'দুরাশা' গল্পটি

আরো একবার পড়া উচিত। এসব ধর্মই নয়। মনুষ্যত্ব ধর্ম যা আসল ধর্ম তার অনুশীলন করা হল কবে? জনকত বিশুদ্ধ যুক্তিবাদী মানুষ সংস্কারমুক্ত মাত্র। সব দেশেই তাই। কিন্তু প্রাচীন সংস্কারকে ক্রমাগত বাড়িয়ে তোলার যে উৎসাহ তা শুধু এদেশের বৈশিষ্ট্য। এমন প্রতিকূল অবস্থায় মৈত্রেয়ী দেবীর এই 'নবজাতক'-উদ্যম অবশ্যই প্রশংসাযোগ্য। বেশ ভাল লাগল এই পত্রিকাখানি।

একটি পুনশ্চ যোগ করি। গত ৪ঠা মার্চ (১৯৭১) তারিখে মৈত্রেয়ী দেবী আমাদের বাড়িতে আসবেন, সমস্ত ঠিক, কিন্তু সকালে ফোন পেলাম—আসা হবে না। ইলেকশনের পরে দিন ঠিক করা হবে। অর্থাৎ ১০ই মার্চের পরে।

পরবর্তী আর একটি ইলেকশন সমাগত প্রায়, এখনো তাঁর আসা হয়নি!

একপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

নীরদচন্দ্র চৌধুরীর একটি জিজ্ঞাসায় শ্রীযুক্তা হেমন্তবালা দেবীর উল্লেখ আছে। রবীন্দ্রনাথের 'চিঠিপত্র' পর্যায়ের ৯ সংখ্যক গ্রন্থে হেমন্তবালা দেবীকে লেখা যে সব চিঠি আছে, তাতে রবীন্দ্রনাথের আপন ধর্ম্মমত এবং তা সাধারণ মানুষের ভক্তিপথ থেকে কি পরিমাণ স্বতন্ত্র, তা যে ভাবে আলোচিত হয়েছে, এমন আর কোনো চিঠি বা রচনায় দেখেছি বলে মনে পড়ে না। এই 'চিঠিপত্র-৯' বিষয়ে নীরদবাবুর সঙ্গে আলোচনা কালে নীরদবাবু হেমন্তবালা দেবীর পরিচয় জানতে চেয়েছিলেন। আমিও এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চেয়ে হেমন্তবালা দেবীর পুত্র সুবিখ্যাত সেতারশিল্পী বিমলাকান্ত রায়চৌধুরীকে চিঠি লিখি। বিমলাকান্ত তার উত্তরে এমন বিরাট এক বংশ তালিকা (দুই জমিদার বংশের) পাঠিয়েছে, যাতে পূর্বাপর সকল পরিচয়ই জানা গিয়েছিল। সে পরিচয় আমিও যতটা সম্ভব এখানে দিচ্ছি বিমলাকান্তের চিঠিসমেত—

৮৬।১।১এ বেলতলা রোড
কলিকাতা ২৬
৪।৫।৬৫

শ্রীচরণেষু,

দাদা, গতরাত্রে চিঠি পেলাম। গুষ্টিসুদ্ধ সম্পূর্ণ পরিচয় দিলাম। এর থেকে আবশ্যক অনাবশ্যক বুঝে আপনি চৌধুরী মহাশয়কে [নীরদচন্দ্র চৌধুরী] জানাবেন। আপনারও বিশদভাবে জানা হয়ে যাবে।...

আমি ও মহারাজকুমার জয়ন্তনাথ [জগদিন্দ্রনাথ রায়ের পৌত্র, যোগীন্দ্রনাথ রায়ের পুত্র] একদিন আপনার কাছে যাব তিনচার দিনের মধ্যেই।...

প্রণত বিমলাকান্ত

আমি বিমলাকান্ত-প্রেরিত বংশ তালিকার অধিকাংশই এখানে দিচ্ছি। —নীরদচন্দ্র চৌধুরী যে অনুমান করেছিলেন হেমন্তবালা দেবী ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর কন্যা, সে অনুমান ঠিক। (এই বংশ তালিকাটি 'চিঠিপত্র-৯'তে ছাপা থাকলে আরো ভাল হত মনে হয়।)

নাটোর বড় তরফ | **ভিতরবন্দ (রংপুর) জমিদার বংশ**

মহারাজা গোবিন্দনাথ রায়

মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়
(শরৎসুন্দরীর ছোট ভাই)
ম. যোগীন্দ্রনাথ রায়
জয়ন্তনাথ রায়

শরৎসুন্দরী + বরদাকান্ত রায়চৌধুরী

রায়বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার
শৈলেন্দ্র
তৃপ্তিলতা + **বিমলাকান্ত**

ভগবতী দেবীচৌধুরাণী
(বড় তরফ)
বরদাকান্ত রায়চৌধুরী
ব্রজেন্দ্রকান্ত + **হেমন্তবালা**

ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
হেমন্তবালা

বাসন্তী বাগচী
(ডাঃ নিখিলচন্দ্র বাগচী
কিশোরকান্ত

পুঃ ভগবতী দেবীচৌধুরাণী সম্পর্কে যুগান্তরে ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন "সেকালের মহিলা জমিদার"।—বিমলাকান্ত

বিমলাকান্ত আমার সঙ্গে পরিচিত ছিল নামে। কিন্তু সম্পাদক-লেখক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়াতে কিছু ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ ঘটল। কারটুন ছবি আঁকা, ফোটোগ্রাফি, সেতার, থেকে আরম্ভ করে সে বহু বিদ্যার অধিকারী। এমনকি আমার সঙ্গে তার চারিত্র্যের অনেকখানি মিল আছে, একথা সে আমাকে এক দীর্ঘ চিঠিতে জানিয়েছিল আমার স্মৃতিচিত্রণ পড়ার পরে। ব্যক্তিগত ভাবে সে তখনও আমার অল্প পরিচিত। আমি সে চিঠির অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি—

86/1/1A Beltala Rd.
Calcutta 26
20.11.64

শ্রীচরণেষু,

দাদা, আপনার বইখানা পড়ে চিঠি লেখবার লোভ সামলাতে পারলুম না। আপনার সম্বন্ধে সত্যি বলতে কিছুই জানতাম না, কিন্তু অকারণ একটা আত্মীয়তা বন্ধনে জড়িত হয়ে পড়েছি। বই খানি পড়ে কারণ খুঁজে পেলুম। আপনার জীবনের সর্ব প্রধান দ্রষ্টব্য দেখলুম যে আপনি versatile, এবং এর অনেকগুলি বিষয়ই আমার মধ্যেও আছে। কিন্তু কিছু অসংস্কৃত অবস্থায়। আপনার বাল্যস্মৃতি আমার বাল্যস্মৃতিকে মনে করিয়ে দিল, শুধু স্থান এবং সামাজিক পরিস্থিতি একটু তফাৎ!

রবি বর্মার ছবি, জলছবি, স্প্রিংএর ছাতা, বিলেতি কাগজ এবং কাপড়ের গন্ধ, ভ্রাম্যমান কলের গান, কুমোরের কারখানা, হাঁড়ি পোড়ানো এবং তার গন্ধ, বাড়ীর তৈরী বহেড়া-হরিতকী-ভিজানো কালো কালি, খাগের ও পালকের কলম, ম্যাপ দেখে জায়গা খোঁজার খেলা, (আজও মনে আছে— ভারতে দুটো এলাহাবাদ, প্রথমটা ইউ-পি, দ্বিতীয়টি পঞ্জাবে, বোধহয় সিন্ধুতীরে)। মামাবাড়ী যাবার সময় সিরাজগঞ্জ জগন্নাথগঞ্জ ঘাটের স্টীমার, মাল্লাদের জলমাপার ধ্বনি, খালাসীদের রান্নার গন্ধ—আপানার বই থেকে মুক্তিলাভ করে আমার নাকে ঢুকছে। মামাবাড়ীর থিয়েটারের ড্রপসিন— শিবাজী ছিল না, একটি বিলেতি Oldmasterএর reproduction ছিল, আর একটি ছিল ওথেলো ও ডেসডিমনা, আর বাঘশিকার…'মুকুল'

পত্রিকা বাবা নিতেন, তাঁর নাম ধাঁধার উত্তরে ছাপা দেখেছি, আমার সময়ে 'সন্দেশ' মাৎ করে রেখেছিল। পঞ্জিকার বিজ্ঞাপন দেখে রবার স্ট্যাম্প, পকেট প্রেস, ৪ কৌটা দাদের মলমে ১২৭ দফা উপহার, মায় সার্জের কোট আমিও আনিয়েছিলাম (বিমলাকান্ত আমার চেয়ে আরো বেশি এগিয়েছিল এদিকে মনে হয়। দাদের মলম বা উপহার আমি আনাইনি।)—কিন্তু সবই ফাঁকি। Intellectual development আপনার মত ছোট বয়সে আমার হয় নি। আমার বোধ হয় ২৫।২৬ বছর বয়স থেকে সুরু হয়েছে। (এইখানে বিমলাকান্তের ভুল হল, আমার ও জিনিসটি অদ্যাবধি হয়নি।)

কিশোরীমোহন চৌধুরী (রাজসাহী) আমাদেরও খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। চোখ আঁকা রামদা, হুঁকোদানি (এর একটা বিশেষ নাম আছে, ভুলে গেছি), সাইকেল, পাল্কী চড়ে বা ছাতা মাথায় সামনে দিয়ে যাওয়াতে বাধা, আমারও দেখা আছে। আপনার মত এখানে সেখানে যাতায়াতে আমার একেবারেই সাহস বা সাধ্য ছিল না—আপনি একা কলকাতা এসেছেন, আমি কল্পনাও করতে পারতুম না। রাজনীতির সঙ্গে চিরকাল খারাপ সম্পর্ক ছিল। আমরা ছিলুম ব্রিটিশরাজের বশংবদ। যখন কালুখালিতে অ্যানডারসনের ট্রেনের নিচে বোমা ফাটছে, তখন আমি মৈমনসিংহের জমিদার সভার সেক্রেটারি হিসেবে অ্যানডারসনের সঙ্গে করমর্দন করে চা পানে আপ্যায়িত হচ্ছি। যতীন মৈত্র (চোখ) বাবার বন্ধু, আমারও চোখ দেখতেন বিনা পয়সায়। ওঁর ছেলে রবীন্দ্র আমার প্রেসিডেনসি কলেজের সহপাঠী। (আর একটি মেয়ের সঙ্গে রাজেশ্বর মিত্রের বিয়ে হয়েছে।)

শিশিরকুমার ভাদুড়ি বাবার সহপাঠী বন্ধু—তাঁর থিয়েটারের openingএ আমাদের বাড়ীসুদ্ধ ঢালা পাস থাকতো।···দারজিলিঙ প্রথম দর্শনের অভিজ্ঞতা এবং মনের ওপর তার প্রতিক্রিয়া অবিকল আপনার মত আমারও হয়েছিল। ···ওষুধ সম্বন্ধে আগ্রহ আপনার মত আমারও। অনেক বই ঘাঁটাঘাঁটি করেছি, স্টেথোসকোপ ছিল, ইনজেকশন সিরিঞ্জ কিনেছিলাম। ···ম্যাজিক সম্বন্ধে আমার আগ্রহ আপনার মতই আরম্ভ হয়, তবে একটু গভীর ভাবে। 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতার reaction বোধ হয় সবার পক্ষেই একরকম। মেট্রোপলিটানের সারদারঞ্জন রায় আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। টাউন ক্লাবে হাতে ধরে আমাকে ব্যাটধরা শিখিয়েছিলেন। আমার বয়স

তখন ১৪ বছর। ক্ষীরোদ গুপ্তকে দেখিনি। তবে তাঁর পুত্র রবীন গুপ্তকে খোকাদা বলতাম। মেয়েকে আজও 'বাচ্চা মাসিমা' বলি।

রবীন গুপ্তের ফোটোগ্রাফি স্টুডিও ছিল দারজিলিং ম্যাকেনজি রোডে Robin Studio। টাইফয়েডে মারা যায়। চারু সান্যাল আমাদের বাড়ীর স্থায়ী চিকিৎসক, দূর সম্পর্কের আত্মীয়তাও ছিল। বাডীতে এলে উচ্চ হাসিতে পাড়া মুখরিত হত। গলাবন্ধ কোট-প্যান্ট, ছাই রঙের সেকেলে রেনো গাড়ী···চেহারা দেখলেই রোগীরা ভাল হয়ে যেতো।···

১৯২৪ সনে কার্তিক বোসের ল্যাবরেটরি থেকে ২৫ টাকা দিয়ে Vest Pocket Kodak কিনলাম। ডীলার ভদ্রলোকের নাম ভূপেন্দ্র বসু মনে হয়। পরে 3-A Kodak, জার্মান Certo (9×12 cm), Contax—কিনলাম, বেচলাম। কোয়ার্টার সাইজ কোডাক আমার দেরাজে আজও আছে। হাউটন বুচারের ক্যাটালগ আমারও নিত্য সঙ্গী ছিল। স্যাণ্ডার-সন ক্যামেরা কেনবার লোভ শিশুকাল থেকে আজও অটুট। খোকাদার ছিল স্যাণ্ডারসন। আমি আবার সিনেম্যাটোগ্রাফের বই এবং অনেক পরে Pathe Baby কিনে বেচেছি। ··সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়কে চিনে-ছিলাম তাঁর হিন্দুস্থানে চাকরি করবার সময়ে। তাঁর দৌহিত্র আজ আমার সেতারের শিষ্য। আমিও ছবি আঁকি অশিক্ষিত পটুত্বে, বর্তমানে·· তেলরঙা আরম্ভ করেছি। সাইজ বোধহয় ২ × ২½ ফুট। চরকা আমাদের বাড়ীতেও ঢুকেছিল চারপাঁচটা, মা কাটতেন, আমিও কেটেছি একখানা কাপড়ের সুতো। প্ল্যানচেট ও টেবিল ধরা আমার মা বাড়িতে প্রচলন করেন, আমিও টেবিল প্ল্যানচেট ধরেছি। পিটম্যান পদ্ধতিতে শর্টহ্যাণ্ড শেখার চেষ্টা করে ছেড়ে দিয়েছি। আপাতত উর্দু শিখছি।

···দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীকে প্রথম দেখি বংশীবাদক আর্টিস্ট হিসেবে অতি প্রিয়দর্শন—কুস্তি করেন। আজ তাঁর চেহারায় আর্টিস্টের লক্ষণের চাইতে বাঘভালুক শিকারীর লক্ষণ অধিকতর পরিস্ফুট, সাংঘাতিক পালো-য়ানের চেহারা। কার অ্যাণ্ড মহলানবিশ থেকে আমরা রেকর্ড কিনতাম। ···রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটে আপনারা যেতেন শেষের অংশে, আমরা থাকতুম রাস্তার সামনের অংশে আপনাদের টানা রোয়াকে বসে আড্ডা দিতুম। হেমন্ত চাটুজ্জে শনিবারের চিঠির রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটের বাড়িতে অনেকদিন ছিলেন—হিমুদা বলতাম। নিখিলচন্দ্র দাস আমাকে সম্পূর্ণই মুগ্ধ করেছেন



বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী

ফোটো : পরিমল গোস্বামী ১৯৭১

আপনার লেখার মাধ্যমে।—এরকম চরিত্র দেখিওনি, ভাবিওনি। তবে তাঁর হাসির কথা শুনে আমিও হাসতে হাসতে ধরাশায়ী হলাম।

বইখানা পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল যেন আমিই লিখেছি কতকগুলো জায়গা। ...আমার জীবনের সঙ্গে এত মিল যে অবাক হই। 'চিঠিপত্র-৯' -এর বাদ দেওয়া অংশগুলো লিখে পাঠালাম। আপনার বইতে (চিঠি-পত্র-৯তে) লিখে নেবেন। প্রণাম জানবেন।

প্রণত: বিমলাকান্ত

আমার স্মৃতিচিত্রণে আমার বাল্যকালের স্মৃতি পড়ে বিমলাকান্তের বাল্যস্মৃতি জেগেছে। দুইই প্রায় সমান্তবাল। আবার বিমলাকান্তের এই চিঠি পড়ার পর আমারও আবার সব মনে পড়ে গেল। ঐ জীবনটা ভাবতে বেশ ভাল লাগে।

ইতিমধ্যে আমি বিমলাকান্তকে সঙ্গীত বিষয়ে সাধারণের কাজে লাগে এমন একখানি জীবনী কোষ লেখার ইঙ্গিত দিয়েছিলাম। এজাতীয় বই সাংবাদিকদের খুব কাজে লাগে। বাঙালী সাহিত্যিকদের জীবনী কোষও নেই। ইংরেজীতে বাবোতেবো লাইনেব সাহিত্যিক বিজ্ঞানী প্রভৃতির কোষ আছে, Biographical Dictionary নামে। আমাদের দেশে তার শুধু অভাব আছে। বাংলায় সাহিত্যিকদের পৃথক জীবনী কোষ চমৎকার হতে পারে। বিজ্ঞানীদেব অথবা সঙ্গীত শিল্পীদেব বা আরো অনেক বিভাগের কৃতীদের হতে পারে। ভাষা কতখানি সমৃদ্ধ হল এতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিমলাকান্ত সঙ্গীতবিষয়ে আলোচনা ও গবেষণা করছে, অতএব আমার মনে হয়েছিল তাব পক্ষে এ কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। এ বিষয়ে তার দিক থেকে যে সব অসুবিধা আছে তা জানিয়ে আমাকে লিখল—

৭ নন্দন রোড, কলিকাতা-২৫

১৯।১১।৬৬

শ্রীচরণেষু,

দাদা,...আপনি যে কাজের ভার আমাকে দিতে চাইছেন, অর্থাৎ সঙ্গীত-শিল্পী, রচয়িতা, সুরকার, সঙ্গতকার — সবারই কয়েক লাইন জীবনী ও পরিচয় সম্বলিত বই লেখা—সে কাজ কি একা আমার দ্বারা সম্ভব হবে? এবং এ কাজে বেশ অর্থের প্রয়োজন, গভর্নমেণ্ট যদি আর্থিক সাহায্য করে

তবেই সম্ভব। এবং এর জন্যে কয়েক জন লোকও রাখতে হবে। তবু বাংলা দেশেই বোধ হয় হাজার কয়েক নাম বেরোবে। তথা সংগ্রহ করা, খুবই কষ্টকর হবে। এবং তা edit করা অর্থাৎ অবান্তর ছাঁটাই করা, আরও কঠিন। আমারও এচিন্তা অনেক দিন আগে একবার এসেছিল, হাতও দিয়েছিলাম, কিন্তু দুতিনটি জীবনী পেলাম। এক একখানা ৮।১০ পৃষ্ঠা করে। ...একটা বোর্ড যদি করা সম্ভব হয় তবে আমি চার পাঁচ ঘণ্টা করে খাটতে প্রস্তুত আছি। ...আপনার suggestion সম্বন্ধে চিন্তা করে দেখবো। এরকম বই বিশেষ প্রয়োজনীয়। আমার ইচ্ছে ছিল গ্রামোফোন রেকর্ডের শিল্পীদের নিয়ে এ রকম বই করা, কিন্তু হল না।...

স্নেহধন্য বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী

বিমলাকান্ত ১৯৬৮ সনের ৩০শে মে থেকে ১৯৬৯ সনের ২৬শে জানুয়ারি পর্যন্ত প্রায় আট মাসকাল জারমানি ফ্রান্স ও বেলজিয়ামে অবস্থান করে সেতার বাজিয়ে গুণীজনদের কাছে বিশেষ প্রশংসা পেয়েছে। ভ্রমণ ও প্রোগ্রাম তালিকা দীর্ঘ, মোট ৩০টি বৈঠকে বসেছে এবং প্রত্যেকটি বৈঠকেই সঙ্গীত-প্রিয়দের উপস্থিতি এবং গুণগ্রহণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ডুয়েজেলডরফ-এ টেলিভিজন-এও উপস্থিত হয়েছে। নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে. অথবা গুনীজনের বাড়িতে কয়েকটি বৈঠক বসেছে তাকে নিয়ে। এসব দেখেছি তার মুদ্রিত সচিত্র ব্রোশারে।. দেখে বিশেষ আনন্দ লাভ করেছি।

২৪শে এপ্রিল (১৯৭১) কাগজে পড়লাম "বিমলকুমার রায়চৌধুরী" তাঁর ভারতীয় সঙ্গীত কোষের জন্য সঙ্গীত নাটক আকাদামি থেকে ৫০০০ টাকা পুরস্কার পেয়েছেন। পূর্বদিন রেডিওতে বলা হয়েছিল "বিমল রায়চৌধুরী," এবং পরে ইংরেজী কাগজে দেখেছি Bimal K Raychaudhuri। ভারতীয় সঙ্গীতকোষ বইখানা বিমলাকান্ত আমাকে ৫।১০।৬৫ তারিখে উপহার দিয়েছিল, তাই বইখানা জানা ছিল। নইলে রেডিওর খবরে অথবা খবরের কাগজে ছাপা নাম দেখে বুঝতেই পারতাম না লোকটি কে। এর বিরুদ্ধে গ্রন্থকার প্রতিবাদ জানায়নি। বিমল রায়চৌধুরীর প্রতিবাদ জানানো উচিত ছিল। কিন্তু সেও নীরব। সংশোধন করা হয় নি তাই, আর সে জন্য নামের ভুলটা, ভুল আকারেই প্রচারিত হয়ে গেল।

আমি ২৫শে এপ্রিল বিমলাকান্তকে অভিনন্দন জানিয়ে পরে লিখি—সরকার থেকে তোমার নাম বদল করে দিয়েছে, না তুমি নিজে করিয়েছ

ইচ্ছে করে? ভাবলাম বাড়ি বদল করেছে, অতএব কলকাতা করপোরেশনের অনুকরণে নাম বদলের ইচ্ছা হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু বিমলাকান্ত নাম বদল বিষয়ে কোনো কথার জবাব না দিয়ে যা লিখল তা এই—

৭, নন্দন স্ট্রীট

৩০।৪।৭১

শ্রীচরণেষু,

দাদা, আপনার চিঠি পেয়ে আপ্লুত হলাম এবং কৃতজ্ঞতার সঙ্গে অভিনন্দন গ্রহণ করলাম।

আপনার অনুগ্রহেই যুগান্তর সাময়িকীতে আমার অনেক লেখা বেরিয়েছিল সুতরাং সে কৃতজ্ঞতা চিরস্থায়ী।···

দুখানা মোটা মোটা বই ইংরেজীতে লিখেছি—The Dictionary of North Indian Classical Music (বাংলা সঙ্গীত কোষের ইংরেজী)। ও The Grammar of North Indian Ragas, এতে ১০০ রাগের বিশদ বিশ্লেষণ আছে।

তাছাড়া একটি বই লেখা হয়ে গেছে—Musical Reminiscences and Two Essays: Aesthetics and the Component Parts of Ragas.

তিনখানা বই একজন আমেরিকান মহিলা খুব খেটে এডিট করছেন দেড় বছর যাবৎ। বইগুলি বেরোলে আবার পশ্চিম থেকে ডাক পড়বে।···

ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্যের মৃত্যু সময়োচিত হলেও শোকাপ্লুত হয়েছিলাম—আমার একজন অকৃত্রিম শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। প্রণাম নেবেন (নববর্ষেরও)।

ইতি—

প্রণত, বিমলাকান্ত

বিমলাকান্তের বহু গুণ, কিন্তু সে সবের উপরে তার বিনীত আচরণ এবং সৌজন্য আমাকে মুগ্ধ করেছে। —অভিজাত বংশের ছেলের কাছে এটাই প্রত্যাশিত। এই চিঠিখানায় সে ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখ করেছে। ত্রৈলোক্যনাথ আমার পিতার বন্ধু ছিলেন। তিনিও সমস্ত জীবন শিক্ষা বিভাগে যোগ্যতার সঙ্গে সুনামের সঙ্গে কাজ করেছেন। খুব

জনপ্রিয় ছিলেন, ছোটবড় সবাইকে সমান ভাবে ভালবাসতেন। তাঁর স্মৃতি কথা একখানা চমৎকার বই। দীর্ঘকাল তিনি রাজবাড়ি রাজা সূর্যকুমার ইনস্টিট্যুশনের হেডমাস্টার ছিলেন। তাঁর সুযোগ্য ছাত্র সন্তোষকুমার ঘোষ ঐ বইতে তার এক রচনায় ত্রৈলোক্যনাথের প্রতি তার শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে, আমিও করেছি। বইখানা নবগ্রন্থনা, ৮ কৈলাস বসু স্ট্রীট থেকে অল্পদিন হল প্রকাশিত হয়েছে।

বিশ্বভারতী-প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠিপত্র-৯ বইখানি আমাকে বিমলাকান্ত প্রসঙ্গে কয়েকবার উল্লেখ করতে হয়েছে। ঐ বইয়ের অধিকাংশ চিঠিই বিমলাকান্তের মা হেমন্তবালা দেবীকে লেখা। মোট সংখ্যা ২৬৪। বিমলাকান্তকে লেখা ১২ খানা চিঠি আছে। বাসন্তী দেবী ও নিখিলচন্দ্র বাগচীকে লেখা (বংশ তালিকা দ্রষ্টব্য) ও অন্যান্য অনেক চিঠি আছে। হেমন্তবালা দেবীর সঙ্গে কবির প্রথম পরিচয় বেশ মজার।

বিমলাকান্তের প্রথমে উদ্ধৃত ৪।৫।৬৫ তারিখের চিঠির শেষে লেখা আছে 'আমি ও মহারাজকুমার জয়ন্তনাথ একদিন আপনার কাছে যাব তিনচার দিনের মধ্যেই।' —সে প্রতিশ্রুতি সে পালন করেছিল। আমিও জয়ন্তনাথকে সিকি শতাব্দি পরে দেখে খুশি হযেছিলাম। প্রমথ চৌধুরী যখন 'অলকা' মাসিক সম্পাদনা করেন সেই সময় জয়ন্তনাথ প্রায় রোজ আসতেন অলকায়। লিখতেনও ঐ মাসিকে। ১৯৬৫ সনের ২০শে এপ্রিল বিমলাকান্তের সঙ্গে তিনি এসেছিলেন।

যে মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের পৌত্র জয়ন্তনাথ, সেই জগদিন্দ্রনাথের ভগ্নী শরৎসুন্দরীকে বিবাহ করেন বরদাকান্ত চৌধুরী, (পুত্রবধূ হেমন্তবালা দেবী)— এঁদের পৌত্র বিমলাকান্ত। অতএব জয়ন্তনাথের সঙ্গে বিমলাকান্তের আত্মীয়তা-বন্ধন স্বভাবতই—(যদিও পরস্পরের কি সম্পর্ক তা আমার গণনা-শক্তির বাইরে।) কিন্তু আমার সঙ্গে এদের সম্পর্ক শুধু "এক ক্ল্যান" বলে। —এই কথাটি প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাতের দিনই তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন (১৯৩৯)। আমাকে বলেছিলেন, এক ক্ল্যান তো? অর্থাৎ বারেন্দ্র কিনা।

জয়ন্তনাথ তাঁর পারিবারিক সৌজন্য বজায় রেখে আমাকে লিখলেন— (ইংরেজী ২৩শে এপ্রিল ১৯৬৫)—

6, Lansdowne Road
Calcutta
১০ই বৈশাখ ১৩৭২

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

সে দিন সকালে একটি আনন্দময় প্রশান্ত মন নিয়ে আপনার বাড়ী থেকে ফিরে এসেছি। কি ভালোই যে লাগলো আপনার সান্নিধ্যে এতো দিন পরে। কোথায় সেই "অলকা-যুগ" আর কোথায় আজকের দিন। কি দুস্তর ব্যবধান। অলকাকে যুগ বলে হয় তো অন্যায় করিনি—(যে-যুগে মধ্যমণি থাকতেন নদাদা অর্থাৎ প্রমথ চৌধুরী এবং তাঁর চার পাশ ঘিরে আমি আপনি এবং আরো অনেকে।) [অলকা যুগ বলা অন্যায় হয়েছে বৈ কি। অলকাপুরী বললে ঠিক হত।]

স্মৃতিচিত্রণ এবং দ্বিতীয় স্মৃতি দুটোই কিনেছি। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের লেখা "বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও শিশিরকুমার" কোথায় কিনতে পাবো বলতে পারেন? ...শ্রীমতী হৈমন্তীকেও (আমার পৌত্রী, তখন বয়স ঠিক দুবছর) এই সঙ্গে একটা চিঠি দেব ভাবছিলাম কিন্তু আমার ভাষা এবং অক্ষর এ দুটোর একটাও ওর মনঃপূত হবে না ভেবে সেই ইচ্ছা আপাতত চাপা দিয়ে রাখলাম। বছর কয়েক বাদে চেষ্টা করা যাবে।...

ইতি

স্নেহাকাঙ্ক্ষী শ্রী[illegible]নাথ রায়

চিঠিখানার ভাষাকৌশলে সন্দেহ থাকে না, পত্র লেখক উত্তরাধিকার সূত্রে (মেণ্ডেল সূত্র অনুযায়ী) প্রকৃত রসস্রষ্টা হতে পেরেছেন।

দ্বিপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

রায় বাগান স্ট্রীটের বিখ্যাত বসু পরিবারের, বিদ্যাসাগর কলেজের পূর্বতন সেক্রেটারি সুধীরকুমার বসুর পুত্র পুলক বসু। পুলক, আমার পুত্র হিমানীশের ক্লাসমেট। দুজনে ১৯৫২তে লণ্ডন যাত্রা করল।

পুলকের ছোট বোন অমিতা। সেও স্বামীসহ ১৯৫৯তে রুমানিয়ার প্রধান শহর বুখারেস্টে যাত্রা করল। এবং দুবছর সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে রুমানিয়ার ভাষা শিক্ষা শেষ করে দেশে ফিরে এলো ১৯৬১ তে। পুনরায় বুখারেস্ট যাত্রা ১৯৬৭তে সরকারী নিমন্ত্রণ পেয়ে।

এই সময় সে আমাকে অনেকগুলি চিঠি লিখেছিল ওখানকার পরিবেশের কথা ও অন্যান্য নানা কথা জানিয়ে। তার চিঠি যে পরে আমার পত্রস্মৃতিতে স্থান পাবে এ কথা সে, আমার পত্রস্মৃতি লেখার কল্পনাও যখন আসেনি, তখন হয় তো মনে মনে কোনো অলৌকিক শক্তিতে বুঝতে পেরেছিল। আর সেজন্য তার প্রত্যেকখানা চিঠিই বেশ দীর্ঘ এবং সযত্নরচিত।

মনে হয় লেখিকা হবার মনোভাব নিয়েই সে জন্মেছে। অনেক বই সে রুমনিয়ার ভাষা থেকে অনুবাদ করেছে। তার দ্বিতীয়বারের ভ্রমণ কাহিনীও পুস্তকাকারে ([illegible]নার বাইরে, জেনারেল প্রিন্টার্স) বেরিয়েছে।

কিন্তু এসব কথা অবান্তর। তার চিঠিগুলি নিজস্ব মূল্যেই চিত্তাকর্ষক। বিদেশে গেলে তুলনায় দেশের দুর্দশার কথাটা মনে পড়ে, যাদের দেশের প্রতি মমত্ব আছে। এর আগে অমিয়া চৌধুরাণীর চিঠিতেও তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। অমিতার চিঠিতেও সেই একই বেদনা ও ক্ষোভ মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করেছে।

Hotel Arges
Pitesti
20-8-67

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

…মস্কোয় এক রাত্রি থেকে বুখারেস্টে এসে পৌঁছেছি। ভিসা না থাকায় মস্কো বিমানবন্দর থেকে বাইরে যেতে পারিনি। ওর ভেতরেই একটা বনে পদচারণা করে রাশিয়ার মাটির স্পর্শ লাভ করলুম।

বুখারেস্টে···রাজাদের হাল এখন খুব খারাপ। বুখারেস্ট থেকে বেরিয়ে এক পাহাড়ী শহরে এসে দুদিন ছিলাম। জায়গাটার নাম আগে ছিল ব্রাশোভ—পরে হয় স্তালিন নগর। তারপরে আবার এখন ব্রাশোভে পরিণত হয়েছে।

এখন অন্য পথে বুখারেস্টে ফিরছি, রাত্রিবাস করছি আধাশহর একটা জায়গায়—যেন নব-আলিপুর। তা বলে মনে করবেন না আমাদের গ্রামের সঙ্গে নব-আলিপুরের যতখানি তফাৎ, এখানকার সঙ্গে বুখারেস্টের তফাৎও ততখানি। আধাশহর অর্থে রাস্তায় গাড়ি একটু কম চলে, এবং লোকজনের জামাকাপড় চুলকাটার স্টাইলটা একটু সেকেলে।

যাই হোক, কাল সন্ধ্যায় বুখারেস্টে ফিরছি। রবীন্দ্রনাথ যে হোটেলে ছিলেন এবং তারপর অনেক ভদ্রলোক, চোর-জোচ্চোর ও স্মাগলারও যে হোটেলে থেকেছে ও থাকছে, সেখানে ফিরছি। ২৩শে অগস্ট রুমানিয়ার গণতন্ত্র দিবস। সেদিন রাজধানীতে থেকে উৎসব দেখব। তারপর সমুদ্র-তীরে [কৃষ্ণসাগর] ভ্রমণ করে আবার বুখারেস্টে ফিরব ২৮শে। তারপর মস্কোর পথে দেশের দিকে।

আবার চাল নেই, চিনি নেই, ময়দা নেই, মাছ নেই, শুনতে কলকাতায় ফিরব ২রা-৩রা সেপটেমবার। এ কদিন বেশ আরামে আছি। অতিথি বলে নয়, সাধারণ লোকেরও মুখে নেই নেই শুনি না. রাস্তায় সবাই হাসি-মুখে চলেফিরে বেড়াচ্ছে এমন দৃশ্য কতদিন দেখিনি। চায়ের সঙ্গে চিনির কিউব দেয়—সবটা না খেলে ফেলে দেয়, দেখলেও কষ্ট হয়। কলকাতায় এতটুকু চিনির জন্যে মাথা খুঁড়তে হয়।···

যে-কোনো রেস্তোরাঁয় খেতে গেলে এত খাবার দেয় যে, খেতে পারা যায় না। দুপুরে দুপদ খাবার খেলে রাত্রে আর খাবার প্রশ্ন ওঠে না। এক -পদ খেলে কোন রকমে হয়ত রাত্রে একটুকরো পাঁউরুটি খাওয়া যায়। খাদ্য-দ্রব্য শস্তা নয় অবশ্য—এক কে-জি কালো রুটির দাম দুই লেই—প্রায় দুটাকার সমান। কিন্তু সবচেয়ে কম মাইনে পায় ঝাড়ুদার—মাসে ৭০০ লেই।

এক কে-জি রুটিতে সারা পরিবারের খাওয়া হয়ে যায়। রুটির নিজস্ব দোকান আছে। সেখানে তাকের ওপর জানলার ধারে স্তরে স্তরে সাজানো নানা ধরনের নানা বর্ণের রুটি। পথ চলতে দেখি আর ভাবি—হে মোর দুর্ভাগা দেশ!···

দেশটার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য খুবই বৈচিত্র্যময়। পাহাড়পর্বতে গাড়ি করে অনেক ঘুরলাম। অনেক মিউজীয়াম, প্রাচীনকালের দুর্গ দেখলাম, কিন্তু যে যাদুমন্ত্রে অন্নবস্ত্র সুরক্ষিত করছে এরা, সেটা দেখেই অবাক হয়ে যাচ্ছি। না, প্রচার নয়। ওসব স্টালিনী স্টাইল আজকাল বরবাদ হয়ে গেছে। সংখ্যাতত্ত্বের হিসাব কিছু কিছু পাচ্ছি। আর চোখে দেখছি। আর বারবার মনে পড়ছে আমাদেব গ্রামগুলোর কথা।

কাল একটা যৌথখামাবে গিয়েছিলাম। শুনলাম আজকাল নাকি চাষীরা মোটরগাড়ী করে শহরের বাজাবে শাক মাছ নিয়ে যায। গ্রামে নাকি ঘরে ঘরে টেলিভিসন বেফ্রিজাবেটর। দেখা হয় নি, জানি না। কিন্তু গ্রামের পথ অ্যাসফাল্ট বাঁধানো, দোকানে কাঁচের জানালা। বাড়িঘব বাইরে থেকে দেখে মফঃসল শহবেব শৌখিন লোকেব বাড়ি বলে মনে হয। জানলায় যে লেসের পর্দা ঝোলে তা কলকাতায আমাব কেনবার সামর্থ্য নেই।

আবও একটা আশ্চর্য বস্তু দেখলাম, যা আমাদের দেশে হযত কখনোই সম্ভব হবে না। লেখকদেব এখানে অসাধারণ সম্মান। লেখক সমিতিব সভাপতি জাহারিয়া স্তানকু একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক। ওঁর একটা উপন্যাস আমি অনুবাদ কবেছি, সেই সূত্রে ওঁব সঙ্গে দেখা কবেছিলাম। তারপর দিন উনি আমাকে দুপুরে খেতে নিমন্ত্রণ করলেন, বুখাবেস্ট থেকে একটু দূরে বনের মধ্যে একটা বেস্তোরাঁয়। সেখানে একজন রুশ সাহিত্যিক ও তাঁর স্ত্রী ছিলেন। মন্ত্রী মহোদয় লেখকদেব কাছে সম্মানে শ্রদ্ধায় প্রায় অবনত হয়ে ছিলেন। স্তানকুব স্ত্রী মাতৃসুলভ স্নেহে মন্ত্রীমহোদযেব গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন, এসো বাবা বসো। কতদিন দেখিনি। বাড়িতে ছেলেপুলে ভাল তো? দেখেশুনে চোখকান জুড়িয়ে গেল। আমাদের লেখকেরা যে কবে পুরস্কারেব লোভে পাত্রমিত্রদের খোশামোদ করা ছাড়বেন।

এতক্ষণ রুমানিয়ার প্রশংসা করার পরে একটু আত্মপ্রশংসা করা যাক। স্তানকু প্রমুখ সবাই যখন আমাব রুমানিয়ান ভাষা জ্ঞানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠছিলেন, তখন সহমন্ত্রী বললেন, "উনি যখন বুখারেস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন, সেই সময় আমি ডীন ছিলাম, সেজন্য গর্ববোধ করছি।" তারপর ফিরে এসে মাথাঘোরার ওষুধ খেলাম।

অমিতা রায়

ভিলা নারচিসা, এফোরিয়ে
রুমানিয়া
২৪-৮-১৯৬৭

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

দুদিন বুখারেস্টে বাস করে আবার পালিয়ে এসেছি। সেবার ছিলুম পাহাড়ে, এবার এসেছি সমুদ্রে। পাহাড়ে যাবার রাস্তাটা ভারি সুন্দর ছিল, এবারকার রাস্তা সমতল মাঠের মধ্যে দিয়ে। বৈচিত্র্য কম। কিন্তু গাড়ি-করে ড্যানিয়ুব নদী—এরা যে নদীকে মিষ্টিস্বরে বলে দুনাবেয়া—পেরোবার জন্যে ফেরি নৌকায় ওঠার আগে একটা আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হল। নৌকাঘাটের পাশে একটা ছোট্ট রেস্তোরাঁ আছে, সেখানে একটা মাত্র খাবার পাওয়া যায়। কি জানেন? মাছ। টাটকা ভাজা মিঠে জলের মাছ। খেয়ে মনে হল এমন জিনিষ ছোটবেলায় খেয়েছি বটে। আপনার সেই গল্প [যাদুঘর] অনুযায়ী যখন ভবিষ্যৎ বাংলা দেশে যাদুঘরে মাছের মডেল বানাবার জন্য গবেষণা চালান হবে তখন যদি গবেষকেরা একবার রুমানিয়া ঘুরে যায়! এখানে মোটাসোটা কয়েকটি বেরালকেও ঘুরতে দেখলাম, ঠিক যেন বিস্মৃত বাংলা দেশ। যাকগে, এসব শুনে আবার আপনার মন খারাপ হবে অতএব অন্য প্রসঙ্গে যাওয়া যাক।

যে বাড়িটায় এখন আছি, এর নাম নারচিসা (অর্থাৎ নারসিসাস, যে নাম আমাদের পরিচিত)। এঁরা আমার জন্য একটি পুরো অ্যাপার্টমেন্ট রেখেছেন, আমার সঙ্গিনী শ্রীমতী প্লেশা আছেন অন্য একটা বাড়িতে। শোবার ঘর, রান্নাঘর, বসবার ঘর, স্নানের ঘর, সব আছে। সব সাজানো-গোছানো—রেডিও রেফ্রিজারেটরসুদ্ধ আছে। টেবিলের উপর টাটকা গোলাপফুল পর্যন্ত। আমাদের গাড়ির ড্রাইভার ঘরে সুটকেসটা দিয়ে যেতে এসেছিল, বললে, "বাঃ! এখানকার রেডিওটা খুব ভাল তো! আমার বাড়িতেও ঠিক এই রেডিও আছে।"

৯ ভালভের বিরাট রেডিও সাধারণ ড্রাইভারের বাড়িতে, কি আর বলব! এখানে কিন্তু দরজায় একটা মাত্রই গা-চাবি। শোবার ঘরের পাশে বারান্দার রেলিং ডিঙিয়ে যে-কোন লোক উঠতে পারে। অথচ তার মধ্যে একটামাত্র কাঁচের দরজা, সেখানেও শুধু ঐ গা-চাবি। এ বাড়িতে এমনি চারটে অ্যাপার্টমেন্ট আছে। কিন্তু এই যে রাত্রে শার্সির দরজার উপর থেকে মোটা

ভেলভেটের পর্দা সরিয়ে বসে বসে চিঠি লিখছি, একটুও ভয় করছে না। চোরেরও না, ভূতেরও না। এত দামী দামী জিনিসই যখন চুরি যায় না, তখন আমার আর ভয় কি?

এখানে আসবাবপত্রের ভীষণ দাম। ছোট্ট লেসের টেবল-ক্লথটারই দাম হবে টাকা পঞ্চাশ। এ সব দেশ থেকে—এরা ভূত মানে না বলে—বছরে কত হাজার মৃতের আত্মা হয় চালান হয়ে যাচ্ছে, আর না হয় শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। কিংবা এদের পুনর্জন্ম হচ্ছে ভূত-মানা দেশে।

আমার ঘরটা একতলায়। সমুদ্রের জলো হাওয়ার হাত থেকে বাড়িটা বাঁচাবার জন্য সামনে একসারি ঘনপাতার গাছ লাগানো আছে, তাই সমুদ্র দেখতে পাচ্ছি না ঘর থেকে। সমুদ্র অবশ্য অনেক নিচে। এ জন্য মাঝে-মাঝে সিঁড়ি-দেওয়া তিনতলা ব্যালকনি আছে বীচের উপরে।

এদেশের বেশির ভাগ লোক কিন্তু সমুদ্রের চেয়ে পাহাড় বেশি ভালবাসে। পাহাড়ও এখানে বড় সুন্দর। সুইজারল্যাণ্ডের আল্‌প পর্বতমালা শীতের তুষারে অপূর্ব সুন্দর, কিন্তু গ্রীষ্মেও মখমলের মতন সবুজ।

আগে জানিয়েছিলাম, পাহাড়ের উপর দিয়ে দড়পথে বেড়িয়েছি। কি ভাল যে লাগল! প্লেনে ওঠার চেয়েও সুন্দর। প্লেনে বন্ধ খাঁচার অনুভূতি, আর দড়িপথে মনে হয় আকাশে রিকশায় চলছি।

পাহাড়ী শহর ব্রাশোভ অদ্ভুত সুন্দর। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই শহরের পত্তন। ভারী মজার জায়গা। একটা চোদ্দতলা হোটেল, আবার তার পাশেই একটা নিচু বাড়ি, তার পাশেই এক প্রাচীন গির্জা, আবার কোথাও প্রাচীন দুর্গের একটা আস্ত দেয়ালের উপর দিয়ে গাঁথা হয়েছে নতুন কোন শিক্ষায়তনের বাড়ি। অথচ সবকিছুর মধ্যে সামঞ্জস্য আছে। আমরা যে হোটেলে ছিলুম সেটা রাজধানী বুখারেস্টের যে-কোনো হোটেলের চেয়ে সুন্দর। উঠোনে একটা বড় পুকুরের মধ্যে থেকে সরু লম্বা একটা ফোয়ারার ধারা অনেক দূরে উঠে নিচে ঝরে পড়ছে। এই জলধারায় নানা রং প্রতি-ফলিত হচ্ছে— জলের মধ্যে দীপাবলীর আলোর খেলা।

ঐ আধুনিক হোটেলের থেকে একটু দূরে একটা প্রাচীন গ্রীক গির্জার পিছনে একটা মধ্যযুগীয় দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। সেখানে সরু পায়ে চলা পথের দুপাশে বন্যলতার জড়াজড়ি। অনেক অচেনা ফুলের ভিড়। মাঝে মাঝে পাখীর ডাক।…এ যেন সত্যিই মধ্যযুগ। এই দুর্গের উপরে এখনো প্রত্নতত্ত্ব

বিভাগের হাত পড়েনি। এর অমার্জিত ভাব সেই জন্যই। ব্রাশোভ শহরের বিখ্যাত কালো গির্জা এর কাছেই। গথিক গড়ন, তৈরি করতে নাকি একশ বছর লেগেছিল। তারপর সপ্তদশ শতকের শেষদিকে পুড়ে কালো হয়ে গেছে। আমরা যেদিন গিয়েছিলাম, সেদিন রবিবার। অনেকে প্রার্থনা করছিলেন। দেবস্থানে এত সুন্দর গাম্ভীর্যময় ভক্তির পরিবেশ এমন ডিসিপলিন একমাত্র সভ্য দেশগুলিতেই সম্ভব! কিন্তু এখানকার গাছের পাতার মতো আমার চিঠির পাতা আর বাড়ানো ঠিক নয়।

অমিতা রায়

আথেনি পালাস হোটেল
বুখারেস্ট
২৯ অগাস্ট, ১৯৬৭

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

…দেশ দেখার ফর্দে শেষ নাম ছিল ডক্টর মিনোভিচের মিউজীয়াম। বুখারেস্টের কাছেই এই বাড়িটা। ডক্টর মিনোভিচ নামক ইনজিনিয়ার লোকশিল্পের নানা নিদর্শন সংগ্রহ করেছিলেন। বাড়ির এক একটি দেয়ালে সীলিঙে এক এক শতাব্দীর স্টাইলে কারুকার্য করিয়ে ছোট্ট একটি গির্জার বেদীর মডেল করিয়েছিলেন, তারপর বাড়িটাকে মিউজীয়াম করে তুলে মৃত্যুর আগে এটিকে আকাদেমাকে দান করে যান। এখন এটি জাতীয় সম্পত্তি। মিনোভিচের একজন ভাগনে অথবা ভাইপো অথবা নাতি (রুমানিয়ান ভাষায় nepot বলতে এ সবই বোঝায়, ভাষাতাত্ত্বিকেরা নেপোটিজম অথবা 'নেভিউ-টিজম্-এর কথা ভাববেন) এর তদারক করেন। আমাদের দেখিয়ে শুনিয়ে তিনি বললেন, মাতৃভাষায় কিছু লিখে দিয়ে যান ভিজিটর্স বুকে। এ পর্যন্ত এদেশের যত জায়গায় গেছি, সুযোগ পেলেই বাংলা এবং রুমানিয়ান—দুই ভাষাতেই লিখে এসেছি। পাতা উল্টে দেখে নিয়েছি অন্য কোনও ভারতীয় ভাষার বা বর্ণের ছাপ নেই সেখানে। তখন মনে হয়েছে আট বছর আগে যে এই বুখারেস্টে বসে এত পরিশ্রম করে রুমানিয়ান শিখেছিলাম তার সার্থকতা এতদিনে মিলল। নিমন্ত্রিত অতিথি হয়ে এসে অন্তত্র কয়েকটা বাংলা অক্ষরও তো এই খাতাগুলোয় পৌঁছে দিতে পারলাম। এবং আর কোনো ভারতীয় ভাষার আগেই!

হস্টেলে থেকে এখানে পড়বার সময় আমাদের এম্‌ব্যাসির নিরামিষভোজী লোকদের স্ত্রীরা বলতেন, তোমার আর কি, খাওয়াদাওয়ার তো বাছবিচার নেই, যেখানে খুশী থাকতে পার। 'বঙ্গাল মুলুকমে এইসাই হোতা হ্যায়।' ভাগ্যিস বাংলা দেশে খাওয়াদাওয়া ছোঁয়াছুঁয়ির হাঙ্গামা নেই, তাই বিদেশ বাস বাঙালীর পক্ষে সহজ। আমিই এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাঙালী ছাত্রী ছিলাম।...

মিউজীয়ামের কথা বলছিলাম। ছোটখাট এই মিনোভিচ মিউজীয়াম যেমন একজনের ব্যক্তিগত সংগ্রহ, সিবিউএর একটি বিরাট মিউজীয়াম তেমনি অষ্টাদশ শতকের ব্যারন ব্রুকেনথানের ব্যক্তিগত সংগ্রহ। রাজপ্রাসাদের মতন ঐ বাড়িটিও তাঁরই নিজের বাড়ি ছিল। এর ছয়টি শাখা—প্রকৃতি-বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, লোকশিল্প, সামন্ত যুগের শিল্প আর গ্রন্থাগার। এক সপ্তাহ ধরে দেখলেও সময়ে কুলোয় না। আমার দুটি শাখায় কোনো রকম চোখ বুলিয়ে যাওয়াতেই সারা দিন লেগেছিল। শোনা গেল গ্রন্থাগারে দুলক্ষ চল্লিশ হাজার বই আর পাণ্ডুলিপি আছে। এবং তার সবই জ্ঞানবিজ্ঞানের মূল্যবান বই।

বুখারেস্টে আর একটি মিউজীয়াম আছে গ্রিগোরে আন্তিপার ব্যক্তিগত সংগ্রহ, নেচার হিস্টরি মিউজীয়াম। এর সংগ্রহের সংখ্যা আর উৎকর্ষ নাকি ভিয়েনার মিউজীয়ামের পরেই। অর্থাৎ পৃথিবীর দ্বিতীয়। আন্তিপা সারা পৃথিবীর বন্ধু বান্ধবদের কাছে চেয়েচিন্তে জিনিসপত্র জোগাড় করে এই মিউজীয়াম করেছিলেন।

আমাদের দেশের ধনীদের টাকা এদের চেয়ে অনেক বেশি ছাড়া কম ছিল না। তারা এত টাকা কি করত বলুন তো? বাঁদরের শ্রাদ্ধ আর বেরাল বিয়ে দিতেন বটে। কিছু সৎকাজও করেছেন, কিন্তু তা কনভেনশনাল। এবং পুণ্য লাভের নিশ্চিত আশায়।

আর একটি আশ্চর্য মিউজীয়াম দেখলাম—গ্রাম মিউজীয়াম। একটা পার্কের মধ্যে সতেরো একর জমিতে সতেরোটি প্রদেশের গাছপালা, ঘরবাড়ি, কুয়ো, যাঁতাকল সব। মডেল বা মিনিয়েচার নয়—আসল। সত্যিকার ঘর-বাড়ি গ্রাম থেকে তুলে এনে বসানো হয়েছে। ভিতরে বাইরে সবই যেমন ছিল তেমনি। বেশ ভাল লাগল। এবারে আসবার পর আর এখানকার গ্রাম দেখিনি। এরা যাকে গ্রাম বলে সেখানে পিচের রাস্তা নিয়ন আলো।

ছেলেমেয়েরা হাতে হাতঘড়ি বেঁধে গাড়ি চালায়। কোন কোন জায়গায় ক্ষেত-খামারের কাছে পথ কিছু ভাঙা—কলকাতার কলেজ স্ট্রীটের মতন। কলকাতার গ্রাম মিউজীয়ম তো সব জায়গাতেই ছড়িয়ে আছে। ছেঁড়া চটের ৩ হাত × ৪ হাত 'বাড়ি'র এক একটা কলোনি।···

অমিতা রায়

আকাশ পথে
১।৯।১৯৬৭

···আমি এখন কোথায় জানি না। মস্কো ছেড়েছি বিকেলে। ইংরেজী মতে কাল সকালে দিল্লী পৌঁছাব। মাঝামাঝি কোন জায়গায় আকাশে আছি। চিঠি দিল্লী থেকে ডাকে দেব। বিমান-মাঝি আকাশ সমুদ্র পার করে দেবে। কিন্তু আমি ভাবছি আমাদের দেশকে পার করবে কে? এ চিন্তা মন অধিকার করে আছে। রুমানিয়ায় সতেরো দিন বাস করে একেবারে বোকা বনে গেলাম। দ্বিতীয় যুদ্ধে রুমানিয়া গুঁড়িয়ে গিয়েছিল। তার আগেও এমন কিছু নাম করা দেশ ছিল না। থাকার মধ্যে ছিল মাটির নীচে খানিকটা পেট্রল আর মাটির উপরে লক্ষ্মীছাড়া মানুষের পাল। তাদের পেটে ভাতও ছিল না বিদ্যাও ছিল না। অথচ এই বিশ বাইশ বছরে এরা কি করেছে! এমন কি ১৯৬১-তে যে রুমানিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলাম, ১৯৬৭-র রুমানিয়া তাকেও কতদূরে ফেলে চলে এসেছে! এত সমৃদ্ধি এত সৌন্দর্য এরা কোথায় পেল?

রাশিয়া এদের প্রথম দিকে খুব সাহায্য করেছে, সে কথা সত্য। কিন্তু আমরা? আমরাও তো সাহায্য পেয়েছি। আমাদের মতন এমন মাটির সম্পদ কটা দেশের আছে? এত বিদেশী সাহায্য কোন্ দেশ পেয়েছে? তারপর আমরা তো এক আবহমানকালের ঐতিহ্য পেয়েছি—পেয়েছি ইংরেজ শিক্ষার আলোক। সে সব আমাদের কোন্ কাজে লাগল?

এরা তো দেশ গড়তে মানুষও কত কম পেয়েছে। তবে যে ক'জন পেয়েছে তারা ওদের ম্যান-পাওয়ার, আর আমরা কেবলই পপুলেশন। এই পপুলেশন আমাদের বিশেষ কোনো কাজে কেউ লাগাল না। আমরা খুব অহঙ্কার করে গান গেয়েছি 'চল্লিশ কোটি মোরা'—এখন দেখছি সংখ্যাটা

কমানো যায় কি করে। এবং গানটা কারোই ভাল, যদিও এত ভিখিরী নিয়ে গর্ব করা গানেও উৎসাহ হয় না।

এদেশের একজন নেত্রীস্থানীয়া মহিলার সঙ্গে ২৬শে অগস্ট দেখা করেছিলাম; এঁর নাম মারিয়া গ্রোজা—নারী কাউনসিলের সেক্রেটারি ছিলেন আগে। তখন আমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। এখন ঐ কাউনসিলের প্রেসিডেন্ট উনি। কাউনসিলের সাপ্তাহিক পত্রিকারও সম্পাদিকা, আবার ওদিকে পার্লামেন্টের চারজন ভাইস-প্রেসিডেন্টের একজন। আমি ওঁর সঙ্গে কাউনসিলেই দেখা করেছিলাম। আমি মিনিট পাঁচেক আগে পৌঁছেছিলাম।...তিনি ঠিক কাঁটায় কাঁটায় সময় হলে ফাইলের কাজ চুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলেন।...ঘরে গিয়ে দু-একটি কথার পর বললেন, তুমি তো ১৯৬১তে দেশে ফিরলে? তারপর থেকে কি হয়েছে সেটাই বলি তা হলে।

তারপর তিনি, আমার দিদিমার কাছে বসলে যেমন ঘরোয়া কথা সব গড়গড় করে বলে যান, তেমনি করে এই ক বছরে দেশের মেয়েরা কতটা এগিয়েছে, মেয়েদের জন্য কি কি করা হয়েছে, শিশু কল্যাণের কাজ কি কি করা হয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ধাপ পর্যন্ত সব শিক্ষায় কি কি পরিবর্তন এসেছে, সব গল্পের মতন বলে গেলেন—স্ট্যাটিসটিক্স সমেত।...একবার রেফারেন্স বই দেখলেন না।...আমি সংখ্যার তোড়ে ভেসে গেলাম। খাতা পেনসিল নিয়ে বসেছিলাম, বন্ধ করে রেখে দিলাম।...

শ্রীমতী গ্রোজার বাবা ছিলেন রুমানিয়ার প্রথম প্রধান মন্ত্রী। নাম পেতরু গ্রোজা। তাঁর নেতৃত্বেই রুমানিয়া জারমান শাসন থেকে মুক্তি পায়। তিনি যখন দেশের ভার নিয়েছিলেন, তখন দেশে একেবারে লক্ষ্মীছাড়ার অবস্থা। তখন বরফের উপর খালি পায়ে হেঁটেছে লোক—এমনই দারিদ্র্য ছিল তখন। সে ঐ দ্বিতীয় যুদ্ধের ঠিক পরের অবস্থা। এখনকার লোকেরা সে সব দিন দেখেনি। তখনকার লোকদের কাছে শুনেছি গ্রোজা একটা মোটা ওভারকোট পরে টুপি মাথায় পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন আর পথের লোকদের ডেকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতেন তাদের কিসের অভাব, কি দুঃখ। এখনকার প্রেসিডেন্টও নিজে পথে বেরিয়ে সব দেখে বেড়ান। বাজারে ঢুকে খারাপ খাদ্যবস্তু কিছু দেখলে নিজহাতে টেনে পথে ফেলে দেন।—কিন্তু এসব রূপকথার গল্প বলে আর লাভ কি?

অমিতা রায়

চিঠিগুলি নানা দিক থেকে মূল্যবান। দুদেশের তুলনায় যে বৈপরীত্য ফুটে উঠেছে, তা আমরা শিল্পীর দৃষ্টিতে আলোছায়ার খেলা রূপে দেখি। তা ছাড়া আর কিছু না। কিছুই ভাবি না ও নিয়ে।

অমিতা বিস্মিত হয়েছে ওদেশে দামী জিনিস চুরির সুবিধা থাকা সত্ত্বেও চুরি হয় না। ঐ বিস্ময়ের মধ্যেই এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের দুরবস্থার কারণ প্রায় সবখানিই খুঁজে পাওয়া যাবে।

ত্রিপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

শ্রীমতী অমিয়া চৌধুরাণীর চিঠিতে একাধিকবার মারগারেট চাটার্জির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার ইন ফিলজফি। অক্সফোর্ডের সমারভিল কলেজে পাঠকালে বিশেষ মেধা ও কৃতিত্বের জন্য বৃত্তিলাভ করে এবং বিবাহের পর দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেয়। সঙ্গীতে বিশেষ নাম আছে, পিয়ানোয় বিশেষ করে। কবিতা, প্রবন্ধ ছোট গল্প এদেশে ও বিদেশে প্রকাশিত হয়েছে। মারগারেটের জন্মপদবী Gantzer.

আমার সঙ্গে তার পরিচয় হয় আমার কন্যা তপতীর (মিসেস পি. কে. রায়) মারফৎ। ওরা সবাই দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকাবাসী।

মারগারেটের বাংলা শেখায় খুব আগ্রহ, মুখে কিছু কিছু কাজ চালিয়ে যায়, এবং তার দুখানা বাংলা চিঠিও আমার কাছে আছে। একখানা চিঠির রচনা আমার ভাল লেগেছে। কিন্তু সম্ভবত এ চিঠি গুছিয়ে লিখতে তাকে কিছু পরিশ্রম করতে হয়েছে। তার মাতৃভাষায় লেখা চিঠি অনেক আছে। প্রত্যেকখানা চিঠিতেই আমার স্বাস্থ্যবিষয়ে মমত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা। এবং তার সঙ্গে সাংসারিক অনেক কথা, মেয়েদের স্বভাবসিদ্ধ অবিরাম কথা বলার অভ্যাসও তার মধ্যে কিছু পাওয়া যায়।

আমি তার একটি কবিতা বাংলায় অনুবাদ করে বিমলচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত 'এষা' নামক ত্রৈমাসিক পত্রে দিই। এই সামান্য কারণে তার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

মারগারেটের চিঠিগুলি ভাল লাগে এজন্য যে, আমার জানবার অনেক কথা তাতে থাকে। (আমার কন্যাদের সকল সংবাদও তার কাছ থেকেই বেশি পাই।)

দর্শনশাস্ত্রের রীডার এবং কবি। বিনয় এবং মনের উদার স্নেহপ্রীতি, তদুপরি তার কবিরূপে সাধারণ মানুষের প্রতি দরদ উল্লেখযোগ্য।

১২।৪।৬৭ তারিখে আমাকে তার কাব্যগ্রন্থ The Spring and the Spectacle খানা উপহার দিয়েছিল। এই বইয়ের একটি কবিতা From the Abyss আমার খুবই ভাল লেগেছিল, এবং আমি নিজে থেকেই তার অনুবাদ করেছিলাম।



মারগারেট চাটার্জি

ফোটো : পরিমল গোস্বামী ১৯৬৮

কবিতাটি যে আমি অনুবাদ করতে চাই তা শোনার পর মারগারেটের চিঠিখানার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করছি।

Dunloe Lodge
Simla 5.
20. 5. 67.

শ্রীচরণেষু,

I was so happy to receive your letter to know that you had liked mine and really delighted that you have responded to my "From the Abyss" to the extent of wishing to translate it. I feel almost humble about this. Of course nothing could satisfy me more unless it be the capacity to write in Bengali myself and for this I must wait for my next life—if any! It is very good of you indeed to take this trouble.

I feel so happy on your account that Lily [Tapati] and family will be with you on June 3rd···

It was so thoughtful of you to write in English in the sense that it is quite true that I am often quite honestly not able to read a word here and there unless the style is tempered to my small capacity. But I will improve!

With my pranam
Most gratefully and affly
Margaret

তারপর আমার অনুবাদ ছাপা হল যখন, তখন মারগারেটের স্বভাবতই খুব আনন্দ হয়েছিল অনুবাদ পড়ে। 'এষা' সম্পাদক কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ নিজে খুশি হয়েছিল অনুবাদ পড়ে। এবং ঐ বছরে শারদ সাহিত্য সমালোচন উপলক্ষে রেডিওতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এই অনুবাদের বিশেষ উল্লেখ করেছিল। তাছাড়া মারগারেট তার কলকাতার নিবাস থেকে জানাল—

71 J Hindusthan Park
Calcutta-29
1. 7. 69.

শ্রীচরণেষু

···I was asked to participate in a meeting of a Literary Society called 'চন্দ্রলোক' and did so. I read my poem "From

the Abyss". and your Bengali translation of it was then read by Mr. Justice P. B. Mukherji and some discussion followed. The translation was much admired, In fact some comparisons were made with writings of Tagore on human distress, specially after the first war. I think you will be interested to hear of all these doings.

I do have a second book of poems ready which I shall probably call " Towards the Sun" after one of the poems. This line actually occurs in Aurobindo's 'Savitri'. In the new collection I think there is some influence from the very little that I know of Indian literature, and I think there is no nostalgia about the past at all. However I have not decided which poems to include and which to leave out and the collection has not as yet gone to the publishers.

I participated in the recent seminar on Gandhian Economics for 2 days and as a result was asked to do some public speakingon behalf of the Gandhi Centenary Committe

with pranam
Margaret.

এবারে আমার অনুবাদ সম্পর্কে মারগারেটের নিজের অভিমত তার এক-খানা চিঠিতে পাওয়া যাবে।—

Delhi 7
16-10-67.

পরিমলদা,

....Today I have received the copy of এষা containing your wonderful translation of my poem. I am full of admiration for it. for your choice of words and the way you have captured what I wanted to say. In some ways I would say the translation was better than the original. You know how grateful I am. It is now ten o'clock at night and I have just come from Lily's house where I had been to show it to her. I have brought away a copy of your story in অমৃত to read.

Yesterday .I received a nice letter from your friend Bimal Chandra Ghosh about whom I would like to know more from you.

I understand that Nirad Babu is thinking of making a trip to Calcutta next month. It will be a happy meeting for you both if he does.

On Friday of this week I travel to Madras for a philosophy seminar, I am looking forward not so much to this as to seeing the SEA. It is years since I saw it—at Digha....

Sincerely
Margaret

এইভাবে কখনো নীরদবাবুর বিষয়ে কখনো আমার কন্যার খবর কখনো তার বই বা কবিতা যখনই সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছে আমাকে পাঠিয়েছে।—কখনো আমার স্বাস্থ্য উপলক্ষ করে আমাদের চিঠি লেখা চলে মাঝে মাঝে।

মারগারেটের প্রথম বই পেয়ে আমি তাকে একখানা চিঠি লিখেছিলাম তা এখানে উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন।

যাই হোক, বাংলা শেখা বিষয়ে মারগারেট লিখেছিল পরজন্ম যদি থাকে তবে সেই জন্মে বাংলায় লিখতে পারবে। এটি পড়ার পর পরজন্ম বিষয়ে আমার নিজের ধারণা তাকে জানিয়ে দিলাম। অর্থাৎ যা শিখবে, এ জন্মেই শেখ। ২৮;৫;৬৭তে যা আমি লিখেছিলাম তার শেষ অংশ—

.. If you cannot agree, don't worry. Learn to write in Bengali in this very life—doubting at least that there may not be any hereafter.

আমি যাঁদের পরিচিত, এবং যাঁদের সংবাদ শুনলে খুশি হব, নিজে থেকেই মারগারেট তা আমাকে জানায়। নীরদবাবুর সব খবর তার চিঠিতে আছে। 'বিলেত থেকে বাড়ি ফিরতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন (৩১-৭-৬৮), যদিও ওখানে তাঁর দিন কাটছে ভাল, তবু ফিরে আসার জন্য উৎসুক হয়েছেন এটা ভাবতেও ভাল লাগছে'—এমন সব খবর পাওয়া যাবে মারগারেটের চিঠিতে। শ্রীমতা জ্যোতি সেন অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে আছে তাকেও দেখে আসছে সে। লিখেছে She speaks very affectionately of you and of your early encouragement to her in her writing. হাজারিবাগের শ্রীমতী জ্যোতি এবং তার পিতা বিজয়কান্ত সেন ও কন্যার সঙ্গে বন্ধুবর নির্মলকুমার বসু আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। জ্যোতির পিতা

বিখ্যাত শিকারী ছিলেন, তাঁর শিকার কাহিনী আমি ধারাবাহিক ভাবে ছেপেছি এবং তা পুস্তক আকারে প্রকাশিতও হয়েছে। জ্যোতির মেয়ে স্বপ্না ইনটারমীডিয়েট পড়বার সময়েই বাংলা ও ইংরেজী কবিতা লিখতে পারত, এবং তা খুবই ভাল লেগেছিল আমার। নানা দিকে তার ক্ষমতা ছিল, ক্যারিকেচার অতি চমৎকার করত। তার 'রামা রাউ'-এর ক্যারিকেচার এখনো ভুলিনি। রামা রাউয়ের বিশেষ উচ্চারণে তার বিশেষ ইংরেজী স্বপ্না অনর্গল বলে যেতে পারত। ইংরেজীতে এম-এ পাস করেছিল। অনেকদিন ওদের খবর জানি না, শুনেছি সে এখন সংসার করছে। জ্যোতিও খুব ভাল লিখত, সে নৃতত্ত্বে এম-এ পাস করে দিল্লীতে চাকরি করছিল।

আর একখানা ইংরেজী চিঠির কিছু অংশ এখানে বাংলায় শোনাচ্ছি।

চিঠির আরম্ভে আছে, "আজ লিলির কাছে শোনা গেল আমি নাকি দুনিয়ার এদিকে যা কিছু ঘটছে তার সংবাদ আপনাকে সরবরাহ করা বিষয়ে একটি নির্ভরযোগ্য আকর।" এইটে প্রমাণের জন্যই বোধ হয় তার চিঠিতে সংবাদ দিয়েছে সে অনেক। গোড়াতে আরো বলেছে, "এই সুনাম রক্ষার জন্য আমি অবিলম্বে কলম নিয়ে বসছি।" তারপর বলেছে লিলির বাগানে সব কিছুই নাকি এমন সবুজ এবং সতেজ এবং টাটকা যে তাদের ইচ্ছা আমি যেন আমার প্রিয় কলকাতা ছেড়ে অবিলম্বে ওখানে চলে যাই...

20, Canning Lane
New Delhi
22-11-68.

Parimalda,

...You know even the most eminent of writers go on holiday and the inscription runs "This column will be reserved next week when so and so returns from his vacation". In fact such action should serve to whet the appetite of one's readers. I only wish you would take the hint. But I fear you won't...

Our dear friend Nirad Babu also Baudi—is back. In fact I have just remembered he will be 71 tomorrow so I must go and convey my greetings. He has brought back a lot of things and his mood is a mixture of happiness at being in his own country and despair at the squalor he sees around....

This is a queer disease we have, those of us who push the pen—a feeling of terrible emptiness in between one piece of work and the next. Does this mean that writing is a kind of addiction, like drugs or smoking—this would surely be to demean the craft and yet there is an elemenf of this about it...

Mo t affectionately Margaret.

একখানা চিঠির বর্ণনা অংশটি উদ্ধৃত করছি। মারগারেটের একটি পোষা বেঁজী আছে, তার সঙ্গে মুক্ত বেঁজার তুলনা হচ্ছে। এবং তার সঙ্গে ঘরের বর্ণনা—

Delhi-7
31-7-69.

শ্রীচরণেষু,

....My son and I saw a mongoose at liberty this morning and felt rather guilty about our incarcerated one. But I suppose we are all in some sort of bondage or other....

I should tell you about my room. The size is about the same as yours—perhaps a little smaller. On one wall I have a chalk drawing of Rabindranath done by Sudhir Khastagir and then a little farther on, a tiny fruit the original cf which I saw in Switzerland. Then I have pictures of Kant and Bach who are my gurus in philosophy and music respectively. Then there is a print of Rembrandt's 'Rabbi' again something the original of which I saw. It is more black than white and the face is full of sadness. There is next a picture of Franciscan monk kneeling and holding a skull in his hands. This was a picture which used to hang in my school when I was very young. I have it now to remind me that time is running short and that I must be careful about my time ..

With pranam
Margaret.

চিত্রধর্মী বর্ণনা এবং অনেক সময় কিছু দার্শনিকতা মারগারেটের চিঠির বৈশিষ্ট্য। আর মাত্র সামান্য কিছু নমুনা দিচ্ছি। (এ খানি পূর্ব চিঠির আগে লেখা)—

D. U. W. A. Hostel
Delhi-7
21-3-68

শ্রীচরণেষু,

....I too have been feeling I cannot remember things as I should. I am in the garden and the flowers are heavy with rain. Each is so different from the other.

I am sure you should not compare yourself with Nirad Babu. We cannot all be active in the same degree or in the same ways. He is lucky to be fit, but then again we cannot all have that health and physique

I am full of admiration learning about the translations you have been doing—specially the Russel book which I feel is a wise one. Have you seen the first page of his autobiography—about his life being moved by three great winds, the desire for love, for knowledge and the desire to alleviate human suffering? It is a most powerful piece of prose....

With my pranam.
Affectionately yours
Margaret.

ফুলের পার্থক্যের সঙ্গে এক মানুষের থেকে আর এক মানুষের পার্থক্য—ইঙ্গিতটা খুব ভাল লেগেছিল, এবং ইঙ্গিত বলেই। আমি প্রকৃতপক্ষে রাসেলের The Conquest of Happinessএর পূর্ব অনুবাদের পরবর্তী সংস্করণ ছাপার জন্য কাটাছাঁটা করছিলাম—রূপা অ্যাণ্ড কো প্রকাশকদের পক্ষ থেকে। আর অনুবাদ করছিলাম ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের A Visit to Europeএর। এই অনুবাদের কথা নীরদচন্দ্র চৌধুরী প্রসঙ্গে বলেছি। এটি প্রকাশিত হয়নি। পরবর্তী চিঠিখানিতে লেখিকার কর্মজীবনের একটি দিকের ছবি পাওয়া যাবে।

Delhi—7
15-10-69

শ্রীচরণেষু

...I have been out of station twice recently, once to lecture on Gandhi in Aligarh and to attend a Seminar (also on

Gandhi) in Benares. In Aligarh I was delighted to spend a long time with a magnifying glass poring over old illustrated manuscripts and found them—both in colours and in delicacy of execution—brother to the similar works of art by mediaeval works in the West that I had seen in Rome and Florence. There was so much blue and so much gold. I found it exciting to pick out the faces of the horsemen and to notice when there were no longer Middle Eastern faces but wild Central Asian ones. One could feel all the pent-up desire to represent, not only in words but in colour the living world of men, animals, trees, and flowers—whatever the Koran may or may not decree.

In Benares my deepest experience (I am only telling you these) was meeting Pandit Gopinath Kaviraj—ill in hospital but amazingly clear in mind. He spoke on divine and on human love—in answer to a question of mine I felt that old age and extreme disability could be conquered if one had his courage and (perhaps) his own special sources of strength. I suppose we all have our special sources.

Affectionately, Margaret.

মার্গারেট মাদ্রাজ থেকে এক চিঠিতে (২৫-১০-৬৭ তারিখের চিঠি দ্রষ্টব্য) বহুদিন পরে সমুদ্রের স্পর্শ পেয়ে খুব আনন্দিত। বর্ণনা দিয়েছে তীরভূমির শামুকের বৈচিত্র্য এবং কাঁকড়ার লুকোচুরির। তার উত্তরে সমুদ্র প্রথম দেখে আমার মনে কি ভাব জেগেছিল, তা এই ভাবে জানিয়েছিলাম—

Calcutta-50
10. 11. 67.

কল্যাণীয়াসু,

I hope you are back from Madras by now. I must thank you for remembering me even when you were holding your poetic sessions with your old friend the Sea. Your love for it was beautifully expressed in one of your letters.

My experience was different. When for the first time I went to Puri (in 1929), I was suddenly lost in the wilderness of blank space. I was overawed by the sight of the sea

with its high and mighty breakers constantly foaming and lashing against the shore. The shock of surprise was too great for me. It was also so sudden that I almost panicked and felt small and crushed by the very vastness of the scene. I felt like running away to my hotel room just to avoid the glaring eyes of infinite emptiness. My true smallness was exposed to something too great for my comprehension, I felt insulted.

The next time I went to Puri everything was drab and colourless. I felt like a conqueror. I had conquered myself.

Yours sincerely
Parimalda

এরপর এক বর্ষাকালে গিয়ে যে অপরূপ রঙের শোভা দেখেছিলাম, আকাশ-সমুদ্র জুড়ে মেঘে মেঘে, তরঙ্গে তরঙ্গে, সে কি সাত রঙের মত্ততা—সে কথাটা এই চিঠিতে সম্পূর্ণ গোপন করেছিলাম।

চতুষ্পঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

শ্রীমতী অমিয়া চৌধুরাণীর আরো কয়েকখানি চিত্তাকর্ষক চিঠি পেয়েছি সম্প্রতি। তিনখানা চিঠি, একখানি এয়ার লেটারে ও দুখানি খামে। এই তিনখানা চিঠিতে যত শব্দ আছে তা একত্র ছাপলে ছোটখাটো একখানা বই হয়। একখানা এয়ার লেটারে যে, খবরের কাগজের দেড় কলম পরিমাণ শব্দ ধরে তা না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত হত। এমন চিঠি পেয়ে আমি খুবই আনন্দ পেয়েছি বলা বাহুল্য। কত সংবাদ আছে, কত চাক্ষুষ দেখার বিবরণ আছে, যা ছবির মতো চোখের সামনে ফুটে উঠেছে পড়তে পড়তে। লেখিকা শিল্পী মানুষ, চোখের দেখা আর মনের দেখা, সহৃদয়তার যোগে ভারী সুন্দর করে তুলেছে তাঁর পত্র রচনাকে। তিনখানি চিঠিই বিদেশ থেকে লেখা। কিছু লণ্ডন থেকে, বাকি অক্সফোর্ড থেকে। কিন্তু আমাকে বাধ্য হয়ে চিঠিগুলির অংশ উদ্ধৃত করতে হচ্ছে স্থানাভাবে। এবং চিঠিগুলি তারিখ হিসাবে সাজানোর বাধা হয়েছে আগের চিঠি পরে পাওয়ায় এবং একই চিঠি দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে বিভিন্ন তারিখে লেখায়।

51 Old Road
Wheatley (Oxon)
Oxford, U. K.
1. 1. 71

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

লণ্ডনে এসে অবধি ভাবছি আপনাকে সব খবর দিয়ে চিঠি লিখবো কিন্তু সে ইচ্ছা মনেই থেকে যায়, সময় আর করে উঠতে পারি না।

ওপরে যদিও হুইটলির ঠিকানা দিয়েছি কিন্তু চিঠিখানা লিখছি বসে ছেলের বাড়ি [লণ্ডন] থেকে।···হুইটলি একটা ছোট গ্রাম অক্সফোর্ড থেকে পাঁচ মাইল দূরে। এখানে বাড়ী পাবার আগে একমাস অক্সফোর্ডে এক বাঙালী পরিবারের সঙ্গে ছিলাম। সেখানে থাকার পর আমার শারীরিক ও মানসিক এমন অবস্থা হয়েছিল যে তা কাটিয়ে উঠতে বেশ সময় লেগেছে।....আমার ত সারাদিন হাউস কীপারের মত থাকতে হয়েছে। রান্না করা বাসনমাজা ছাড়া আর কোনো দিকে মনই দিতে পারিনি। ···বাড়ীটার চারদিক একেবারে

খোলা আর অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য। দূরে পাহাড়, তারপর সারি দিয়ে গাছ। তারই গা দিয়ে নেমে গেছে ক্ষেত।....প্রকাণ্ড ক্ষেত, হয় গম কিংবা বার্লি বা ওট, আর তার পরেই হল একটা pasture land—চারণ ভূমি। কত গরু ও ভেড়া চরে বেড়াচ্ছে। এরা দিনরাত বাইরেই থাকে। সবুজ মাঠে শাদা কালো অথবা ব্রাউন গরু চরে বেড়াচ্ছে, দেখতে এত সুন্দর যে কি বলবো। এখানে ঘাস কিন্তু চির সবুজ, কখনও মরে না...আমার রান্না ঘরের একটি দেয়ালে প্রকাণ্ড কাঁচ দেওয়া। আমি রান্না করতে করতে কি যে সুন্দর দৃশ্য দেখি বলতে পারবো না।

গ্রামে থাকার একটা নতুন অভিজ্ঞতা হলো। গ্রামের সবাই অতি সুন্দর মিশুকে ও অমায়িক। সবাই সবার খোঁজখবর করে। আর শুধু গ্রাম কেন, আমি এদেশের লোকের কাছে একটা হৃদ্যতা যা পাচ্ছি সে বলবার নয়। অনেকেই বলে থাকেন এরা discriminate করে; কিন্তু আমার ধারণা এটা নির্ভর করে যার যার নিজের ব্যবহারের উপর। লণ্ডনে অক্সফোর্ডে কত লোকের সঙ্গে যে ভাব হয়েছে। আর তাদের কি আগ্রহ। অচেনা লোকও পথে দেখা হলে শুভেচ্ছা জানায়।

গতবার ১৯৬৮ সনে অক্সফোর্ডে অ্যাশমোলিয়ান মিউজীয়ামে একটি গার্ডের (মহিলা) সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপ হয়ে গিয়েছিল। আমি, ঐ মিউজীয়ামটা আমাদের হস্টেলের কাছে থাকাতে, প্রায়ই যেতে পারতাম। ঐখানে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে সব নোট করতাম, স্কেচও করতাম।...ঐ যে গার্ড ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, এ বছরে অক্সফোর্ডে এসে একদিন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ পেছন থেকে কে এসে জড়িয়ে ধরলো। আমি দেখি সেই ভদ্রমহিলা। আমায় বললো, "আমি কিন্তু তোমার স্বামীকে রাস্তায় দেখেই বুঝেছি "probably I shall meet my lady." ব্রিটিশ কাউনসিল হস্টেলে যখন আমরা ছিলাম, সেখানে ইলেকট্রিক মিটারে শিলিং ফেলে আলো পাবার ব্যবস্থা ছিল। শিলিং না ফেললে আলো পাবো না। উনি ত কেবলই ঐ প্রবাদ আওড়াতেন 'ফেলো কড়ি মাখো তেল।' সেজন্য শিলিং যোগাড় করতে হত। একদিন তরকারীর দোকানে শিলিং চেয়েছিলাম, কিন্তু তাদের তখন ছিল না। বললো শিলিং coin ত নেই। একটি ভদ্রমহিলা 'কিউ'এর নম্বর ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে এসে আমাকে ৪টি শিলিং দিলেন এবং আবার গিয়ে একেবারে পিছনে দাঁড়ালেন। এ রকম কে করে?

বাসে উঠতে গেলেও কোন হাঙ্গামা নেই। 'কিউ' করে দাঁড়াতে হয়। গতবার রিজেন্ট পার্কের পশুশালা দেখে বাস-স্টপে সকলের পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, আমি অতটা খেয়াল করিনি, একজন ভদ্রমহিলা আমার আগে ছিলেন, তিনি আমায় ঠেলে ৫ জনের (তাঁর শ্বশুর শাশুড়ী ও তিন ছেলে-মেয়ের) আগে টেনে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললেন, I noticed you arrived here before us.

এখানেও সে দিন বাস্-স্টপে দাঁড়িয়ে আছি, একের পর এক সব গ্রামবাসী নারী-পুরুষ জড়ো হচ্ছেন ছেলেমেয়ে নিয়ে, বড়দিনের বাজার করতে যাচ্ছেন। সকলেই আমরা বাস-স্টপে একটা ছোট খুপরী ঘরে দাঁড়িয়ে গল্প-সল্প করছি···এর মধ্যে যেই বাস্ এলো, অমনি সবচেয়ে প্রথমে আমায় গাড়ীতে ঠেলে তুলে দিয়ে বললে you were waiting for a long time.

এসব ভদ্রতা কি আমাদের দেশে আছে ?···

ইতিমধ্যে জেন অস্টেনের 'সেন্স অ্যাণ্ড সেন্সিবিলিটি' হলো, অতি চমৎকার হয়েছে। যাঁরা অভিনয় করেছেন এত স্বাভাবিক হয়েছে। আর একটা দেখেছিলাম এখানে এসেই—গুস্তাভ ফ্লোবেয়রের 'সেন্টিমেণ্টাল এডুকেশন'। মাঝে মাঝে শারলক হোমস-এর গল্পগুলিও হয়। যিনি শারলক হোমস-এর অভিনয় করেন এত সুন্দর বলেন যে মনেই হয় না থিয়েটার দেখছি।

এবারে আমাদের বেশী অক্সফোর্ডে ও হুইটলিতেই থাকা হচ্ছে। গত অগস্ট মাসে অক্সফোর্ডে থাকতে বারফোর্ড টেনটন নামক একটা গ্রামে গিয়েছিলাম। বি-বি-সি'র ভূতপূর্ব সংবাদ প্রেরক (আমাদের সঙ্গে দিল্লীতে আলাপ ছিল) প্রকাণ্ড বাড়ী কিনেছেন, অনেকখানি জমি নিয়ে। আমরা অক্সফোর্ডে আছি শুনে গাড়ী নিয়ে এসে তাঁর বাড়ী নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই গ্রামে যেতে যা অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য।···আমরা যাবার সময় এবং আসবার সময় সে দৃশ্য দেখতে দেখতে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লাম।···ওখানে খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরে উনি সমস্ত বাড়ীটা ঘুরে দেখতে গেলেন মিস্টার মিলনারের সঙ্গে। আমি বাগানে গল্প করছিলাম মিসেস মিলনারের সঙ্গে। একটু পরে উনি এসে বললেন, যাও, ঘুরে সব দেখে এসো। ঠিক শিলঙে

তোমাদের বাড়ী যেমন ছিল—গরুর ঘর, ঘোড়ার আস্তাবল, গাড়ীর ঘর, খড়ের ঘর, কিচেন গার্ডেন সব রয়েছে।'

উনি বললেন, 'বাড়ীখানা দেখে কিশোরগঞ্জের কথা মনে হচ্ছে।: আর আমি বললাম এ যে হুবহু আমাদের বাড়ী! রোজই সন্ধ্যাবেলা ফায়ার-প্লেসে খাওয়া-দাওয়ার পর দুজনে আগুনের ধারে বসে টেলিভিজ্‌ন দেখি, গল্প-সল্প করি। অবশ্য হাতে আমার চির-নেশা উলের কোনও বোনা থাকেই।

আপনাকে একটা বড খবর দেওয়া হযনি। বি-বি-সি ওঁর উপরে একটা ডকুমেণ্টারি ফিল্‌ম্‌ এই গ্রীষ্মে টেলিভিজনে দেখাবে। এটা কালারে হবে। অক্‌টোবর মাসে এই ফিলমটা তোলা হয়েছে। প্রথম দৃশ্যটা হলো উনি লণ্ডনের একটা খুব বড় দর্জির দোকানে কাপড পছন্দ করছেন, তারপর একটা স্যুটের মাপ দিচ্ছেন। বি-বি-সি এই স্যুটটা ওঁকে উপহার দিয়েছে বড় দিনের সময়। দাম ১০০ পাউণ্ড শুনেছি। অবশ্য বি-বি-সি একটা মোটা ফী-ও দিয়েছে ফিল্‌ম্‌টা করার জন্য।

তার পরের দৃশ্য: উনি ড্রেসিং-টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ডিনারে যাবার জন্য সাজ করছেন, আমি কাপড়-চোপড় এগিয়ে দিচ্ছি: এবং ওঁর গলার ঝাবো (jabot) ও হাতের লেস্‌ পরিয়ে দিচ্ছি ইত্যাদি। (ও, আপনি জানেন কিনা জানি না গতবার যখন আমরা এসেছিলাম এদেশে, তখন উনি অষ্টাদশ শতকের পোশাকের মত ভেলভেটের (প্লাম কালার) স্মোকিং-জ্যাকেট ও লেসের jabot ও হাতের frill করিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন)।

পরের দৃশ্য: লণ্ডনে আমরা এক বাড়ীতে ডিনার খাচ্ছি, লেডি অ্যাশটন ইত্যাদি অনেকে রয়েছেন। বাড়ীটা বড সুন্দর, একেবারে টেমস নদীর গা বেয়ে উঠেছে।

তার পরের দৃশ্য: উনি লণ্ডনের সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সঙ্গে একজন ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে আলাপ করছেন। তার পরের দৃশ্যগুলি অক্সফোর্ডে তোলা। উনি ও আমি সকালবেলা আইসিস নদীতে রাজহাঁসদের খাওয়াচ্ছি আর নদীর ধারে বেড়াচ্ছি।

তার পরের দৃশ্য: উনি অল সোল্‌স কলেজে এদিক-ওদিক ঘুরে কথা কইছেন। শেষটা উস্টার কলেজে ডীনের ঘরে বসে দুজনে কথোপকথন। ঠিক কবে দেখানো হবে এখনও খবর আসেনি।

ওঁর প্রবন্ধ এখানে টাইমস্ ও ডেলি টেলিগ্রাফে বের হয়েছে। এর জন্য ওরা সর্বোচ্চ প্রাপ্য দিয়ে থাকে। ১৪০০ শব্দের [বাংলা কাগজের মাপে প্রায় পৌনে দু'কলম] জন্য ৭৫ পাউণ্ড। [অর্থাৎ এক হাজার টাকার উপরে।] এখন প্রায় প্রতি মাসে ডেলি টেলিগ্রাফ একটি করে লেখা চায়।

৩১।৩।৭১ আপনার চিঠি পেয়েই যে চিঠি লিখেছিলাম তার প্রাপ্তি-সংবাদ গতকাল পেয়েছি।

এবারে এখানে শীতটা মৃদু ছিল। তবে বরফের দৃশ্য ওঁর লেখায় পড়ে ধারণা করতে পেরেছেন যে তা কি সুন্দর। কিন্তু আমি লণ্ডন থেকে ফেরার সময় ট্রেন থেকে এবং হুইটলি এসেও heavy frostএর (snow নয়) যা দৃশ্য দেখলাম সে আর জীবনে ভুলবো না। এখন সব গাছগুলি পাতাশূন্য, শুধু ডালে পরিণত, কিন্তু তার উপর ফ্রস্ট [তাপমাত্রা হিমাঙ্কে পৌঁছলে ঘাসে বা গাছে বা বাইরের কোনো ঠাণ্ডা জিনিসে বরফের অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ক্রিস্টাল জমে, তাকে ফ্রস্ট বলা হয়।] জমে এমন সুন্দর একটা রূপ নিয়েছিল, ঠিক মনে হচ্ছিল, আমাদের দেশের উড়িষ্যার ফিলিগ্রী ওয়ার্কের মত রূপোর তার দিয়ে কেউ গাছ তৈরী করে রেখেছে। এখন আবার বসন্তকাল আরম্ভ হয়েছে। চারদিকে মাটি ফুঁড়ে ক্রোকাস্ কত রকমারি রঙের ফুটেছে। ড্যাফোডিল ফুটতে আরম্ভ করেছে। ফরসাইথিয়া [গুল্ম জাতীয়] ফুলে গাছ ভরে গেছে। এর রঙ ঠিক আমাদের দেশের সোঁদালের মত। আর চারদিকে ব্ল্যাকবার্ড, থ্রাশ, রোবিন-রেডব্রেস্ট ইত্যাদি পাখীর গান যা শুরু হয়েছে।...

আপনি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানবেন। এক লাইন লিখে প্রাপ্তি-সংবাদ দেবেন। ইতি

প্রণতা—অমিয়া

চিঠিখানার বোধহয় একতৃতীয়াংশ দেওয়া গেল। স্কয়ার ব্র্যাকেটে কিছু কিছু ব্যাখ্যা দিতে হল পাঠকের সুবিধার জন্য। ইংল্যাণ্ডে বাস করে অথবা ফিরে এসে এখানকার কারো লেখায় প্রকৃতির এমন চমৎকার অন্তরঙ্গ এবং বিস্ময়ভরা বর্ণনা আমি আর দেখিনি। প্রায় প্রতি চিঠিই নিসর্গ সৌন্দর্যের বিস্ময়ে ভরা। এজন্য চিঠিগুলি আরো মূল্যবান হয়ে উঠেছে।

আর দুখানা চিঠির অংশ দিয়ে এ পরিচ্ছেদ শেষ করছি।

Wheatley (Oxon)
27. 4. 71

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার ১৮ই এপ্রিলের চিঠিখানা গতকাল পেয়ে খুব নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আমার বড় চিঠিখানা তা হলে পেয়েছেন। আজকাল আর ডাকঘরে একটুও বিশ্বাস নেই।...এ দেশের লোকও এখন ভয়ানক দায়িত্বহীন হয়ে পড়েছে।...সব দিকে দেশটা রসাতলে যেতে বসেছে।...

আজ আপনাকে একটা সুখবর দিচ্ছি। আপনি লিখেছেন কবে ফিরব আমরা। আমাদের প্রথমে ফেরবার কথা ছিল জুলাইয়ের শেষে কিন্তু একটি প্রস্তাব আসায় আমরা এখানেই থেকে সব শেষ করে ফিরতে ফিরতে নভেম্বর-এর শেষ কিংবা ডিসেম্বরের প্রথম হয়ে যাবে। প্রস্তাব এসেছে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ওঁকে অকটোবর মাসে ৪ টা লেকচার দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে।...ওঁর আর আমার যাতায়াত খরচ, থাকার খরচ ইত্যাদি ছাড়া একটা বেশ ভাল ফী দেবে।...আমরা এখান থেকেই গিয়ে অকটোবর মাসে শিকাগো হয়ে তারপর দেশে ফিরবো।

আমরা ১৯৭০এর নভেম্বর মাসে যে, ইয়র্ক এবং লীড্‌স গিয়েছিলাম সেই খবরটা দেওয়া হয় নি। লীড্‌স বিশ্ববিদ্যালয়ে ওঁর একটা বক্তৃতা ছিল।...আমরা ইয়র্কশিয়রের হাওয়ার্থ-এ ব্রণ্টি মিউজীয়াম দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে আপনার জন্য একটি বুকমার্ক কিনেছি। এই বুকমার্কের প্রথম ছবিটা শারলোট বসে লিখছেন। দ্বিতীয়টা তাঁরা যে বাড়ীতে থাকতেন। তৃতীয়টা যে প্যারিশ চার্চে তাঁদের বাবা প্যাটরিক ব্রণ্টি যাজনা করতেন।

ইংল্যাণ্ডের এক এক জায়গায় এক এক রকমের সুন্দর দৃশ্য। ইয়র্কশিয়র মুয়ারল্যাণ্ডের যে দৃশ্য দূর দিগন্তে যে ভাবে চলে গিয়েছে এবং চক্রবালের সঙ্গে বিলীন হয়ে গিয়েছে, এমিলি ব্রণ্টির উদারিং হাইট-এ এর যে রকম ব্যাখ্যা আছে, ঐ পরিবেশে থাকলে ঐ রকম মনের ভাব আসতে বাধ্য।

আমার কিন্তু ইংল্যাণ্ডে এসে, আমরা এককালে যে সব বড় বড় কবিদের লেখা পড়েছিলাম, সেগুলো খুব মর্মে মর্মে অনুভব করি। যেমন নাকি হ্যাম্পস্টেড হীথ-এ বেড়াতে গিয়ে দেখলাম জঙ্গলের ভিতর অন্ধকার মত ঝোপ ঝোপ ফার্ন আর একটা ছোট্ট নদী, কুলুকুলু শব্দ করে বয়ে যাচ্ছে,

অমনি টেনিসনের 'ব্রুক' কবিতাটা মনে পড়ে গেল—'For men may come and men may go,/But I go on for ever.

এ রকম অনেক কবির অনেক কবিতাই। এখন ক'দিন ধরে একটা প্রশ্ন মনে খুব তোলপাড় করছে। ওঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, উনি বললেন হেরিকের ড্যাফোডিল পড়েননি। কিন্তু সেদিন এক ইংরেজী সাহিত্যের লেকচারারকে জিজ্ঞাসা করেও উত্তর পাওয়া যায়নি। হেরিকের ড্যাফোডিল কবিতায় পড়েছি Fair daffodils, we weep to see, you haste away so soon. কিন্তু ড্যাফোডিল ত দু-চার দিনে শুকোয় না দেখছি। আমাদের বাগানে যে ড্যাফোডিল ফুটেছে ও ফুটেছিল, এক মাসের উপর গাছেই তাজা আছে। আর ফুলদানিতে ঘরে সাজালেও দিন দশ-বারো ত থাকেই।…আবার ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-এর ড্যাফোডিল কবিতাটাও যখনই মাঠে-ঘাটে তাকানো যায় তখনই মনে পড়ে। ইংরেজী কবিতা বা গল্প কিংবা নিসর্গ দৃশ্যের কথা এতদিন পড়ে এসেছি বা ছবিতে দেখেছি, কিন্তু সেটা চাক্ষুষ দেখে একেবারে অন্য রকম একটা অনুভূতি মনে জাগে।

এককালে খুবই ছবি আঁকতাম। এখন সুন্দর দৃশ্য দেখলে হাত নিস্‌পিস করে।…

আর একটা খবর দিয়ে আজকের মত শেষ করি।…আপনারা ত কাগজে পড়ে বিচলিত হচ্ছেন। আর আমরা এখানে T.V. তে সব চোখের সামনে ঘটনাগুলি দেখতে পাচ্ছি। বুঝতেই পারছেন আমাদের অবস্থা। উনি ত এত বিচলিত হয়েছেন যে, একমাস ধরে কোন কাজ মন দিয়ে করতে পারছেন না।…

আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নেবেন।

প্রণতা—অমিয়া

আমার নিজের ধারণা, 'you haste away so soon'-এর so soon কথাটি যে-কোনো প্রিয় ফুল সম্বন্ধেই বলা যায়, তার আয়ু একদিন হোক বা একমাস হোক। মানুষ সম্বন্ধেই যখন কথা আছে life is short—১০০ বছর পরমায়ু হওয়া সত্ত্বেও, তখন একমাসের আয়ুকে স্বল্পায়ু বলায় বাধা কি?

51, Old Road
Wheatley (Oxon)
Oxford, Ox 91NX
18. 1. 71

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার ১১. ১. ৭১ তারিখের এয়ার লেটারখানা এইমাত্র এলো। উনি

একটু কাজে এক্ষুনি লণ্ডন যাচ্ছেন, তাই আমায় উত্তর দেবার জন্য বলে গেলেন। আজই উত্তর না দিলে কত দিনের মধ্যে আর চিঠি লেখালেখি করা যাবে বলা যায় না। কারণ আজই শেষ clearance হবে। আসছে কাল থেকে পোস্টাল স্ট্রাইক সুরু হবে। স্ট্রাইকের ভয়ে যা চিঠিপত্র লিখবার সব আজই লিখে ফেলছি। এদেশেও একটা না একটা হুজুগ লেগেই আছে। সেপটেম্বর অকটোবরে হল ডাস্টবিন স্ট্রাইক, তারপর হল কোল স্ট্রাইক, তারপর হল ইলেকট্রিসিটি স্ট্রাইক, তারপর অয়েল—এখন সুরু হবে ডাকঘর স্ট্রাইক। অয়েল ছাড়া আর সব স্ট্রাইকগুলিতে আমরা পডছি মুশকিলে। কয়লা দিয়ে আমাদের সেন্ট্রাল হীটিং, বিদ্যুৎ দিয়ে শুধু আলো নয়, আমাকে রান্না করতে হয়। তবে চলে গেছে কোনক্রমে। কিন্তু ডাক বন্ধ হলে হবে বিপদ।···

আপনার চিঠি পেয়ে আমরা দু'জনেই খুব খুশী হয়েছি। আজ আপনার চিঠি পেয়ে জানতে পারলাম যে হিন্দুস্থান স্ট্যানডার্ডে ওঁর বরফ থেকে আলো কি ভাবে ভূমি থেকে আকাশে প্রতিফলিত হয় সে বিষয়ের লেখাটি বেরিয়েছে। এবং দ্বিতীয়টাও বেরিয়েছে। জানেন, কেউ একটা লেখে না দেশ থেকে যে, লেখাটা কেমন লাগল মাঝে মাঝে ওঁর ভাইঝিরা ছাড়া। এবং বের হল কিনা তাও জানতে পারি না।

এখানে অর্থাৎ লণ্ডনে, গত জুন মাসে আসার পর থেকে খালি ভাবি আপনাকে লম্বা চিঠি লিখবো, আর কতবার আরম্ভ করি, কিন্তু সে আর শেষ হয় না। যখন যা দেখি, মনে হয় শুধু আমরা একা কেন উপভোগ করবো, তক্ষুনি আপনাদের লিখে জানাতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু কাজকর্মে এমন জড়িয়ে পড়ি যে, আর শেষ করা হয় না।···এদেশের লোকের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি সব আমাদের থেকে যে কত তফাৎ অথচ আমরা নিজেদের ব্যবহার দিয়ে কতখানি এদের কাছে এসে যাই এবং অনেকে কত তফাতে সরে পড়ে···

আগেই আপনাকে জানিয়েছি আমরা হুইটলি বলে একটা ছোট্ট গ্রামে বাড়ী নিয়েছি। গ্রামটি ভারী সুন্দর। চারদিকেই পাহাড়। আমাদের বাড়ীটা একটা পাহাড়ের গায়ে ছোট্ট একতলা বাংলো। বাড়ীটি খুবই ভাল পাওয়া গিয়েছে, আর গ্রাম বলেই খুব কম ভাড়া।···বাড়াটায় ৫ খানি ঘর, ৩টি বেড-রুম, ১ টা সিটিং রুম, ১ টা ড্রইং রুম, আর প্রকাণ্ড কিচেন,

টয়লেট-বাথ বাড়ীর সামনে। পেছনে বাগান, গ্যারাজ, কোল-শেড, টুল-শেড, টেলিফোন, টেলিভিজন, পুরো বৈদ্যুতিক গ্যাজেট, ওয়াশিং মেশীন, তাছাড়া বেডিং, লিনেন, বাসনপত্র যাবতীয় যা ঘর-সংসার করতে লাগে। কিচেন গার্ডেনে নিজেই খুঁড়ে খুঁড়ে বাগান করতে লেগে গিয়েছি। বাঁধা-কপি, বীন, এসব লাগিয়েছি- বেশ সুন্দর গজিয়েছে।

গ্রাম হলে কি হবে। আমি দেখছি এখানে সংসার করা বেশী সোজা। ফোনে বলে দিলেই বাজার সওদা সব বাড়ী পৌঁছে দিয়ে যায়। গ্রামের বাসিন্দারা অতিশয় অমায়িক, ও ঘরোয়া। তরিতরকারী মাছ ডিম মাংস সব তাজা পাওয়া যায়। আমাদের দেশের মত এখানেও ধোপা সপ্তাহে একদিন এসে জামা-কাপড় নিয়ে যায় ও দিয়ে যায়। দিল্লীতে আমাদের পাড়ায় যেমন আমি সর্বজনীন মাইজী, এখানেও তেমনি আমি সর্বজনীন 'মা' তে পরিণত হয়েছি। কাগজে স্ট্রাইকের খবরটা দেখে চিঠি ডাকে দেবেন। আপনি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নেবেন, ইতি—

স্নেহধন্যা অমিয়া

"তক্ষুনি আপনাদের লিখে জানাতে ইচ্ছে হয়"—কথাটি অর্থপূর্ণ। আনন্দে হোক বা বেদনায় হোক, মন যখন আলোড়িত হয়, এবং যখন তা অন্যকে শোনাবার জন্য মনে একটা অদম্য প্রেরণা জাগে, সাহিত্য রচনার মূলে থাকে সেই প্রেরণা। আরনল্ড বেনেট এই কথাটা সুন্দর ভাবে বলেছেন—You were full of your discovery. You were under a divine impulsion to impart that discovery. You had a strong sense of the marvellous beauty of something, and you had to share it.

শ্রীমতী অমিয়ার মধ্যে সাহিত্যসৃষ্টির পূর্ব শর্ত সবই ছিল, কিন্তু "পণ্ডিত স্বামী'র প্রাইভেট সেক্রেটারি রূপেও তাঁর জীবনের সার্থকতা কিছু কম হয়েছে মনে হয় না।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

অমিতা রায় বিমানে বসে কত উচ্চতা থেকে চিঠি লিখেছিল জানি না, (৪০৫ পৃঃ দ্রঃ) কিন্তু ১৭০০০ ফুট উচ্চতায় বসে আমার কাছে এ জীবনে একটিমাত্র ব্যক্তি চিঠি লিখেছে ১৯৬৪ সনে, তার নাম তপতী বিশ্বাস। তার চিঠিখানা এই—

Advance Base Camp
17000 ft.
24. 4. 64

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

গতকাল আমরা গোটা দলটা বেস্ ক্যাম্প ছেড়ে অ্যাডভান্স বেস ক্যাম্পে এসে পৌঁছেছি। উচ্চতা ১৭০০০ ফুট। চারধারে শুধু বরফ আর বরফ। ভীষণ ঠাণ্ডা। এই নির্জন স্থানে আমরা ছয় জন শিক্ষার্থিনী, দুইজন ইন্‌সট্রাক্টর আর দশজন হায়ার অ্যালটিচুড শেরপা তাঁবু খাটিয়ে বাস করছি। আগামী ২৮শে এপ্রিল যাত্রা করব। চূড়ার নাম ফর্কড পীক (Forked Peak), ২২০০০ ফুটেরও বেশী উঁচু। জানি না কতদূর পর্যন্ত এগোতে পারব। এখনও পর্যন্ত আবহাওয়া ভাল দেখা যাচ্ছে। তবে গতকাল সারারাত খুব বরফ পড়েছে, তার জন্য ঠাণ্ডাও খুব বেশী। হাত জমে যাচ্ছে। বরফের উপরেই তাঁবু টাঙিয়ে অস্থায়ী আস্তানা তৈরী করেছি আমরা কটি প্রাণী মিলে। মাঝে মাঝে গরম প্যান্টে হাত ঘষে নিয়ে তবেই লিখতে হচ্ছে। আমাদের এই ক্যাম্পের ঠিক সামনেই দেখা যাচ্ছে ঈস্ট রোটাং হিমবাহ। তার চারদিকে সিকিম হিমালয়ের নামকরা সব শৃঙ্গ। এবারে আসল শিক্ষার পালা শুরু।

Rock climbing, chimney climbing ইত্যাদি এগুলো আগেই শিখেছি। এখন শিখছি আরও উঁচুতে বরফের উপর সিঁড়ি বানাতে, ফাটলের উপর রোপ ব্রিজ করতে, তার উপর দিয়ে বুকে হেঁটে ফাটল পার হতে, গর্তে কেউ পড়ে গেলে তাকে উদ্ধার করতে আর ইগলু (এস্কিমোদের বরফের ঘর) বানাতে। আমাদের ইগলু হচ্ছে বরফে গর্ত করে তার ভিতর



তুষারাবৃত পর্বতের উচ্চতায় ওঠার পোশাকে মাউনটেনিয়ারিং ছাত্রী—
তপতী বিশ্বাস

ফোটো : পরিমল গোস্বামী, ১৯৬৫

প্রয়োজন মত যাতে আশ্রয় নেওয়া যায়। এতে তুষার ঝড়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

এইসব আনুষঙ্গিক ট্রেনিং শেষ করে আমরা চূড়ায় আরোহণের জন্য এগিয়ে যাব। এগিয়ে ত যাব, কিন্তু কতদূর পর্যন্ত জানি না। আদৌ পারব কিনা তারও নিশ্চয়তা নেই। আবহাওয়া এখনও পর্যন্ত মোটামুটি ভালই। গতকাল সারারাত ধরে তুষারপাত চলেছে। সকালে উঠে দেখি সমস্ত তাঁবু প্রায় বরফে ঢেকে আছে। সেজন্য ঠাণ্ডাও বেশী। তাঁবুর মধ্যে বসে বসে আমি ও আমার তাঁবু সঙ্গিনী রাণী ভগবানদাস (অন্ধ্রের মেয়ে) দুজনে দু'জায়গায় চিঠি লিখছি। উঃ কি ঠাণ্ডা! গরম গরম চা আর কফি খাচ্ছি। খিদে একেবারেই নেই। সব সময় মাথা-ধরা আর বমি বমি ভাব। মাঝে মাঝে অকারণে খুব কান্না পাচ্ছে। এ সমস্তই altitude sickness, তবে আরো দু' একদিন পরে acclimatised হয়ে গেলে আর কোন অসুবিধা হবে না।

এখানে জল বলে কোন পদার্থ নেই। সবই জমাট বরফ। স্টোভে বরফ গলিয়ে জল তৈরি হচ্ছে, কিন্তু সেই জল কাজে লাগাবার আগেই আবার বরফ হয় যাচ্ছে। ঠাণ্ডায় আর লেখা যাচ্ছে না। আজ এখানেই শেষ করছি।

—তপতী বিশ্বাস

গত ২৪।৫।৬৩ তারিখের ইতস্ততঃতে এই চিঠির কিছু অংশ উদ্ধৃত করে ১৭০০০ ফুটের দাবী প্রগতি বিষয়ে মন্তব্য করেছিলাম। সে অবশ্য অক্সিজেন-বিরল মনো-বায়ুস্তরের মন্তব্য। মাউনটেনিয়ারিং বাঙালী মেয়ে দূরের কথা, বাঙালী ছেলেদের মধ্যেও যখন কল্পনার অতীত ছিল, তখন থেকে আমি এ বিষয়ে চিন্তা করতে আরম্ভ করেছি। এবং এ শিক্ষা তো আরম্ভ হল তেনজিং-এর শিক্ষাধীনে ১৯৫৩ সনের এভারেস্ট বিজয়ের অনেক পরে। এবং সেই পূর্ব যুগে, যখন বাঙালী ছেলেরা ও মেয়েরা শুধু সাঁতার নিয়ে ব্যস্ত, সেই সময় রেডিওতে পাহাড়ে ওঠা বিষয়ে একটি কথিকা প্রচার করেছিলাম। আমার অবশ্য পর্বতারোহণ পরিকল্পনা ছিল অন্য উদ্দেশ্যে। বলেছিলাম এ কাজ আরম্ভ করা উচিত তথ্য সংগ্রহের জন্য। প্রথমে পরিচিত স্থানে আরোহণ, ক্রমে অপরিচিত স্থানে এবং তারপর ক্রমে উঁচুতে ওঠা। প্রতি বৎসর পূর্ব বৎসর অপেক্ষা বেশি তথ্য সংগ্রহ এবং বেশি অপরিচিত স্থানে অভিযান

চালানো। এইভাবে পাহাড়ে ওঠার একটা ঐতিহ্য গড়ে তোলা দরকার বাঙালী যুব সম্প্রদায়ের।

শান্তি পাল তখন সাঁতারে ঝুঁকেছিল খুব। তার ছাত্রী লীলা চাটুজ্জে থাকত বারুইপুরে। শান্তি ছিল আমার বিশেষ অনুগত। তার আমন্ত্রণে বারুইপুরে গিয়েছি, লীলার সাঁতার কৌশল দেখেছি, ফোটো তুলেছি। লীলাব কথা পরে কিছু বলা যাবে।

শান্তি পাল খুব কবিতা লিখত, এবং তার প্রথম যুগে কবিতার ছন্দ অথবা ভাব সামঞ্জস্য ঠিক আছে কিনা প্রায়ই দেখাতে আনত আমার কাছে। একদিন তাকে বললাম, তুমি তো একা মানুষ, তোমার পক্ষে প্রতি বছর এক এক দল ছেলেকে পাহাড়ে নিয়ে পাহাড়ে তথ্য সংগ্রহ শেখাতে আরম্ভ কর। কবিতাতে কিছু হবে না, সাঁতারও শেষ পর্যন্ত কে কত ঘণ্টা জলে চিৎ হয়ে ভেসে থাকতে পারে তাইতে শেষ হয়। স্পোর্ট হিসেবে মন্দ নয় কিন্তু ওতে সমাজের ব্যাপক কিছু উপকার হয় না। ইত্যাদি অনেক কিছু বলেছিলাম। শান্তি পাল কথাটি হৃদয়ঙ্গম করল এবং বলল এ বিষয়ে আরো আলোচনা করবে। আমি খুব খুশি হলাম শুনে। দিন'পনেবো পরে শান্তি এসে হাজির। বলল এই কবিতাটি একটু দেখে দিন না?

পাহাড়ে ওঠা শেখার কথায় তাই তপতী বিশ্বাসের দাদা বিশ্বদেব বিশ্বাসের সঙ্গে (অনুমান ১৯৬২ তে) পরিচয় হওয়া মাত্র তাকে বললাম ধারাবাহিকভাবে সব লিখতে থাক। এবং যদিও আমার পূর্বে যে পরিকল্পনা ছিল—বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার উদ্দেশ্যে পাহাড়ে ওঠা অভ্যাস করা, তা না হলেও বাঙালীর পক্ষে মাউনটেনিয়ারিং শিক্ষাও আমার কাছে খুবই একটা আনন্দ সংবাদ বলে মনে হল।

বিশ্বদেবের সে রচনাগুলির সংগ্রহ পুস্তকাকারে বেরিয়েছিল। তারপর বিশ্বদেব কাবরুডোম শিখরে (২১৬৫০ ফুট) অভিযানের সফল নেতৃত্ব করেছিল। তারপর তার নানা অভিযানের নেতৃত্ব। এই অভিযান কাহিনীও আমি ধারাবাহিক ছাপার ব্যবস্থা করি।

একদিন তাকে বলেছিলাম 'তিন দিন চিন্তা করার সময় দিচ্ছি, তিন দিন পরে আমাকে জানাবে পর্বতারোহণ সহজ না ৩০-এ বাসে ওঠা সহজ?' আমি তখন ৩০-এ বাসে যাতায়াত করতাম যুগান্তর থেকে। সে উঠত আমার আগে, আমার জন্য আসন রাখার জন্য। বিশ্বদেব ভেবে বলেছিল

পর্বতারোহণ অনেক সহজ। কিন্তু ৩০-এ বাসে ওঠার চেয়েও কঠিন কাজ সে সম্প্রতি করেছে। অর্থাৎ বিবাহ করেছে।

এইবার তপতার পূর্বের দুখানা চিঠি এখানে উদ্ধৃত করি।

হিমালয়ান মাউনটেনিয়ারিং ইনসটিট্যুট
দারজিলিং
১১।৪।৬৪

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

এবারের দলে শিক্ষার্থিনী ছজন। ভারতের প্রায় সব রাজ্য থেকেই মেয়েরা এসেছে—মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র, গুজরাট, মহীশূর. বাংলা থেকে শুধু আমি। আমাদের শিক্ষা শুরু হয়ে গেছে। এখন theoretical class চলছে, তার মানে নানা লেকচারের পালা। আমাদের এবার একটা নতুন ও গুরুত্ব পূর্ণ কাজ করতে হচ্ছে। ম্যাপ দেখে বই পড়ে লেকচার শুনে পরিকল্পনার কাজ এগিয়ে চলেছে। বেশ শক্ত কাজ। পরিকল্পনাটা হচ্ছে পশ্চিম সিকিমের ‘ফর্ক্‌ড পীক’-এ আমাদের অভিযান শুরু হবে স্থির হয়েছে।

আমরা শিক্ষার্থিনীরা ছাড়াও আমাদের সঙ্গে থাকবেন দুজন instructor ও পনেরো জন শেরপা, আর কিছু কুলি। তারা আমাদের মালপত্র পৌঁছে দেবে। আরও আনন্দের কথা সঙ্গে থাকছেন স্বয়ং শিক্ষাগুরু তেনজিং। নতুন ডাক্তার ক্যাপটেন সোরাস, সকলের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করলেন। দলের সকলেই বেশ সুস্থ এবং শক্তসমর্থ। অর্থাৎ হাই অ্যালটিচুডে আরোহণ করার উপযুক্ত। আর দুএক দিনের মধ্যেই দুর্গম পথে যাত্রা শুরু হবে আমাদের। মনে এক অদ্ভুত উত্তেজনা ও আনন্দ। বেশ বুঝতে পারছি এক বছর আগেকার সেই পরিচিত পথটা আবার আকর্ষণ করছে।···

তপতী বিশ্বাস

ইয়কসাম
১৭।৪।৬৪

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

দারজিলিং ছেড়ে হাঁটতে হাঁটতে দুটো ক্যাম্প করার পর এখানে এসে পৌঁছেছি। এ পথের শেষ গ্রাম এটি। উচ্চতা প্রায় ৫০০০ ফুট—দারজিলিং থেকে প্রায় ১০০০ ফুট নীচু। এর পর থেকে শুরু হবে ঘন জঙ্গল—যেমন স্যাঁত-

সেঁতে তেমনি অসংখ্য জেঁাকে ভরতি। তার জন্য সব সময় একটা সন্ত্রস্ত ভাব —এই বুঝি জেঁাকের আক্রমণ হল। জেঁাকের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য সঙ্গে তামাক পাতা আর নুনের পুঁটুলি নিয়েছি।

প্রথম দিন অনভ্যাসের ফলে পাহাড়ী পথে এই চড়াই উৎরাই ক্রমাগত অতিক্রম করে চলতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। তেষ্টায় পাগলের মত জল খেয়েছি, তাই হয়ত বেশী কষ্ট হয়েছিল। পিঠে ভারি বোঝা, হাতে তুষার গাঁইতি বা ice axe নিয়ে রোজ ৭।৮ মাইল করে হাঁটায় সর্বাঙ্গে অসহ্য ব্যথা। দুটি পায়ে বড বড় ফোস্কা, মাথার উপর চনচনে রোদ। তবে একমাত্র সান্ত্বনা আগামী কাল পুরো বিশ্রাম। পরশু থেকে আবার চলা শুরু হবে।

জঙ্গরী ২০।৪।৬৪—আজ গোটা পথটাই ছিল চড়াই। একহাঁটু কাদা ভরা রাস্তার দুধারে "উদ্ধত যত শাখার শিখরে রডোড্রেনডন গুচ্ছ।" পায়ের কাছে লাল হলুদ গোলাপী ফুলের পাপড়ি। ঠিক না দেখলে বোঝান যায় না।

খানিকটা চলার পর একটু একটু করে তুলোর মত তুষারপাত হতে শুরু করল। রেন কোট চাপালাম গায়ে। এবার ঝিরঝিরিয়ে পড়া তুষার গুলো তার উপর জমতে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখি তুষার গাছের পাতা-গুলোকে ভারী করে দিয়েছে। এই প্রথম তুষারপাত দেখেই সমস্ত ক্লান্তি আর জড়তা যেন এক মিনিটে উবে গেল। এতদিন যা শুধু ফিলমে দেখেছি আজ তা বাস্তবে দেখলাম, একেবারে ব্যক্তিগত পিঠের উপর। বেশ মজা লাগছিল বরফের গোলা তৈরি করে সকলের গায়ে ছুঁড়ে মারতে। মাটিতে পা পিছলে যাচ্ছিল বরফের জন্য। কতবার যে আছাড় খেয়েছি তার ঠিক নেই।

জঙ্গরী জায়গাটা ১৩,৫০০ ফুট। কাজেই ঠাণ্ডা খুব বেশী। কাঁপতে কাঁপতে তাঁবুতে পৌঁছলাম সবাই। ঠাণ্ডা হাওয়া। অ্যালটিচুড সিকনেস বা উচ্চতা ব্যামো আরম্ভ হয়েছে, সকলেরই এক অভিযোগ—মাথা ধরেছে।

পরের দিন দেখা গেল শাদা বরফের আবরণ, তাঁবুর উপর জমা বরফ।

তপতী বিশ্বাস

তপতীর এই পর্বতারোহণ, পরে আরো অনেক বাঙালী মেয়ে অনুসরণ করেছে। কিন্তু পরিণামে কতটা কি লাভ হচ্ছে এখনো তার হিসাব আসেনি। তবে তপতীর ১৭০০০ ফুট থেকে স্থায়ী ভাবে সী-লেভেলে পতন ঘটেছে, অর্থাৎ সে বি-এ পাস করে কলকাতায় চাকরি জীবন যাপন করছে।

পুনশ্চঃ—কি জাতীয় পোশাকে বরফের দেশে পথ ভেঙে ওঠে, তা দেখতে চেয়েছিলাম। একদিন বিশ্বদেব সেই বোঝা নিয়ে তপতীর সঙ্গে এসে হাজির। সেই পোশাকে, আইস-অ্যাক্স হাতে, চোখধাঁধানো রোদের হাত থেকে চোখ-বাঁচানো কালো চশমা পরা তপতীর একখানা ফোটোগ্রাফ তুলেছিলাম ১৯৬৫ সনে। সেইখানা এইসঙ্গে মুদ্রিত হল।

লীলা চাটুজ্জের নাম করেছি তপতীর প্রসঙ্গে। সে এখন লীলা বন্দ্যোপাধ্যায় পুত্রকন্যার জননী। এমন অবস্থায় সে ১৯৬১ সনের ১৩ই ফেব্রুয়ারি আমাকে বারুইপুর থেকে লিখে জানিয়েছিল সে তখন ইংলিশ চ্যানেল পার হবার জন্য আয়োজন করছে। কিন্তু নানা বাধা, ফরেন এক্সচেঞ্জ মিলছে না। ভীষণ উৎসাহ একাজে।

ঐ একই ঠিকানা থেকে ১২।৬।৬১ তারিখে লিখল "আপনি জানেন এ বছরও আমি ইংলিশ চ্যানেল পারে যাবার চেষ্টা করছি। কি হবে বলতে পারছি না।"—তারপর ১৯৬৪ নবেম্বর মাসে শান্তিনিকেতন থেকে জানাল সে সন্তরণ শিক্ষিকা হয়েছে সেখানে। সুধাকান্ত রায়চৌধুরী প্রসঙ্গে (৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) তার নাম উল্লেখ করেছি, তখন সে ওখানে। তারপর ৩।১০।৬৮ তারিখে জানাল সে দুর্গাপুরে বাস করছে। অর্থাৎ তার সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার ইচ্ছা সফল হয়নি। ইংলিশ চ্যানেলের চেয়েও প্রশস্ততর সমুদ্রে সে এখন সন্তরণে রত আছে—সংসার সমুদ্রে। এবং এ সমুদ্র ইংলিশ চ্যানেল থেকে শুধু বৃহত্তর নয়, মহত্তর।

এই প্রসঙ্গে মনে এলো আর এক উর্ধ্বে-ওঠা (ওড়া) মেয়ের কথা। উর্ধ্ব সীমায় শ্রীমতী দূর্বা বন্দ্যোপাধ্যায় কত ফুট উঠেছে সে সব বৃত্তান্ত বিস্তারিত ভাবে আমাকে জানাবে বলেছিল, কিন্তু সময় পাচ্ছে না। তবে তার উর্ধ্বে ওঠা বিমানে, পাইলট রূপে। তার সী-লেভেলে পতন সহজে ঘটবে বলে মনে হয় না।

শেষ পরিচ্ছেদ

অনেক দিন আগে—১৯৩৪ সনে--একখানি ইংরেজী 'Merry Stories' নামক বইতে একটি কৌতুক পড়েছিলাম—তা হঠাৎ মনে পড়ে গেল এই পরিচ্ছেদ কি ভাবে আরম্ভ করব তা ভাবতে ভাবতে। সে কৌতুককাহিনীটি এই—একটি লোক টেলিফোনের অপারেটরকে একটি বিশেষ নম্বরে লাইনটি দিতে বলল। অপারেটর বলল, ওটা তো আপনার নিজের নম্বর। লোকটি বলল, জানি, আমি নিজের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

আমিও এই পরিচ্ছেদে তাই করতে যাচ্ছি। যে চিঠিখানা আমার সামনে পড়ে আছে, সেটি একখানা পোস্ট কার্ড—১৯০৭ সনে লেখা, এবং আমারই লেখা, আমার পিতার কাছে! সবুজ কালিতে লেখা সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজত্বের এক পয়সা দামের এই পোস্ট কার্ডখানা আজও আমার কাছে কি করে আছে মনে আনতে পারছি না। কিন্তু এই চিঠির পথেই প্রথম জীবনে ফিরে যাওয়ার একটা সুযোগ পাওয়া গেল।

১৯০৭ সনের প্রাচীন ভঙ্গির বাংলা গদ্য! আমার বয়স তখন নয় থেকে দশের মধ্যে। চিঠিখানা ডিকটেশনে লেখা—অর্থাৎ অন্যের বলে যাওয়া ও আমার লেখা। সেখানা এই রকম—

শ্রীশ্রীহরি সহায়

সাতবাড়িয়া [পাবনা]
৫ই আশ্বিন ১৩১৪

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু,

আজ ১০।১২ দিন হইল আপনার কোন পত্র না পাইয়া বড়ই চিন্তিত আছি পত্র না লেখার কারণ কি বুঝিতে পারি নাই পত্র পাঠ মাত্র কুশল সমাচার লিখিয়া নিশ্চিন্ত করিবেন। মাতাঠাকুরাণীও এ পর্যন্ত আসেন নাই এবং তাঁহার পত্রাদিও অনেক দিন পাইনা। এই সকল কারণে বড়ই চিন্তিত আছি ইতিপূর্বে যে পত্র লিখিয়াছি তাহা বোধ হয় পাইয়া থাকিবেন বড়মার ব্যারামের কথা লিখিয়াছিলাম তাহা আরোগ্য হইয়াছে আমি ভাল আছি ও গ্রামেও ব্যারাম নাই পত্রের উত্তর সত্বর লিখিবেন শ্রীচরণে নিবেদন

ইতি
Parimal Goswami
Satbaria

নামস্বাক্ষরটি ইংরেজীতে। মাঝে অনেক বাক্যে প্রাচীন বাংলার মতোই কোনো ছেদচিহ্ন নেই। এই ৬৪ বছর আগের ভাষা দেখে অনেক কথাই মনে আসে। এ সময়ের বহু আগে থেকে বাংলা ভাষা অনেক এগিয়ে গেছে। আমি পাবনা জেলার একটি গ্রামে বসে যখন এই ভাষায় চিঠি লিখছি, তার ১৬ বছর আগে প্রায় ২৮ মাইল দূরে, পাবনা জেলার আর এক গ্রামে বসে রবীন্দ্রনাথ আর এক ভাষায় চিঠি লিখছেন—

..."একলা বসে বসে আমি যে এর ভিতরে কি অনন্ত শান্তি এবং সৌন্দর্য দেখতে পাই সে আর ব্যক্ত করতে পারিনে। ..মাথাটা জানালার উপরে রেখে দিই, বাতাস প্রকৃতির স্নেহহস্তের মত আস্তে আস্তে আমার চুলের মধ্যে আঙুল বুলিয়ে দেয়, জল ছলছল শব্দ করে বয়ে যায়, জ্যোৎস্না ঝিকঝিক করতে থাকে এবং অনেক সময় "জলে নয়ন আপনি ভেসে যায়।" অনেক সময় মনের আন্তরিক অভিমান, একটু স্নেহের স্বর শুনলেই অমনি অশ্রুজলে ফেটে পড়ে,—এই অপরিতৃপ্ত জীবনের জন্যে প্রকৃতির উপর আমাদের আজন্মকালের অভিমান আছে, যখনি প্রকৃতি স্নেহমধুর হয়ে ওঠে তখনই সেই অভিমান, অশ্রুজল হয়ে, নিঃশব্দে ঝরে পড়তে থাকে—তখন প্রকৃতি আরো বেশি করে আদর করে, এবং তার বুকের মধ্যে অধিকতর আবেগের সহিত মুখ লুকোই।" (সাজাদপুর, ২২শে জুন ১৮৯১, ছিন্নপত্র)

রবীন্দ্রনাথের এ ভাষা কত দিন আগে থেকে আয়ত্ত হয়েছে, অথচ গ্রামের ভাষা পড়ে আছে প্রায় বিদ্যাসাগরের যুগে। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য ৩০ বছর বয়সে লিখেছেন, আর আমি লিখছি ৯ বছর বয়সে। কিন্তু তিনি এরও বহু আগে ১৭-১৮ বছর বয়স থেকে যে ভাষায় লিখছেন, (য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র দ্রঃ) প্রকৃতিকে যে চোখে দেখেছেন, ভাষার কথা দূরে থাক, সে চোখে প্রকৃতিকে দেখা আজও আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

গ্রামে বাসকালে প্রকৃতির মধ্যে ডুবে ছিলাম, নিজেকে তার অংশ বলেই হয় তো তাকে বাইরের দৃষ্টিতে দেখতে পারিনি। কিন্তু সেই পল্লী-জীবন থেকে দূরে সরে এসে আজও পরমাত্মীয়ের বিচ্ছেদ বেদনাই অনুভব করি মাত্র, আর কল্পনায় মনে মনে ছবি গড়ি।

দক্ষিণ পাবনা ও উত্তর পশ্চিম ফরিদপুর জেলা মিলিয়ে ছিল আমার চল্লিশ বছরের পল্লী বিচরণ ভূমি। শহরে পড়াশোনা করেছি, তারপর ১৯৩৭ থেকে সম্পূর্ণ শহরবাসী।

পল্লীর মাটির উপর শুয়ে পড়ে থাকা, তার ঘাসের উপরে বন্ধুদের সঙ্গে মিলে খেলা-শেষে বিশ্রাম। পাবনার পদ্মানদী অথবা ফরিদপুরের চন্দনা নদীর জলে প্রতিদিন সাঁতার কাটা, এবং এক একটি বেলা জলে কাটানো, ঝড়বৃষ্টি শিলবৃষ্টির তাড়ায় ছুটে আসা ; ধানক্ষেত, পাটক্ষেত, আকের খেতের স্পর্শ অনুভব করা ; শীতকালে মাঠে মাঠে কড়াইশুঁটি খাওয়া, কুল খাওয়া ; সরষের ক্ষেতের হলুদ সমুদ্রে, তার মাদকতাপূর্ণ গন্ধে, নেশাগ্রস্ত হওয়া ; নদীতে, ডোবায়, নানা ভাবে মাছধরা ; বর্ষার বিপজ্জনক পদ্মায় ছোট ইলিশ মাছ ধরার নৌকায় বসে বসে বহু দূর চলে যাওয়া, আবার পাল তুলে ফিরে আসা ; বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো, পাখীর বাসা দেখা, ছানা ধরা। জোঁক, কেঁচো, সাপ, শূয়োর, ঝমর ঝমর করে ছুটে-চলা সজারু, আর লাফারু বন-বিড়ালদের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন , নদীতে কুমীরের পেরিসকোপের মতো দুটি চোখ ভাসিয়ে ছুটে চলার দৃশ্য, শুশুকের হুশ করে উঠেই ডুবে যাওয়া, এ সব দৃশ্যের সঙ্গে কি ঘনিষ্ঠ পরিচয়। কখনো শীতকালে ঘরের পাশে বাঘ ডাকার শব্দ শোনা। মাছদুধফলফুল থেকে আরম্ভ করে আকাশ বাতাস, চাঁদের আলো, অন্ধকার আকাশের নক্ষত্র—আর প্রায় দিগন্তব্যাপী শূন্যতার কি যে প্রাচুর্যের মধ্যে ছিলাম, তা বর্ণনাতীত। রক্তে সে সবের স্মৃতি বয়ে বেড়াচ্ছি আজও।

এক একটা মুহূর্তে সব মনে পড়ে যায়। সর্বাঙ্গে সর্বমনে যার স্পর্শ জন্মের পর থেকে অনুভব করেছি, সে সবই তো আমার সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধা ছিল। যখন ছিল, তখন তা বুঝতে পারিনি। ঐ সব মিলিয়ে তবে তো আমি ছিলাম সম্পূর্ণ। হাওয়ার মধ্যে বাস করে হাওয়ার অস্তিত্ব যেমন ভুলে থাকি, কেবল ঝড়ের হাতে মার খেলে তবে বোঝা যায় যে আমাকে যারা গড়ে তুলেছে ঝড়ও তাদের একটি উপকরণ। বইতে পড়ে জানতে পেরেছি দেহের প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ১৫ পাউণ্ড করে বায়ুর চাপ সবসময় বয়ে বেড়াচ্ছি—আমি জমির যে উচ্চতায় বাস করি সেখানে। অর্থাৎ যাকে বলে sea-level, তাইতে। তাই এই সী-লেভেল ছেড়ে যেদিন (১৯১৩) ছয়সাত হাজার ফুট উপরে উঠেছিলাম স্কুল জীবনে, সেদিন দেহের উপরকার বায়ুর চাপ কি পরিমাণ কমেছিল জানি না, কিন্তু উন্মাদ হতে আর বাকি ছিল না।

এ সব কথা মনে এলে সমস্ত পল্লীর স্মৃতি একসঙ্গে মনে জেগে ওঠে।

আমরা বন্ধুরা মিলে কতদিন চন্দনা নদীর ধারে ঘাসের উপর শুয়ে গ্রীষ্ম সন্ধ্যা কাটিয়েছি। কোনো বন্ধুর বাড়ির ডাব চুরি করে সেখানে বসে বসে খেয়েছি, দুপুরের গ্রীষ্মে আমগাছের ছায়ায় বসে গরম হাওয়া 'উপভোগ' করেছি। একটু বাইরে রেললাইনের উপর থেকে গ্রামটিকে অদ্ভুত রহস্যাবৃত বোধ হত, বিশেষ করে রাত্রিবেলায়।

গ্রামে প্রবেশের মুখে পথের দুধারে বাঁশঝাড়। তার আশেপাশে কত আম কাঁঠাল গাব গাছ, গাছ থেকে গুলঞ্চ লতার ঝুরি নেমে এসেছে নিচের দিকে। তেলাকুচার লতা, মাকালফলের লতা আর তিতপোল্লার লতা। পদ্মা-ধৌত দক্ষিণপাবনা ও উত্তর-পশ্চিম ফরিদপুরের চেহারা একই। গাছপালা লতা সব এক। এখন সেই তিতপোল্লার স্মৃতিও কত মধুর লাগে। ভদ্র নাম ধুন্দুল। তরকারীরূপে খাওয়া যায় না, শুধু তার শুকনো কঙ্কাল গায়ে সাবান ঘষার কাজে লাগে। ইংরেজী নাম লুফা (loofah)। এই সব লতা প্রত্যেকটি গাছের সঙ্গে প্রায় জড়াজড়ি করে বেড়ে ওঠে। তেলাকুচা ছোট পানতুয়ার আকারের সবুজ ফল, পাকলে উজ্জ্বল লাল, মাকালের চেয়েও যেন বেশি লাল। জঙ্গলে উচ্ছে লতার প্রাচুর্য, ছোট ছোট উচ্ছে ফলে আছে। কেই বা পাড়ে আর কেই বা অত খায়। তারপর বেতের ঝাড। এক একটি বেত-গাছ প্রায় ১৫।২০ ফুট উঁচু, লতার মতো লিকলিকে, বেশি মোটা নয়, স্কুল মাস্টারের বেত হয় তাতে। ঝাড়ের বেতগাছগুলি ঘন সন্নিবিষ্ট, তার কাঁটা ঠেলে ভিতরে যায় কার সাধ্য। তার পাকা ফল টক-টক স্বাদের, মুখরোচক। নাম বেথোল। বেত ফলের অপভ্রংশ বেথোল। রেলের ধারে আকন্দ গাছ আর নীল গাছগুলিকে আচ্ছন্ন করে ঢেকে রয়েছে আলোক লতা, কাঁচা সোনার মতো রং, চোখের তৃপ্তি। বেতের ঝাড় থেকে বেত বড় কেউ কাটে না, অমনি থাকে, মাঝে মাঝে বেতকাটা লোকেরা এসে কেটে নিয়ে যায়। তার কচি ডগা আমরা খেয়েছি ভাতে সেদ্ধ করে, কিছু তেতো স্বাদের, শুনতাম খুব উপকারী। কি উপকার টের পাইনি কখনো। তাকে বেতাগ বলা হত। বেতের আগ = বেতাগ।

গ্রাম্য পথের দুধারে আশশেওড়ার আর ঘেঁটু ফুলের ঝোপ। দেশে তার নাম ভাঁটফুল, বিভূতি বন্দ্যোর ভাঁটফুল। ফাল্গুন চৈত্র মাসে সেই সাদা সুগন্ধ ফুলে পথের দু ধারে কি শোভা! যেন তুষার পাত হয়েছে ঝোপে। গ্রামের উত্তর-পূব দিকে, নতুন রেলপথের পারে (কালুখালি ভাটিয়াপাড়া লাইন

বেরিয়ে এসেছে মূল রেলপথ থেকে) সেইখানে পুরানো আমলের ভাঙা নীল কুঠি আর তার প্রকাণ্ড জীর্ণ 'ভ্যাট' জঙ্গলে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, তার আশে-পাশে নীলগাছের ছড়াছড়ি। ছেলেবেলায় সেই ঝাঁকড়া সবুজ পাতার গাছগুলি দেখে কিছুতে ভাবতে পারতাম না যে এ থেকে নীল কি করে তৈরি হত। আর এখন যেমন সবুজ মেহেদি পাতা দেখেও ভাবতে পারি না এ থেকে লাল হলদে রং বেরোয় কি করে।

পদ্মার ওপারে পাবনা। পাবনা জেলায় আমাদের পূর্বতন বাড়িতে দেখেছি সমস্ত জঙ্গল ভরা পিঁপুল লতা। দুতিন ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা শাদা ছিট আঁকা সবুজ ফল অজস্র। কচি অবস্থায় ছিঁড়ে ভেঙে গন্ধ শুঁকতাম, বেশ লাগত। পুষ্ট হলে তুলে রোদে শুকিয়ে রাখা হত। মিছরির সঙ্গে পিঁপুল মরিচ তেজপাতা সেদ্ধ করে গরম গরম খেতে ভাল লাগত, কাসি হলে খুব খাওয়া হত, উপকার হত কি না মনে নেই। বনকাঁঠাল, মস্ত বড় উঁচু গাছ, ক্রিকেট বলের মতো, গাঢ় হলুদ রঙের ফল এবড়ো খেবড়ো চোপসানো, পাকলে বেশ নরম এবং ভিতরে কোয়া বিচি ইত্যাদি ঠিক কাঁঠালের মতোই, কিন্তু খুব ছোট ছোট, খাওয়া যায়, মিষ্টি-মিষ্টি রস। স্থানীয় নাম ডউয়া। কাঁকরোল, করমচা, কামরাঙা ঝোপেঝাড়ে অগুনতি।

কতরকম লতা,—কতরকম ছোটবড় গাছ, তাছাড়া দারুচিনি, তেজপাতা, সপেটা, লিচু, প্রভৃতি আমদানি করা গাচ, ভেরেণ্ডা, জিওল, বেড়াচিতা—এদের বিচিত্র স্পর্শের সঙ্গে, ঘ্রাণের সঙ্গে, বর্ণের সঙ্গে, মিলিয়ে ছিলাম। এরা ছিল আমার গায়ে গায়ে লাগা সব সঙ্গী। বাগানে গোলাপ, যুঁই, রজনীগন্ধা, টগর, চাঁপা, বেলী, কুটরাজ, (কুর্চি, এর শাদা ফুল কি সুন্দর মিষ্টি গন্ধযুক্ত।) কত বকুল, শিউলি, স্থলপদ্ম। গাবের ফুলের যে কি অপরূপ গন্ধ, তা আজও ভুলতে পারিনি। ঝোপে-ঝাড়ে ডুমুর গাছের তিন চারিটি পাতা জুড়ে টুনটুনি পাখীর বাসা, আম গাছের পাতা জুড়ে লাল ডেঁয়ে পিঁপড়ের বাসা, আর আম গাছের উঁচু ডালে মৌচাক। আতাফুলের অপূর্ব মিষ্টি গন্ধ। বাতাপি লেবু, সবই বন্য, ফল ছিঁড়ে ফুটবল খেলতাম। ঝোপে-ঝাড়ে ভারী ওজনের অজস্র নোনা ফল, পাখীরা ছাড়া খাবার কেউ নেই। জলে কলমী লতা, কি সুন্দর মৃদুগন্ধী ফুল তার। দূরে বিলভরা পদ্মবন, গাছে গাছে পাখীর মেলা—হলদে পাখী সবুজ পাতার আড়ালে আলোর ঝলকের মতো। ঘুঘু, বড় পাখী হাঁড়িচাঁচা, ডোবায় আহার সন্ধানী পানকৌড়ি, গাছের ডালে

দোয়েল, শালিক, চড়ুই, ফিঙে। লম্বা ঝাউ গাছের ডালে ডালে বাবুই পাখীর বাসা। ছোট ছোট ঝাউগাছের সারি নদীর পাড় রক্ষার জন্য সারবন্দীভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। বর্ষায়, ছোট অচল চন্দনা নদী পদ্মার রাঙা জলের প্রবল প্রবাহ নিয়ে এসে দুকূল প্লাবিত করে সবাইকে জলদানের পুণ্যলাভ করতে করতে বয়ে যায়। পদ্মানদী বর্ষায় অতি ভীষণ আকার ধারণ করে—যখন প্রথম বর্ষণের জলের অপরিমিত বোঝা বয়ে আনে আষাঢ় মাসে। তারপর গভীর গম্ভীর ভাবে ছুটে চলে সমুদ্রের দিকে। স্রোতের আবর্তে পাক খেয়ে খেয়ে ছুটতে থাকে, দূর থেকে কুলুকুলু ধ্বনি শোনা যায়। প্রথম উচ্ছ্বাসের গর্জন তখন কিছু শান্ত। আর কিছুক্ষণ পর পর 'বরিশাল গান্'-এর জোড়া গর্জন প্রতিধ্বনিত হয় সকল আকাশ বাতাসে দিনরাত। মাথার উপরে উন্মুক্ত আকাশ, বহু দূরে চিলের দল ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গাছে বসে কখনো ট্যাঁ—ট্যাঁ দীর্ঘ টানা কান্নার সুরে ডাকছে। এত মাছ যে দেশে, সে দেশে ওরা যে মাঝে মাঝে কাঁদে কেন বোঝা যায় না। এ বিষয়ে মাছরাঙা পাখীরা খুব ধীর স্থির, বাঁশের মাস্তলের মাথায় বসে থাকে, মাছ দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়ে জল থেকে একটিকে তুলে নিয়ে প্রাতরাশ অথবা মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করে। আর শাদা ডানায় গাঙচিল দলধরে নদীর উপরে উড়ে বেড়ায়, এরা খুব ভাল শিকারী। কাঠঠোকরা নারকল গাছের উপরে ঠোকা প্র্যাকটিস করছে ঠক ঠক ঠক। ঘোর গ্রীষ্মে আর বর্ষায় পথে ঘাটে এমনকি শোয়ার ঘরেও সাপের ভয়। পথে সাপ এক পাশ থেকে আর এক পাশে কত যে ছুটে যেতে দেখেছি। দক্ষিণ পাবনার পদ্মার ধারে যেখানে জীবনের প্রথম সতেরো আঠারো বছর কাটিয়েছি, সেখানে বাল্যকালে দেখেছি মনসা পূজার ঘটা। মনসা দেবী পাইকেরী ছাঁচে গড়া, ঠিক ডমরুর মত দেখতে, দুপাশে দুটো গোখুরো সাপ এঁকে বেঁকে মাথা তুলেছে, ঠিক বিড়ালের দুটি কানের মতো। সেই মাটির ডমরু আকারের মনসার উপর-অংশে কালো তুলিতে চোখ মুখ আঁকা হয় পোড়ানোর পর। তাতে রং লাগিয়ে কুমোরেরা বহু মনসা বিক্রি করত। তারপর পদ্মা নদীতে সেগুলিকে বিসর্জন দেওয়া হত। শৈশবে নদীর জল থেকে তা সংগ্রহ করার কি আগ্রহ! লাউডগা সাপ যে কত দেখেছি। এক ডাল থেকে আর এক ডালে চলে সেই লিকলিকে সবুজ রঙের সাপ। এরা নির্বিষ।

গ্রামের আকাশ-ভরা তারা, শহরে তেমন দেখি না। উজ্জ্বল ছায়াপথ

গ্রামের আকাশে শহরের মতো ছায়ায় ঢাকা থাকে না। হ্যালির ধূমকেতু, যা ১৯১০এ গ্রামে দেখেছি, তেমন আশ্চর্য আকাশ-পথিক এ জীবনে আর দেখা হবে না। কারণ এই মাটির পথিকের তখন কোনো চিহ্নই থাকবে না। সমস্ত আকাশ জোড়া সোনার সম্মার্জনী, সন্ধ্যাকাশের অভূতপূর্ব শোভা! একে আবার দেখা যাবে ১৬ বছর পরে ১৯৮৬ সনে।

জন্ম থেকে এই ভাবে এই সব বন্ধুদের প্রিয় সঙ্গে ধীরে ধীরে বড় হয়েছি। এই পরিবেশে যখন এক হয়ে মিলিয়ে ছিলাম, তখন এর প্রভাব যে জীবনে কতখানি তা বুঝব এমন ক্ষমতা ছিল না।

কত হাজার হাজার কোটি কোটি বছরের বিশ্ব ইতিহাস এই গাছপালা তৃণগুল্মের ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে আছে। এ রহস্যের আদি অন্ত নেই। মগজের আশ্রয়ে মন নামক এক অজ্ঞাত রহস্য বসে বসে নিজেকে কেন্দ্র করে সীমাহীন বিশ্বপরিধির ব্যাসার্ধ মাপছে। কিন্তু প্রথম জীবনে ছিল শুধু দেখার বিস্ময়, সে বিস্ময় শহরের জীবনে আর সম্পূর্ণ ফিরে এলো না। মন বারবার উড়ে যায় সেই ধূলিপথে, যেখানে ঘাসের বুকে সর্বাঙ্গ মেলে দিয়ে শুয়ে থাকলেও কেউ জিজ্ঞাসা করবে না এখানে শুয়ে কেন, কোনো গাড়িও গায়ের উপর দিয়ে দেহটিকে পোস্টমর্টেমে পাঠাবার উপযুক্ত করে নিষ্পেষিত করে যাবে না। শহরে বসে বসে সব জিনিস বিশ্লেষণ করার এক অনিষ্টকর মনোবৃত্তি লাভ করেছি।

আগে যে কোনো একটি গাছকে বা ফুলকে সম্পূর্ণ গাছ বা ফুল রূপে দেখেই আনন্দ পেতাম। এখন দেখি ডালটি বা কোন্ পাতাটি ত্রুটিপূর্ণ, গাছের কোন্ দিকটি ছেঁটে দিতে পারলে এই ত্রুটি বর্জন করা যাবে, ফুলের কোন্ পাপড়িটি কুঁকড়ে গিয়ে ফুলের সিমেট্রি নষ্ট করেছে ইত্যাদি।

আজ ৮ই নবেম্বর ১৯৭০, বেলা সাড়ে চারটে, এসব লিখছি দোতলার ছাতে বসে। অল্প দূরের কলের চিমনি থেকে ঘন কালো ধোঁয়া আকাশ আচ্ছন্ন করেছে। তবু ভাল, এই মুহূর্তে হাওয়া কোন্ অজ্ঞাত কারণে পূব থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে প্রবাহিত হচ্ছে, তাই উত্তরে অবস্থিত ধোঁয়ার স্রোত ঠিক মাথার উপর দিয়ে চলছে না। পূব দিকের তিন-চারটি বাড়ির পরে কোনো এক বাড়ি থেকে হাল্কা হিন্দি গানের রেকর্ড বাজছে, অশ্রাব্য মনে হচ্ছে।

আকাশ এখন সম্পূর্ণ মেঘশূন্য। মেঘ থাকলে এ লেখা হত না এখন।

সূর্যাস্তের আধঘণ্টা অন্তত দেরি আছে, ইতিমধ্যে প্রায় আধখানা চাঁদ মধ্যাকাশ থেকে কিছু পূব দিকে বসে আমার অস্বস্তিটা লক্ষ্য করছে। পাঁচটা কাক ছাতের খাটো প্রাচীরে বসে আছে। এই পরিবেশে গ্রামের স্মৃতি লিখছি।

মেঘ থাকলে সূর্যাস্তের সময় আকাশ জুড়ে যে বিচিত্র শোভা হয়, সে দৃশ্য থেকে চোখ এবং মন ফেরানো যায় না। এই বিচিত্র রঙের কল্পিত স্রষ্টাকে রবীন্দ্রনাথ সম্বোধন করেছেন রঙের পাগল বলে। আমিও তো প্রায় তাই, শুধু দর্শকরূপে। আকাশের শতরকম রঙের অযত্ন বিন্যাস মনকে অত্যন্ত উতলা করে তোলে। তা প্রতি মুহূর্তে নতুন। তিনশ চারশ কোটি বছর ধরে হয়তো পৃথিবীর আকাশে এমনি মেঘে মেঘে রঙের ভাঙাগড়া আর নতুন নতুন বিন্যাস চলেছে, কিন্তু আজও কোথাও দুটি মুহূর্তে তা একরকম হল না। আরো হাজার কোটি বছর ধরে এ খেলা চললেও কখনো দুটি জায়গার দুটি মুহূর্তের চেহারা এক হবে না। মনের মধ্যে এই সীমাহীন বর্ণ বৈচিত্র্যের শুধু প্রতিফলন হয়, ভাষার অভাবে সে বৈচিত্র্য প্রকাশ করা যায় না। বারবার সেই একই ভাষা ব্যবহার করতে হয়, উপায় নেই।

শহরে ছাতে বসে সন্ধ্যাকাশের সেই রঙের খেলার দিকে চাইলে তখন আমি যে শহরে আছি, তা সম্পূর্ণ ভুল হয়ে যায়। ৪০০ কোটি বছরের আকাশের গায়ে স্থানও নেই, কালও নেই, তার কোনো চিহ্নই নেই, আছে চিরকালের মেঘবিন্যাস আর বর্ণবিন্যাসের খেলা।

আমারই লেখা একখানি চিঠি বহু বছরের স্মৃতির যবনিকাখানি এতক্ষণ তুলে ধরেছিল। তার কারণ বোধহয় এই যে, আজ ১৯৭০এ যে পরিবেশে এসে পৌঁছেছি, সেখান থেকে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট কিছুই আর দেখতে পাচ্ছি না, তাই শৈশব থেকে অদ্যাবধি যে পরিবেশে, যাদের সঙ্গে, বাস করেছি, সেই সবের স্মৃতির মধ্যে নিজেকে বসিয়ে আরাম পাই। যে পথে চলে এসেছি এতদূর, সে পথে আবার স্মৃতির যাত্রা শুরু করে আনন্দ পাই। সবই সেই পরিচিত মানুষ, পরিচিত মাটি, পরিচিত পশুপাখী গাছপালার স্মৃতি। তাই এই পত্রস্মৃতি, এটি আত্মস্মৃতিরই অন্য নাম। দুঃখ রয়ে গেল এই যে, সব বলা হল না।

প্রসঙ্গত

পৃষ্ঠা—১৯

পরিচ্ছেদের শেষে পড়তে হবে : বারীন্দ্রকুমারের মৃত্যু হয় ১৮ই এপ্রিল ১৯৫৯। তাঁর আদ্যশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় ১৭ই মে। শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিতির জন্য আমন্ত্রণপত্র বহন করে এনেছিলেন বারীন্দ্রকুমারের 'মেজদা' মনোমোহন ঘোষের কন্যা শ্রীযুক্তা লতিকা ঘোষ। পত্রের নিচে প্রথম স্বাক্ষর তাঁর। আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি। তিনি খামের উপর লিখে গিয়েছিলেন

I missed you by some minutes

Lotika Ghosh (16. 5. 59)

লতিকা ঘোষের অনেক অনুরোধ আমি রেখেছি, কিন্তু এটি রাখতে পারিনি বলে দুঃখিত হয়েছিলাম।

পৃষ্ঠা—২৯

প্রমথ চৌধুরীর চিঠি ও আমার মন্তব্য বাদ পড়েছে। তা এই :

শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী—

কল্যাণীয়েষু, আমার লেখাটি পাঠাচ্ছি। হস্তাক্ষর খুব স্পষ্ট নয় তাই একখানি proof পাঠিয়ে দিয়ো। ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী ২১।৮।৩৯

এ চিঠি তাঁর 'অলকা' মাসিকের সম্পাদকীয় বিষয়ে। নিজের হাতের লেখার নিন্দা তিনি নিজেই করছেন, এটি তখন খুব উপভোগ করেছিলাম।

পৃষ্ঠা—১৩০

পি. সি. সরকার যুগান্তরে আমার টেবিলে তাসের ম্যাজিক দেখিয়েছিল ২৫।৮।৫৩ তারিখে। সে সময়ে বাইরের যাঁরা উপস্থিত ছিলেন : নিখিলচন্দ্র দাস, রঞ্জিৎ রায় (কমিক অভিনেতা), ও ডাক্তার পূর্ণেন্দুকুমার চট্টোপাধ্যায়।

পৃষ্ঠা—২২৬

"জাগিল কি ঘুমাল সে" নামক আমার মৃত্যুবিষয়ক প্রবন্ধ সম্পর্কে আরো একজন সমজদার আবিষ্কার করেছি, নাম রমেন মজুমদার, পরিচয় : আকাশবাণীর অনেক বিজ্ঞানের আসর পরিচালক ও যুগান্তর সাময়িকীতে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখক। আমাকে এক চিঠিতে (আমার ম্যাজিক লণ্ঠন নামক পুস্তকে) ঐ প্রবন্ধটি পাঠান্তে জানিয়েছিল—

'জাগিল কি ঘুমাল সে' রচনাটি পড়েছি দুবার। আমার মনে হয় এইটিই এ গ্রন্থের সবচেয়ে বেশি চিন্তাগর্ভ ও চিন্তা উদ্দীপক রচনা।...

পৃষ্ঠা—২২৮

বই উৎসর্গ করা প্রসঙ্গে যে ২৯ জনের নাম উল্লেখ করেছি, তার সঙ্গে দ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্যের নাম যোগ করতে হবে।

পৃষ্ঠা—৩৩১

যাঁরা আমাকে কবিতায় চিঠি লিখেছেন তাঁদের নামের সঙ্গে কবিশেখর কালিদাস রায়ের নাম যোগ হবে। এই পুস্তকেরই ৬ সংখ্যক পৃষ্ঠাতে তাঁর কবিতায় লেখা চিঠি দেখা যাবে।

নামসূচী

অ

অক্ষয়কুমার দত্ত ৪৯
অক্ষয়কুমার নন্দী ১৯১—১৯৩
অখিল নিয়োগী ১৭৪
অচিন্ত্য সেনগুপ্ত ২২১, ২৩৮, ২৩৯
অজিতকৃষ্ণ বসু (অকৃব) ২৩১
অজিত ঘোষ ১৭৪
অজিত চট্টোপাধ্যায় ২৬৬
অজিত দত্ত ২৯২
অঞ্জনা ভৌমিক (আরতি) ২৩২
অতুলচন্দ্র বসু ৫৪, ৬৯—৭৫, ৭৬, ২৮১
অতুলচন্দ্র সরকার (এ. সি. সরকার) ২৩০
অতুলানন্দ চক্রবর্তী ১২৩, ১৫৩, ১৫৫, ২৬২,
২৮০, ২৮১
অদ্রীশ বর্ধন ৩২৩
অনিলবরণ ঘোষ ১২৮
অন্নপূর্ণা গোস্বামী ১২৮
অপর্ণা দেব ১১৫, ১১৭, ১১৮
অপূর্বকৃষ্ণ দেব ১১৭, ১১৮
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২, ৫৪, ৭৫, ১২২, ১২৩
অবনী সেন ৫৩
অবলা বসু ৪৭
অভিজিৎ আচার্য ৩৬১
অমল দেব ১১৫
অমল হোম ৫৯, ৬৭, ৬৮, ৯৭, ১২১—১২৭,
৩১৪, ৩২৬
অমলা নন্দী ১৯২, ১৯৩
অমলাশঙ্কর ১৯১
অমৃতলাল বসু ১১৫
অমিতা রায় ৩৯৮—৪০৭
অমিয়া চৌধুরাণী, নীরদচন্দ্র চৌধুরী ২৯৪-৩২১
অমিয়া চৌধুরাণী ৪০৮,
অরবিন্দ ঘোষ ১৬, ১৭, ৪১০
অরুন্ধতী দেবী ৩১৮
অশোক চট্টোপাধ্যায় ২৩৬, ২৪৩,২৮১
অশোক বাগচী ২২৫
অশোক মৈত্র (আরণ্যক) ১৮০—১৯০
অশ্বিনী গুপ্ত ১১২
অসীমকৃষ্ণ দেব ১১৯
অসীমা গোস্বামী ১১৮
অহীন্দ্র চৌধুরী ২৪৮

আ

আনন্দমোহন বসু ৩২৬
আবদুল আজীজ আমান ১২৮, ৩৪৩
আরতি ভৌমিক (অঞ্জনা) ২৩২
আলতাফ চৌধুরী ২৩৬
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১২৮
আশু দে ১৭৮, ১৬৯—১৭৩, ২০৭
আশুতোষ রসন ৩৯১

ই

ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী ২৯—৩১
ইন্দুভূষণ রায় ২৪২
ইন্দুমতী বসু ৬২
ইন্দু মুখোপাধ্যায় ১৭৪, ১৭৫
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০১
ইলা পালচৌধুরী ৬১

ঈ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ২৭৯

উ

উৎপল দত্ত ১৪৭
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ৯২
উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১৬৫
উপেন্দ্র ভট্টাচার্য ৯৭
উমাপদ ভট্টাচার্য ১৭৩

উষাবতী (পটল) ১৭৪

ঋ

ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৭

ক

কনক মুখোপাধ্যায় ১২৮
কপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য ২৪, ২৩৬
কমলা সমাদ্দার ১৯৬
কাজি নজরুল ইসলাম ৪, ৫, ৪১, ৪২, ৪৫, ১৫৭, ১৯১, ২০৯
কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় ৯১, ৯২
কানাইলাল মুখোপাধ্যায় ২৮৯, ২৯০
কালিদাস নাগ ৫৮, ৫৯—৬২
কালিদাস রায় ২—১০, ১২৮, ১৫০, ৩৫৭
কালীকিঙ্কর ঘোষদস্তিদার ৫২, ৫৪, ৫৬, ৫৭, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৭৫, ৭৬, ১৫৩, ১৬৪
কিরণকুমার রায় ১, ৩, ৪, ৫, ৬৬, ১৩০, ১৪১, ১৫০—১৫৮, ২৩৬, ২৫১
কিশোরীমোহন চৌধুরী ১৪৩, ৩৯১
কীর্তিনারায়ণ চৌধুরী ২৯৬
কুমুদিনী মিত্র ৩০১
কৃষ্ণকুমার মিত্র ৩০১
কৃষ্ণধন ঘোষ (কে ডি ঘোষ) ১৫, ১৬, ১৭
কৃষ্ণধন দে ১৪১
কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ৩৩, ৫৯
কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৪৯
কেদারনাথ মজুমদার ৩২৪
কে. ভি. সেন ১১, ১২
ক্ষিতিমোহন সেন ৩৪৫
ক্ষীরোদ গুপ্ত ৩৯২

গ

গজেন্দ্রকুমার মিত্র ৮৭, ২২৬, ৩০৪, ৩১০, ৩৪৯
গজেন্দ্র ঘোষ ৭৫, ১৬৪
গণপতি চক্রবর্তী ২৩০
গান্ধীজি ৯২
গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী ১১৩
গীতশ্রী বন্দনা সেনগুপ্ত ৩৭৮
গীতা দাশ ১৯২
গুরুসদয় দত্ত ১৯৩
গোকুল নাগ ৬১
গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য ৪৭—৫১, ১৬৩, ২৮১
গোপাল ঘোষ ৭৫, ১৬৪
গোপালদাস মজুমদার ১৫৭
গোপাল ভাঁড় ৩৮
গোপাল হালদার ৯৪, ৯৫, ৯৯, ১০০, ১০১, ১৩৬
গোবর্ধন আশ ৫৩
গৌর মুখোপাধ্যায় ১১৬, ১১৭
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ৯৫
গ্র্যান্ট সাহেব ১৫

চ

চন্দ্রমুখী বসু ৯২
চন্দ্রশেখর বেঙ্কটরামন্ ১৬১
চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ৪১, ৮৯, ৯০, ২৯০, ২৯১
চারুচন্দ্র সান্যাল ৩৯২
চারুপ্রকাশ ঘোষ ১৬৬
চিত্রিতা দেবী ২৯
চিত্তরঞ্জন দাস ৯৯
চেস্টারটন ২৭০
চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায় ২৮১

জ

জগদিন্দ্রনাথ রায় ৩৯৬
জগদীশচন্দ্র বসু ২২, ৪৭, ১৬২, ১৯৫
জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য ২৫, ৪০
জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৩
জয়ন্তনাথ রায় ৩৯৭
জয়ন্তী সেন ২২৪, ৩০৫, ৩৫৫, ৩৫৯—৩৭৩
জলধর সেন ২৯০
জসীম উদ্দীন ২৩৫
জাহান-আরা বেগম ২৩৫, ২৩৬
জিতেন্দ্রনাথ চৌধুরী ২৮৯
জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৪৬
জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৭

জিলিয়াল ম্যালি ১০৪
জীবনময় রায় ২৪১—২৪৪
জ্যাকসন ১৬৫
জ্যোতির্ময় ঘোষ (ভাস্কর) ১২৮, ২০০—২০৪
জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় ৯৩
জ্যোতির্ময়ী দেবী ১
জ্যোতি সেন ৪১১

ড

ডাফ কুপার (ডাফ কুপার পুরস্কার, পুরস্কার প্রাপ্তদের নাম ও অন্যান্য তথ্য) ২৯৬, ২৯৭, ২৯৮

ত

তপতী বিশ্বাস ৪২৬—৪৩১
তারকনাথ পালিত ২৪
তারকমোহন দাস ১২৮
তারাকুমার মুখোপাধ্যায় ১৪৬
তারাচরণ গুই ১৭৭
তারাদাস মুখোপাধ্যায় ২২, ২৩, ২৪
তারাপদ চট্টোপাধ্যায় ৭০
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭০—১৭৭, ২৮১
তুলসীচরণ ভট্টাচার্য ২৯১
তুষারকান্তি ঘোষ ২০৩, ২৭২
তৃপ্তিলতা মজুমদার ৩৮৯
তেনজিং নোরকে ৪২৭
ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য ৩৮৯, ৩৯০
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ২৭৭, ৩১৮, ৩১৯, ৩২০, ৩৩৮, ৪১৪

দ

দক্ষিণারঞ্জন আচার্য ১৭৪
দক্ষিণারঞ্জন বসু ১২৮
দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ১৯৭—১৯৯
দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০, ৪৪
দিলীপকুমার রায় ১২০
দীনেশচন্দ্র সেন ৯৩
দীপনারায়ণ সিং ২৪, ২৫
দেবপ্রসাদ মিত্র ৯৫
দেবিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬৪
দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী ৫২—৫৬, ৫৮, ৬৩—৬৭, ৭১, ৩৯২
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১১১
দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৯১
দ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য ২৭০, ৪৪০
দ্বিজেন্দ্রকুমার সান্যাল ৯৬
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০, ৩৪২

ধ

ধরমবীর ১১১
ধীরেন্দ্র চৌধুরী ২৮৯
ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১২০
ধ্রুবনারায়ণ চৌধুরী ২৯৫, ২৯৬

ন

নন্দলাল বসু ১২
নবদ্বীপ হালদার ১৬৭, ১৬৮
নরেন্দ্র ঘোষ ১২৮, ২১২
নরম্যান লুইস ২৩৮, ২৪০
নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৮২, ২০২
নাটোর বড় তরফ বংশপরিচয় (শরৎসুন্দরী, গোবিন্দনাথ রায়, জগদিন্দ্রনাথ রায়, যোগীন্দ্রনাথ রায়, জয়ন্তনাথ রায়) ৩৮৯
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ২২১—২২৫, ৪০৯
নলিনীকান্ত সরকার ১, ৫, ৮, ১৬, ৩৭, ৪২, ১৪০, ১৯১, ২৬৬, ২৮১, ৩২৭
নলিনীরঞ্জন রায় ১, ১৭৯
নিখিলচন্দ্র দাস ১৭৮—১৬০, ২৪৭, ২৬৫ ২৬৬, ৩৯২
নিজাম হায়দারাবাদ ২৫, ২৬
নিতাই ঘটক ১৭৪
নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী ৬, ২৬, ২৭
নিবেদিতা ৬০, ৬১
নিবেদিতা বিশ্বাস ৩৭৯
নির্মলকুমার বসু ৪১১
নিশিকান্ত ৩৭, ৪৪

নীরদচন্দ্র চৌধুরী ৬৭, ৭৮, ১২১ ১২৩, ১২৪, ১৩২, ১৩৪, ১৩৫, ১৪৭, ১৫০, ১৫১, ২৮১, ৩২৬, ৪১১—৪১৩, ৪২১
নীরদচন্দ্র চৌধুরী অমিয়া চৌধুরী ২৯৪—৩২১
নীরদ মজুমদার ৭৬
নীরদ ভট্টাচার্য ৯৬, ৯৭
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ৭০, ১৪০, ২৩৬, ২৬৬, ২৬৯—২৮১
নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার ২৪০, ১৭৪
নেপোলিয়ন ১৩৯

প

পঙ্কজকুমার রায় (পি. কে. রায়) ১১০, ১১২
পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ১৫, ৯৩
পরিমল গোস্বামী ৪৩২
পানিকর ৬৫
পান্নালাল ঘোষ ১৫১, ১৫২
পি. বি. মুখার্জি (জাস্টিস), ৪১০
পুলিনবিহারী সেন ৪১, ৪২, ১০৮, ২৮২—২৯৩, ৩২৬, ৩৫৯
পৃথ্বীন্দ্রনাথ চৌধুরী ২৯৬
পোপ ২৩১
প্রতাপাদিত্য ২৪২
প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত ২৯২
প্রতুলচন্দ্র সরকার (পি. সি. সরকার) ২২৮—২৩৪, ৪৪০
প্রফুল্লচন্দ্র রায় (পি. সি. রায়)
প্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ী (পিসিএল) ২৪৫, ২৬৬
প্রফুল্লচন্দ্র সরকার ৯৩
প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় (মানিক) ১৬৫
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ২৮৫
প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ৯১—৯৯
প্রমথ চৌধুরী ২৪, ২৯, ৪২, ১১৫, ১২০, ৩৯৬, ৩৯৭, ৪৪০
প্রমথনাথ বিশী ৫, ২১, ১৪১, ১৫৯, ১৭৭, ১৯৬, ২০৫, ২৩৮, ২৪৫—২৪৯, ২৫১, ২৬৬, ২৭১, ২৮১, ৩১৪, ৩৪৯
প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় ৬৭
প্রমোদ দাসগুপ্ত ১৩০, ১৫৫
প্রাণতোষ ঘটক ১২১, ১২৭, ১২৮, ২৪৫, ২৬৩, ৩৬০
প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ৪২, ৪৩, ১৪৩
প্রেমেন্দ্র মিত্র ১২৮, ২২১, ২৫১, ২৬৬, ২৭১, ২৭২—২৮১, ৩৫০, ৩৫৯, ৩৭১

ফ

ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ ৪৭
ফণীন্দ্রনাথ মিত্র ১৩৪
ফণীন্দ্রনাথ রায় ১, ১২৯, ১৭৯
ফ্রানসিস টমসন ২৮৭
ফ্যারাডে ৫১

ব

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৭৯, ৮০
বঙ্কিমচন্দ্র সেন ৯৩, ৯৭
বটকৃষ্ণ ঘোষ ৭০, ২৮১
বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) ১২১, ১২৮, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৬, ১৫৩, ১৬৯, ১৭২, ২০৬, ২০৭, ২০৯, ২৩৫, ২৫৬—২৬৮, ২৮৯, ৩১৪, ৩৪৯
বরদাকান্ত রায়চৌধুরী ৩৮৯, ৩৯৬
বসন্ত রায় ২৪২
বাখ্ ৪১৩
বাণী রায় ১২৮
বারনার্ড শ ১০৭
বারট্রাণ্ড রাসেল ৩৮৬, ৪১৪
বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ১৪—১৯, ৪৪০
বাসন্তী বাগচী ৩৮৯, ৩৯৬
বাসব ঠাকুর ২১, ২৭, ৩৮১, ৩৮২, ৩৮৪
বিজয়কান্ত সেন ৪১১
বিজয়কৃষ্ণ বসু ৬১
বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় ৯৩, ৯৭, ৩২৩
বিধানচন্দ্র রায় ১৪৮
বিনয়কুমার সরকার ১০—১৩
বিনয়কৃষ্ণ দত্ত ৫৭

বিনয়কৃষ্ণ দেব ১১৩
বিনয় ঘোষ ১২৮
বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ৫৪, ২৮৯, ২৯০, ২৯১, ২৯৮, ৩৩৭
বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ৬৪, ৯৪, ২০৪, ২১০ ২৬২
বিভাস রায়চৌধুরী ৫৮
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭০, ১২১, ১১২—১৪১, ১৭৭, ১৬৩, ১৬৪, ১৯৪, ২০৭, ২১১, ২৮১, ২৯৭, ৩১০, ৩১৪, ৩৪৯, ৩৫১, ৩৬১
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ১২৮, ৩৪৭—৩৭১, ৩৭৭
বিভূতিভূষণ সেন ২০৭
বিমলচন্দ্র ঘোষ ৪০৯, ৪১০
বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী ৩১৬, ৩৮৮—৩৯৬
বিমলা দাস ৯৪
বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ২০৩, ২২৩
বিশ্বদেব বিশ্বাস ৪২৮
বিশ্বনাথ রায় ১২৮
বিহারীলাল গোস্বামী ১৭৭
বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ১৪০, ১৭৭, ২০৮, ২০৯, ২১৪, ২৪৮, ২৮১
বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬
বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ১৭৪
বীরেন্দ্রনাথ রায় ১৮৩
বেণীমাধব দাস ৯৪
বেনজির আহমদ ২৩৫, ২৩৬
বেলা ভট্টাচার্য ৩০৬
ব্যোমকেশ মজুমদার ২৮৯
ব্রজরঞ্জন রায় ৯৭
ব্রজেন্দ্রকান্ত রায়চৌধুরী ৩৮৯
ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ৩৮৯
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩, ১২১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৭, ১৭৭—১৭৯, ১৮০, ২০৮, ২২৩, ২৯৯
ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ৬০, ৬২
ব্রতিশঙ্কর রায় ৫৭, ৫৮, ৩৪৯
ব্র্যাডলি বার্ট ১৮৭

ভ

ভবতোষ দত্ত ২৯২
ভিতরবন্দ রংপুর জমিদার বংশ (ভগবতী দেবী, বরদাকান্ত রায়চৌধুরী, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, ব্রজেন্দ্রকান্ত রায়চৌধুরী, হেমন্তবালা দেবী বিমলাকান্ত বাসন্তী, কিশোরকান্ত) ৩৮৯
ভূপেন্দ্রনাথ নন্দী ১৪০, ১৪১
ভূষণচন্দ্র দাস ৩৪৯
ভোলতেয়র ৩২৩
ভোলা চট্টোপাধ্যায় (ভি-সি) ৫৬, ৫৭, ৭৫
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় ১৭২

ম

মঞ্জু আচার্য ২০
মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৬
মণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দার ১, ৭৮, ১৩২, ১৯৪—১৯৬
মণীন্দ্র রায় ৯৪, ৯১
মধুসূদন দত্ত ৭৫
মনীশ ঘটক ২২৯ ৩২৮
মনোজ বসু ১২৮, ১৭৭, ২২১, ২২৪, ২৪৮, ২৮১
মনোমোহন ঘোষ ৩, ১৬
মন্মথনাথ বসু ২৪৮
মহাঋষি মহেশ ১৭৭, ১৭৮
মহারাজা কাশিমবাজার ৪
মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য ১২৮
মহেন্দ্রনাথ সরকার ২৬২
মাখনলাল সেন ৯৬, ৯৭, ৯৮
মানসী চৌধুরী ১১৪
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ৫, ১৬৫—১৬৬, ২৫১, ২৮১
মায়া বসু ১২৮, ২৩৬—২৪০
মারগারেট চাটার্জি ৩০৪, ৩০৯, ৪০৮—৪১৬

মীরা দেবী ৪২
মুকুল দে ৫৩
মুজাফফর আহম্মদ ৪৫
মুসোলিনী ৬৪
মৃণাল ঘোষ ২০৯
মেণ্ডেল ৫১, ৩৯৭
মৈত্রেয়ী দেবী ৩৮০—৩৮৭
মোহিতলাল মজুমদার ৪২, ৭০, ২৪৫, ২৮১, ৩৪৯
ম্যাক্স মুয়েলার ৩১৮, ৩২০
ম্যাটারলিংক ৭১

য

যতীন্দ্রকুমার সেন ৯০
যতীন্দ্রনাথ মৈত্র ৩৯১
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ৫
যতীন্দ্রমোহন বাগচী ১৫৭
যদুনাথ সরকার ৪০, ১৭৭, ৩১৪
যামিনী রায় ২৮১
যোগানন্দ দাস ২৬৬
যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ১৩৩, ১৯৪
যোগেশচন্দ্র বাগল ৩৩

র

রঙীন হালদার ১৩০, ১৩৪
রজনীকান্ত গুহ ৩২৪
রঞ্জিৎ রায় ২৬৬
রণজিতকুমার সেন ১২৮
রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০
রমা চৌধুরী ৩২৬
রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৩
রমেন্দ্র চক্রবর্তী ২৯৯
রবি বর্মা ১২, ৩৯০
রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ১৭২, ১৭৭
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭, ৮, ২০, ২১ ২৩, ২৪, ২৯, ৩০ ৩২, ৩৮, ৩৯, ৪৫, ৪৬, ৫৪, ৫৯, ৬২, ৭৩, ৮৮, ৯৭, ১১১, ১১২, ১২১, ১২৩, ১৫২, ১৭৯, ১৭৩, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৯৭, ২৪৮, ২৮৬, ২৮৭, ৩০৩, ৩১১, ৩২২, ৩৪০, ৩৪৫, ৩৪৯, ৩৭২, ৩৮০, ৩৮১, ৪১৩
রাঙামা ১৫, ১৬, ১৭
রাজকৃষ্ণ দেব ১১৭
রাজনারায়ণ বসু ১৫, ১৭
রাজশেখর বসু ৭৮, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৪—৯০
রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৯৫
রাজ্যেশ্বর মিত্র ৩৯২
রাণু ভৌমিক ১২৮
রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ৩, ৪
রাধাকান্ত দেব ১১৭
রাধাচরণ চক্রবর্তী ১১
রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় ৭০
রাণী চন্দ ২৮৬
রামচন্দ্র অধিকারী ৪০, ৪২, ৪৬
রামমোহন রায় ৯৭
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ৩৩, ১৬১, ২৪২, ৩২২
রেবা রায় ১৯৯
রেমব্রান্ট ৪১

ল

ল চ গী [illegible]
লাল মিয়া ২৩৫, ২৩৬
লালা তারিণীচরণ ১৫
লীলা বন্দ্যোপাধ্যায় ৪০
লীলা মজুমদার [illegible]২, ১২৮, ২২৩, ২২৪, ৩৭৭—[illegible]
লীলা সিং ২৪, ২৫
লেলে (বিষ্ণু ভাস্কর) ১৬

শ

শম্ভু রায় ৪
শম্ভু সাহা ১২৪, ১২৫
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৯৫, ১৯৫
শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ৪১, ৪২, ৯৭, ১১৮
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৮, ১৩৩, ১৭৭, ২০৬—২২১, ২৪৬, ৩৪৯
শশিশেখর বসু ৭৮—৮৩, ৮৪, ১৯৫, ৩৪৯
শান্তা দেবী ৬০, ২৪২
শান্তা মজুমদার (শানু) ৭৬

শান্তি ঘোষ ৯৯
শিবদাস বসুমল্লিক ২৫৬
শিবরাম চক্রবর্তী ১৬৮, ২০৫
শিশিরকুমার ভাদুড়ি ২৮, ৪০, ৪১, ১৪২—১৪৯, ১৭৪, ৩২৫, ৩৯১
শীতলাকান্ত শীল ১৮০—১৮৬
শুভচারী দাশগুপ্ত ৩৮২
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ২৮১
শৈলেন চৌধুরী ১৭৪, ১৭৫
শৈলেশ দত্তগুপ্ত ১৭৪
শোভা রায় ১১৪
শোভা সেন ১৪৭
শ্রীচৈতন্য দেব ৩৪০, ৩৪১
শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ৪৯

স

সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য ৭
সজনীকান্ত দাস ৭, ৮, ২০, ২১, ২২, ৪১, ৪৭, ৪৮, ৭০, ৯৩, ৯৮, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৭, ৬৪, ১৭৭, ২০৭, ২৭১, ২৬৬
সতীনাথ ভাদুড়ী ৩৭১
সতীশচন্দ্র রায় ৪৪, ৪৬
সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় ২৬৮
সত্যজিৎ রায় ৩৭০
সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ২৮১
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ৯৭
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ৯২, ৯৩
সত্যেন্দ্রনাথ বসু ১১৫, ১১৬, ১১৮, ১১৯
সন্তোষকুমার ঘোষ ৩৯৬
সন্তোষ সিংহ ২৪৮
সবিতা সেনগুপ্ত ৪৭
সমরেশ ভট্টাচার্য ২৫৬
সরযূবালা দেবী ২০৮
সরলা (লাহিড়ী) ২০
সরোজ আচার্য ৯৪, ৯৯—১১২
সরোজকুমার রায়চৌধুরী ১২৮, ১৬৩, ৩৪৯
সরোজনলিনী দত্ত ১১, ২০, ২২
সরোজিনী ঘোষ ১৭
সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ৩, ৪, ১৫৬, ২৫১, ২৮০, ৩৯২
সারদারঞ্জন রায় ৩৯১
সুকমলকান্তি ঘোষ ৩৮৪
সুকুমার সেন ২৮১, ৩৮১
সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী ৭, ৫৭, ১৫৪, ১৭৭, ১৮০, ১৮৩, ২৮১
সুধাংশু বসু ৯৪
সুধীরচন্দ্র সরকার ২৬৬
সুধাকান্ত রায়চৌধুরী ১৬—৪৬
সুধীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৭৭
সুধীরকুমার খাস্তগির ৪১৩
সুধীরকুমার চৌধুরী ৩২২—৩২৮
সুধীরকুমার বসু ৩৯৮
সুধীরকুমার ভট্টাচার্য ১৩৬
সুধীরকুমার মজুমদার ৩৭৭
সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ১২৮
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৪১, ৪২, ৭৯, ১১৩, ১১৭, ১১৯, ১২৩, ২৮১, ২৯৯, ৩১৪
সুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৭৫
সুবিমল লাহিড়ী ২৯৩
সুভাষচন্দ্র বসু ১১২
সুভো ঠাকুর ২৭, ৭৪, ৩৮২
সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ৩৮৯
সুরেন্দ্রমোহন চৌধুরী ১৪৩
সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ১৭৩—১৭৬
সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (কাশী) ১৭৬
সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস ৭০
সুরেশচন্দ্র মজুমদার ৯৭, ১০০, ১০১
সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ১২৩
সুশীল দে ৩৪৯
সুশীত রায় ১১৪
সুশীলমাধব মল্লিক ১৩৪, ১৩৫
সুশীলকুমার দে ৭০, ২৮১
সূর্য রায় ৭৫



নামসূচী

সুহাস রায় ৩
সৈয়দ মুজতবা আলী ২৪৫, ৩৩৭—৩৪৬
স্ক্রিমজার ৩
স্টিফেন ৩
স্টিফেন লীকক ১৫৫
স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য ১৬৬—১৬৮
স্বরা সেন ৪১২
স্বর্ণলতা ঘোষ ১৬
স্বামী বিবেকানন্দ ৬০, ৬১, ১৫১, ৩৪০, ৩৪১
স্মৃতি ঠাকুর ২৮, ৩৮২

হ

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪১
হরিনাথ দে ৩৪৫
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ১২৮
হরিপদ রায় ২১, ২৮১
হরীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৬২
হলডেন ২২৫
হারীতকৃষ্ণ দেব ১১৩—১২০
হিমানীশ গোস্বামী ১০৪
হিরণকুমার সান্যাল ১২৪, ১২৫
হেজলিট ১৮৫
হেমচন্দ্র বাগচী ৭০, ২৮১
হেমন্তবালা দেবী ২১, ৩১৬, ৩৮৯, ৩৯৬
হেমলতা ঠাকুর ১১, ২০—২৬
হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ১২৭, ৩৯২
হেমেন্দ্রকুমার রায় ৯৫, ১২২, ১২৩ ১২৮, ১৪৯
হেমেন্দ্র দাশগুপ্ত ২৪৮
হেমেন্দ্র বসু ১২
হেরম্বচন্দ্র মৈত্র ৩, ১৮৯
হৈমন্তী গোস্বামী ৭৭, ৩৯৭

সংযোজন

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ৩৪৯, পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ ৪১৭, বিনয়কৃষ্ণ দত্ত ৩৪৯

তাঁর ব্যক্তিত্বের আর দর্শনশীল আলোকচিত্র দেখতে পেয়েও তাঁর সাধুবাদ করব। বইখানির documentary value অর্থাৎ সাময়িক জীবনের নজীর প্রকাশন, এর একটি বিশেষ মূল্য আছে, আর সেদিক থেকে এই বইয়ের একটি মর্যাদা চিরকাল থাকবে। ·· (কথাসাহিত্য)

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত বলেন

···কয়েকজন সাহিত্যিক, সাংবাদিক, অভিনেতা, অধ্যাপক প্রভৃতির কথা।···পরিচ্ছেদগুলির একটিব সঙ্গে আব একটির কোনও যোগ নেই। কিন্তু সব মিলিয়ে যে যুগ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, সেই যুগের ছবি হয়ে উঠেছে। একটি বিশেষ কারণেও এই বইটির দুর্লভ মূল্য আছে। এমন কয়েকজনেব কথা পবিমলবাবু বলেছেন জীবিত কালেও যাঁদের খ্যাতি একটি ছোট পাঠক গোষ্ঠীব মধ্যে আবদ্ধ ছিল। তাঁদের কথা আমবা প্রায় বিস্মৃত হয়েছি অথচ তাঁদেব কথা বাদ দিলে গত পঞ্চাশ বছরের বাংলা সাহিত্য ও সমাজেব পবিচয় সম্পূর্ণ হয় না। ইতিহাস লেখকেরা সম্পূর্ণ কর্তব্য পালন কবেননি। পরিমলবাবু সেই ত্রুটি এই গ্রন্থে ঢেকে দিতে চেষ্টা কবেছেন। বনবিহাবী মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য কিংবা জ্যোতির্ময়ী দেবীর কথা এর পূর্বে বোধহয় কেউ বলেননি। এঁরা প্রত্যেকেই আত্মপ্রচারে উদাসীন, এবং মনের দিক থেকে নির্লিপ্ত। পবিমলবাবুর লেখায় তাঁদেব সাহিত্যগুণ এবং চরিত্রের অন্যান্য দিক স্পষ্ট হয়েছে।·· একটি বিলুপ্তপ্রায় কালকে পরিমলবাবু ধরে বেখেছেন এবং তাঁর কলম একসঙ্গে তুলি কলম ও ক্যামেরার কাজ করেছে। (আকাশবাণী)

পরিমল গোস্বামী রচিত

আধুনিক ব্যঙ্গ পরিচয়

মূল্য—ছয় টাকা

"আধুনিক ব্যঙ্গ পরিচয়-এ পরিচয় আছে ঈশ্বর গুপ্ত থেকে হালের ব্যঙ্গ রসিকদের ব্যঙ্গ রচনার। কার কৌতুক রচনা কোন্ জাতের, কার ব্যঙ্গের কোন্ লক্ষ্য, প্রতিটি আলোচনায় লেখক তা উদাহরণ দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। শুধু তাই নয়, ব্যঙ্গের মধ্যেই ব্যঙ্গকাব্যের মেজাজ মানসিকতার ছাপ পড়ে বলে পরিমলবাবু রচনার সূত্র ধরে সেই মানসিকতারও খোঁজ করার চেষ্টা করেছেন। বই-এর ব্যঙ্গ থেকে ভোট-ব্যঙ্গ, হাল আমলের খবরের কাগজের ব্যঙ্গ, কোনো ব্যঙ্গই পরিমলবাবুর আলোচনা থেকে বাদ পড়েনি।"

আনন্দবাজার পত্রিকা ১৮।১১।৭০

প্রখ্যাত সমালোচক

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী বলেন

বাংলা ভাষায় ব্যঙ্গ সাহিত্য সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।



যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত
অধ্যাপক ও বাংলা বিভাগের প্রধান

শ্রীঅজিত দত্ত বলেন

সাহিত্যানুরাগী পাঠক বইটির আগাগোড়া একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্বের স্পর্শ পেয়ে খুশি হবেন।



প্রেসিডেন্সি কলেজের বাংলাসাহিত্যের
অধ্যাপক

শ্রীভবতোষ দত্ত বলেন

মনে হয় আধুনিক ব্যঙ্গ পরিচয়ের ভূমিকাতে ব্যঙ্গের লক্ষণ যেরকম সুনির্দিষ্ট এবং পরিষ্কার করে বলা হয়েছে এমন আর কোন বইতে হয়েছে বলে জানি না।

পরিমল গোস্বামী রচিত গ্রন্থ তালিকা

১৯৩৬—১৯৭১

ছোটগল্প, বড়গল্প

বুদ্বুদ ১৯৩৬
ট্রামের সেই লোকটি ১৯৩৪
ব্ল্যাক মার্কেট ১৯৪৫
শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গগল্প ১৯৫৪
মারকে লেঙ্গে ১৯৫০
বারোভূতের আসব ১৯৬২
ডিটেকটিভ শিবনাথ ১৯৪৪
শুভবিবাহ ১৯৬৯

স্মৃতিকথা

স্মৃতিচিত্রণ ১৯৫৮
দ্বিতীয় স্মৃতি ১৯৬২
আমি যাঁদের দেখেছি ১৯৬৯
পত্রস্মৃতি ১৯৭১

প্রবন্ধ রম্যরচনা ভ্রমণ

ম্যাজিক লণ্ঠন ১৯৫৫
সপ্তপঞ্চ ১৯৫৭
ইতশ্চেতঃ ১৯৬২
আধুনিক ব্যঙ্গ পরিচয় ১৯৬৬
রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান ১৯৭০
পাশে পাশে ১৯৬৬

নাটক

দুষ্মন্তের বিচার ১৯৪১
ঘুঘু ১৯৪১
দন্তপ্রলয় ১৯৬৮

অনুবাদ

বারট্রাণ্ড রাসেল ঃ
সুখের সন্ধানে ১৯৬০
আর. বীড ঃ
ইংরেজ ডিটেকটিভের চোখে
প্রাচীন কলকাতা ১৯৬৭

ফোটোগ্রাফি

ক্যামেরার ছবি ১৯৪২
আধুনিক আলোকচিত্রণ ১৯৫১

কিশোর পাঠ্য

আষাঢ়ে দেশে ১৯৪৪
মেরুপথের যাত্রীদল ১৯৫৭
স্কুলের মেয়েরা ১৯৫৮
রোল নম্বর ২০৫ ১৯৬২

সম্পাদিত গ্রন্থ

মহামন্বন্তর ১৯৪৪
ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী ১৯৫৮

বর্তমান গ্রন্থ পত্রস্মৃতি বাদে অন্য যে পুস্তকগুলি মাত্র এখন পাওয়া যা শুভবিবাহ, আমি যাঁদের দেখেছি, আধুনিক ব্যঙ্গ পরিচয়, দন্তপ্রলয়, সু সন্ধানে, ইতশ্চেতঃ, স্কুলের মেয়েরা, রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান।